	লেখক	পৃষ্ঠা
বিতা)	চিত্তরঞ্জন দাশ	১
(গল্প)	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	২
	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৯
	শ্রীকালিদাস রায়	১৬
	শ্রীরামেন্দু দত্ত	২৭
)	চিত্তরঞ্জন দাশ	৩০
ল্প)	শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	৩১
	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৩৬
	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	[illegible]
কবিতা)	ইন্দিরা দেবী	
গল্প)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	
)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৬১
গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৬২
মনীতি (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	
বিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
তপূর্ব্ব কবিতা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	
বতীর পক্ষ (নক্সা)	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
[illegible]	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	
	শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য	
[illegible]াঠ (ছড়া)	শ্রীঅমৃতলাল বসু	
র (নাটক)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
	শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচ	
)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ	
[illegible] (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ	
[illegible] (চিত্র [illegible]		

*
দেশীয়
*
মূলধনে
*
প্রতিষ্ঠিত,
*
দেশীয়
*
লোকের
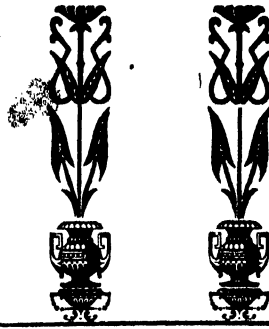
সুদিনে দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

হিন্দুস্থানে জীবন বীমা

করিলে পরিজনগণের জন্য ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে **হইবে না।**

*
দেশীয়ের জ
*
বীমা
*
কোম্পানি
*
দেশীয়
*
কোম্পানীর
*
মধ্যে
*
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
*

ইতিহাস) — শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০১
াম (কবিতা) — শ্রীরামেন্দু দত্ত — ২১০
কুরী ও রেডিয়াম (বিজ্ঞান) — শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় — ২১১
প্রকৃতি (পক্ষীবিজ্ঞান) — শ্রীসত্যচরণ লাহা — ২১৪
নচিত্র নক্সা) — শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার — ২১৭
(উপন্যাস) — শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ২২৪
ড়ি (গল্প) — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — ২৩৫
া (কবিতা) — শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ — ২৪২
া (গল্প) — শ্রীপ্রমথ চৌধুরী — ২৪৩
চক (প্রবন্ধ) — শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী — ২৫১
াগরে দুই দিন (রাজনীতিক নক্সা) — শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল — ২৫৮
৫ (নক্সা) — শ্রীঅমৃতলাল বসু — ২৬৯
স্বাস্থ্য (স্বাস্থ্যবিজ্ঞান) — শ্রীচুণিলাল বসু — ২৭৬
আত্মোৎসর্গ (নক্সা) — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার — ২৮৬
চিড়িয়াখানা (চিত্রে নক্সা) — — — ২৮৮
আশীর্ব্বাদ (গল্প) — শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী — ২৯১
— মহাত্মা গন্ধী — ৩০৭
র জীবন ও প্রাণীজীবন (সন্দর্ভ) — শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু — ৩০৮

চিত্র-সূচী

ত্রিবর্ণ চিত্র

	চিত্র	শিল্পী	পৃষ্ঠা
	শারদীয়া	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার	প্রচ্ছদ-পট
	জ্যোৎস্নায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	প্রথম
	শিশির-বিন্দু	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮
	দেবার্চ্চনে	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৮
	কুমারের রোগশয্যা	শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬
	ভাবাবেশে	শ্রীভবানীচরণ লাহা	৪৪
	চিত্রলেখা	এস, জে, ঠাকুর সিং	৬০
	দেবদূতরূপে নলরাজা	শ্রীবামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৮
	সরস্বতীর কমল বনে	শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৬
১০	ঘরে ও বাহিরে	শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ	৮৪
১১	ওমর খৈয়ম	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার	১০৮
১২	তথাগত	শ্রীনন্দলাল বসু	১৪০
১৩	লিপি	শ্রীঅলীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৬
১৪	আঁধারে	শ্রীভবানীচরণ লাহা	১৮০
১৫	কুসুম ও কণ্টক	শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ	১৯৬
১৬	শালিক	শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুমারী	২১৬
১৭	বয়ঃসন্ধি	শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৪৪
১৮	গদ্যপদ্য	শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬০
১৯	দীপালোকে	শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত	৩০৪

মের সৌধ ১০
টপিটার্স গির্জ্জার অভ্যন্তর ১১
টপলস গির্জ্জার অভ্যন্তর ১৩
ামিড ১৫
লাসিয়ম ১৭
ারাম ১৯
[illegible] ২০
ট এঞ্জেলো ২১
স্তার মন্দির ২২
পিয়ামওয়ে সমাধি ২৩
ষ্টান্টাইনের তোরণ ২৪
নমোহনের পুরাতন মন্দির ২০১
ানোট টিলা ২০২
সাদেবীর টিলা ২০২
মকদফিসের মূর্ত্তি ২০৩
ঐ ২০৩
টরা টিলা ২০৪
মুণ্ডা টিলা ২০৪
শিস্কের মূর্ত্তি ২০৫
প্তমাতৃকামূর্ত্তি ২০৫
প্তসমুদ্রী টিলার শিবলিঙ্গ ২০৬
র্য্যমূর্ত্তি ২০৬
প্তমি টিলার শ্রীমূর্ত্তি ২০৭
গাবিন্দজীর পুরাতন মন্দির ২০৭
গাবর্দ্ধন ধারণ ২০৮
গলকিশোরের মন্দির ২০৮
গাবিন্দজীর মন্দিরের অভ্যন্তর ২০৯
গলকিশোরের মন্দির ২০৯
ড্যাডাম কুরী ২১১

দীর্ঘ চিত্র

মুনাতীরে মথুরা ২০৮

৫২। কা[illegible]ওয়া ১৬১
৫৩। শাশুড়ী ও বধূ ১৬১
৫৪। পাচক ও প্রভূ ১৬২
৫৫। স্ত্রী ও জুয়াড়ী স্বামী ১৬৩
৫৬। গৃহস্বামী ও কমিশনার ১৬৪
৫৭। বধূ ও পিসশাশুড়ী ১৬৫
৫৮। ভদ্র লোক ও বীমার দালাল ১৬৬
৫৯। কেরাণী ও "বড় বাবু" ১৬৭
৬০। গহনার হুকুম ১৬৮
৬১। বেত্রাঘাত ১৬৯
৬২। রোগী ও ডাক্তার ১৭০
৬৩। পথিক ও কনেষ্টবল ১৭১
৬৪। নারী ও অত্যাচারী ১৭২
৬৫। হেমলতা ১৭৩
৬৬। লেডী ডাক্তার ২১৮
৬৭। নিরুপম বাবু ও বিড়াল ২১৮
৬৮। হেমলতা ও বিড়াল ২১৯
৬৯। নিরুপমের দুর্গতি ২১৯
৭০। হেমলতা ও নিরুপম ২২১
৭১। দ্রব্যং মূল্যেন (শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন) ২২৩
দুনিয়ার চিড়িয়াখানা—(শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ) ২৮৩
৭২। পুরুষসিংহ ২৮৮
৭৩। ফড়িং ২৮৯
৭৪। পা-চাটা কুকুর [illegible]
৭৫। সুখের পায়রা ২৯০
৭৬। ধর্ম্মের ষাঁড় ২৯১
৭৭। শকুনি ২৯১
৭৮। গভীর জলের মাছ ২৯২
৭৯। গজেন্দ্রগামিনী ২৯২
৮০। টাকার কুমীর ২৯৩
৮১। পাঁটা ২৯৪
৮২। গাধা ২৯৪
৮৩। কোলা ব্যাং ২৯৫
৮৪। আস্ত বাঁদর ২৯৫
৮৫। মেনী ২৯৬

১৩৩২

বাঙ্গালীর সঙ্গীত

আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ
গাহিছে আশার গীতি, পূর্ণ কর আশ ;
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু নহে কাপুরুষ
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস ।

করহ সার্থক আজ সত্যেরে সাধিয়া
দূর করি' হিংসাদ্বেষ বিদ্রূপ বিলাস ;
এই মহামন্ত্র রাখি বক্ষেতে বাঁধিয়া
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস ।

ওই হের, দেবতারা প্রসন্ন হইয়া
লিখেছে গগন-ভালে রবি-রশ্মি দিয়া—
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস ।

ওই শুন, দৈববাণী গগনে গর্জ্জিয়া
আলোড়িছে বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রাণমন ;
আপন কর্ম্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন ।

শুনো না অলীক কথা মিথ্যা প্রলোভন
সঁপিও না সর্ব্ব আশা বিদেশি-চরণে,—
দূর কর দুর্দ্দিনের মিথ্যা আরাধন
সত্যেরে সহায় কর জীবনে মরণে !

দেবতা কহিছে কথা অন্তর ভরিয়া
দেবতার বাক্যে আজ পূর্ণ কর মন ।
আপন কর্ম্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া
আপন ধর্ম্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন ।

প্রজাপতির পরিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

উকীলের চিঠি

সন্ধ্যার পর আদালত হইতে গৃহে ফিরিয়া, প্রৌঢ়বয়স্ক উকীল শ্রীযুত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতলে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, একখানা-হাত ভাঙ্গা ইজি-চেয়ারের উপর লম্বমান হইয়া, একেবারে যেন এলাইয়া পড়িলেন। চাপকানটি খুলিয়া রাখার সামর্থ্যও তাঁহার দেহে যেন আজ আর নাই।

গৃহিণী রান্নাঘর হইতেই স্বামীর পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন; তিনি তখন ময়দা মাখিতেছেন, বড় মেয়ে কমলা তাঁহার কাছে বসিয়া কুটনা কুটিতেছে। ময়দা মাখা শেষ হইতে প্রায় ৫ মিনিট লাগিল; গৃহিণী তখন হাত ধুইয়া, চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া, কমলাকে রুটী ক'খানা বেলিয়া রাখিতে বলিয়া, স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাগা, এখনও পোষাক ছাড়নি ?"

শ্যামাচরণ বাবু নীরবে মাথাটি নাড়িলেন।

গৃহিণী শঙ্কাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা, অমন ক'রে রয়েছ কেন ? শরীর ভাল আছে ত ?"—সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিলেন,—না, গা গরম হয় নাই।

শ্যাম বাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "শরীর ভালই আছে "

"তবে তুমি অমন ক'রে রয়েছ কেন, বল না! আজ কি বেশী মেহনত হয়েছে? আদালতে বেশী কায ছিল ?"

শেষের কথাটিতে শ্যামাচরণের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল—সেটা দুঃখের হাসি। আজ বিশ বৎসর ত প্র্যাকটিস্ হইল, মক্কেলের কাযের ভিড়ে মারা যাইবার অবস্থা ত এ পর্য্যন্ত কোনও দিন হয় নাই। তিনি প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না; ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চাপকানটি খুলিয়া স্ত্রীর হাতে দিলেন। হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে যাইতেছিলেন, গৃহিণী বলিলেন, "তুমি ব'স ব'স, আমি খুলে দিচ্চি।"

স্ত্রীর সাহায্যে বস্ত্রপরিবর্ত্তন সমাধা করিয়া শ্যাম বাবু বলিলেন, "খবর খারাপ; হংসরাজ সুন্দরমলরা উকীলের চিঠি দিয়েছে, এক মাসের মধ্যে তাদের টাকা শোধ না করলে নালিশ করবে।"—বলিয়া শ্যাম বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "বটে! তা, সে কথা এখন আর ভেবে কি করবে বল! এক মাস ত সময় আছে, সে তখন যা হবার, তাই হবে। তুমি যাও, হাতে মুখে জল দাও, আমি তোমার চা ঠিক করি গে।"

"যাই"—বলিয়া শ্যামাচরণ গামছাখানি কাঁধে লইয়া, নীচে নামিয়া গেলেন।

শ্যামাচরণ বাবুর বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। নিবাস হালিসহর গ্রামে। প্রত্যহ নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া হুগলির আদালতে ওকালতী করিতে গিয়া থাকেন। তাঁহার একটি পুত্র, দুইটি কন্যা। পুত্র সুরেন্দ্রনাথের বয়স ২২ বৎসর। হুগলি কলেজ হইতে বি, এ, কলিকাতায় আইন পাশ করিয়া দুই বৎসর যাবৎ সে অধ্যয়ন করিতেছে। বড় মেয়ে কমলা সন্তান-সম্ভাবিতা, মাসখানেক হইল পিতৃগৃহে আসিয়াছে। ছোট সরলা নিজ শ্বশুরালয়েই রহিয়াছে।

কন্যা দুইটির বিবাহ দিয়া শ্যামাচরণ বাবু ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। হুগলির হংসরাজ সুন্দরমল মাড়োয়ারী ফারমের নিকট হাণ্ডনোটে তিন হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। আসলের ত কথাই নাই, সুদটাও যে সব মাসে ফেলিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। তাহাদের প্রাপ্য এখন চার হাজার টাকার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। উপার্জ্জন যাহা করেন, তাহাতে পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, কলিকাতাস্থ পুত্রের পড়ার খরচ যোগাইয়া মহাজনের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এক মাসের মধ্যে চার হাজার টাকা কোথা হইতে আসিবে ?

রাত্রিতে আহারাদির পর কর্ত্তা-গিন্নীর কথোপকথন হইতেছিল। কর্ত্তা বলিলেন, "লোক আমায় বলে, তোমার টাকার ভাবনা কি? তোমার বি, এ, পাশ করা

ছেলে, তার বিয়ে দিয়ে এখনই ত অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা ঘরে তুলতে পার !"

গৃহিণী বলিলেন, "তা ত বলবেই লোকে। আজকালকার বাজারে বি, এ, পাশ ছেলের দাম ত পাঁচ হাজার টাকা ন্যূনসংখ্যে ! কিন্তু ছেলেকে যে রাজি করতে পারিনে, সেই ত হয়েছে বিপদ কি না !"

কর্ত্তা বলিলেন, "ছেলে যদি রাজি হয় ত এখনও হ'তে পারে। কোন্নগরের মুখুয্যেদের সেই মেয়েটির এখনও বিয়ে হয় নি। এ শনিবারে সুরোকে ডেকে পাঠাব ? আর একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখা যাক এস। অলঙ্কার, দানসামগ্রী এ সব ছাড়া নগদ পাঁচ হাজার দিতে তখনই ত তারা রাজি ছিল বোধ হয়, টেনে টুনে সাড়ে পাঁচ কি ছয়ও করা যেতে পারে। বাপের এই বিপদ শুনলেও কি তার মন গলবে না ?"

গিন্নী বলিলেন, "এ দিকে ত মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি খুবই দেখায়। কিন্তু কথা বল্লে শোনে না, ঐ ত দোষ।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভক্তি-টক্তি নয়—ও সব শুধু বচন—বচন ! আজকালকার ছেলেদের ত ঐ রকমই হয়েছে কি না ! মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য ; কিন্তু কাযের বেলায় ফক্কিকার !"

স্বামীর মুখে পুত্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য শুনিয়া গৃহিণীর মনে একটু আঘাত লাগিল। তিনি বলিলেন, "কিন্তু যে কথা সে বলে, তাও ত কিছু অন্যায্য কথা নয় ! সে বার বল্লে, 'দেখ মা, এই বরপণের অত্যাচারে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থ জর্জ্জর হয়ে রয়েছে ; যে মেয়ের বাপ গরীব, তা'র ত কষ্টের অবধি নেই। দেশের এই অমঙ্গল দূর করবার জন্যে আমরা কলেজের ছাত্ররা মিলে সমিতি করেছি, কত বক্তৃতা ক'রে বেড়াচ্ছি, খবরের কাগজে কত প্রবন্ধ লিখছি, কত ছেলেদের খোসামদ ক'রে ধ'রে এনে প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করিয়ে নিচ্ছি,—আমাকেই সকলে সেই সভার সম্পাদক করেছে ; এখন আমিই যদি পণ নিয়ে বিবাহ করি, তা হ'লে লোকসমাজে আর মুখ দেখাব কেমন ক'রে ?'—আমাদের বিষম দুরবস্থা, তাই যা বল ; কিন্তু ছেলের কথা ত অসঙ্গত নয় !"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে ত সবই বুঝি। কিন্তু বাপের এই অপমান, এই দুঃখের চেয়ে সমাজে তার মুখ দেখাতে না পারার দুঃখ অপমানই কি এত বড় হ'ল ?"

গৃহিণী এ কথার কোনও সদুত্তর দিতে পারিলেন না। যাহা হউক, স্থির হইল, এ শনিবারে বাড়ী আসিতে অনুরোধ করিয়া কালই সুরেনকে পত্র লেখা হইবে।

সুরেন পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রতি শনিবারে না হউক, এক শনিবার অন্তর বাড়ী আসিতই। ইদানীং "বিবাহপণ-নিবারিণী সমিতির" সম্পাদক হইয়া, তাহার অত্যন্ত সময়াভাব ঘটিয়াছে। খুব উৎসাহের সঙ্গে কায চলিতেছে। তাই এখন সে মাসে একবার করিয়া বাড়ী আসে মাত্র। ইংরাজী মাসের প্রথম শনিবারে বাড়ী আসে, পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎও করা হয়, মাসিক খরচের টাকাটাও লইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুবকের কর্ত্তব্যজ্ঞান

শনিবার সন্ধ্যার ট্রেণে সুরেন আসিয়া পৌঁছিল। সে দিন আর মা তাহাকে কিছুই বলিলেন না। পরদিন প্রাতে তিনি আহ্নিক করিতে বসিয়া, পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সুরেন আসিয়া মা'র কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসু-নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

গৃহিণী তাঁহার আসনের নিম্ন হইতে উকীলের চিঠিখানি বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

সুরেন সেখানি পাঠ করিয়া মা'র হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তাই ত ! এখন উপায় ?"

মা বলিলেন, "তুমি, বাবা, উপযুক্ত ছেলে,—উপায় তুমিই কর।"

সুরেন নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে কহিল, "আমি কি উপায় করবো, মা ?"

মা বলিলেন, "কোন্নগরের মুখুয্যেদের সেই মেয়েটিকে বিয়ে কর। এখনি নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে।"

সুরেন বলিল, "কিন্তু মা, আমি ত বলেছি যে—"

পুত্রকে বাধা দিয়া জননী বলিলেন, "তুমি যা বলেছ, তা আমি শুনেছি। তুমি বলেছ, বিবাহপণ-নিবারিণী সভার তুমি এক জন মস্ত পাণ্ডা, তুমি পণ নিয়ে বিবাহ করলে সমাজে আর তুমি মুখ দেখাতে পারবে না। সে সবই আমি বুঝি। কিন্তু এ দিকে, যিনি তোমার জন্মদাতা, মহাগুরু—যিনি এত কষ্ট ক'রে, আপনি না খেয়ে তোমায় খাইয়ে, তোমায় এত বড়টা ক'রে তুলেছেন, নিজের গায়ের রক্ত জল ক'রে তোমায় মানুষ করছেন, তিনি যে দেনার দায়ে জেলে যান! উনি জেলে গেলে সমাজে কি তোমার মানসম্ভ্রম বাড়বে, বাবা?"

সুরেন কিয়ৎক্ষণ নতমস্তকে বসিয়া কি চিন্তা করিল। তাঁহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "আর কি কোনও উপায় নেই, মা?"

মা বলিলেন, "আর কোনও উপায় নেই। কমলার বিয়ের পর আমার যে ক'খানা গহনা বাকী ছিল, সরলার বিয়ের সময় সে সবই গেছে, তা ত তুমি জান। হাতে এই যে দুগাছি রুলি দেখ্‌ছ, এই সার। কোথাও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে যেতে হ'লে আমার যেন মাথা কাটা যায়—এক জন উকীলের পরিবার, তা'র এই দুরবস্থা! কিন্তু সে কথা যাক্। সম্বলের মধ্যে এই বাড়ীখানি। তা, পাড়াগাঁয়ে এ পুরানো বাড়ী, এ বেচলে হাজার টাকা পাওয়া যায় ত ঢের। আর এই থালা, ঘটী-বাটি—লেপ কাঁথা বিছানা—এ সব বিক্রী করলেই বা আর কত হ'বে?" বলিতে বলিতে গৃহিণীর নেত্রযুগল সজল হইল, কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল।

সুরেন বলিল, "তা বলছিনে। আর কোথাও যদি ধার পাওয়া যায়—"

"কে আর ধার দেবে, বাবা? কি বিষয়-সম্পত্তি আছে যে, তাই দেখে ধার দেবে?—বিশেষ, মহাজন যে হবে, সে এটা জানতেই পারবে যে, আর এক মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়ে, ৪।৫ বছরের মধ্যে তা'র একটি পয়সাও শোধ করতে পারেনি; তা'রাই নালিশের ভয় দেখাচ্ছে ব'লে, তাদের দেবার জন্তেই এই টাকা ধার করা হচ্ছে।"

সুরেন নীরবে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা বলিলেন, "সুপুত্রের যা কর্ত্তব্য, তাই তুমি কর, বাবা। পিতাকে সত্য থেকে মুক্ত করবার জন্তে [illegible] গিয়েছিলেন, তুমি তোমার পিতাকে জেল থেকে মুক্ত করবার জন্তে বিয়ে করবে, এটা কি একটা বড় কথা হ'ল? মেয়েটি আমি দেখেছি; খাসা মেয়ে, ঘর আলো-করা মেয়ে। সদ্‌বংশ, সকল রকমেই উপযুক্ত কুটুম্ব। লোক যেমনটি চায়, এও তেমনই। আর অমত কোরো না, বাবা, রাজি হও, এই বোশেখমাস পড়তেই শুভ কার্য্যটি হয়ে যাক।"

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া, "আচ্ছা মা, ভেবে চিন্তে দেখি"—বলিয়া সুরেন উঠিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে, শ্যামাচরণ বাবু অন্তঃপুরে আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্লে খোকা?"

পুত্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, গৃহিণী সে সমস্তই বিবৃত করিলেন। শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "বোধ হয় মন গলেছে; রাজি হ'বে। কি বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "মা সুবচনী, মা মঙ্গলচণ্ডী তাই করুন। আমি তোমাদের পূজো দেবো মা, ছেলেকে আমার সুমতি দাও।"

সন্ধ্যাবেলায় কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা কিছু বলেছে?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "না, এখনও কিছু বলেনি। কা'ল কলকাতায় ফেরবার আগে ব'লে যা'বে বোধ হয়।"

সোমবার প্রাতে গৃহিণী পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া, তাহার অনুসন্ধানে গিয়া, শয্যার উপর একখানি পত্র পাইলেন। কম্পিত হস্তে সেখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন—

"মা,

আমি তোমাদের অধম সন্তান, তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। সারা দিন, সারা রাত্রি, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি; যে আদর্শকে আমি জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে কোনও মতেই বিচ্যুত হইতে পারিব না, প্রাণ গেলেও নহে। আমাকে তোমরা, পার ত, ক্ষমা করিও। ভোরের ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। ইতি

প্রণত—শ্রীসুরেন।"

পত্র পড়িয়া গৃহিণীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। স্বামীকে গিয়া তিনি সে পত্র দেখাইলেন। তিনি উহা পাঠ

শিশির-বিন্দু

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, "যাক্ গে—না করলে ত রয়েই গেল। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হ'বে। কিন্তু এবার টাকা নিতে এলে তা'কে ব'লে দিও, আর আমি তার খরচ যোগাতে পারবো না। খাইয়ে পরিয়ে তাকে এত বড়টা করলাম, লেখাপড়া শেখালাম, এখন নিজের পথ সে নিজেই দেখুক।"

গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পর মাসে প্রথম শনিবারে সুরেন টাকা লইতে আসিল না, সুতরাং ও কথা তাহাকে বলাও হইল না। কলিকাতা হইতে পিতাকে সে চিঠি লিখিল,

"বাবা,

আমি আপনার অকৃতজ্ঞ সন্তান, আপনার আদেশ আমি পালন করিতে না পারিয়া, কিরূপ মনোদুঃখে কাল কাটাইতেছি, তাহা আমার অন্তর্য্যামীই জানেন। অপর কথা, আপনার এরূপ অর্থসঙ্কটের সময় আমার পড়ার খরচের জন্য আপনাকে বিব্রত করা আর আমার উচিত নহে। এ কয়দিন চেষ্টা করিয়া মার্চেন্ট আপিসে আমি একটি ৪০৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি যোগাড় করিয়া লইয়াছি, তাহাতেই আমার খরচ চলিবে। আপনার ও জননী দেবীর পাদপদ্মে আমার শত শত প্রণাম। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কর্ত্তব্যপথে চিরদিন স্থির থাকিতে পারি। আমি আপনাদের ক্ষমার অযোগ্য, তা জানি,

তথাপি ক্ষমাপ্রার্থী
শ্রীসুরেন।"

ইহার কয়েকদিন পরে শ্যামাচরণ আসিয়া স্ত্রীকে জানাইলেন, হংসরাজ সুন্দরমলের যিনি উকীল, তিনি তাঁহার মক্কেলগণকে বলিয়া কহিয়া স্তুতি-মিনতি করিয়া, ঋণ পরিশোধের সময়টা এক মাসের স্থানে ছয় মাস করিয়া লইয়াছেন।

গৃহিণী বলিলেন, "তা ত হ'ল! কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই বা চার হাজার টাকা আসবে কোথা থেকে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "দেখি, ভগবান্ কি করেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "কলিতে ভগবানের বিচারই যদি থাকবে, তা হ'লে আর ভাবনা কি?"

"দেখা যাক্"—বলিয়া শ্যাম বাবু চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধু-সঙ্গম

ভগবান্ বিচার করুন আর না করুন, প্রজাপতি কিন্তু একটা ভারি মজা করিলেন।

হালিসহরনিবাসী উমাচরণ চৌধুরী মহাশয় রাজপুতানার কোনও দেশীয় করদরাজ্যে উচ্চ বেতনে চীফ জষ্টিস বা প্রধান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কয়েকদিন হইল, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা অমলার বিবাহ জন্য ছুটী লইয়া তিনি সপরিবারে স্বগ্রামে আসিয়াছেন।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে উমাচরণ ওকালতী করিবার অভিপ্রায়ে রাজপুতানায় গমন করেন; মাঝে একবারমাত্র দেশে আসিয়াছিলেন, সেও ১০।১২ বৎসরের কথা।

এই উমাচরণ ছিলেন শ্যামাচরণের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। নামসাম্যের জন্য বাল্যকালেই ইঁহারা "বন্ধু" পাতাইয়াছিলেন। এখন উভয়েরই চুল পাকিলেও, পরস্পর সেই "বন্ধু" সম্ভাষণই চলিয়া থাকে।

উমাচরণ ক্রমে শ্যামাচরণের সাংসারিক ব্যাপারের সমস্ত কথাই শুনিলেন। শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন; বন্ধুর সঙ্গে গোপনে কি একটা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সুরেনকে পূর্ব্বে তিনি ১০।১১ বৎসরের বালকটি মাত্র দেখিয়াছিলেন। এক দিন কলিকাতায় যাইয়া, নিজে অপ্রকাশ থাকিয়া সুরেনকে দেখিয়া আসিলেন। তাহার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে গোপনে একটু অনুসন্ধানও করিলেন। বুঝিলেন, সে যুবকের চরিত্র অনিন্দনীয়।

ফিরিয়া আসিয়া উমাচরণ বলিলেন, "বন্ধু, তোমার ছেলেটিকে দেখে এলাম। আমার ত বেশ পছন্দই হয়েছে। আমার অমলাকে তা হ'লে তুমি নাও—সে তোমার ছেলের অনুপযুক্ত হবে না।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "তা হ'লে, সেই পরামর্শই রইল ত? ছেলের যা কোট, বিয়ের সময় শুধু শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে, একটি হর্তুকী দিয়ে তুমি কন্যাদান করবে;' তা'র পরদিন চুপি চুপি এসে আমি টাকাটা নিয়ে যা'ব। দেনাটাও ফেলে দেবো, বউমার জন্যে গয়নাগাঁটিও গড়াতে দেবো।"

উমাচরণ কিছুক্ষণ ভাবিলেন; তাহার পর বলিলেন, "সে যেন হ'ল; কিন্তু তোমার যে দেনাশোধ হয়ে গেল,

তুমি যে পুত্রবধূর অলঙ্কার গড়াচ্ছ, এ সব কা'র টাকাতে, সে কথা জানতে কি খোকার বাকী থাকবে? তখন যদি সে বেঁকে বসে? যদি বলে, আমায় ঠকিয়ে বিবাহ দেওয়া হয়েছে, ও স্ত্রীকে আমি গ্রহণ করবো না?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "না না—তা কি আর সে করতে পারে? একবার বিয়ে হয়ে গেলে, তা'র পর বিবাহিতা স্ত্রীকে কি সে ত্যাগ করতে পারে? লেখা-পড়া শিখেছে, একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান ত আছে!"

উমাচরণ বলিলেন, "কি জানি, ভাই, আজকালকার ছেলেদের কর্ত্তব্যজ্ঞান যে ভীষণ! কোন্‌টা যে তাদের কর্ত্তব্য আর কোন্‌টা যে নয়, তা আমরা, সেকেলে মানুষ, বুঝিও না ছাই! কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাপকে যে জেলে যেতে দিতে পারে, সে স্ত্রী ত্যাগ করবে, তা আর আশ্চর্য্য কি?"

এই সময় ডাকওয়ালা একখানা চিঠি দিয়া গেল। সুরেনের চিঠি। সুরেন লিখিয়াছে, আগামী ১২ই এপ্রিল তাহাদের ল' কলেজ গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইবে। যে ফারমে সে চাকরী করে, তাঁহারা দার্জ্জিলিঙে তাঁহাদের একটি ব্রাঞ্চ খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। সেই কারণে "ছোট সাহেবের" সঙ্গে তাহাকেও দার্জ্জিলিঙে গিয়া মাসখানেক থাকিতে হইবে। মাসখানেক সে এখন বাড়ী আসিতে পারিবে না, ইত্যাদি।—পত্রখানি পড়িয়া, শ্যামাচরণ সেখানি বন্ধুর হাতে দিলেন।

পত্র পড়িয়া, উমাচরণ বলিলেন, "ভালই হ'ল।"

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাল হ'ল?"

"দাঁড়াও, একটু ভেবে চিন্তে দেখি, তার পর তোমায় বল্‌বো এখন।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কয়েকখানি পত্রাংশ।

১

দার্জ্জিলিং
১০ই বৈশাখ

বন্ধুবরেষু

আমরা গত কল্য নিরাপদে দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়াছি। উপস্থিত স্যানিটেরিয়মে আসিয়া উঠিয়াছি, ২।১ দিনের মধ্যেই একটি বাড়ী লইব। সুরেন বাবাজীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় এখনও পাই নাই। যেমন যেমন হয়, পরে তোমায় জানাইব। বউঠাকুরাণীকে আমার নমস্কার এবং কমলা মা'কে স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি

তোমার বন্ধু
উমাচরণ

২

দার্জ্জিলিং
১৩ই বৈশাখ

বন্ধু,

গত কল্য বিকালে ম্যালে বেড়াইতে বেড়াইতে সুরেন বাবাজীকে দেখিতে পাইলাম। পরিচয় লইয়া, বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলাম, "অ্যাঁ, তুমি হালিসহরের শ্যামাচরণের ছেলে? আমারও বাড়ী যে হালিসহর, আর তোমার বাবা যে আমার বাল্যবন্ধু!"—তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আনিলাম। যাহা গোপন করা আবশ্যক এবং যাহা প্রকাশ করা চলিবে, সে সম্বন্ধে গিন্নীকে সব শিখাইয়া পড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। রাত্রিতে তিনি তাহাকে আহারের জন্য জিদ করিলে সুরেন সম্মত হইল। অমলার সঙ্গেও তাহার আলাপ করাইয়া দিয়াছি। অমলা কা'ল গান শুনাইয়াছে—গান শুনিয়া সুরেন খুব খুসী হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা গেল। আগামী কল্য বিকালে তাহাকে চা-পানের নিমন্ত্রণ করিয়াছি এবং বলিয়াছি, চা-পানের পর সকলে একত্রে বেড়াইতে যাওয়া যাইবে।

* * *

৩

দার্জ্জিলিং
১লা জ্যৈষ্ঠ

বন্ধু,

সুরেন প্রায় প্রতিদিনই বিকালে এখানে আসিয়া চা খায়, এবং সান্ধ্য ভোজনও মাঝে মাঝে এখানে সম্পন্ন করে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে তোমায় জানাইয়াছি। সুরেন যতক্ষণ না আইসে, অমলা বেটী ততক্ষণ পথপানে চাহিয়া থাকে; অথচ এমন ভাবটা দেখায়, যেন তা'র মনে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। তোমার ছেলেটিও, ভাই, বড় কম যান না। অমলা যতক্ষণ ঘরে না থাকে, ততক্ষণ সে যেন ছট্‌ফট করে। মধ্যে এক দিন, আমাদের শরীরটা ভাল নয় বলিয়া, সুরেনের জিম্মাতে অমলাকে বেড়াইতে পাঠাইয়াছিলাম। দু'জনে একলা বেড়াইতে যাইবে শুনিয়া, মনের আনন্দ গোপনের জন্য দু'জনেরই সেই "অমানুষিক" চেষ্টার দৃশ্যটা যদি, ভাই, দেখিতে! উহারা মনে করে, আমরা বুড়াবুড়ী কিছুই বোধ হয় বুঝিতে

পারি না, সন্দেহও করি না : দু'জনে বাহির হইয়া গেলে, বুড়াবুড়ী আমরা ত হাসিয়াই আকুল। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। কয়েক দিন হইল, আমরা বার্চ্চহিলে বেড়াইতে গিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়া নিজেদের বাড়ী ফিরিয়া আসি। ঘণ্টাখানেক পরে উহারা ফিরিল। তখন নিজেদের মুখ হইতে হাসি-তামাসার ভাবটা মুছিয়া ফেলিয়া, দুশ্চিন্তার ভাবটা আনয়ন করা আমাদের পক্ষেও বিশেষ আয়াস-সাধ্য হইয়াছিল।

* * *

৪

দার্জ্জিলিং
১২ই জ্যৈষ্ঠ

ভাই বন্ধু,

গত কল্য সুরেন আমার নিকটে আসিয়া, অমলার হস্ত প্রার্থনা করিয়াছে। আমি বলিলাম, "বেশ ত, তা হ'লে তোমার বাবাকে আমি চিঠি লিখি!" সে বলিল, "বাবাকে চিঠি লিখলে তিনি এখনই আপনার কাছে অনেক টাকা চেয়ে বসবেন।" আমি বলিলাম, "তা'তে আমি পিছপাও নই। বিনা টাকায় আজকালকার বাজারে কা'র আর মেয়ের বিয়ে হয় বল?" সে বলিল, "বাবা যদি টাকা নেন, তা হ'লে কিন্তু আমি বিবাহ করতে পারবো না। আপনি অমলাকে শুধু শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে, একটি হত্তুকী পণ দিয়ে যদি দান করেন, তবেই আমি বিবাহ করতে পারি।" শুনিয়া আমি কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিলাম, "কি! এত বড় কথা তুমি বল আমায়? শুধু শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে হত্তুকী দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করবো? কেন, আমায় কি তুমি একটা যে সে লোক পেয়েছ? তোমার চোখে আমি একটা পথের ভিখারী বুঝি, না?"

ধমক খাইয়া ছেলেটা মুষড়াইয়া গেল; আমতা আমতা করিয়া বলিল, "না না, সে ভাবে আমি বলিনি, আপনি রাগ করছেন কেন?"—তা'র পর সে তা'র পণ-নিবারিণী সভার কথা, আরও কত কি সব মাথামুণ্ড বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "ওঃ, কলকাতার সেই পণ-নিবারিণী সভা? প্রোফেসর অমূল্য বোস যা'র সভাপতি?" খোকা বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" আমি বলিলাম, 'সেই লোকই ত সম্প্রতি বিবাহ ক'রে শ্বশুরের টাকায় বিলাত গেছে। খবরের কাগজওয়ালারা তাই নিয়ে তাকে কি রকম গালাগালিটা দিয়েছে দেখ না!"—বলিয়া সেই দিন প্রাতে প্রাপ্ত একখানা সংবাদপত্র তাহাকে দেখাইলাম। পড়িয়া সুরেন ভারি দমিয়া গেল। বলিল, "তা হলেই বুঝুন না! আমি সেই সভার সম্পাদক। আমিও যদি ঐ কার্য্য করি, আমাকেও ত এমনি ক'রে গালাগালি খেতে হ'বে!" এই কথা শুনিয়া, যেন আমি একটু ঠাণ্ডা হইয়াছি, এইরূপ অভিনয় করিয়া বলিলাম, "কিন্তু, বাপু, তুমি হাজার রাজি থাকলেও, তোমার বাপের অমতে তোমাকে আমি জামাই কি ক'রে করি বল? তোমার বাবাকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি ত! তিনি ভারি একরোখা মানুষ। শেষকালে ব'লে বসবেন, ও বউ আমি গ্রহণ করবো না। তার চেয়ে, বাপু, তোমার বাবাকে চিঠিপত্র লিখে সব ঠিকঠাক করি, তিনি অনুমতি দিলেই শুভ কার্য্যটি হ'তে পারবে।" খোকা বলিল, "সে আশা বৃথা। তিনি বড় অর্থ-সঙ্কটে প'ড়ে আছেন। বিনা টাকায় কখনই তিনি সম্মতি দেবেন না।" আমি বলিলাম, "তা হ'লে বাপু, এ কাযের মধ্যে আমি নেই। বাপ-মা'কে লুকিয়ে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে, সে হতেই পারে না, অসম্ভব। আমার মেয়ের অন্যত্র সম্বন্ধ করতে হ'বে। তুমি বাপু, এ বাড়ীতে আর এস না। অমলা ত এখন নিতান্ত ছোট্টটি নেই—তোমাদের দেখা-শুনা হ'লে মিছামিছি মন খারাপ বৈ ত নয়।" এই কথা শুনিয়া, আমাকে একটি প্রণাম করিয়া, সুরেন প্রস্থান করিল।

রাত্রিতে গিন্নীর কাছে শুনিলাম, মেয়েটা কোথায় দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মেয়ের খোঁজে যাইয়া তিনি দেখেন, সে বিছানায় উবুড় হইয়া পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া কান্দিতেছে। তা'র মা'র কাছে সে আর কোনও কথা গোপন করিতে পারে নাই; বলিয়াছে, অন্যত্র তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিলে সে আফিম খাইবে। গিন্নী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "মেয়েটার কষ্ট দেখে মনে হ'তে লাগলো, সব কথা তা'কে খুলেই বলি। কিন্তু তোমার নিষেধ। সেই জন্যে তা'র কাছে কিছু ভাঙ্গতে পারলাম না।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "কালকের দিনটে চুপ ক'রে থাক। পরশু চিঠি লিখে সুরেনকে ডেকে পাঠিও। অমলাকে তুমি ব'লে রেখ, সুরেন আজ আসবে, বাপ-মা'র অনুমতি নেওয়া সম্বন্ধে তাকে রাজি করা, অমলারই ভার। এ বিষয়ে সুরেন রাজি হ'লে, আর কোনও গোলই নেই, এই মাসেই বিয়ে হ'তে পারে। সুরেন এলে পরে, অমলার কাছে তা'কে রেখে তুমি চ'লে এস। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যা'বে এখন।"

পরামর্শমতই কার্য্য হইয়াছিল। যাইবার সময় সুরেন আমায় বলিয়া গিয়াছে, আজই সে তোমাকে চিঠি লিখিবে।

আচ্ছা, ভাই, দিনে দিনে হইল কি বল ত? আমরাও ত এক দিন বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু কৈ, তাহার

মধ্যে এমন সব মজার ব্যাপারের বাষ্পমাত্রও ত ছিল না! সেকালে জন্মিয়া আমরা কি ভুলই করিয়াছি হায় হায়! বড়ই ঠকিয়া গিয়াছি। ধুত্তোর সে কাল!

* * *

দার্জ্জিলিং
১২ই জ্যৈষ্ঠ

পরম-পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী দেবী
শ্রীচরণকমলেষু।

মা!

দার্জ্জিলিঙ্গে পৌঁছিয়া, পৌঁছান সংবাদটিমাত্র তোমায় দিয়াছিলাম। তা'র পর নানা কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত তোমাদের পত্র লিখিতে পারি নাই, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

এখানে পৌঁছিবার অল্পদিন পরেই বাবার বাল্যবন্ধু হালিসহরনিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হয়। ইঁহার নাম আমি তোমাদের নিকট শুনিয়াছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বে ইঁহাদিগকে দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। এ বার ছুটীতে প্রথমে হালিসহর গেলে তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল শুনিলাম। তাঁহার কন্যা অমলাকে অবশ্যই তোমরা দেখিয়াছ; তাহার সহিত তিনি আমার বিবাহ দিতে চাহেন; টাকাকড়িও যথেষ্ট দিতে প্রস্তুত আছেন, এরূপ আভাস পাইয়াছি।

পণ লইয়া বিবাহ করার আমি কিরূপ বিরোধী, তাহা ত তোমরা ভালরূপই জান। আমি পণনিবারিণী সভার সেক্রেটারী হইয়া ঐ কার্য্য করিলে, দেশের চক্ষুতে আমি যে অত্যন্ত হেয় হইয়া পড়িব, তাহাতেও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজে আমাকে নানারূপ শ্লেষ, বিদ্রূপ ও গালাগালি করিবে। কিন্তু টাকা না পাইলে বাবা জেলে যান! সেটা ঘটিতে দেওয়া আমার পক্ষে ঘোর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হয়, তাহাতেও সন্দেহ পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিয়াছি, আমার পরমগুরু পিতৃদেবের মঙ্গলার্থে আমার আদর্শ, আমার প্রতিজ্ঞা, আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই বলি দিয়া, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব।

অতএব, মা, বাবাকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাইয়া, তাঁহাকে বলিও যে, আমি আর তাঁহার অবাধ্য সন্তান নহি। তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই আমি নতমস্তকে পালন করিতে প্রস্তুত আছি। তবে, অন্য কোথাও নহে—এই চৌধুরী মহাশয়ের সহিতই কথাবার্ত্তা হয়, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

আমার এখানকার সরকারী কার্য্য এক সপ্তাহ পরে শেষ হইবে। কলেজ খুলিতে এখনও এক মাস বিলম্ব আছে। 'সাহেবকে' বলিয়াছি, তিনি আমায় তিনসপ্তাহের ছুটী দিবেন, ঐ তিন সপ্তাহ বাড়ী গিয়া তোমাদের চরণ-সেবায় অতিবাহিত করিব, স্থির করিয়াছি।

সেবক
শ্রীসুরেন।

পুঃ,—চৌধুরী মহাশয়কে পত্রখানি শীঘ্রই লেখা প্রয়োজন। কারণ, শ্রাবণের মাঝামাঝি তাঁহার ছুটী ফুরাইবে, তিনি আবার রাজপুতানায় চলিয়া যাইবেন।"

উপসংহার

মহাসমারোহে, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

পরবৎসর সুরেন ওকালতী পাশ করিয়া, সস্ত্রীক রাজপুতানায় চলিয়া গেল। সেখানেই শ্বশুরের আদালতে সে এখন ওকালতী করে। তাহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মিয়াছে। উমাচরণ বাবুরও পেন্সন লইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। পেন্সন লইবার কালে জামাতাকে তিনি একটি ছোটখাট জজীয়তী পদে বাহাল করিয়া আসিতে পারিবেন, মহারাজ বাহাদুর এরূপ আভাসও দিয়াছেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রোম
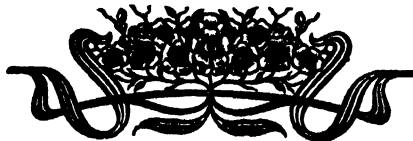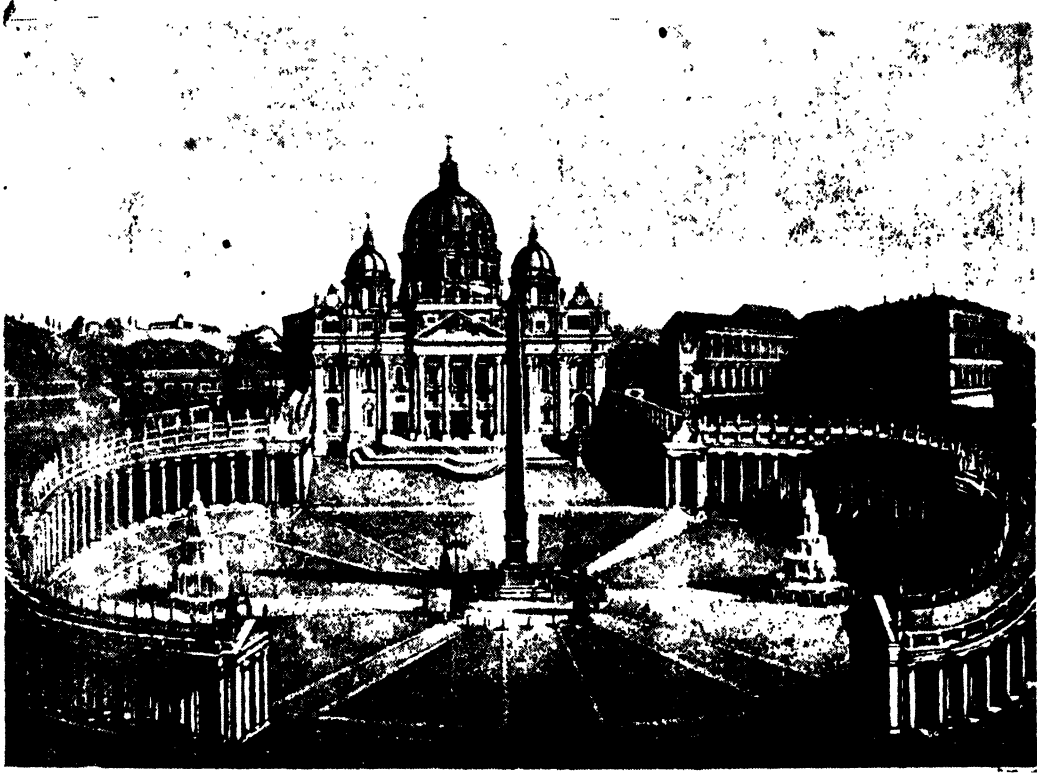
সেণ্টপিটার্স গির্জ্জা

বাল্যকালে এক দিকে যেমন মেকলের কবিতায় রোমের কীর্ত্তিকথা পাঠ করিয়াছিলাম, তেমনই আবার হেমচন্দ্রের কবিতায় রোমের দুর্দ্দশার কথায় বিলাপ দেখিয়াছিলাম :—

"দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যা'র কোথায় সে রোম ?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী. সিন্ধু, ব্যোম !
ধরণীর সীমা যা'র ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ আজি কোথায় সে রোম !
সাহস ঐশ্বর্য্যে যা'র ত্রিভুবন চমৎকার—
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম ?
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম !
কি চিহ্ন আছে রে তা'র রাজপথ দুর্গে যা'র
পৃথিবী বন্ধন ছিল, কোথায় সে রোম !—
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম ?"

এক দিন সত্য সত্যই ধরণীর সীমা রাজ্যসীমা করিবার বলবতী বাসনা রোমকে দিগ্বিজয়ে উৎসাহিত করিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার বুঝাইতে হইলে এইটুকু বলিলেই, বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে যে, এক দিকে যেমন খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫ হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড রোমের অধীন ছিল, তেমনই আবার দেখা যায়, খৃষ্টীয় ২২৬ অব্দেও ভারতে—মালাবারে রোমান সৈন্য অবস্থিত ছিল। ভারতের সহিত বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্যবন্ধনও দৃঢ় ছিল। রোমান লেখক প্লীনী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ পণ্য যোগাইয়া সে সাম্রাজ্য হইতে বৎসরে প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা লাভ করে। সে সময়ের ৬৮ লক্ষ টাকার মূল্য কত ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যেমন বহু দুর্গ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছিল, তেমনই বহু রাজপথ রচিত করিতে হইয়াছিল।

সেই জন্য য়ুরোপে প্রচলিত কথা আছে—সব রাজপথ রোমে লইয়া যায়।

রোমের সহিত পৃথিবীতে যদি আর কোন নগরের সাদৃশ্য থাকে, তবে সে বারাণসীর। উভয় নগরই কিংবদন্তীর কুহেলিকায় ঐতিহাসিক আলোকপ্রবেশপথ রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে—উভয় নগরই বহু শতাব্দীর ধ্বংসস্তূপ বক্ষে লইয়া দণ্ডায়মান—উভয় নগরই এক সময় পুণ্যতীর্থ ছিল। কিন্তু সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। কারণ, বারাণসী হিন্দুভারতের রাজধানী—হিন্দু স্বভাবতঃ আক্রমণ—গণতন্ত্রের অভ্যুদয়—এ সবই রোমের বক্ষে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। সে সকলের সাক্ষ্য আছে—যুগের পর যুগের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে। আবার এই রোমে ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত রাজনীতিকদিগের বিবাদ হইয়াছে। রোমের নাম উচ্চারণ করিলে মানসপটে চিত্রের পর চিত্র যেন চলচ্চিত্রের চিত্রমালার মত লক্ষিত হয়। রোম বলিলে যেমন মনে হয়—প্রাচীনত্ব, গৌরব, সমৃদ্ধি, বীরত্ব, বিজয়, উপনিবেশস্থাপন, স্বাধীনতা, ব্যবস্থা, ব্যবহারশাস্ত্র, সংযম, সৌন্দর্য্য, তেমনই আবার মনে পড়ে—নিষ্ঠুরতা,
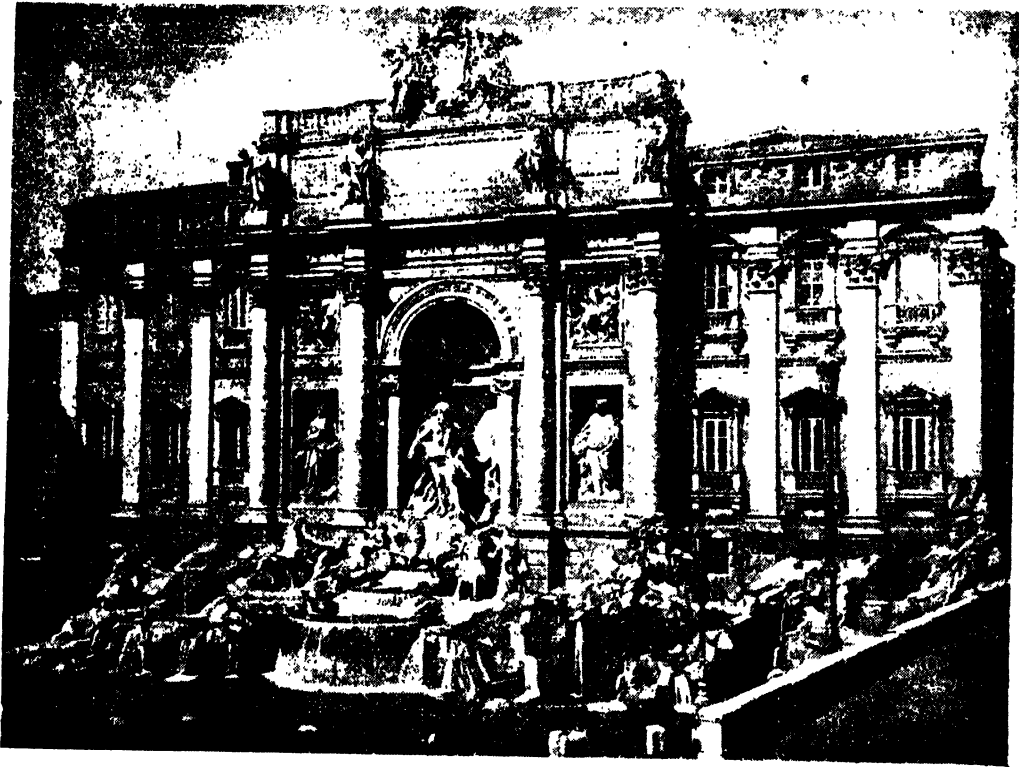
রোমের সৌধ

দার্শনিক—হিংসা তাহার ধাতুতে নাই—সে ইহকাল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরকালের চিন্তায় তন্ময় হয়। আর রোম বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র—ইহকালসর্ব্বস্ব জাতির জিগীষার কেন্দ্র। সপ্তশৈলশিরে অবস্থিত রোমের রাজদণ্ড দিকে দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। রোম বীরত্বের মণিমঞ্জুষা, সম্পদের খনি ছিল। রোমের বীরত্ব যখন বিলাসকে স্থান দান করে, তখন সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হয়। রাজবংশের পর রাজবংশের উত্থান-পতন—বর্ব্বরের ঈর্ষ্যাদ্বেষ, অন্তর্বিপ্লব, বিলাস, ধ্বংস। সে কি সুদীর্ঘ ইতিহাস—মানবের উন্নতির ও অধ.পতনের কি সুস্পষ্ট বিবরণ! সার্দ্ধ-দ্বিশতাব্দীকাল রোম সম্রাটের অধীন ছিল—পঞ্চশতাব্দী ব্যাপিয়া তথায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাহার পর আবার পঞ্চশতাব্দীকাল রোম বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। রাজা, রাষ্ট্রপতি, সেনানায়ক—রোমের রঙ্গমঞ্চে ইঁহারা একের পর এক জন অবতীর্ণ হইয়াছেন—নাটকে আপনাদের অংশ অভিনয় করিয়াছেন,

—তাহার পর যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সে যবনিকা বিস্মৃতির অন্ধকার যবনিকা; আজ ইতিহাস তাহার পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঘটনা-পরম্পরার ছিন্ন সূত্র পুনর্গ্রথিত করিয়া হার রচনার চেষ্টা করিতেছে। আজ রোমের রাজনীতিক ইতিহাসে আবার নূতন অধ্যায় আরব্ধ হইয়াছে। জগতের রঙ্গমঞ্চে ইতিহাসের যে নাটক যুগযুগ ধরিয়া অভিনীত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে রোমানরা অল্প স্থান অধিকার করে নাই—অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই। জগতের ত্যাগ করিলাম। প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম—প্রকৃতির শোভা অনুরূপ। মেঘ ও বৃষ্টির অবসান হইয়াছে। অলিভ গাছ দেখা যাইতেছে—গাছের পাতায় রৌদ্র। ক্ষেত্রে কৃষকরা চাষ করিতেছে—কৃষিকার্য্যে গরু ব্যবহৃত হইতেছে। পথে অশ্ব ও গর্দ্দভ-বাহিত যানে নরনারী গতায়াত করিতেছে—তাহাদের বেশে বর্ণের বৈচিত্র্য।

মধ্যাহ্নে আমরা রোমে উপনীত হইলাম। আমাদের রোমে অবস্থিতি অল্পক্ষণ। কাযেই ষ্টেশনের নিকটে "গ্র্যাণ্ড কণ্টিনেণ্টাল" হোটেলে বাক্স প্রভৃতি রাখিয়া
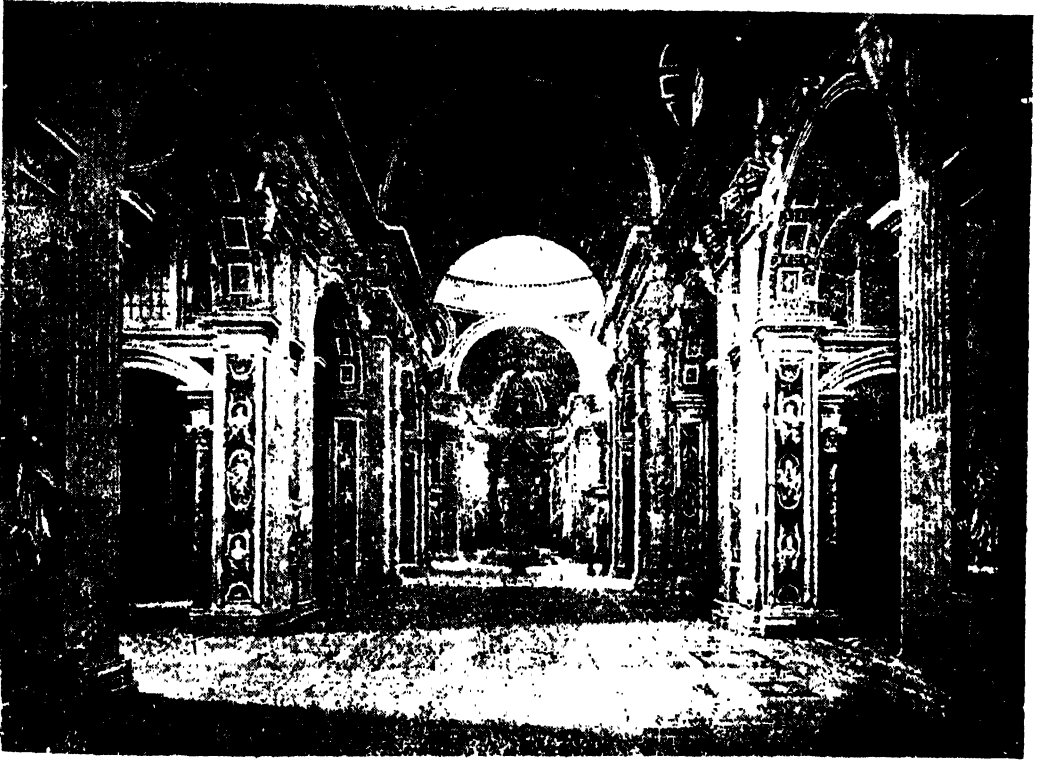
সেণ্টপিটার্স গির্জ্জার অভ্যন্তর

সভ্যতায়, শিল্পে, সাহিত্যে রোম যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই।

তাই যখন টারাণ্টো বন্দর হইতে বিলাতে যাইবার পথে রোম অতিক্রম করিতে হইল, তখন রোম দেখিবার প্রলোভন আর সংবরণ করিতে পারিলাম না। এ দেশে ট্রেণে রাত্রিকালে শয়ন করিতে হইলে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়—রাত্রির জন্য প্রায় ১৫ টাকা। সন্ধ্যায় টারাণ্টো নগর দেখিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই একটি ব্যাপারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—যুদ্ধের জন্য আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সরকার নিয়ম করিয়াছেন, বিজ্ঞাপনের কাগজে মাশুল হিসাবে টিকিট সংবদ্ধ করিতে হইবে।

আমরা প্রথমেই যাত্রীদিগের অবলম্বন "পথিপ্রদর্শক" টমাস কুক এণ্ড সন্সের কার্য্যালয়ের সন্ধানে গমন করিলাম। পথে দেখিলাম, স্ত্রীলোক ট্রামগাড়ী চালাইতেছে।

এ দৃশ্য ইতঃপূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই—পরেও দেখিতে পাই নাই; কারণ, বিলাতে যুবতীরা "কণ্ডাক্টারের" কায করিলেও ট্রাম বা যান-চালকের কায করে নাই। রোমের নারীরা সুন্দরী। তাহাদের সৌন্দর্য্যের বৈশিষ্ট্য তাহাদের চক্ষু দীপ্তকৃষ্ণতার—কেশও লোহিত বা স্বর্ণবর্ণ নহে—প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। পথে ফলের প্রাচুর্য্য—পীচ, পেয়ার, ফিগ—আঙ্গুরের ত কথাই নাই। রেলপথের উভয় পার্শ্বে দ্রাক্ষাক্ষেত্র লক্ষিত হইয়াছিল—পর্ব্বতের উপরেও স্তরে স্তরে দ্রাক্ষাক্ষেত্র—গুচ্ছ গুচ্ছ হরিতাভ বা কৃষ্ণবর্ণ দ্রাক্ষাফল রহিয়াছে। ক্ষেত্র হইতে দ্রাক্ষা ও পিপায় দ্রাক্ষারস নগরে বাহিত হইতেছে।

নগরের প্রধান রাজপথগুলি প্রস্তরফলকে আস্তৃত। অশ্ববাহিত যানেরই সংখ্যাধিক্য। চালকদের প্রায় সকলেরই হাতে সংবাদপত্র।

ককের কার্য্যালয়ে আমরা রোমের দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের বিবরণ-পুস্তিকা, মানচিত্র প্রভৃতি ও দোকানে চিত্রপুস্তক ক্রয় করিলাম। কুকের কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে পারিশ্রমিক স্থির করিয়া লইয়া এক জন "পথিপ্রদর্শক" দিলেন। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ২খানি মোটরে যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। আমরা সমুচ্চ সৌধমালার মধ্যবর্ত্তী পথে সর্ব্বপ্রথমে রোমের বিরাট সেণ্ট-পিটার্স গির্জ্জা দেখিতে চলিলাম।

রোমে এত সুন্দর গির্জ্জা আর নাই—পৃথিবীর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। এককালে রোম খৃষ্টান জগতের কেন্দ্র ছিল এবং এই গির্জ্জাই রোমের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার সৌন্দর্য্য তাজমহলের সৌন্দর্য্যেরই মত বর্ণনাতীত—দেখিলে মন সৌন্দর্য্যের ভাবে মুগ্ধ ও প্রফুল্ল হয়। ভারতবাসীর পক্ষে ইহার প্রথম দর্শনে তাজমহলের কথাই মনে হয়। ইহাও শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে রচিত; কিন্তু কালবশে প্রস্তরের বর্ণ আর অমল ধবল নাই—হরিদ্রাভা ধারণ করিয়াছে। সমগ্র হর্ম্ম্যের উপর একটি বৃহৎ গম্বুজ—প্রসিদ্ধ শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর কল্পনা। যে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া গির্জ্জায় উপনীত হইতে হয়, তাহাও অতুলনীয়। তাহা ডিম্বাকৃতি এবং প্রবেশ করিলে দক্ষিণ ও বাম উভয় দিক দিয়া পথ—পথের উভয় পার্শ্বে সমদূরবর্ত্তী স্তম্ভশ্রেণী—প্রত্যেক স্তম্ভ সাড়ে ৪২ ফিট উচ্চ। চারিদিকে ধর্ম্মার্থে উৎসৃষ্টজীবন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগের ও ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতিকৃতি—এই সব মূর্ত্তির সংখ্যাও অল্প নহে—২ শত ৩৬টি; প্রত্যেকটি ১০ ফিট উচ্চ। সমগ্র প্রাঙ্গণ প্রস্তরাস্তৃত। প্রাঙ্গণে ২টি ফোয়ারা—সেই দুইটির মধ্যস্থলে মিশরে হেলিওপলিস হইতে ক্যালিগুলা কর্ত্তৃক আনীত একটি প্রস্তরস্তম্ভ। ইহা ৮২ ফিট উচ্চ। ইহা প্রথমে নিষ্ঠুর সম্রাট নীরোর "সারকাসে" প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ইহারই মূলে সেণ্ট পিটারকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল। নীরোর কুকীর্ত্তির কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ইনিই রোম নগরে অগ্নিযোগ করিয়া অগ্নিশিখার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতে করিতে আনন্দে বংশীবাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যে স্থানে গির্জ্জাটি অবস্থিত, তাহারই একাংশে সেণ্ট পিটারের সমাধি হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। দীর্ঘকালে বর্ত্তমান গির্জ্জাটি নির্ম্মিত হয়। ইহার নির্ম্মাণারম্ভ হইতে গৃহপ্রবেশ পর্য্যন্ত ধরিলে মোট ১ শত ৭৬ বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ২৮ জন পোপের জীবনান্ত হয় এবং ১৫ জন স্থপতি ইহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলোর নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি। আর এক জন—র‍্যাফেল। প্রথমে উঠিয়া কনষ্টাণ্টাইনের ও সার্লামেনের বৃহৎ প্রতিকৃতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। মধ্যভাগে অর্থাৎ গর্ভগৃহে প্রবেশের ৩টি দ্বার—মধ্যবর্ত্তীটি ব্রোঞ্জের।

গির্জ্জার মধ্যে আসিয়া চারিদিকে চাহিলে মর্ম্মরের ও স্বর্ণের বাহুল্যে বিস্মিত হইতে হয়! সত্যই—"The interior is a wilderness of mable and gold," মূর্ত্তি ও স্তম্ভগুলির দূরত্বহেতু সহসা সেগুলির প্রকৃত আকার বুঝা যায় না; দণ্ডায়মান মানুষের সহিত তুলনা করিলে তাহাদের স্বরূপ বুঝা যায়। যে সব মূর্ত্তি প্রভৃতি স্বাভাবিক আকারের বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সে সব অতি বৃহৎ। প্রাচীর কারুকার্য্য-খচিত মর্ম্মরাস্তৃত। এক স্থানে মর্ম্মরের আসনে সেণ্ট পিটারের মূর্ত্তি। ভক্তগণ মূর্ত্তির চরণ চুম্বন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। যে স্থানে মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান হইতেই গম্বুজের ভিতরের সৌন্দর্য্য সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

গির্জ্জার মধ্যে যে সব শিল্পসম্পদ সংরক্ষিত,সে সকলের বর্ণনা করিতে হইলে একখানি পুস্তক রচনা করিতে হয়। দেখিয়া মনে হয়—শিল্পীরা যেন "আনিয়া বিবিধ ফুল পূজার বিধানে," এই মন্দির সুসজ্জিত করিয়াছেন। ইহার মূর্ত্তিসংখ্যা ৩ শত ৯৬; বেদীর সংখ্যা ৩০; প্রদীপের সংখ্যা ১ শত ২১। ইহাতে ১ শত ৩৪ জন পোপের দেহাবশেষ সমাহিত। এক কালে এই ধর্ম্মাচার্য্য পোপ-দিগের প্রভাব অসাধারণ ছিল—ইঁহাদের আদেশে নৃপতি-দিগের উত্থান-পতন হইত—লোকের বিশ্বাস ছিল, স্বর্গের দ্বারের চাবি ইঁহাদিগের হস্তগত।

শিল্পসম্পদ পরীক্ষা করিবার জন্য এই গির্জ্জা দেখিতে হইলে, তাহাতেই দিনের পর দিন ব্যয়িত হইয়া যায়—তবুও দেখিয়া তৃপ্তি হয় না।

বহু মন্দিরে বহু দিনের সঞ্চিত ধনরত্নাদি রহিয়াছে; বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সম্পত্তি বহু ভূস্বামীর ঈর্ষ্যার উদ্রেক করে। রামেশ্বরে দেবতার শয়ন-শোভাযাত্রা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সে মন্দিরের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবেন। মাদুরার মন্দির নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সবই সত্য। কিন্তু মন্দিরের ঐশ্বর্য্য মঞ্জুষায় অন্ধকার গহ্বরে লুক্কায়িত থাকে—নয়নানন্দবিধানজন্য তাহা প্রকাশ্যভাবে রক্ষিত হয় না। সেরূপে তাহা রক্ষা করিবার উপায়ও নাই। মন্দির প্রাঙ্গণ, ভোগমণ্ডপ প্রভৃতি লইয়া যত বড়ই কেন হউক না—গর্ভগৃহ—দেবতার বেদীর কক্ষ অন্ধকার। যে স্বচ্ছান্ধকার দীপালোক ব্যতীত দূর হয় না—যে স্বচ্ছান্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত না হইলে দেবদর্শন সম্ভব

সেণ্টপলস্ গির্জ্জার অভ্যন্তর

মন্দিরের ঐশ্বর্য্য যে ভারতেও নাই, এমন নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া ভক্তদল দেবতার চরণে অর্ঘ্য দিয়া আসিয়াছে—সে সব বহুমূল্য। দক্ষিণ-ভারতে রামেশ্বর হইতে মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, সিমাচলম, পুরী—

হয় না—তাহার আধ্যাত্মিক কোন সার্থকতা আছে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সাধারণ আলোকপ্রিয় মানবের পক্ষে তাহা প্রীতিপ্রদ নহে। গর্ভগৃহে বায়ু-চলাচলেরও সুবিধা নাই। সেই বদ্ধ বায়ু পরিমলে

ও ধূপ-ধূনার ধূমে যেন গুরু হইয়া উঠে—তাহাতে যেন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। হর্ম্ম্যতল প্রদীপের ঘৃতে অপরিচ্ছন্ন ও পিচ্ছিল। মন্দিরমধ্য চরণামৃতে বহু যাত্রীর চরণধূলির সংমিশ্রণে কর্দ্দমাক্ত। অন্ধকার কক্ষমধ্যে বাদুড় ও চামচিকা বাস করে—মন্দির অপরিচ্ছন্ন করে। ভারতের মন্দিরের এই অবস্থার সহিত সেণ্টপিটার্স গির্জ্জার মত গির্জ্জার তুলনা করিলে মনে হয়, এই স্থানে প্রতীচী আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছে। ইহকালের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা আমাদের পরকালের সম্বল ধর্ম্মের স্থানকেও যেন অবজ্ঞায় উপেক্ষায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। প্রতীচীর গির্জ্জায় আলোক ও বাতাস যেমন প্রফুল্লতার সঞ্চার করে—মন্দিরের ঐশ্বর্য্যের শৃঙ্খলাময় সজ্জা তেমনই নয়নানন্দবিধান করে। দুই জাতির ধর্ম্মস্থান যেন দুই জাতির মনোভাবের প্রভেদ দেখাইয়া দেয়। আমরা "চিরসুন্দরকে" মানসমন্দিরে সুন্দর দেখিতে চেষ্টা করি; ইহারা সুন্দরে চিরসুন্দরের ভজনা করে।

রোমে গির্জ্জার সংখ্যা অত্যধিক—অনেক গির্জ্জাই সুন্দর। কিন্তু সময়াভাবে আমরা আর একটিমাত্র গির্জ্জা দেখিয়াছিলাম—সেণ্টপলস।

এই গির্জ্জাটি রোমের প্রাচীন প্রাচীরের বহির্দ্দেশে অবস্থিত। সেণ্টপিটার্স গির্জ্জার তুলনায় ইহা ক্ষুদ্রায়তন। ইহার বাহিরের সৌন্দর্য্যও সে গির্জ্জার বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত তুলিত হইতে পারে না। ইহা ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে থিয়োডোসিয়াস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পোপ-পরম্পরার চেষ্টায় ইহার সম্পদ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার স্থাপত্যাদর্শ ও সেণ্টপিটার্স গির্জ্জার স্থাপত্যাদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ। ইহা যেরূপ স্থাপত্যাদর্শের, সেরূপ স্থাপত্যাদর্শের গির্জ্জার মধ্যে ইহার তুলনা নাই। মন্দিরাভ্যন্তরে বহুমূল্য কারুকার্য্য—প্রস্তরে প্রস্তর কাটিয়া বসাইয়া ইহার প্রাচীরগাত্র সুসজ্জিত। বহু শতাব্দীতে বহু যত্নে প্রস্তুত এই গৃহ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অগ্নিযোগে ভস্মীভূত হয়। তখন দ্বাদশ লিও রোমের পোপ। তিনি পূর্ব্বাদর্শে ইহার পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠন শেষ হয়।

গির্জ্জার অভ্যন্তর—অর্থাৎ গর্ভগৃহ ৪ শত ১০ ফিট দীর্ঘ, প্রস্থে ১ শত ৯৫ ফিট। ইহা ৭৫ ফিট উচ্চ। প্রবেশপথে যে ২টি বৃহৎ হরিদ্রাবর্ণের আলাবাষ্টারের স্তম্ভ লক্ষিত হয়, সে ২টি এবং বেদীর উপরিস্থিত আচ্ছাদন মিশরের রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক উপহৃত। এই আলাবাষ্টার প্রস্তর মিশরে পাওয়া যায় এবং কায়রোয় ইহাতে গঠিত নানা পণ্য বিক্রীত হয়। বেদীর নিম্নভাগ বহুমূল্য ম্যালাকাইটে রচিত—রুসিয়ার সম্রাট প্রথম নিকোলাসের উপহার। রুসিয়ার সম্রাট জার-বংশ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমতাবলম্বী ছিলেন। রোমান ক্যাথলিকরা হিন্দুদিগের মত "মানত"ও করেন। জার-বংশের শেষ সম্রাট নিষ্ঠুরভাবে নিহত নিকোলাস অপুত্রক অবস্থায় গির্জ্জায় গির্জ্জায় "ধর্ণা" দিয়াছিলেন। তিনি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মাণ যুদ্ধের সুযোগে সমগ্র রুস প্রজা যখন সশস্ত্র হইবার সুযোগ লাভ করে, তখন তাহারা জারের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবধ্বজা উত্থিত করিয়া সে বংশ ধ্বংস করে। বিক্ষুব্ধ প্রজার রোষানলে সমৃদ্ধ সম্রাটপরিবার ভস্মাবশেষ হয়—'কেহ না রহিল আর বংশে দিতে বাতি।" ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে আমরা রোমে উপনীত হই। তখন রুসিয়ার রাজবংশ ধ্বংস হইয়াছে। আমাদের প্রদর্শক ম্যালাকাইটের বেদী দেখাইয়া বলিলেন, "যিনি এই বহুমূল্য উপহার দান করিয়াছেন—আজ তাঁহার বংশ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নামশেষ হইয়া রহিল।" সত্যই বটে—"নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম!" রুসিয়ার জারের পতন স্বৈরশাসনের উপর দারুণ অভিশাপ-নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। ছাতের অভ্যন্তরে কতকগুলি পুরাতন প্রস্তরের মিনাকরা কায রহিয়াছে—তাহাদের অঙ্গে অগ্নির স্পর্শচিহ্ন বিদ্যমান। গির্জ্জার মধ্যে সেণ্ট পিটারের ও সেণ্ট পলের মূর্ত্তি রহিয়াছে।

রোমে ভ্যাটিকান পোপের প্রাসাদ—সেণ্টপিটার্স গির্জ্জার পার্শ্বেই অবস্থিত—গির্জ্জাসংলগ্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন—পৃথিবীতে আর কুত্রাপি এত বড় প্রাসাদ নাই। তবে ইহা কেবল প্রাসাদ নহে। কারণ, ইহার মধ্যে ভাস্করকার্য্যের সংগ্রহশালা, চিত্রশালিকা, পুরাবস্তুগৃহ, পুস্তকাগার, ভজনালয় প্রভৃতি আছে। বিচিত্রবর্ণের পোষাকে সজ্জিত রক্ষীদিগের দ্বারা রক্ষিত দ্বার অতিক্রম করিয়া মধ্যে প্রবেশ করিলে

যেন বাহুল্যে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। পোপের এই রক্ষীদিগের প্রবর্ত্তন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এবং শুনিতে পাওয়া যায়, প্রসিদ্ধ শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো রক্ষীদিগের বেশের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। প্রথমে এই প্রাসাদ পোপদিগের আবাসই ছিল। সার্লামেন রোমে অবস্থিতিকালে এই প্রাসাদেই ছিলেন। কালবশে ইহা হতশ্রী হয় এবং পোপরা অন্যত্র বাস করিতে থাকেন। পরে ইহা পুনরায় পোপদিগের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং তদবধি ক্রমে ক্রমে নানারূপে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

মনে পড়ে। কত সাধনা, কত ষড়যন্ত্র, কত ত্যাগ, কত ভোগ—মানুষের চরিত্রের কত ভাবের বিকাশ!

পৃথিবীর, নানা স্থান হইতে শিল্পী ও শিল্পামোদীরা শিল্পকীর্ত্তি দেখিবার জন্য এই প্রাসাদে আসিয়া থাকেন। এই শিল্পসৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রাসাদে ধর্ম্মগুরু পোপ বাস করেন। যাঁহার আদেশে এক দিন খৃষ্টান রাজ্যসমূহের উত্থান-পতন হইয়াছে—যাঁহার ভয়ে নৃপতিরা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন—যিনি মানুষের স্বর্গবাসের ছাড় দিবার অধিকারী বলিয়া, ভগবানের প্রতিনিধিরূপে পূজিত হইতেন—
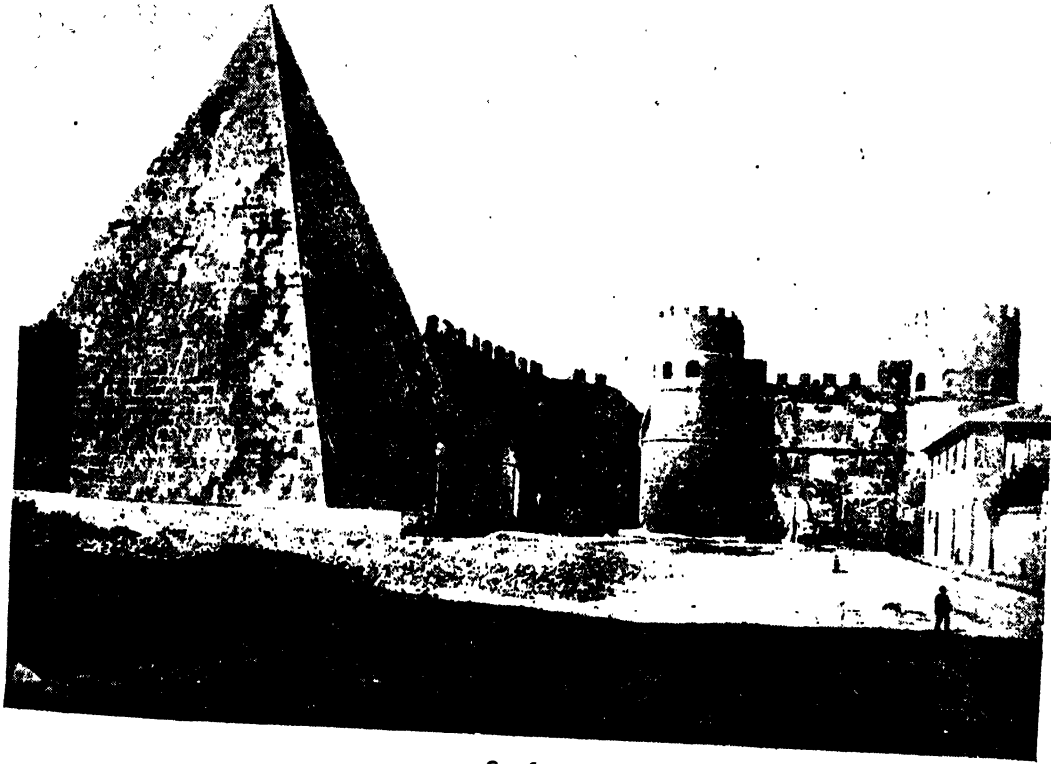
পিরামিড

শত শত শিল্পী আপনার শিল্পনৈপুণ্য অর্ঘ্যরূপে নিয়া এই প্রাসাদ সুসজ্জিত করিয়াছে। ভক্তির সঙ্গে নৈপুণ্য মিশিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কীটস বলিয়াছিলেন—"যাহা সুন্দর, তাহা চিরানন্দক।" ভ্যাটিকানে যে সব শিল্পকীর্ত্তি সংরক্ষিত, সে সত্য সত্যই চিরানন্দদায়ক।

ভ্যাটিকানে প্রবেশ করিলে কত দিনের কত স্মৃতি

আজ তাঁহার প্রভাব-প্রতাপ এই প্রাসাদ-প্রাচীরের বাহিরে আর বড় অনুভূত হয় না।

পোপের পূর্ব্বকথা ও বর্ত্তমান অবস্থা মনে করিলে দিল্লীর মোগল সম্রাটদিগের ইতিহাস মনে পড়ে। দিল্লীর দাওয়ানী খাসের মর্ম্মর-প্রাচীরে সম্রাট সাহজাহান যে দিন স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন:—

"যদ্যপি স্বরগ থাকে এই মহীতলে,
এখানে—এখানে তাহা ; এখানে কেবল"

সে দিন কি তিনি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারই পুত্র আওরঙ্গজেবের পতনের পরই মোগল সম্রাটদিগের প্রভাব, প্রতাপ, সমৃদ্ধি স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা দিল্লীর দুর্গে একরূপ বন্দী হইয়া "শুদ্ধাস্থ-সাম্রাজ্য" লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন? তিনি কি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, বাহাদুর সাহের পত্নী জিন্নাতমহল যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নারীহৃদয়ে পোষণ করিতে পারিবেন—বাহাদুর শাহের মনে তাহারও স্থান হইবে না? এক দিন দিল্লীদুর্গে দাঁড়াইয়া—চারিদিকে গৌরবের স্মৃতি লক্ষ্য করিয়া—শ্মশানবৈরাগ্যবশে মনে যে ভাব অনুভব করিয়াছিলাম, রোমে ভ্যাটিকান দেখিয়া মনে সেই ভাবই অনুভব করিলাম? "এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি?"

আজ পোপের সঙ্গে তুর্কীর খলিফার অবস্থা তুলনা করা যায়। ইসলামের ধর্ম্মগুরু খলিফার পরিণাম কি হইয়াছে? যে বীর মুস্তাফা কামাল পাশা তুর্কীর হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধারসাধন করিয়াছেন—তিনি খলিফাকে জাতীয় মুক্তির পথে বিঘ্ন বিবেচনা করিয়া—উন্নতির অন্তরায় মনে করিয়া বাহুবলের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া দেশত্যাগী করিয়াছেন। ইসলাম জগৎ ধর্ম্মগুরুর জন্য অশ্রুপাতও করে নাই—উচ্চকণ্ঠে কামাল পাশার জয়ধ্বনি করিয়াছে!

সে হিসাবে ইটালীর মুক্তিদাতারা পোপের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। পোপকে তাঁহারা প্রাসাদাদিতে অধিকার দিয়াছিলেন এবং ইটালীর রাজস্ব হইতে বার্ষিক ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে পোপের পক্ষে সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া বসবাসের ও নিরুপদ্রবে ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার যথেষ্ট সুবিধা অনিবার্য্য।

মিশরে সেকালে সম্রাটদিগের দেহ যে স্থানে রক্ষিত হইত, তথায় পিরামিড রচিত হইত। পিরামিড প্রস্তররচিত সূক্ষ্মাগ্র ত্রিভুজাকৃতি। তাহার মধ্যে—অন্ধকার কক্ষে শব রক্ষিত হইত। পিরামিড মিশরের বৈশিষ্ট্য। কায়রোর উপকণ্ঠে মরুমধ্যে পিরামিড অনেকে দেখিয়াছেন। রোম যখন ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে উৎফুল্ল ছিল—তখন তথায় বহু দেশের বহু ব্যাপার অনুকৃত হইয়াছিল। বিলাসী রোমানদিগের অঙ্গাবরণের জন্য এই ভারতবর্ষ হইতে মসলীন, কার্পাসবস্ত্র রপ্তানী হইত। সমাধির জন্য মিশরের পিরামিডও অনুকৃত হইয়াছিল। সেণ্ট-পলস গির্জ্জার নিকটে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সমাধিক্ষেত্রের সান্নিধ্যে সেষ্টিয়াসের পিরামিডাকৃতি সমাধি রোমের অন্যতম অতিপ্রাচীন চিহ্ন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০ বা সেই সময় সেষ্টিয়াসের মৃত্যু হয়। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে এগ্রিপা তাঁহার এই সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত করান। কিংবদন্তী আছে, এই পিরামিডের পার্শ্বস্থ পথ দিয়া সেণ্টপলকে বধার্থ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তৎকালে এই স্থানে কেবল সেষ্টিয়াসের সমাধি ছিল। আজ তাঁহার সেই সমাধির সান্নিধ্যে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির দেহ সমাহিত হইয়াছে। কবি শেলী লিখিয়াছিলেন,—"এমন মধুময় স্থানে সমাহিত হইব মনে করিলে মৃত্যুকেও ভালবাসিতে প্রবৃত্তি হয়।" এই সমাধিক্ষেত্রে কবি কীটসের দেহ সমাহিত। স্মৃতিমন্দিরে নীত হইবার পূর্ব্বে শেলীর হৃদয়ও এই সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত ছিল। কবিযুগলের ভক্ত বন্ধু সেভার্ণ ও ট্রেলনীও এই সমাধিক্ষেত্রে জননী ধরণীর অঙ্কে শেষ শয়ন লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী দেশের বহু লোক রোমে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া এই সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হইয়াছেন সকল সমাধিস্তম্ভের উপর পিরামিডের ছায়া পতিত হয়।

রোমের সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট গৃহ—কলোসিয়ম। ইহার সম্মুখে সম্রাট নীরোর বৃহৎ ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি যে ১ শত ২০ ফিট উচ্চ ছিল, তাহাতেই ইহার স্বরূপ অনুমিত হইবে। সম্রাট হাডরিয়ান ২৪টি হস্তীর পৃষ্ঠে ইহা নীরোর স্বর্ণপ্রাসাদ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কলোসিয়মের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যে বেদীর উপর এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অবশেষ এখনও বিদ্যমান—তবে তাহার আচ্ছাদন-মর্ম্মর আর নাই।

কলোসিয়মের বিশালত্ব প্রথম দর্শনেই দর্শককে অভিভূত করে। ইহা রোমের—সমগ্র ইটালীর বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক
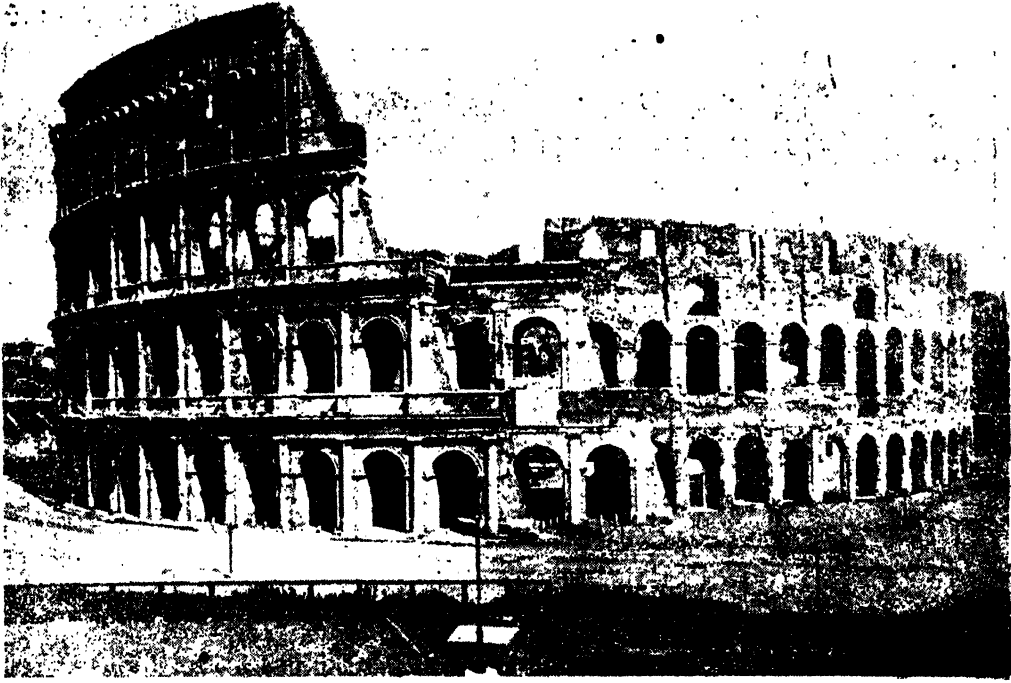
কলোসিয়ম

বলা যাইতে পারে, মিশরের পক্ষে পিরামিড যাহা, ইটালীর পক্ষে এই কলোসিয়ম তাহাই। পৃথিবীতে এরূপ বিশাল সৌধ আর দেখা যায় না। ইরাকের নদীকূলে টেসিফনে যে প্রাসাদের একটিমাত্র খিলান অবশিষ্ট আছে এবং অদ্যাপি দর্শকের বিস্ময় উৎপাদিত করে, কলোসিয়মের তুলনায়, বোধ হয়, তাহাও ক্ষুদ্র ছিল। যে স্থানে পূর্ব্বে নীরোর স্বর্ণপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে ভেস্‌পেসিয়ান, টাইটাস ও ডমিশিয়ান—৩ জন সম্রাটের রাজত্বকালে এই সৌধ নির্ম্মিত হয়। ইহা প্রাচীন রোমের রঙ্গগৃহ ছিল। এই ডিম্বাকৃতি গৃহের প্রাঙ্গণে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং পশুর সহিত মানুষের যুদ্ধ হইত—বহু খৃষ্টানকেও "বিধর্ম্মী" বলিয়া হিংস্র সিংহের মুখে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। রোমের অধিবাসীরা এই গৃহে স্ব স্ব উপবেশনস্থানে উপবিষ্ট হইয়া সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিত ও দেখিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিত। যে সকল কক্ষে হিংস্র জন্তুগুলিকে বদ্ধ রাখা হইত এবং পরে প্রাঙ্গণে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত, সে সব কক্ষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্স এই সৌধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—এই সৌধ দেখিলে মনে হয় যেন, দুষ্ট ও বিস্ময়কর প্রাচীন রোমের প্রেতাত্মা রোমের ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। এমন অভিভূতকর, বিশাল, গম্ভীর ও শোকোদ্দীপক সৌধ আর নাই। আজ ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে হৃদয় যেরূপ চঞ্চল হয়, যখন ইহা রক্তসিক্ত হইত, তখনও ইহার দর্শন মনে তেমন চাঞ্চল্য সঞ্চার করিতে পারিত না। সুখের বিষয়, আজ ইহা ধ্বংসাবশেষমাত্র।

মানুষে মানুষে যুদ্ধ ঘটাইয়া মৃত্যুতে তাহার পরিণতি করা—মানুষকে হিংস্র জন্তুর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করা—এ সব দৃশ্য নিষ্ঠুরতারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কোন প্রকারে রক্তপাত যাঁহারা বর্ব্বরতার চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করেন এবং হিন্দুদিগের

বলিদানেই তাহাদের অসভ্যতার প্রমাণ দেখেন, তাঁহারা মানবচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইয়া যায়েন। রক্ত-চিহ্ন দেখিলেই যাহারা মূর্চ্ছিত হয়, তাহাদের পক্ষে অনেক সময় আত্মরক্ষাও অসম্ভব হইয়া উঠে; কারণ, মানুষের প্রকৃতি যত দিন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত না হইবে, তত দিন যুদ্ধবিগ্রহও অসম্ভব হইয়া উঠিবে না, তত দিন মানুষ মানুষকে আক্রমণ করিবে—তত দিন জগতে যোদ্ধার প্রয়োজন শেষ হইবে না।

কলোসিয়মের ব্যাস ১ মাইলের এক-তৃতীয়াংশ। ইহাতে ৮০টি খিলানসমন্বিত ৪টি স্তর ছিল—এই চারি-তল গৃহে ৫০ হাজার দর্শকের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং দর্শকরা নিম্নে ২ শত ৭৩ ফিট দীর্ঘ ও ১ শত ২০ ফিট প্রস্থ প্রাঙ্গণে ক্রীড়াকৌতুক দেখিত। সময় সময় নৌযুদ্ধ দেখাইবার জন্য প্রাঙ্গণ জলে পূর্ণ করা হইত। যে পথে পরে সেই জল বাহির করিয়া দেওয়া হইত, সেই পয়ঃপ্রণালীও দেখিতে পাওয়া যায়।

সে আজ কত কালের কথা! খৃষ্টীয় ৭২ অব্দে এই সৌধের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয় এবং ৮ বৎসর পরে টাইটাস ইহার উদ্বোধন করেন। সেই উদ্বোধনের সময়ে যে সব ক্রীড়াকৌতুক রোমের অধিবাসীদিগের চিত্তরঞ্জন করিয়া-ছিল, সে সকল শতদিবসব্যাপী হইয়াছিল এবং তাহাতে পঞ্চ সহস্র পশু নিহত হয়।

এই সৌধে আসনের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং প্রত্যেক আসনে তাহার সংখ্যা ক্ষোদিত। রোমের অধিবাসী মাত্রেরই জন্য আনন্দবিধানের এই ব্যবস্থায় যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, রোমের স্বৈরাচারী সম্রাটরাও গণতন্ত্রের ভিত্তি লোকমত উপেক্ষা করিতে সাহস করিতেন না।

মধ্যযুগে কলোসিয়ম হইতে বহু প্রস্তর অপহৃত হইয়া-ছিল। যে সকল ধাতব কীলক প্রস্তরখণ্ডসমূহ সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও স্থানে স্থানে আর নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হয়। তাহা না হইলে আজ হয় ত দর্শক প্রাচীন রোমের এই বিশাল সৌধের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিস্মৃত অতীতের চিত্র কল্পনা করিবার সুযোগও পাইত না।

রোমের ফোরামের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই ফোরাম বা বাজার এক সময় রোমের রাজনীতিক জীব-নের কেন্দ্র ছিল—এই স্থানেই রোমের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত হইত। এই স্থানেই বক্তা, প্রচারক প্রভৃতি স্ব স্ব মত প্রচার করিতেন—লোককে স্বমতের যুক্তিযুক্ততা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন! যখন ২টি মাত্র পাহাড় লইয়া রোম ছিল, তখন উভয় শৈলের মধ্যবর্ত্তী এই স্থানে রোমের বাজার স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে ইহা জলাভূমি ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ অব্দে টার্কুইন পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করাইয়া ইহার জল-নিকাশ-ব্যবস্থা করেন। তদবধি ইহার বক্ষে বীরদিগের স্মৃতিস্তম্ভ, দেবতার মন্দির, বিচারা-লয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। এই সকল স্তম্ভা-দিতে রোমের উন্নতির পারম্পর্য্য লক্ষ্য করা যাইত। বাস্তবিক এই ফোরাম পরীক্ষা করিলে রোমের উত্থান-পতনের ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারিত। আজ তাহা রোমের গৌরবের শ্মশান—বর্ত্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিদের সাহায্য ব্যতীত ইহার পূর্ব্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। বর্ব্বরদিগের দ্বারা বিধ্বস্ত, গির্জ্জা গঠিত করিবার জন্য হৃতোপকরণ, দীর্ঘ ৩ শতাব্দীকাল ৪০ ফিট আবর্জ্জনার নিম্নে আচ্ছন্ন, পশু-বিক্রয়ের হাটে পরিণত—এই ফোরাম আজ পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতিমাত্র বক্ষে লইয়া বিদ্য-মান। তবে ইহার যে সব অংশ আবিষ্কৃত হইয়া লোক-লোচনের গোচর হইয়াছে, তাহাতেই ইহার পূর্ব্বাবস্থা কল্পনা করিতে পারা যায়।

ফোরাম ২ শত ৩০ গজ দীর্ঘ ও ৮০ গজ প্রস্থ ভূমি-খণ্ডে অবস্থিত। ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভাদির মধ্যে কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) ফোকাসের স্তম্ভ। ইহা সম্রাট ফোকাসের স্মৃতিরক্ষার্থ খৃষ্টীয় ৬০৮ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ৫৪ ফিট উচ্চ স্তম্ভের উপর সম্রাটের স্বর্ণবর্ণ-রঞ্জিত মূর্ত্তি ছিল।

(২) কার্টিয়াসের হ্রদ। স্তম্ভের পূর্ব্বে যে স্থান আছে, কিংবদন্তী তাহাকে দেশের কল্যাণকামনায় আত্ম-ত্যাগের গৌরবস্থল করিয়াছিল। কিংবদন্তী, প্রাগৈতি-হাসিক যুগে একবার যখন মহামারী রোমনগর জনশূন্য করিতেছিল, তখন দেবতার বাণী শ্রুত হয়—রোম যাহা

ফোরাম

সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাই বলি না দিলে মহামারী দূর হইবে না। তাহা শুনিয়া আত্মত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কার্টিয়াস সশস্ত্র অবস্থায় অশ্বারোহণ করিয়া অগ্রসর হয়েন। সম্মুখে মেদিনী দ্বিধাবিভক্ত হইলে, বীর অশ্বসহ তাহাতে পতিত হইলে গর্ত্তমুখ বন্ধ হয়।

এই স্থানের পূর্ব্বদিকে ডমিশিয়ানের অশ্বারোহী মূর্ত্তির বেদী।

(৩) জুলিয়াস সিজারের মন্দির। ইহা খৃষ্টীয় ৪২ অব্দে অগষ্টাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্থানে মার্ক এণ্টনী শোকার্ত্ত রোমানদিগকে জুলিয়াসের শব দেখাইয়াছিলেন।

(৪) সিজারের মঞ্চ।

(৫) স্বর্ণমাইল স্তম্ভ। পূর্ব্বোক্ত মঞ্চের দক্ষিণে যে বেদীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, তাহাতেই খৃষ্টীয় ২৯ অব্দে অগষ্টাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় স্বর্ণস্তম্ভ স্থাপিত ছিল। এই স্থান হইতে রোমান সাম্রাজ্যের দিকে দিকে রাজপথ প্রসারিত ছিল এবং এই স্তম্ভ হইতেই সে সব পথের দূরত্ব পরিমাপ করা হইত।

ফোরামের বাহিরে সকল দিকে যে কত সৌধের অবশেষ, কত মন্দিরের চিহ্ন, কত স্তম্ভ, কত তোরণ—রোমের বিগত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ফোরামের বর্ণনা—এই সমৃদ্ধিকেন্দ্র আজ শ্মশান "It is now merely a maze of melancholy masonry, marble and tufa."

দেখিলে সাহজাহানের দিল্লীর উপকণ্ঠে কুতবমিনারের চারিদিকে পুরাতন রাজধানীর ভগ্নাবশেষের কথা স্মৃতি-পটে সমুদিত হয়। কালের আক্রমণ প্রহৃত করিয়া আজও কতকগুলি স্তম্ভ ও কয়টি সৌধাবশেষ দণ্ডায়মান। আর কত কাল তাহারা এই ভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, তাহা কে বলিতে পারে? মানুষ যে সব সৌধাদি রচনা

করিয়া কালজয়ী হইল বলিয়া মনে করে, কাল কত সামান্য চেষ্টায় সে সব ভগ্নস্তূপে পরিণত করিয়া মানবের ক্ষমতাকে উপহাস করিতে থাকে!

প্রাচীন রোমের বহু সৌধের মধ্যে কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টির উল্লেখ করিব? তবে ইতিহাসপাঠকের নিকট প্যান্থিয়ন এত পরিচিত যে, তাহার বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। পুরাতন সৌধের মধ্যে কোনটিই এই প্যান্থিয়নের মত সুরক্ষিত নহে। তাহার সুন্দর গম্বুজে একটিমাত্র ছিদ্রপথে আলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যে গম্ভীর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, সেণ্ট-পিটার্স গির্জ্জায়ও তাহা দুর্ল্লভ। শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো বলিয়াছিলেন—মানুষে ইহার কল্পনা করে নাই, করিয়াছিল দেবদূতরা। ইহার অসাধারণ স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য ব্যতীতও ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ১ হাজার ৮ শত বৎসরের পুরাতন গৃহরাজির মধ্যে ইহাই আজও ব্যবহৃত। খৃষ্টীয় ২৭ অব্দে মার্কাস এগ্রিপা ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন ইহা স্নানাগার করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন এবং ইহা সর্ব্বদেবমন্দিরে পরিণত হয়। ইহার অভ্যন্তরে প্রাচীরে কুলঙ্গীতে সকল দেবতার মূর্ত্তি রক্ষিত ছিল। গৃহের অধিকাংশ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইলে খৃষ্টীয় ১২০ অব্দ হইতে ১২৪ অব্দের মধ্যে বিনষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হয়। সেই জন্যই ইহার স্থাপত্যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বাবধি অবস্থিত অংশে ১৬টি থাম আছে—সেগুলি ৩৯ ফিট উচ্চ। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেই দেখা যায়, গম্বুজের ছিদ্রপথে কক্ষে আলোকপাত হইয়াছে—দক্ষিণ ইটালীর রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবসে এইরূপ আলোকপাতের ফল বড় মধুর বোধ হয়। প্রাচীরগুলি মর্ম্মরাবৃত—মধ্যে মধ্যে কুলঙ্গী। বাহিরে ও ভিতরে ব্রোঞ্জের যে সব সজ্জা ছিল, তাহার বহুভাগই আজ অন্তর্হিত। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দেও তৃতীয় আর্ব্বাণ সেণ্ট-পিটার্স গির্জ্জার বেদী নির্ম্মাণের জন্য ও পোপের দুর্গ সেণ্ট এঞ্জেলোয় কামান গঠিত করিতে এই সৌধ হইতে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার মণ ওজনের ব্রোঞ্জ লইয়া

গিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ইহা অখৃষ্টানের মন্দির বলিয়া বন্ধ করা হয়। তাহার পর সপ্তম শতাব্দীতে পোপ ইহা অধিকার করিয়া দেবমূর্ত্তি স্থানচ্যুত করেন। এই প্যান্থিয়নে প্রসিদ্ধ চিত্রকর র‍্যাফেলের দেহ সমাহিত। তাহার পর যুক্ত ইটালীর ২ জন সম্রাটের—দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ও তদীয় পুত্র প্রথম হাম্বার্ট—শবও এই প্যান্থিয়নে স্থান পাইয়াছে।

প্যান্থিয়নের কথায় আমরা সেণ্ট এঞ্জেলো দুর্গের উল্লেখ করিয়াছি। এই দুর্গ হাডরিয়ানের স্মৃতিসৌধের সঙ্গে একসঙ্গে গ্রথিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভিত্তি দীর্ঘে ও প্রস্থে ১ শত ১৪ গজ। সম্রাট হাডরিয়ান খৃষ্টীয় ১৩০ অব্দে ইহা নির্ম্মিত করান। প্রথমে হাডরিয়ানের পোষ্যপুত্রের, পরে হাডরিয়ানের, মার্কাস অরেলিয়াসের, সেপ্টিমিয়াস সেভেরাসের ও কারাকালার ভস্ম ইহাতে রক্ষিত হয় ও খৃষ্টীয় ২১৭ অব্দে ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার প্রাচীর মর্ম্মরাস্তৃত ছিল। ইহা নানা মূর্ত্তিতে সজ্জিত ছিল এবং সর্ব্বোপরি হাডরিয়ানের বিরাট মর্ম্মর-মূর্ত্তি শোভা পাইত। সে মূর্ত্তির মস্তক এখনও ভ্যাটিকানে রক্ষিত। খৃষ্টীয় ৪২৩ অব্দে ইহা দুর্গে পরিণত করা হয় এবং প্যান্থিয়ন হইতে ব্রোঞ্জ আনিয়া তাহার প্রথম কামান

সেণ্ট এঞ্জেলো

প্যান্থিয়ন যেমন রোমের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মন্দির, তেমনই সেণ্ট এঞ্জেলোর দুর্গ ও কাসল নামে পরিচিত হাডরিয়ানের স্মৃতিসৌধ রোমের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সমাধিসৌধ। বর্ত্তমানে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী গৃহের মধ্যস্থল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই ১ শত ৬৫ ফিট উচ্চ, চক্রাকৃতি সৌধ কলোসিয়মেরই মত রোমের সকল স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার ঢালাই করা হয়। খৃষ্টীয় ৫৩৭ অব্দে গথরা রোম আক্রমণ করিয়া ইহা শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম কিংবদন্তীমূলক। খৃষ্টীয় ৫৯০ অব্দে রোমে মহামারীর আবির্ভাব হয়। আমাদের দেশে যেমন এরূপ ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়, পোপ তেমনই অনুতপ্তদিগের শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক দিন যখন শোভাযাত্রা সেতু অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল, তখন
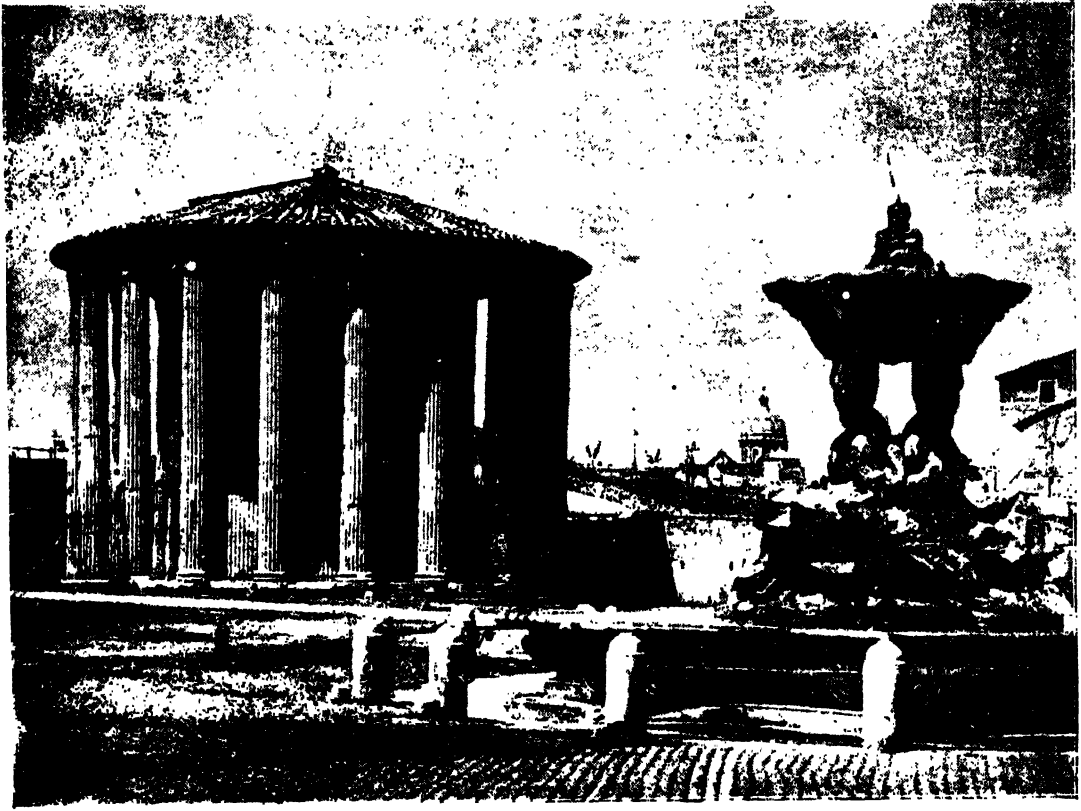
ভেস্তার মন্দির

তিনি দেখেন, দেবদূত মাইকেল রক্তাক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করিতেছেন। সেই সময় হইতে মহামারী অন্তর্হিত হয়। ৬১০ খৃষ্টাব্দে শৈলশিরে—'মেঘমালার মধ্যে" সেণ্ট মাইকেলের গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার উপর সেণ্ট মাইকেলের মূর্ত্তি ছিল। বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত নূতন।

এই দুর্গের ইতিহাস মধ্যযুগে রোমের ইতিহাস।

যে সেতু পার হইয়া স্মৃতিসৌধে যাইতে হয়, তাহাও হাডরিয়ানের সময়ের। রোমের নদী টাইবারের বহু সেতুর মধ্যে সৌন্দর্য্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টাইবারের বন্যায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বহু সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা আজিও অক্ষুন্ন অবস্থায় গঠনদৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মেকলের কবিতায় টাইবারের বর্ণনা পাঠ করিয়া টাইবার সম্বন্ধে মনে যে ধারণা পোষণ করিয়াছিলাম, টাইবার দেখিয়া সে ধারণা দূর হইল। কল্পনায় ও বাস্তবে কি প্রভেদ! বিলাতের কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার কবিতায় তাহার আভাস দিয়াছেন—ইয়ারোর কল্পনা ও স্বরূপ কত ভিন্ন! আমাদের দেশে কবির 'যমুনা-কল্পনা'—

"তা'র কূলে কূলে বুঝি বকুল তমাল
করে ফুল ছায়া দান;
তা'র জলে জলে ছুটে প্রেমের স্মিরিতি
কল্লোলে বিরহ-গান!
সেথা সমীর-হিল্লোলে বাজে বা বাঁশরী
পরাণ উদাসী করা;
সেথা দিবসের আলো গোধূলি কোমল,
আঁধার কৌমুদীভরা।"

কিন্তু যমুনার স্বরূপ আজ কি? বৃন্দাবনতলবাহিনী
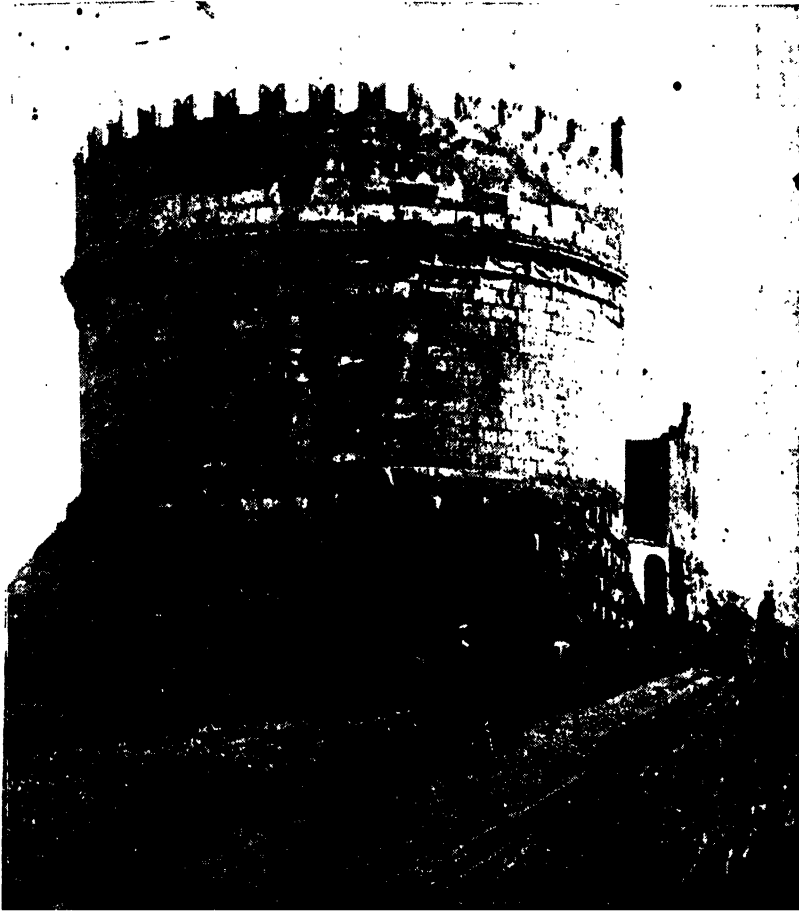
এপিয়ান ওয়ে—সমাধি·

টেমসই শীর্ণকায় বলিয়া মনে হইয়াছিল, টাইবার ত পরের কথা। বাস্তবিক টাইবার আমাদের দেশের সাধারণ খাল অপেক্ষা বিস্তৃত নহে। তবে পার্ব্বত্য প্রদেশের নদী—মধ্যে মধ্যে বন্যায় প্রবল ধারা বহিয়া থাকে। সেই বন্যার সময় জলস্রোতে সেতুও ভাসিয়া যায়।

রোমে টাইবারের উপর অনেকগুলি সেতু আছে। টাইবারের জলধারা রোমকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সুন্দর করিয়াছে।

রোমের এপিয়ান-ওয়ে দীর্ঘ পথ। ইহার উভয় পার্শ্বে যে সকল পুরাতন সমাধিসৌধ কালের প্রভাব ও রৌদ্র-বৃষ্টির আক্রমণচিহ্ন অঙ্গে লইয়া দণ্ডায়মান, সে সকলের মধ্যে সমাহিত ব্যক্তিরা যে এক কালে রোমের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাহাদের অঙ্গে উৎকীর্ণ মৃত ব্যক্তির পরিচয়ফলক ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে—স্থানে স্থানে সৌধাঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই পথের পার্শ্বে এক দিকে যেমন বীরদিগের সমাধিসৌধ—অপর দিকে তেমনই সুন্দরী-দিগের স্মৃতিগৃহ। দেখিয়া কবি গ্রের সেই কথা মনে পড়ে :—

"উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ কিংবা প্রতিমূর্ত্তি তা'র,
ফিরে কি আনিয়া দিবে মৃতদেহে প্রাণ ?"

এই সকল স্মৃতি-সৌধের মধ্যে ২টি বিরাটত্বহেতু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি ঐতিহাসিক ও কবি কর্তিনাসের সমাধি বলিয়া বিখ্যাত। আর একটি গিরিশিরে—

যমুনা আজ নামশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেখিয়া আক্ষেপগীতি মনে পড়ে :—

"যমুনে, এই কি তুমি
সেই যমুনা প্রবাহিণী ;
যা'র বিমল তটে রূপের হাটে
বিকা'ত নীলকান্তমণি ?

* * * * *

কোথা সে জলকেলি কোথা সে চন্দ্রাবলী ?
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী ?
কোথা সেই বংশীধারী রাসবিহারী—
বামেতে রাই বিনোদিনী ?"

গঙ্গার, পদ্মার, মেঘনার দেশ হইতে যাইয়া বিলাতের

সিসিলিয়া মেটেল্লার সমাধি। সিসিলিয়ার সমাধির ব্যাস ৬৫ ফিট। ইনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর লোক—ক্রেসাসের পত্নী। স্মৃতি-সৌধের মধ্যবর্ত্তী এই পথ প্রাচীন রাজপথের রাজ্ঞী বলিয়া পরিচিত। সিসিলিয়ার স্মৃতি-সৌধ যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থান হইতে দেখিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। সেই স্থান হইতে নিম্নে ধ্বংসাবশেষ রোমের দৃশ্য—দূরবর্ত্তী গিরিশ্রেণী—সে কালের জলসরবরাহের জন্য নির্ম্মিত পথ—এ সব দেখিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রকাশের ভাষা নাই।

বিলাসী রোমানরা যে স্নানাগার নির্ম্মাণেও অবহিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কলোসিয়মের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে কিছু দূরে অবস্থিত কারাকালার স্নানাগারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। খৃষ্টীয় ২১২ অব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হয়—ইহা ২ দিকে প্রায় সিকি মাইল স্থান ব্যাপিয়া ছিল। মধ্যস্থলে বিশাল সৌধ—তাহার ৩ দিকে সুসজ্জিত উদ্যান। এই স্নানাগারের মধ্যে পুস্তকালয়, চিত্রশালিকা, বক্তৃতাগার প্রভৃতিও ছিল এবং ইহার ভগ্নাবশেষের মধ্যে বহু ভাস্করকীর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। ১ হাজার ৬ শত লোক এক সময়ে এই বৃহৎ স্নানাগার ব্যবহার করিতে পারিত।

ভুবনেশ্বরে যেমন অসংখ্য মন্দির, রোমে তেমনই অসংখ্য মন্দির, স্তম্ভ, তোরণ।
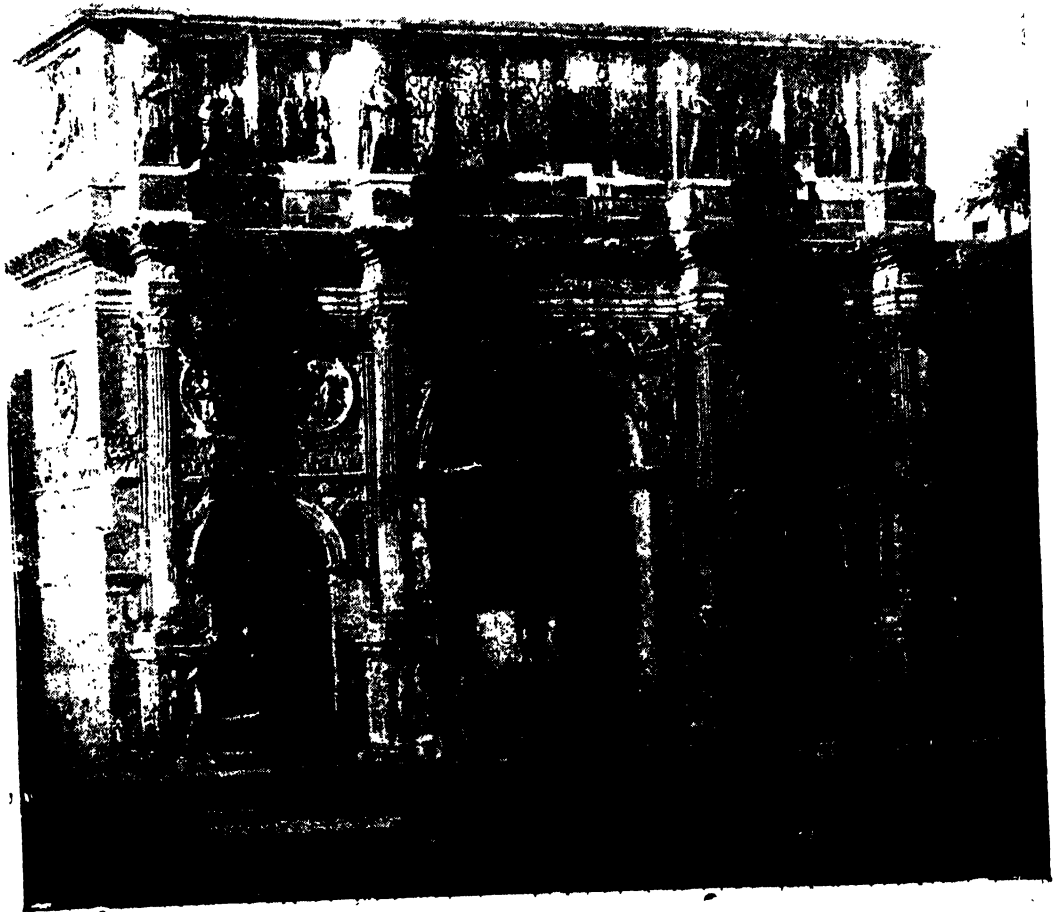
প্যান্থিয়নের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—আর একটি মন্দিরের কথা বলিব। সে ভেস্তার মন্দির। ইহাকে রোমানদিগের জাতীয় পবিত্র অগ্নিকুণ্ড বলা যায়। অগ্নির উপাসক পার্শীরা তাঁহাদের মন্দিরে অগ্নি প্রজ্বালিত রাখেন। আমাদের দেশে "অগ্নিহোত্রীর" কথা সর্ব্বজনবিদিত। রোমের এই মন্দিরে হুতাশন চিরদীপ্ত থাকিত। কেবল বৎসরের প্রথম দিন তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানসহ পুনরায় প্রজ্বালিত করা হইত।৹

যেমন এই একটিমাত্র মন্দিরের কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইয়াছি, তেমনই একটিমাত্র স্তম্ভের কথাই বলিব। মার্কাস অরিলিয়াসের স্তম্ভ তাঁহার উদ্দেশে রোমের জনগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১৭১ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার অঙ্গে তাঁহার জার্ম্মাণ জয়ের ইতিহাস চিত্রিত। ইহার মধ্যে সোপানশ্রেণীও বিদ্যমান এবং ইহা ২৮ খণ্ড মর্ম্মরে রচিত। কিন্তু শিল্পনিদর্শন হিসাবে ট্রাজানের স্তম্ভের সহিত এই স্তম্ভ তুলিত হইতে পারে না। ট্রাজানের স্তম্ভ ১ শত ৪০ ফিট উচ্চ। ইহার গাত্রেও যুদ্ধজয়ের ইতিহাস। স্তম্ভমূলে একটি কক্ষে ট্রাজানের চিতাভস্ম রক্ষিত। রোমের প্রতিনিধি সভা খৃষ্টীয় ১১৪ অব্দে এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

এখনও রোমে বহু তোরণ দৃষ্ট হয়। এই সব তোরণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে পরিচিত। ফোরামে খৃষ্টীয় ১৬ অব্দে প্রতিষ্ঠিত টাইবিরিয়াসের তোরণের ভগ্নাবশেষ আছে। সেপ্টিমিয়াস সেভারাসের তোরণ রোমের প্রতিনিধিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ২০৩ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাও জয়ঘোষণার জন্য নির্ম্মিত। ইহা গ্রীক মর্ম্মরে রচিত এবং ইহার উপর ৬টি অশ্ববাহিত রথে জয়লক্ষ্মী কর্ত্তৃক মুকুটে শোভিত সেভারাসের মূর্ত্তি ছিল। তোরণের পার্শ্বভাগ সামরিক চিত্রে শোভিত। টাইটাসের তোরণ খৃষ্টীয় ৮১ অব্দের। ইহা জেরুজালেম ধ্বংসের স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলোসিয়মের নিকটবর্ত্তী কনষ্টাণ্টাইনের তোরণ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ম্মিত। ইহা কনষ্টাণ্টাইনের জয়স্তম্ভ এবং অদ্যাপি সুরক্ষিত। ইহার সৌন্দর্য্য সহজেই দর্শককে আকৃষ্ট করে। ইহাকে পূর্ব্বধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের সংযোগ-সেতু বলা যাইতে পারে। কারণ, কনষ্টাণ্টাইন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিতে পারিলে তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন। ড্রুসাসের তোরণ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

রোমের আর একটিমাত্র অবশ্যদ্রষ্টব্য স্থানের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সেকালে যখন রোমে খৃষ্ট-ধর্ম্মালোচনা নিষিদ্ধ ছিল, তখন খৃষ্টানরা গোপনে মিলিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন এবং গোপনে আপনাদিগের ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শব সমাহিত করিতেন। সেই জন্য তাঁহারা ভূগর্ভে রচিত সুরঙ্গে আশ্রয় লইতেন। নানা স্থানে এইরূপ সুরঙ্গ আছে। সবগুলির দৈর্ঘ্য মোট প্রায় ৫ শত মাইল হইবে। সঙ্কীর্ণ পথ—মধ্যে মধ্যে কক্ষ।

চারি দিকে প্রাচীন রোমের ভগ্নাবশেষ। কিন্তু সেই সকলের আলোচনা করিতে করিতে আমরা যেন নবীন ইটালীর মুক্তিসংগ্রামের কথা ভুলিয়া না যাই। সে সংগ্রাম যেমন দীর্ঘকালব্যাপী, তেমনই দেশপ্রেমে ও ত্যাগে সমুজ্জ্বল। পরাধীন জাতির মুক্তির সংগ্রাম কখন ত্যাগ ও বীরত্ব ব্যতীত জয়ে শেষ হয় না। ইটালীতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই সংগ্রামের সঙ্গে যাঁহাদিগের নাম নেতৃরূপে বিজড়িত, গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের অন্যতম। ইটালী তাহার মুক্তিযুদ্ধে নায়কদিগের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে কার্পণ্য করে নাই—নানা স্থানে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রোমে একটি পাহাড়ের উপর তাঁহার মূর্ত্তি। আমরা সেই পথে যাইবার সময় দূর হইতে সেই পরিচিত মূর্ত্তি দেখিয়া আমি সঙ্গীকে বলিলাম, মূর্ত্তির মূলে যান থামাইতে হইবে। গাড়ী থামিলে আমি নামিয়া পড়িলাম—সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরাও নামিয়া অবতরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "ইটালীর মুক্তিদাতার মূর্ত্তির পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময়, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শুভ অবসর—আমি বিজিত দেশের অধিবাসী—ত্যাগ করিতে পারি না।" টুপী খুলিয়া তাঁহার মূর্ত্তিমূলে দাঁড়াইয়া একবার স্বদেশের কথা চিন্তা করিলাম। আমাদের ইংরাজ সঙ্গীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন; বলিলেন, "আমরাও মুক্তির—স্বাধীনতার উপাসক।" সত্য—ইংরাজ মুক্তির উপাসক; কিন্তু ল্যাবুশিয়ার যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য—ইংরাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইংরাজ আপনি যাহা মহামূল্য বিবেচনা

করে, অপরে তাহা লাভ করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা সহ্য করিতে চাহে না!

শ্রান্তদেহে সন্ধ্যার প্রাক্কালে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। তখন হোটেলের খানাঘরে লোকসমাগম হইয়াছে। চা-পান করিতে বসিয়া প্রথম সমরজনিত খাদ্যদ্রব্যের অভাব অনুভব করিয়াছিলাম। চা'র সঙ্গে এক পুলিন্দা চিনি দিয়া গেল—প্রয়োজন না হইলে যেন চিনি ব্যবহার করা না হয়—মিতব্যয়িতা ব্যতীত যুদ্ধকালে খাদ্যদ্রব্যের অভাব সহ্য করা যাইবে না।

হোটেলের খানাঘরে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম—মহিলাদিগের ধূমপান আমার দৃষ্টিতে বিরক্তিকর বোধ হইল। ইহার পূর্ব্বে মহিলাদিগকে অবাধে সিগারেট টানিতে দেখি নাই—পরে ফ্রান্সে ও বিলাতে দেখিয়াছিলাম। বিলাতে শুনিয়াছিলাম, যুদ্ধের সময় দুর্ভাবনার আতিশয্য হেতু মহিলাদিগের মধ্যে ধূমপানের অভ্যাস বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাবনা দূর করিবার কি অন্য ভেষজ নাই? এক কালে ধর্ম্মকেন্দ্র রোমেও কি মহিলারা ধর্ম্মালোচনায় দুর্ভাবনা দূর করিতে পারেন না?

দিবসের শ্রান্তির পর স্নান কবিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। হোটেলের কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সে জন্য সন্ধান লইবার চেষ্টা করিলাম। কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারীরা ইংরাজী জানেন না। শেষে তাঁহারা ইংরাজী-জানা এক জন লোককে আনিলেন। তিনি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্নানের জন্য স্বতন্ত্র অর্থ দিতে হইল—প্রায় ১০ আনা।

এ দিকে ইংরাজের রেলযাত্রীদিগের ব্যবস্থাকারী কর্ম্মচারী আসিয়া সংবাদ দিলেন, আমাদের যাত্রার আয়োজন হইয়াছে। রাত্রি প্রায় সাড়ে ৯টার সময় আমরা রোম ত্যাগ করিয়া প্যারিস যাত্রা করিলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বন্দনা

এস ইন্দীবরদলনিন্দী হে সুন্দর বৃন্দাবনচারী কালা,
তব রাতুল-অতুল-থল-কমল-চরণ-মূলে মূরছয়ে অলি-গোপবালা।
এস রুনু ঝুনু শিঞ্জনে মঞ্জুল মঞ্জীরে বঞ্জুল কুঞ্জ-বিতানে,
এস নববিসকিসলয় মল্লিকা-বল্লরী-বিলসিত কুসুম-শিথানে।
এস অশোকাবতংসক ধৃতমণিকুণ্ডল
অংসকচুম্বিত লম্বিত কুন্তল,
পরি গলে পুলকাঞ্চিত-ভ্রমর-করম্বিত কেলি-কদম্বেরি মালা।

তব চঞ্চল চন্দ্রক কিরীট শিখণ্ডক ইন্দ্রায়ুধ রচে ব্যোমে,
তব রাধাধরগৌরবী কান্ত মুখচ্ছবি নিষ্প্রভ করে রবি-সোমে।
মধু ফাল্গুন বনে বনে সঞ্চারে পীতধটী
ঝঙ্কৃত করে তায় কিঙ্কিণীরুত কটি,
তব বংশী নিনাদসুধা ধ্বংসি' হিংসাক্ষুধা কংসেরে করে মাতোয়ালা।

এস বনবাটে নদীঘাটে, গোঠে মাঠে দধিহাটে মধুবন পুষ্পমালঞ্চে,
এস ঝুলন দোলনা পরে, দোলে পিচকারী করে, রসময় এস রাসমঞ্চে।
এস খঞ্জনগঞ্জন-চারু দলিতাঞ্জন—
শোভিত বিলোচন, এস জনরঞ্জন,
বঁধু কুন্দদশনে সিত চন্দ্রিকাহসনে মনোমন্দির কর আলা।

শ্রীকালিদাস রায়।

দুলালী

ছেলেবেলায় দোসাদ পাড়ায় সে-ই ছিল সবার চেয়ে সুন্দরী। তাহার জন্মের সময় তাহার বাপ নাকি কি একটা কারণে তাহাদের তেলকলের "সাহেবকে" অপমান করিয়া এক বৎসর জেল খাটিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর হইতে দুলালীকে লইয়া সে রঘুনাথপুরে দোসাদ পাড়ায় বরাবর বাস করিতে লাগিল। একখানা খাপরার ঘর, তাহারই সঙ্গে একটু ক্ষেত, দুইটা গাই—এই সব লইয়া সে তাহার ছোট সংসারটি বেশ গুছাইয়া আনিতেছিল; দুর্ব্বিপাকের ক্ষতচিহ্ন প্রায় মিলাইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের আরও একটি কন্যা জন্মিল; সে দেখিতে কালো—দুলালীর সঙ্গে রূপে তাহার তুলনাই হয় না।

পনর বৎসর বয়সে ছাতনা ষ্টেশনের "লাইন্‌সম্যান্" মহুয়া দোসাদের সহিত দুলালীর ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরই সে স্বামীর সহিত ছাতনার রেল কোয়ার্টারে ঘরকন্না করিতে চলিয়া গেল। দুলালীর বাপ-মা তাহার ছোট বোনটির বিবাহ দিয়া জামাইকে ঘরজামাই রাখিল।

* * * *

মহুয়া সুন্দরী বধূকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিল। দোসাদের ঘরে অমন রঙ্—অমন রূপ বড় একটা মিলে না। সে একেবারে মাতিয়া উঠিল। দুলালীকে সে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিত। পাশাপাশি কোয়ার্টারে আরও কয়েক ঘর রেলের খালাসী বাস করিত। বিদেশে টাকা রোজগার করিয়া সকলেই তাহার কতকাংশ মদ খাইয়া খরচ করিত। সন্ধ্যার সময় তাহাদের ঘরগুলার সম্মুখের মাঠটায় বসিয়া সকলে মিলিয়া এইরূপে সমস্ত দিনের শ্রমক্লান্তি ভুলিতে চেষ্টা করিত। কাহারও একটা মাদল, কাহারও হাতে একটা দাগকাটা বাঁশের বাঁশী—সকলে মিলিয়া নাচ, গান, হল্লা করিয়া, মাদল বাজাইতে বাজাইতে মদের পাত্রে চুমুক দিত। শীতকালে মালগাড়ী হইতে উঠাইয়া লওয়া কয়লা জালিয়া তাহার চারিধারে বৈঠক বসিত। এই সব আমোদের আসরে মহুয়া এক বিষয়ে সকলকে পরাজিত করিয়াছিল—সে সকলের চেয়ে বেশী মদ খাইতে পারিত। তাহার উপর তাহার মেজাজটা ছিল বিষম খিট্‌খিটে। সব তাল পড়িত গিয়া দুলালীর উপর। প্রায়ই সে বাড়ী ফিরিয়া দুলালীকে মার-ধোর করিয়া না খাইয়াই শুইয়া পড়িত। দুলালী সমস্ত রাত প্রহারের বেদনায় কাঁদিত ও তাহার মাতাল স্বামীকে খাওয়াইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া রাত্রিশেষে ভোরের শীতল বাতাসে অভুক্ত অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িত। নেশার ঘোর কাটিলে, রেলের আলখাল্লাখানা মাথায় পাগড়ীর আকারে বাঁধিতে বাঁধিতে মহুয়া রাত্রির ঢাকা দেওয়া অন্নগুলির ধ্বংসসাধন করিয়া 'ডিউটি'তে বাহির হইয়া পড়িত। দুলালীর খোঁজ পড়িত—আবার যখন সে বারো-টার সময় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভাতের জন্য ফিরিত। দুলালীর স্বামীর এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার ও তাহার রূপ দেখিয়া অনেক অবিবাহিত দোসাদ যুবকের অন্তরে আশার সঞ্চার হইত। তাহার কানে অবশেষে দুই এক জন মন্ত্র গুঞ্জরণের চেষ্টা করিতেও অগ্রসর হইল। কিন্তু দুলালী তাহা-দিগকে এরূপ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল যে, তাহারা প্রত্যেকে দুলালী-লাভ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া অব-শেষে অন্য কোন কুমারী—স্বজাতীয়ার সন্ধানে মনোনিবেশ করিল।......ছুটীর দিনে দুই চার জন খালাসী, দল বাঁধিয়া, "কাঁড় বাঁশ" লইয়া নিকটস্থ শুশুনিয়া পাহাড়ের জঙ্গলে শৃগাল শীকার করিতে বাহির হইত। আর ট্রেণের নিত্যনূতন আরোহীদের মুখ ত আছেই। এইরূপে তাহারা কখনও বৈচিত্র্যের অভাব বোধ করে নাই। দেখিতে দেখিতে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া চলিল। মহুয়া আরও দুই এক যায়গায় বদ্‌লী হইরা অবশেষে চাকুলিয়া ষ্টেশনে কায়েম হইল। পূর্ব্বের মতই সে দুলালীকে নিজের কাছে রাখিল। তবে এখন তাহাদের যৌবনের প্রথম আবেগ কাটিয়া গিয়াছে, দুলালী চার সন্তানের জননী।

* * * *

মহুয়া চিরকালই বদ্‌রাগী, তাহার উপর ইদানীং তাহার সুরাপানের মাত্রা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। "হোরী" পরব উপলক্ষে বহুদিন পরে আজ দুলালী পিতা-মাতার নিকট যাইতে চাহিল। মহুয়া প্রথমে কিছুতেই

যাইতে দিবে না; অবশেষে অনেক কান্নাকাটি করিয়া ও একরকম জোর করিয়াই অনুমতি আদায় করিয়া দুলালী পিতৃভবনে যাত্রা করিল। যাইবার সময় মনুয়া তাহার রাঙা চোখ আর ভাঙা গলায় যথেষ্ট পরিমাণে ভীষণতা আনিয়া দুলালীকে শাসাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, চারি দিন পরে ফিরিয়া না আসিলে তাহার নিস্তার নাই।

কত দিন পরে দুলালী তাহার বাপের বাড়ীর মুখ দেখিল! তাহার সে বাল্যের লীলাভূমির মধ্যে কত পরিবর্ত্তন, যেন অপরিচিতের মত তাহার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সে আর তাহার বাল্যকালের পুরাতন স্থানটি খুঁজিয়া পাইল না; যাহা এক সময় নিতান্ত নিজের যায়গা ছিল, আজ তাহাকে সেখানে আসিয়া পরের আসন দখল করিতে হইল। সে বাড়ীর সম্মুখে যে উঁচুনীচু মাঠ দেখিয়া গিয়াছিল, তাহা আর নাই; সেখানে কাহার অট্টালিকা তৈয়ার হইবে বলিয়া পাঁজা পুড়িতেছে। তাহাদের বাড়ীর পশ্চিমে যে ডোবাটায় সে দু'বেলা বাসন ধুইয়া আনিত, সেটাতে কোন ডেপুটী বাবুর সুনজর পড়িয়াছে। তাহার সঙ্কীর্ণতার আবরণ ও মলিনতার মূর্ত্তি দূর করিয়া তিনি উহাকে একটি প্রকাণ্ড স্বচ্ছ পুষ্করিণীতে পরিণত করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছে তাহার চারিধারের সেই পুঁটুস্ গাছের কাঁটার ঝোপ! তাহার পরিবর্ত্তে উচ্চ প্রশস্ত পথযুক্ত একটি বাঁধে তাহার তিন দিক ঘেরা হইয়াছে; চতুর্থ দিকটিতে একটি সুন্দর মার্ব্বেল পাথরের ঘাট। সোপান-শ্রেণী উঠিয়া গিয়া একটি সরু লাল—কাঁকরের রাস্তায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সেই সরু পথের শেষে ডেপুটী বাবুর "সাহেবী" ধরণে তৈয়ারী "বাঙলো।" তাহার ফটকে স্বর্ণাভ অক্ষরে "The Dream" ক্ষোদাই করা।

নিজের বাড়ীর মধ্যেও দুলালী অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল। তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা আরও বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীর দুই পুত্র; স্বামী লইয়া সে বেশ সুখেই আছে। তাহার ভগিনীপতি বাবুলাল দোসাদ পাড়ার মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। সে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানী করে। বেশ নিরীহ ভালমানুষ। বাড়ীখানিরও শ্রী ফিরিয়াছে। দুধ বিক্রয় করিয়া ও পাড়ায় কয়েক ঘর "বাঙ্গালী বাবুর" বাড়ীতে রোজ দিয়া, মাসান্তে বেশ দুই পয়সা আইসে। উৎসবের মত আনন্দে চারি দিন কোন্ দিক দিয়া ছুটিয়া পলাইল, দুলালী বা তাহার বাপের বাড়ীর কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। বৃদ্ধ মাতা-পিতার অশ্রু ও কাতর অনুরোধ, ভগিনী ও তাহার শিশু পুত্রদের সনির্ব্বন্ধ মিনতি, সর্ব্বোপরি নিজের অন্তরের ক্ষণিক ফিরিয়া পাওয়া স্বাধীনতার অপূর্ব্ব আনন্দে সে আরও তিনটা দিন রহিয়া গেল। সপ্তম দিবসে কান্দিতে কান্দিতে সে যেন আবার নূতন করিয়া প্রথম স্বামিগৃহে চলিল।

মনুয়া যখন চারি দিন অপেক্ষা করার পর দুলালীকে আসিতে দেখিল না, তখন তাহার পঞ্চমে বাঁধা মেজাজ অতি সরলভাবে সপ্তমে চড়িয়া গেল। দুলালী পৌঁছিবামাত্র সে তাহাকে একটা কুঠারীতে তালা দিয়া সমস্ত দিন রাখিয়া দিল; পরে সে ছেলেদের চীৎকারে ধৈর্য্য হারাইয়া এবং সুরার মাহাত্ম্যে দুলালীর অবাধ্যতার মধ্যে অমার্জ্জনীয়তার আভাস দেখিতে পাইয়া তাহাকে সমুচিত প্রতিফল সহ তাড়াইয়া দিবে ঠিক করিল। সে তাহাকে কুৎসিত গালিগালাজ করিতে লাগিল, পরিশেষে এক ষ্টেশন লোকের সাম্‌নে তাহার গাত্রবস্ত্র ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "সেই মিনুষেদের কাছে যা।" তাড়াতাড়ি আট বৎসরের ছেলেটার কাপড় খুলিয়া লইয়া দুলালী লজ্জানিবারণ করিল; কিন্তু অপমানের তীব্র লজ্জায় সে কান্দিতে কান্দিতে বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল।

* * * *

দুই তিন দিন পরে হঠাৎ ঝড়ের মত মনুয়া দুলালীর বাপের বাড়ী আসিয়া হাজির! তাহার হাতে একটা ঝাল্‌দার ভোজালি; চোখ দু'টা রাঙা টক্‌টকে। বেশ বুঝা গেল, সে রাগে আর মদের ঝোঁকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে এক ধার হইতে সকলকে গালি পাড়িতে লাগিল; তাহার পর না খাইয়া কোথায় বাহির হইয়া পড়িল। জানা গিয়াছিল, সে বাহির হইয়া সোজা ভাঁটি হইতে এক টাকা দিয়া আকণ্ঠ সুরাপান করিয়া আসিয়াছিল। বৈকালের দিকে কোথা হইতে মনুয়া আবার ফিরিয়া আসিল ও মেয়েপুরুষ কাহাকেও বাদ না দিয়া গালি দিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় ঘোড়ার সাজ খুলিয়া তাহাদিগকে

দেবার্চ্চনে

জে, এন, মণ্ডলের চিত্রশালা] [শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

দানা-পানি দিয়া বাবুলাল ঘরে ঢুকিয়াই মনুয়ার তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। সে মনুয়ার ব্যবহারে পূর্ব্ব হইতেই বেশ চটিয়া ছিল; তাহাকে এখন আবার "হল্লা" করিতে দেখিয়া সে একটু রাগতভাবেই বলিল, "এই মনুয়া, মদ খেয়ে মাতলামো করিস্ না।" আর যায় কোথায়, মনুয়া ক্রোধে একেবারে বাক্‌শূন্য হইল। এতক্ষণ তাহার একতরফা চীৎকারে সে নিজেই বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল, এইবার এই ধাক্কা পাইয়া তাহার ক্রোধ আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। সে কোন কথা না বলিয়া ভয়ঙ্কর-ভাবে সেই ঝক্‌ঝকে ভোজালিখানা উচাইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। বাবুলাল প্রথমে ব্যাপারটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর "হাঁ—হাঁ" করিয়া উঠিবার আগেই মনুয়া ভোজালিখানা সজোরে তাহার বুকের মধ্যে বসাইয়া দিল।

* * * *

নিকটে গণপৎ সিং দারোগার বাসা। বাবুলালের স্ত্রী কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। তিনি "আউট পোষ্ট" হইতে পুলিস আনাইয়া মনুয়াকে ধরিলেন। রক্তাক্ত ভোজালিখানা সমেত মনুয়াকে ছয় জন পাহারাওয়ালার জিম্মায় থানায় পাঠান হইল। বাবুলালকে ধরাধরি করিয়া কয়েকজন পাহারাওয়ালা ও দোসাদ যুবক হাঁসপাতালে লইয়া চলিল। বাবুলালের স্ত্রী "ওরে আমার বাবুয়া—কোথা গেলি রে" বলিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে নিশীথ-গগন কাঁপাইয়া তুলিল। দুলালী মুখখানা চুণ করিয়া বসিয়া রহিল।

* * * *

হাঁসপাতালে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বাবুলালের মৃত্যু হইয়াছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মোকর্দ্দমা দায়রা-সোপর্দ্দ করিলেন। মনুয়াই যে বাবুলালকে আঘাত করিয়াছিল এবং সেই আঘাতেই যে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহা প্রমাণিত হইয়া গেল। মনুয়াও তাহা স্বীকার করিল। তাহার স্বপক্ষে কেহই ছিল না; সকলেই একবাক্যে বলিল, মনুয়া বদ্‌রাগী লোক, দাঙ্গা ও মারপিট করা তাহার স্বভাবসিদ্ধ। বাবুলালের স্ত্রী উকীল নিযুক্ত করিল, কিন্তু মনুয়ার কোন উকীল ছিল না। সকলেই কানাঘুষা করিতে লাগিল যে, দায়রা জজ ফাঁসীর হুকুম দিবেন। ক্রমে সে কথা দুলালীর কানে উঠিল।……

অপমানিত হইবার পর হইতে দুলালী মনুয়ার উপর আন্তরিকভাবে বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মাতলামো ও কুব্যবহার দুলালীর মনে অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল, তাহার পর এই ভগিনীপতির মৃত্যু-ব্যাপারে সে মনুয়াকে তাহার প্রেমাস্পদরূপে চিন্তা করিতেও ভয় পাইয়াছিল। সে ভাবিল, যেমন আমায় ষ্টেশনের শত লোকের সামনে অপমান করিয়াছে, তেমনই এখন বেশ হইল; সে একটু শিক্ষা লাভ করুক্। দুলালী ভাবিল, সত্য কথাই আদালতে বলিয়া আসিবে; হউক্, তাহার দশ বিশ বৎসর জেল হউক্, বা "দ্বীপ-চালানে" যাউক্। অমন "খুনের" সহিত ঘর করিয়া কি হইবে?

কিন্তু যখন সে শুনিল, মনুয়ার ফাঁসী হইবে, তখন সে একটা বেশ বড় রকমের ধাক্কা খাইল। জেল নহে, দ্বীপচালান নহে, একেবারে ফাঁসী। সে স্বামীর শাস্তি কামনা করিয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ শাস্তি কল্পনা করে নাই। তথাপি তাহার মনে হইল, যেমন লোক, তাহার তেমনই সাজা হওয়া দরকার। তাহার প্রতি মনুয়ার গত কয়েক বৎসরের দুর্ব্ব্যবহার সে যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার মন কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। সে অবশেষে একরূপ স্থির করিয়াই ফেলিল যে, সত্য ঘটনাই বলিয়া আসিবে। তাহার হৃদয়ে মনুয়ার জন্য আর প্রেম কোথায়? সে বন্ধন ত বহুদিন মনুয়া ছিন্ন করিয়াছে; কিসের জন্য তবে আর তাহাকে রক্ষা করা?

* * * *

দায়রা জজের আদালত লোকে লোকারণ্য। মনুয়ার প্রতি বিচারকের রায় যে কি হইবে, সকলেই তাহা প্রায় একরূপ স্থিরনিশ্চিতভাবে আন্দাজ করিতে পারিয়াছে। একে একে সমস্ত সাক্ষীরই শুনানী হইয়া গেল; তাহার পর শেষ, অথচ প্রধান সাক্ষী মনুয়ার স্ত্রীর ডাক পড়িল। তাহাকে আনিবার জন্য এক জন আদালতের চপরাশ-ওয়ালা পিয়ন ছুটিল।……এমন সময় বর্ষণোন্মুখ গম্ভীর আষাঢ়-মেঘের মত স্তব্ধ ধীরমূর্ত্তি দুলালী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বড় বিষাদময় গাম্ভীর্য্যের সহিত জনতা

ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল। আদালতে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজমান। জনাকীর্ণ প্রশস্ত কক্ষ গম্ গম্ করিতেছে, বুঝি জোরে নিশ্বাস ফেলিলেও তাহা সকলে শুনিতে পায়! কেহ তাহাকে পথ দেখাইল না, কেহ তাহার গতিরোধ করিল না, সে স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে নিজের অটুট স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া অতি ধীরে ধীরে একেবারে জজের চেম্বারের কাছে উপস্থিত হইল। বিশাল জনসঙ্ঘ দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত ফলাফল দেখিতে লাগিল। জজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীরবে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হঠাৎ দুলালী থামিল। যোড় হস্তে সে বিষাদ-গম্ভীর স্বরে বলিল, "ধর্ম্মাবতার!" তাহার অশ্রুসজল চক্ষু ভূমিসংলগ্ন হইল, তাহার কণ্ঠস্বরে ও সমস্ত ভঙ্গীতে একটি অনির্ব্বচনীয় ভীষণ দৃঢ়তা স্পষ্ট হইয়া উঠিল; অন্তরের সমস্ত বেদনা যেন মথিত করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার স্বামীর দোষ নাই; আমার ভগিনীপতি বাবুলাল আমায় সে বার জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, যাইতে দেয় নাই, সে আমায় বে-ইজ্জত করিয়াছিল; আমার স্বামী সেই কথা জানিতে পারিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিল ও বাবুলালকে প্রথম দেখিবামাত্র মারিয়াছে।" দুলালী চুপ করিল। তাহার কণ্ঠস্বর আদালত-গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নিস্তব্ধ কক্ষ আবার নিস্তব্ধ হইল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দুলালী যেমন আসিয়াছিল, তেমনই চলিয়া গেল—কেহ তাহার গতিরোধ করিল না।

* * * *

মনুয়ার ফাঁসী হইল না, জেল হইল। দুলালীকে তাহার বাপ-মা তাড়াইয়া দিল।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

সাধন-সঙ্গীত

(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রচিত সঙ্গীত)

[১৯০৬ খৃঃ রচিত, পুরাতন খাতা হইতে]

তারিণী! নিজেরে তরা
তোর সকল অঙ্গ মরণ-ভরা।
নীরস নয়ন, নির্ব্বাক মুখ, শিথিল হস্তে খড়্গ ধরা।
নিজেরে তরা।
মুখে চোখে হায়! মরণ ভায় চরণ-প্রান্তে কোটি কোটি মরা
তারিণী নিজেরে তরা।

জেগে উঠ মা, জীবন পেয়ে
সে জীবন যাক জগৎ ছেয়ে
ভীম গভীর অট্টহাসি মরমে বাজুক শঙ্খ বাঁশী—
মরণ তাড়ায়ে জাগায়ে তুলুক মরণপ্রাপ্ত অসংখ্য মরা।
অসহায় ছাগ ঠেলে ফেলে দে ভারতের প্রাণ, নে, মা, নে, মা, নে;
হৃদয়-রক্তে হাসুক কৃপাণ—রক্ত অধর রক্ত নয়ান
হাসিয়া ডাকিয়া কাঁপায়ে তুলুক মরণপ্রাপ্ত অসংখ্য মরা।
চেয়ে দেখ তুই আপনি মরা
তারিণী! তারিণী নিজেরে তরা।
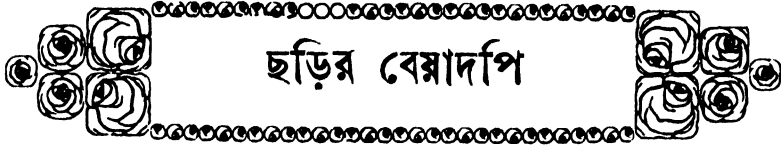
ছড়ির বেয়াদপি

১

মধু চাটুয্যে চটিজুতার ফট ফট আওয়াজে গ্রামের নির্জ্জন পথ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার লাঠির ঠক্ ঠক্ আওয়াজও রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে। আর অধিক দূর নাই, রশি দুই তফাতেই তাঁহার ভগিনীর শ্বশুরের ভিটায় আলোক দেখা যাইতেছে।

তাঁহার গৃহ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে। তাঁহার পুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে, তাই একমাত্র ভগিনীকে সে কথা শুনাইবার জন্য রওনা হইয়াছেন। চাটুয্যে-গৃহিণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কা'ল সকালে খবর দিলেই হইবে, খবর ত পলাইয়া যাইতেছে না; কিন্তু ব্যস্তবাগীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন বিষয়ে বিলম্ব করা অভ্যাসের বাহিরে ছিল।

আকাশে কৃষ্ণা নবমীর ক্ষীণ চাঁদও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। ক্ষণপূর্ব্বে একখানা ছোট মেঘ চাঁদের এক পাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। মেঘখানা যেমন একবার সরিয়া গেল, অমনই চাটুয্যে মহাশয় দেখিলেন, সম্মুখেই ভগিনী মোক্ষদার আটচালার মধ্য হইতে সূক্ষ্ম আলোক-রশ্মি তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে।

"সদানন্দ! বলি, ওহে ঘোষের পো! ও সৈরভী! সৈরভী! দোর খোল হে!" বলিতে বলিতে চাটুয্যে মহাশয় বাহিরের হুড়কা খুলিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। চারিদিক নিশুতি নিঝুম; কেহ সাড়া দিল না। পল্লী-গ্রামের রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত, গ্রামও যেন জন-শূন্য। চাটুয্যে মহাশয়ের গা ছম ছম করিতে লাগিল। পুনরপি চীৎকার করিয়া ডাকিলেও কেহ কোথাও সাড়া দিল না। সব মরিয়াছে না কি? গেল কোথায় সব? ঘুমাইয়া পড়ে নাই ত?

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহসে ভর করিয়া অঙ্গন পার হইয়া দাওয়ার উপরে গিয়া উঠিলেন, কোথা হইতে নাসিকাগর্জ্জনের শব্দ আসিতেছিল, চাটুয্যে মহাশয় তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

একখানি বড় ঘর, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট কামরা। চাটুয্যে মহাশয় বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, বড় ঘরখানির মধ্য হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইতেছে বটে, কিন্তু ঘরের দ্বারে বাহির হইতে শিকল দেওয়া। ব্যাপার কি? চাটুয্যে মহাশয়ের গা-ছমছমানি ক্রমশঃ কম্পনে পরিণত হইল। তিনি একবার ভাবিলেন, 'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতিই এ স্থলে সর্ব্বথা গ্রহণীয়। কিন্তু পদযুগল ত নড়িতে চাহে না! তখন তাঁহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। তিনি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সাহসে ভর করিয়া ঘরের শিকল খুলিয়া ফেলিলেন। ঘরে আলোক জ্বলিতেছে, কিন্তু জনপ্রাণী নাই। তিনি একরূপ কাঁপিতে কাঁপিতে কক্ষমধ্যস্থ শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন—তখন ঘরের আলোককেও যেন তাঁহার সঙ্গী মনে করিয়া তিনি সাহস পাইতেছিলেন।

কিছুক্ষণ বসিয়াই তাঁহার মনে হইল, যেন তিনি বহুক্ষণ এখানে আসিয়াছেন। ব্যস্তবাগীশ আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ এই অন্ধকার রজনীতে এই জনশূন্য কক্ষ হইতে হঠাৎ তিনি শুনিলেন, গম্ভীর নীর-বতা ভঙ্গ করিয়া ধ্বনি উঠিল—"ভূতভুতুম।" সেই পেচকের বিকট চীৎকার তাঁহার নিকট তখন প্রেতের রব বলিয়া অনুমিত হইল। প্রাণপণ শক্তিতে শম্বুক হইতে এক টিপ নস্য লইয়া তিনি একরূপ মুক্তকচ্ছ অবস্থায় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঘরের মধ্যে যে লাঠিটা রাখিয়া-ছিলেন, যাইবার সময় তাহা একবারেই ভুলিয়া গেলেন।

কোন দিকে না চাহিয়া রাম নাম জপিতে জপিতে চাটুয্যে মহাশয় দীর্ঘপাদবিক্ষেপ করিয়া যে পথে আসিয়া-ছিলেন, সেই পথেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

তাঁহার পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কিছুক্ষণ পরে সদানন্দ ভীষণ আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া গোয়াল-ঘরের পার্শ্বস্থ একচালা ঘর হইতে শুনিল, আটচালার বড় ঘরের দরজাটা হাও-য়ায় নড়িয়া শব্দ করিতেছে। বাহিরে আসিয়া দরজাটায় শিকল লাগাইয়া সে আবার গিয়া শয়ন করিল। তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই তাহার ভাঙ্গের নেশাটা খুবই জবর রকম ধরিয়াছিল।

২

উক্ত ঘটনার দুই দিন পরে মোক্ষদা সুন্দরী ওরফে মুখী বামনী এক দিন দিবা দ্বিপ্রহরে প্রতিবেশিনী রাখালীর মা'র নিকট উপস্থিত। তখন রাখালীর মা সবে মাত্র দু'টি ভাত দাঁতে কাটিয়া পানের সহিত দোক্তার পুঁটুলীটি কক্ষে পূরিয়া চুল এলো করিয়া অন্দরের দরদলানে আঁচল বিছাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন। মোক্ষদা আসিয়াছেন দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, বড় রকমের একটা পিচ ফেলিয়া বলিলেন, "কি ভাই যমভোলা, অসময়ে যে? এ যে মেঘ না চাইতেই জল গো!"

মোক্ষদা বালবিধবা, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রগুণে এবং নিঃস্বার্থ পরিহিতসাধনে গ্রামের সব গৃহিণীই তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। রাখালীর মা যথার্থই মোক্ষদাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদের দুই জনে "যমভোলা" সই পাতান ছিল।

মোক্ষদার মুখখানি অন্য দিন সর্ব্বদাই হাসি-হাসি থাকে, আজ গম্ভীর। তিনি বলিলেন, "জরুরী কথা না থাকলে কি মুখী বামনী অসময়ে দেখা দেয়?"

মোক্ষদার বয়স ৪০ পার হইয়াছে, তথাপি তিনি এখনও শক্তসমর্থ; দেখিলে তাঁহাকে কিছুতেই ৩০এর উপর বলিয়া মনে হইত না। শশী বাঁড়ুয্যের বালবিধবা পত্নী মোক্ষদার হাতে টাকাকড়ি ছিল, বিষয়সম্পত্তিও মন্দ নহে। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে এই বুদ্ধিমতী নারী অল্পবয়স হইতে কিরূপ দক্ষতার সহিত তাঁহার শ্বশুরের বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা গ্রামের লোক জানে। আর গ্রামের লোক জানে, তাঁহার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। গ্রামেরই তাঁতিদের বিধবা বধূ সৈরভীকে সঙ্গিনী দাসীরূপে রাখিয়া এবং সদানন্দ গোয়ালার উপর গরু, বাগান, পুকুর ও হাটবাজারের ভার দিয়া মোক্ষদা একাকিনী নির্জ্জন পল্লীতে নির্ভয়ে এত দিন দর্পের সহিত কাটাইয়া আসিয়াছেন। কেহ ঘুণাক্ষরে তামাসা করিয়াও কখনও তাঁহার নামে কলঙ্কের রেখা টানিতে সাহস করে নাই।

তাই যখন রাখালীর মা'র "কি গা, মুখখানা শুকনো কেন" প্রশ্নের উত্তরে মোক্ষদা কাঁদ-কাঁদভাবে বলিলেন, "মুখখানা শুকনো দেখলে এখন, হয় ত এর পরে পুড়ে গেছে দেখবে," তখন রাখালীর মা'র বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন, কি হয়েছে, যমভোলা?"

মোক্ষদা সে কথায় কান না দিয়া আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এত কালের পুরোনো নোক—তার এই কায!"

রাখালীর মা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার কথা বলছ, ভাই?"

একটি প্রকাণ্ড বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মোক্ষদা বলিলেন, "আবার কার! সৈরভীর!"

"এ্যা সৈরভী? কেন, সৈরভী কি করেছে?"

"কি না করেছে।"

"সে কি? সৈরভীর মত ঝি একালে পাওয়া যায় না, বাপু। কি, চুরি করেছে?"

"চুরি? হাঁ, তা' হ'লে ত বাঁচতুম। এ যে তার চোদ্দপুরুষ!"

"তার চেয়ে বেশী? কি এমন কায?" রাখালীর মা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মোক্ষদা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "পরশু ভশ্চায্যি-দের বাড়ী যদু চক্কোত্তির কেত্তন ছিল, জান ত। সৈরভী সন্ধ্যে হতেই ঝোঁক ধরলে, আমায় কেত্তন শুনতে যেতেই হবে। আমি বল্লুম, আবার অত সখ নেই। তা' বল্লে, 'সখ আবার কি? ধম্মকম্মো করা কি সখ? যদু চক্কোত্তির কেত্তোন শুনলে চোখের জল রাখতে পারবে না।' তার জিদ দেখে কেত্তোন শুনতে গেলুম—দূর হোক গে, এত কালের নোক, কথাটা রাখলুমই বা। যখন রাত ১১টার পর বাড়ী ফিরে এলুম, তখন সৈরভী নিজের ঘরে দোর-তাড়া দিয়ে আলো নিবিয়ে ঘুমুচ্ছে, বাড়ীটা নিশুতি নিঝুম। আমার ঘরের দরজার শেকল দেওয়া। মা গো, গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে!"

"সে কি? সব খুলে রেখে ঘুমুচ্ছে! সদানন্দ?"

"হাঁ গো, সবাই অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। আবার শোবার ঘরে ঢুকে দেখি, আলো জলছে। আর কি দেখলুম জান?—বল্লে বিশ্বাস করবে না, আমার বিছানায় কে বা কারা যেন শুয়েছিল, বালিস ধামসান, বিছানা চটকান—আর—আর বিছানার উপর পুরুষমানুষের একটা ছড়ি।"

"মা গো!"

"হাঁ গো, মুখী বামনীর শোবার ঘরে পুরুষমানুষের ছড়ি গো ছড়ি! মনে হচ্ছে, সৈরভী আমায় এই জন্যে অত ক'রে কেত্তোনের নাম ক'রে তাড়িয়েছিল, তার পর মানুষ ঘরে এনেছিল।"

"কিন্তু, কিন্তু, তুমি কি ঠিক জান? এত কালের নোক, এত দিন কেউ একটা কথা তার নামে বলতে পারে নি—"

"তবে ছড়িটার কি পা হয়েছিল যে, আপনি হেঁটে গিয়ে আমার শোবার ঘরে উঠেছিল?"

"তা, সৈরভীর ঘরে না গিয়ে মানুষটা তোমার ঘরে গেল কেন?"

"ঐ ত! ঐটেই ত বুঝতে পারছিনি। তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম। এখন কি করি বল দিকি, যমভোলা!"

"তাই ত। আমিও যে কি বলব, ঠাওরাতে পারছি নে। আচ্ছা, কথাটা সৈরভীর কাছে পেড়েছ?"

"না, পাড়িনি। কথাটা তারই পাড়া উচিত ছিল। দোষ করেছে—তারই মাপ চাওয়া উচিত ছিল। তার পরদিন সকালে যখন আমার শোবার ঘর ঝাঁট দিতে এলো, তখন ছড়িটা দেখে সৈরভী যে রকম ক'রে চমকে উঠলো, তা যদি দেখতে! আমি ছড়িটা তার চোখে পড়ে, এমন যায়গায় রেখেছিলুম। আমি যেন দেখেও দেখিনি, এমনই ভাব দেখালুম। সে যাতে দোষ স্বীকার করে, তার যথেষ্ট সুবিধে দিয়েছিলুম। কিন্তু সে কায ক'রে যাচ্ছে বটে, তবুও একটি কথাও বলেনি। সে দিন কেত্তোন কেত্তোন ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো, কা'ল কেত্তোনের কথা মুখেও আনেনি।"

"তা তোমারই দোষ। এদ্দিন তার সঙ্গে এমন ব্যবহার ক'রে এসেছ, যেন সে তোমার 'গোলাপজল', ঝি ব'লে ত কেউ জানত না।"

"তা এই বয়সে যে এমন হ'তে পারে, তাই বা জানবো কেমন ক'রে?"

"হ্যাঁ! বলে, 'পুড়লো মেয়ে উড়লো ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।' ও ছোটলোকদের ঘরে বিশ্বেস আছে?"

"এত বিশ্বেসী, এত ভদ্দর ভালমানুষটি, এত গতোর—"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু সব গুণ ত আর মানুষের থাকতে পারে না। তা যাক্ গে, ছড়িটা এখন কোথায় রেখেছ?"

"ঠিক যেখানে ছিল, সেইখানেই, আল্‌নায় ঝুলিয়ে। দেখ একবার সৈরভীর বুকের পাটা! ঘর সাফ ক'রে গেল, অথচ ছড়িটা যেন দেখেও দেখলে না।"

"আচ্ছা, আমিই তাকে ডেকে জিজ্ঞেসা করব—"

"না না, অমন কাযও কোরো না। ও-ই বলুক, কোথা হ'তে ছড়ি এলো। তুমি ব'লে খেলো হ'বে কেন?"

"কিন্তু তোমার একবার জিজ্ঞেসা করান ত উচিত।"

মোক্ষদা উঠিলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "হ্যাঁ, তুমিও যেমন—ঝিয়ের সঙ্গে না কি ও-সব কথা কয়!"

মোক্ষদা চলিয়া গেলে রাখালীর পিতা পরেশ বাবু ছিপ ও ছিপের সরঞ্জাম লইয়া দরদালানে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "দেখ, বীরেন এলে বোলো, বড় হুইলটা আমায় দিয়ে আসে, ওটা তার কাছে আছে, আমি চন্দোর কাকার পুকুরে চললুম মাছ ধরতে; ফিরতে সন্ধ্যে হবে।"

দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই ফিরিয়া আসিয়া পরেশ বাবু আবার বলিলেন, "হাঁ, দেখ, একটা কথা বলব ব'লে মনে ক'রে ভুলে গেলুম। আমাদের ও-বাড়ীর বামুন-বৌ যে কেমন-কেমন?" বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

রাখালীর মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাও, কথার ছিরি দেখ! কেমন-কেমন আবার কি?"

পরেশ বাবু অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "বল্‌ব আর কি, বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ ধরেছে। যমভোলা ত নিষ্ঠের হিমালয়। অথচ সে দিন কেত্তোন শোনবার নাম ক'রে রাতে ও-পাড়া গেলেন। সৈরভী কায-কম্মো ছিল না ব'লে সদানন্দকে সেখানে রেখে বাড়ী গিয়েছিল; ফিরে এসে নিজের ঘরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার পর কত রাতে গিন্নী এয়েছে, তা জানেও না। সকালে উঠে গিন্নীর ঘর সাফ করতে গিয়ে দেখে—দেখে—"

"আ মরি! দেখে! কি দেখে?"

"বন থেকে বেরিয়েছে টিয়ে—মুখী বাম্‌নীর শোবার

ঘরে দেখে, কার একখানা ছড়ি! হাঃ হাঃ! একেবারে মাল সমেত গ্রেপ্তার! মাল সরাবারও বুদ্ধি যোগায়নি ?"

"বা রে বিন্তে! শোবার ঘরে ছড়ি এলো কি ক'রে? যদিই বা মানুষ এসে থাকে, তা হ'লে মুখী বামনী ছড়ি সরিয়ে ফেলেনি কেন?"

"আরে বলি শোন না। মানুষটা ভোরে পালাবার সময় বোধ হয়, সৈরভীর গলার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়িতে লাঠীগাছটা ফেলেই পালিয়েছিল। গিন্নী তখনও ঘুমোচ্ছিলো। তার পর সৈরভী এসে তুলে দিলে ছড়ির উপর নজর পড়ে, তাই লজ্জায় তার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। সৈরভী নিজে তা দেখেছে।"

"তোমায় কে বল্লে ?"

"কেন, সৈরভী তার ভাইকে সব বলেছে। তার ভাই আজ সকালে বাবুদের বৈঠকখানায় জানিয়ে গেল। আমি সেখানে ছিলুম, সব শুনেছি।"

রাখালীর মা এতক্ষণ হাসি চাপিয়া রাখিয়া এইবারে হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "মিন্‌সেদের বুদ্ধির বালাই নিয়ে মর্‌তে ইচ্ছে করে! যাও দিকি। যে কাযে যাচ্ছ, যাও। এ সব কথায় তোমাদের হাঁদা মাথার থাকা উচিত নয়।"

পরেশ বাবু বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু কথাটা না বুঝিয়াই চলিয়া গেলেন। তাঁহার "মূল্যবান্" সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছিল।

৩

আজ মুখী বামনীর মুখ-চোখ বিষম গম্ভীর। সদানন্দের ত সাধ্যই নাই, স্বয়ং সৈরভীও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাইতেছে না।

সৈরভী গোবরের হাঁড়ীটা লইয়া রান্নাঘর নিকাইতে যাইতেছে, এমন সময় গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক পড়িল, "সৈরভী?"

সৈরভী মুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিল, "কেন গা!"

"আ গেলো—জবাব দেওয়ার ছিরি দেখ!"

বস্তুতঃ সৈরভী এমন ভাবে কর্কশ স্বরে কখনও জবাব দেয় নাই। আজ গৃহিণীর মেজাজ দেখিয়া সে-ও মরিয়া হইয়াছে। সে সমান ওজনে জবাব দিল, "ঠাক্‌রোণেরও ডাকবার ছিরিটে কি রকম ?"

মোক্ষদা দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিয়া আড়ার খুঁটিটা ধরিয়া দাঁড়াইলেন, কর্কশ স্বরে বলিলেন, "আমার যা খুসী, তাই ব'লে ডাক্‌বো, তা ব'লে তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা ?"

সৈরভী ঘর নিকাইতেছিল, তাহাতেই মন দিয়া অন্যদিকে মুখ না ফিরাইয়া বলিল, "যাদের বুক বড়, তাদের মুখ বড় হয়। গরীব-দুঃখীদের ত গতর খাটিয়ে খেতে হবে—তাদের বুক বড়ও হয় না, মুখ বড় হবে কোথা হ'তে ?"

মোক্ষদার মাথায় হঠাৎ দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এমন কত দিন হইয়াছে, কিন্তু কখনও গিন্নী-দাসীতে কলহ হয় নাই। আজ পূর্ব্বসঞ্চিত ক্রোধ-বারুদের স্তূপে সৈরভীর কাটা কাটা কথার অগ্নি-শলাকা নিপতিত হইল,—মোক্ষদা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বটে রে বটে—এক্ষুনি বেরিয়ে যা, তোর কায করতে হবে না।"

"ওঃ, তা যাচ্ছি। কেন, অন্য লোকের মান-ইজ্জৎ আছে, আমাদের যেন নেই। তোমার মন যুগিয়ে চল্‌বে, এমন লোক এখনও বিধেতাপুরুষ ছিষ্টি করেননি।"

"আচ্ছা আচ্ছা, আমি মন্দ লোক আছি, মন্দ লোকই আছি, তুই ত ভাল। এখন যা দিকি তুই, আমার হাড়ে বাতাস লাগুক।"

"আমারও হাড়ে বাতাস লাগে। এ বাড়ীতে মানুষে কায করে? গতর খাটিয়ে খাব, চাকরীর ভাবনা? এ বাড়ী আমার থাক্‌বার যুগ্যি নয়, যা'র লজ্জার ভয় নেই, বদনামের ভয় নেই, সে এখানে চাকরী কর্‌তে আস্‌বে।"

"কি বল্লি, হারামজাদি! ছোট মুখে বড় কথা? আমার বাড়ীতে ব'সে আমার অপমান? বেরো বল্‌ছি এখনই, নইলে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দোবো।"

"ওঃ, ঝেঁটায় সবাই! বলে, 'ঘর দেখতে কাণা তুমি, পর দেখতে খোল আঁখি দুটো!' কে কারে ঝেঁটায়, গাঁয়ের লোকই দু'দিন পরে দেখবে।"

সৈরভী আর তিলমাত্র উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই

আছাড়িয়া গোবরের হাঁড়িটা অঙ্গনের মধ্যস্থলে ফেলিয়া দিয়া ঝড়ের বেগে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। মোক্ষদা মুহূর্তকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু মুহূর্ত পরেই গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "সৈরভী!"

অভ্যাসের এমনই গুণ, ক্রুদ্ধা ধৈর্য্যহারা সৈরভী দরজা পার হইয়াই ডাক শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, এক পা এক পা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি গা?"

মোক্ষদা তখন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হাত ধুয়ে আয়।"

সৈরভী কলের পুতুলের মত অঙ্গনের কোণে স্থিত মৃৎ-কলসী হইতে জল গড়াইয়া হাত-পা ধুইল। মোক্ষদা বলিলেন, "এ দিকে আয়। তোর ঘর হ'তে কাপড় ছেড়ে আয়। আমি শোবার ঘরে আছি।" উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মোক্ষদা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। সৈরভী পার্শ্বস্থ কামরায় যাইয়া বেশপরিবর্ত্তন করিয়া গৃহিণীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

গৃহিণী তখন অসম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন; তাহাকে দেখিয়াই কোন কথা না বলিয়া অঙ্গুলীসঙ্কেতে বাঁশের আল্‌নার দিকে দেখাইয়া দিলেন। তাহার উপর হইতে একটা ছড়ি ঝুলিতেছিল।

সৈরভী বিস্মিত হইয়া একবার ছড়ির দিকে, পুনরায় গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইল, কিছুই বুঝিতে পারিল না।

তখন মোক্ষদা বলিলেন, "নিয়ে যা, এখানে ও জিনিষ ফেলে যেতে পাবিনি, বুঝলি?"

সৈরভীর এতক্ষণে কথা ফুটিল। অবাস্তব ব্যাপারের সহিত সে যুদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু এইবার ছড়িরূপী বাস্তব দ্রব্য তাহার হুদ্দার মধ্যে আসিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি ও গু ছোঁব না, যার মাথাব্যথা, সে বুকে ক'রে তুলে রাখুক গে।"

মোক্ষদা অন্য কিছু না বলিয়া কেবল গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমায় ঐ ছড়ি নিয়ে যেতে হবে। ছড়ি যার, তারে দিও।"

সৈরভীর যন্ত্রচালিতবৎ হস্তমনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আল্‌না হইতে ছড়ি পাড়িয়া লইল। তাহার যন্ত্রচালিতবৎ দেহ ধীরে ধীরে মনিবের গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল! একবার বলিতে গেল, "ও ছড়ি তোমার লোকের;" কিন্তু কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল।

৪

সদরের হুড়কা খুলিয়া সৈরভী সবেমাত্র গ্রামের পথে দুই চারি পা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে শুনিতে পাইল, অদূরে পুথির শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে নামাবলী-মণ্ডিত কোন ব্রাহ্মণ সম্মুখদিক্ হইতে তাহারই দিকে হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। সে দেখিয়াই চিনিল ঠাকুরুণের ভাই। সে মুখ ফিরাইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

মধু চাটুয্যে সৈরভীকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন, "আরে কে রে, সৈরভী যে রে! সে দিন রাতে তোর ঠাক্‌রুণেতে আর তোতে জোট পাকিয়ে কোথায় লুকিয়ে ছিলি বল্ দিকি? আয়, আয়, খুসীর খবর আছে রে—আমার শশুর যে বিয়ে রে—"

কথা শেষ হইল না, হঠাৎ মধু ঠাকুরের দৃষ্টি সৈরভীর হস্তে ধৃত ছড়ির উপর নিপতিত হইল। পথে যাইতে যাইতে পথিক অপ্রত্যাশিতভাবে বহুমূল্য জহরৎ কুড়াইয়া পাইলে যেমন যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়ে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠে, মধু চাটুয্যে মহাশয়ও সেই ছড়ি দেখিয়া তেমনই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ক্ষিপ্রগতি সৈরভীর হস্ত হইতে ছড়িটি ছিনাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "বাঃ বেশ ত, আমার যষ্টিটি নিয়ে স'রে পড়ছো বেমালুম—বেশ মজা ত!"

ব্রাহ্মণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার গলার আওয়াজ পাইয়া মোক্ষদা গৃহের বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণ একগাল হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্, দেখ্ মুখী, তোর সৈরভীর আক্কেল দেখ্! সে দিন শশুর বিয়ের খবর দিতে এসে রাতে তোর ঘরে বসেছিলুম—জনপ্রাণী কেউ ছিল না, তা যাবার বেলা ভুলে ছড়িগাছটা ফেলে গিয়েছিলুম। তা না হয় সেটা পাঠিয়ে দে,—না একবারে লোপাটের চেষ্টা। হাঃ হাঃ হাঃ! সৈরভী, লাঠী কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলি বল্ ত?"

ঠাকুরুণ ও ঝি, কাহারও মুখে কথাটিমাত্র নাই, উভয়েই বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে উভয়ের দিকে তাকাইয়া

আছেন। মধু চাটুয্যে হাসিয়া বলিলেন, "কি রে, তোরা যে তাক লেগে গেলি। বলি, হ'ল কি?"

ঠাকরুণ ও ঝিয়ের এইবার হুঁস হইল। মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, ও ছড়ি তোমার?"

সৈরভীও সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "মামাবাবু, ছড়িগাছটা তোমার?"

মধু চাটুয্যে তখনও হাসিতেছিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার না ত কি শেমো তাঁতির?"

সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। মোক্ষদা ধীর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া সৈরভীর হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া ধরা গলায় বলিলেন, "সৈরভী!"

সৈরভীও নতজানু হইয়া তাঁহার পদে মুখ গুঁজিয়া তেমনই আওয়াজে বলিল, "ঠাক্‌রোণ!"

উভয়ের নয়নে তখন অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। চাটুয্যে মহাশয় ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া ফেল্ ফেল্ চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

শরৎ

এস কনক-কিরণে হরিতে হিরণে
রঞ্জিত করি' ভুবনে;
এস আশার হাসিতে ভাসিতে ভাসিতে
সুখদ-পরশ পবনে।
এস শঙ্খ-ধবল মেঘ-অঞ্চল
লুটায়ে সুনীল গগনে;
এস নবীন জীবনে জাগায়ে ভুবনে
নীরদ-নিদ্রা-মগনে।
এস তটিনীর জল করি' নির্ম্মল
রবির কিরণে উজলি';
এস কুমুদে কমলে সরসীর জলে
তরুণ সুষমা উছলি'।
এস প্রভাত-শিশিরে হরিতক-শিরে
হীরক-দীপ্তি জ্বালিয়া;
এস আকুল-রঙ্গ হেম-তরঙ্গ
হরিৎ ক্ষেত্রে ঢালিয়া।
এস শোণিত-শোভায় সাজায়ে জবায়
স্থলকমলেরে ফুটায়ে;
এস বিকশিত কাশ, কুসুমের হাস
প্রান্তর ভরি' ছুটায়ে।
এস সেফালীর মূলে ঝরি-পড়া ফুলে
শ্যামে শ্বেত শোভা খচিয়া;
এস নীরদে আলোকে দ্যুলোকে ভূলোকে
নব নব শোভা রচিয়া।
এস গন্ধরাজের গন্ধ ঢালিয়া
মন্দ মধুর সমীরে;
এস শ্বেত তারাদল ফুটায়ে উজল
টগরের শ্যাম তিমিরে।
এস নীল নভতলে বলাকার দলে
লম্বিত মালা দুলায়ে;
এস পুলকের ভরে ধরণীর পরে
মেঘালোক-তুলি বুলায়ে।
এস বনানীর বুকে দোয়েলের মুখে
সঙ্গীত-সুধা বরষি';
এস ডাহুক-বিরাবে গভীর আরাবে
শব্দিত করি' সরসী।
এস রবির কিরণে সাজায়ে বরণে
প্রজাপতি দলে বিলসি;
এস চঞ্চল বায়ে ঊর্ম্মি দুলায়ে
দুলায়ে মরালে উলসি'।
এস চল চঞ্চল মধুপের দল
আনিয়া কমল-কাননে;
এস উজল আলোক স্নিগ্ধ পুলক
মাখায়ে ধরার আননে।
এস জলদ-অঙ্গে বরণ-রঙ্গে
ইন্দ্রধনুরে আঁকিয়া;
এস অমল ধবল স্নিগ্ধ উজল
জ্যোৎস্না-আলোক মাখিয়া।
এস চির সুমধুর আগমনী সুর
ছড়ায়ে গগনে পবনে;
এস মিলনে হরষে পুলক-পরশে
উঠিল বঙ্গ-ভবনে॥

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কালকাসন্দীর কুমারের রোগশয্যা

বসুমতী প্রেস

[শিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিতরের কথা যাহারা জানিত না, তাহারা বিভূতিভূষণের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাই করিত। করিবার কথাও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠে সে সব বাজি জিতিয়াছিল—কোন পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নাই। তাহার পর সেই চাপরাশের বলে সে হিসাব বিভাগে একটা মাঝারী রকমের চাকুরী গ্রহণ করিয়া অসাধারণ দক্ষতা হেতু ৮ বৎসরের মধ্যে মাসিক আট শত টাকা বেতনের অধিকারী হইয়াছে। কেহ কোন দিন তাহার কোন কাযে এতটুকু ভুল ধরিতে পারে নাই এবং উপরিস্থিত কর্ম্মচারীদিগের—বিশেষ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগের—সহিত তাহার ব্যবহারে সেই সব কর্ম্মচারী যেমন মনে মনে রাগ করিতেন, তেমনই মুখে তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিয়া তাহাকে তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতেন। সে যে এক দিন তাহার আফিসের "বড় সাহেবকে" সকল কর্ম্মচারীর সমক্ষে বলিয়াছিল, "আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহা ভুল—আগাগোড়া ভুল"; এক দিন সৈনিকবিভাগের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী টুপী মাথায় দিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিলে সে যে তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছিল এবং সেই উচ্চ কর্ম্মচারী তাহাকে "নিগার" বলিলে তাঁহার ঘাড়ে ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল—সে সব কথা আফিসের ভারতীয় কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদাই বলাবলি করিত। এক দিকে এই—আর এক দিকে নিম্নস্থ ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের সব ভুল সে সামলাইয়া লইত—তাঁহাদের সঙ্গে ঠিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত ব্যবহার করিত। কাযেই আফিসের লোক তাহার প্রশংসাই করিত। কিন্তু ভিতরের কথা যাহারা জানিত, তাহাদের মধ্যে কেহ বা বলিত,—বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে চরিত্রের কোন সম্বন্ধ নাই; কেহ বা বলিত,—এক বিন্দু গোমূত্র পড়ায় এক ভাণ্ড দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিভূতিভূষণ পিতামাতার অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের সন্তান। প্রথম সন্তান কন্যা জন্মগ্রহণ করিবার দীর্ঘ দশ বৎসর পরে সে জন্মগ্রহণ করে। কন্যাকে পিতামাতা দশ বর্ষ বয়সে "কন্যা" অবস্থায় বিবাহ দেন এবং দুই বৎসরের মধ্যে তাহার সীমন্ত সিন্দূরশূন্য হয়। পিতামাতা কন্যার সঙ্গে কঠোর আচার পালন করিতে থাকেন; কন্যাও ছোট ভাইটিকে লইয়া আপনার দুর্দ্দশাদুঃখ ভুলিতে চেষ্টা করে। বিভূতিভূষণ কেবল আদরই পাইয়াছিল—শাসন পায় নাই। আপনার মনকে সংযত করিবার শিক্ষা তাহার হয় নাই। গৃহে এই অবস্থা—বিদ্যালয়ে সে নিজ গুণে শিক্ষকদিগের প্রিয়পাত্র। সে কেবল প্রশংসার আবহাওয়ায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পাঠশালাতেই কুসঙ্গে পড়িয়া সে সুরাসক্ত ও দুশ্চরিত্র হইয়া পড়ে।

আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে অধিকাংশ মাতাই পুত্রের সংশোধনের একটিমাত্র ঔষধ জানেন—পুত্রের বিবাহ দেওয়া। বিভূতিভূষণের মাতা ও ভগিনী সে ঔষধ প্রয়োগের চেষ্টা যথেষ্টই করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগী সে ঔষধ কিছুতেই গিলিতে সম্মত হয় নাই। বিভূতিভূষণের পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়; তখন গৃহে সে-ই কর্ত্তা। মা'র ও দিদির সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে তাহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধ ও অশ্রু কিছুই তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত করাইতে পারে নাই। ঘটক-ঘটকীর দল বহু দিন হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে আশা ও আসা উভয়ই ত্যাগ করিয়াছিল; ক্রমে বিভূতিভূষণের বিবাহে অরুচির কারণও কানাকানি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। যাহারা তাহাকে জানিত, তাহাদের মধ্যে এক দল বলিত, লোকটির কর্ত্তব্যজ্ঞান যেরূপ প্রবল, তাহাতে বিবাহ করিলে, বোধ হয়, সামলাইয়া যাইত; আর এক দল বলিত, কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে বলিয়াই বিবাহ করিল না—যেমন ধোপ কাপড়ের নেকড়াও ভাল, তেমনই বিদ্বান্ হইলে তাহার যত দোষই কেন থাকুক না, সে গুণবর্জ্জিত হয় না।

কিন্তু আর সকলে যখন বিভূতিভূষণের বিবাহের আলোচনাও ত্যাগ করিল এবং একাধিক লজ্জাজনক ব্যাপারের সঙ্গে যখন তাহার নামটা জড়িত হইয়া উঠিল, তখনও তাহার মা ও দিদি তাহার বিবাহের আশা ত্যাগ

করিতে পারিলেন না এবং দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সব "জাগ্রত" "অর্দ্ধজাগ্রত" "নিদ্রিত" দেবতার কাছে এই দুই জন বিধবার প্রার্থনার ও "মানতের" মাত্রা যেন দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। তাঁহাদের এই করুণ প্রার্থনা, কি তাঁহাদের এই ভাবে বিভূতিভূষণের বিদ্রূপ—কোন্‌টি তাহার অদৃষ্ট-দেবতাকে জাগাইয়া ও রাগাইয়া তুলিয়াছিল, বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি যে লুপ্তসুপ্তি গুরু-মহাশয়ের মত জাগিয়া তাহাকে শাসন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর দেবতা যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তখন মানুষ যে তাঁহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না, তাহার প্রমাণ—নলরাজা।

২

বিভূতিভূষণ কাযের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিত—ছুটীর কথা কোন দিন ভাবে নাই। এই অবস্থায় আফিসের হেড ক্লার্ক গাঙ্গুলী মহাশয় পূজার ছুটীর সঙ্গে তাঁহার প্রাপ্য এক মাসের ছুটীটা জড়াইয়া লইয়া গৃহিণীকে হরিদ্বার-পুষ্করাদি তীর্থে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়া ছুটীর দরখাস্ত করিলেন এবং সেখানি বিভূতিভূষণের হাতে দিবার সময়ে বলিলেন, "আপনি ত আর ছুটী নেবেন না! এ দিকে ছ'মাসের ছুটী ত, না নিয়ে বাতিল হয়েই গেছে, এবার আরও তিন মাস যা'বে।"

শুনিয়া বিভূতিভূষণ বিস্মিতভাবে গাঙ্গুলী মহাশয়ের দিকে চাহিল।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "চলুন না—এবার মা-ঠাকুরুণকে নিয়ে তীর্থে বেড়িয়ে আসবেন।"

বিভূতিভূষণ বলিল, "ও সব হয়ে উঠবে না।"

কিন্তু সে সে কথা বলিলেও দুই চারিবার তাহার মনে হইল—ছয় মাস ছুটী বাতিল হইয়া গিয়াছে, আরও তিন মাসের গঙ্গাযাত্রা হইতেছে! মা কোন দিন তাহার কাছে কিছু চাহেন নাই; কিন্তু তীর্থে যাইতে পারিলে যে তিনি ও দিদি পরম আনন্দিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ দিকে দেহের উপর অত্যাচারের ফলে তাহার যকৃৎ নামক যন্ত্রটাও যন্ত্রণা দিবার ভয় দেখাইতেছিল—ডাক্তার বলিয়াছিলেন। সব কথা ভাবিয়া সে মা'র ও দিদির কাছে প্রস্তাব করিল—তাঁহারা যদি দুই চারিটা তীর্থে যাইয়া সন্তুষ্ট হয়েন, তবে সে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে। বলা বাহুল্য, তাঁহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন বিভূতিভূষণ তাহার প্রাপ্য ছুটী লইল এবং যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

তীর্থের কথা হইলেই হিন্দুর মনে প্রথমে গয়া-কাশীর নাম উদিত হয়—মা'র ও দিদিরও তাহাই হইল। প্রথমে গয়ায় যাইয়া বিষ্ণুপদে বিভূতিভূষণ পিতার পিণ্ডদান করিল, তাহার পর সকলকে লইয়া কাশীতে গেল।

তখন পূজার ছুটী—কাশীতে বাঙ্গালী আগন্তুক যেন আর ধরে না। গয়ায় এক বাঙ্গালী যাত্রীর সহিত বিভূতিভূষণের আলাপ হইয়াছিল। তিনি বয়সে বিভূতিভূষণ অপেক্ষা কিছু বড়—মৃত মাতার অভিপ্রায় অনুসারে গয়ায় তাঁহারা পিণ্ডদান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সাত ভাই, এক ভগিনী—ভগিনী সর্ব্বকনিষ্ঠা। পিতা লক্ষৌতে রেলে বড় চাকরী করিতেন এবং ছেলে-মেয়ে সকলেই তথায় জন্মিয়াছিল। ভ্রাতারা কেহ বা চাকুরীয়া, কেহ বা উকীল, কেহ বা ডাক্তার—সকলেই উপার্জ্জনক্ষম। যুবক জ্যেষ্ঠ—তিনি লক্ষ্ণৌ সহরেই ডাক্তারী করেন। যত দিন মা বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন সব ভাই এই সময়ে লক্ষৌয়ে একত্র হইতেন—মা'র মৃত্যুর পর এই এক বৎসর কাটিয়াছে—এ বারও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি কাশী হইয়া লক্ষৌয়ে যাইবেন। ভগিনী স্কুলে পড়িয়া এ বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিভূতিভূষণের অনুরোধে তিনি কাশীতে তাহারই আতিথ্য স্বীকার করিলেন এবং যাইবার সময় তাহাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া গেলেন—লক্ষ্ণৌ না দেখিয়া সে যেন ফিরিয়া না যায়; কারণ, সে অঞ্চলে তেমন সুন্দর সহর আর নাই। তিনি যাইবার সময় মা'কেও বলিয়া গেলেন, "মা, কাশী থেকে বৃন্দাবনে ত যা'বেনই, পথে যেন আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা পড়ে।"

কাশীতে ঠাকুর দেখা শেষ করিতে মানুষের জীবন কাটিয়া যায়—কাযেই কাশী হইতে যাইবার কথা পক্ষকাল পরেও মা'র ও দিদির মনে হইল না। বিভূতিভূষণের পক্ষে কিন্তু পক্ষকাল এরূপ স্থানে স্থিতি বিরক্তিজনক হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ পূজার ছুটীতে কাশীতে এত

পরিচিত লোকের সমাগম হয় যে, বিদেশগমনের সার্থকতা থাকে না। তাই পক্ষকাল পরে তাহার তাগাদায় মা ও দিদি বলিলেন, "তবে চল।" মা বলিলেন, "সেই যে ছেলেটি গয়ায় গিয়েছিল, সে অনেক ক'রে ব'লে গিয়েছে, একবার তা'র বাড়ী যেতে। তা' সে যখন কাশীতে আমাদের বাড়ীতে উঠেছিল, তখন তা'র কথাটা না রাখলে ভাল দেখায় না।"

বিভূতিভূষণ সম্মত হইল। লক্ষ্মৌ দেখিয়া স্থানটি তাহার এত ভাল লাগিল যে, সে মা'কে ও দিদিকে বলিল, বৃন্দাবন হইতে যে তথায় ফিরিয়া আসিবে এবং ছুটীর অবশিষ্ট কালটা তথায় কাটাইবে। মা ও দিদি সে প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। স্থানটা তাঁহাদের ভাল লাগিয়াছিল অন্য কারণে—বিশ্বনাথ কি সে আশা পূর্ণ করিবেন ?

৩

মনের বাসনা পূর্ণ হইলে গোবিন্দজীকে স্বর্ণের ছত্র, গোপীনাথকে স্বর্ণের বংশী ও মদনমোহনকে স্বর্ণের চূড়া দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া মাতাপুত্রী বিভূতিভূষণের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে লক্ষ্মৌ সহরে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় পূর্ব্বপরিচিতদিগের বাড়ীর কাছেই একখানি বাড়ী তাঁহারা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন—বিভূতিভূষণ সেই বাড়ীতে উঠিল। যাঁহারা বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীকে দেখিবার সুযোগ পায়েন নাই, তাঁহারা বাঙ্গালীর অতিথিসৎকারব্যাকুলতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ডাক্তার প্রভাতকুমার, তাঁহার ভ্রাতারা ও সে বাড়ীর বধূরা বিভূতিভূষণের মা'র ও দিদির সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের সত্য সত্যই মনে হইতে লাগিল—তাঁহারা নিতান্তই স্বজন।

এই পরিবারের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছিলেন—এমন কি, হরিদ্বারে যাইবার কথাও আর বিভূতিভূষণকে বলেন নাই। এই সাত ভাইএর এক ভগিনীকে দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মুগ্ধ হইবার মতই বটে। ফুলের বাগানে বিকাশোন্মুখ গোলাবের মত সে সুন্দর পরিবারে সুন্দরী—কিশোরী শিখরবাসিনী। পিতা আদর করিয়া উমার মত মেয়ের এই নাম রাখিয়াছিলেন। তেমন গৌর বর্ণ বাঙ্গালীর ঘরে হাজারে একটি মিলে না—যাহাকে বলে "রঙ্গের দিকে চাওয়া যায় না" তেমনই বর্ণ। দেহের গঠন নিটোল—তাহাকে স্বাস্থ্যের লাবণ্য ও নবযৌবনের পরিপূর্ণতা যে সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। শিখরবাসিনীর দেহে রূপ যেন আর ধরিতেছিল না—তাহার গুণও যেন তেমনই। যেন—"রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী!" তাহার সরল ও সলজ্জ ভাব, তাহার নম্রতা ও সেবাপরায়ণতা দেখিলে কেহ মনেও করিতে পারিত না—সে "পাশকরা মেয়ে!"

এই মেয়েটিকে দেখিয়াই মা'র ও দিদির মনে হইয়াছিল, এইবার যদি বিভূতিভূষণের মতের পরিবর্ত্তন হয়। এমন মেয়েকেও সে যদি বিবাহ করিতে সম্মত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে—তাহার ভাগ্য মন্দ।

শিখরবাসিনীর ভ্রাতারা তাহার বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন। দিদি বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে তাঁহারা সে সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয় বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। বিভূতিভূষণের চরিত্রের কথা তাঁহারা জানিতেন না—এত দিন বিবাহে তাহার অনিচ্ছা যে খেয়াল ব্যতীত আর কিছুও হইতে পারে, তাহা শিখরবাসিনীর সচ্চরিত্র ভ্রাতারা—মানুষকে আপনাদের আদর্শে বিচার করিয়া—কল্পনা করিতেও পারিল না।

শিখরবাসিনীর ভ্রাতৃগণের সম্মতি পাইয়া মা ও দিদি বিভূতিভূষণের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। শুনিয়া বিভূতিভূষণ বলিল, "তোমরা কি যে বল! আমি মনে করেছিলাম, তোমাদের ও ঝোঁক কেটে গেছে! কিন্তু এ কি? আমাকে যদি আবার ঐ কথা বল, তবে আমি আর এক দিনও এখানে থাকব না—কলকাতায় ফিরে যা'ব।"

মা বলিলেন, "জানি আমার কপাল পোড়া—নইলে—ভাগ্যে থাকলে ত অমন বৌ অমন ঘর-আলো-করা সোনার পুতলী ঘরে নিয়ে যেতে পারব! আমি ওদের কাছে বড় আশা ক'রে কথা পেড়েছি। তুই যদি আমার কথা না রাখিস—আমি এ মুখ আর লোকালয়ে দেখাব না।"

দিদি বলিলেন, "তুমি যদি সংসারীই না হ'বে, তবে

আমরা আর কেন নরক ঘেঁটে মরি; তুমি আমাদের বৃন্দাবনে রেখে দিয়ে যাও।”

সংসারের খুঁটিনাটিকে বিভূতিভূষণ বড় ভয় করিত। সে বলিল, “সে কি ক'রে হবে? সেখানে কে তোমাদের দেখবে?”

“অনাথের নাথ গোপীনাথ অনাথাদের দেখবেন। তোমাকে আর আমাদের ভাবনা ভাবতে হ'বে না—আমাদের ভার বইতে হ'বে না। আমরা মাধুকরী ক'রে—জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাব।”

শুনিয়া বিভূতিভূষণ বিপদ গণিল—স্ত্রীলোক সব করিতে পারে, স্নেহের জন্য তাহারা আপনার জীবন অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারে। যাহারা পুত্রের কল্যাণকামনায় সর্ব্বত্যাগের ব্রত করিতে পারে—বুক চিরিয়া রক্ত দেবীকে দিতে পারে—“হাত বাঁধা” দিতে পারে—ইহারা তাহারা।

বিভূতিভূষণ বলিল, “তোমরা কেন ওদের ও কথা বল্‌তে গেলে?”

দিদি বলিলেন, “কি অন্যায় কাযটা করেছি? বিয়ে যেন কেউ করে না!”

“আমার মত লোক—”

“তোমার মত বর অনেক তপস্যা করলে তবে মিলে। ঐ ত ওদের বড় বৌ বল্‌লে, ‘শিখরের ভাগ্যে যদি থাকে, তবেই এ বিয়ে হ'বে। এ বার বুঝব, ও কেমন শিবপূজা করেছিল।’ ভাইরাও সবাই বল্‌লে, ‘তবে অগ্রাণের প্রথমে যে দিন থাকে, সেই দিনই বিয়ে হয়ে যাক।’ ওরা সবাই বোকা—আর তুমি একা বুদ্ধিমান্!”

“ওরা আমার কি জানে?”

“আর জানাজানিতে কায নেই। জানবার জন্যে ত আর কেউ ব্যস্ত হচ্ছে না। কিসে তুমি অপাত্র?”

কিসে অপাত্র, তাহা মনে বিশেষ জানিলেও বিভূতিভূষণ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। “কি আপদ!”—বলিয়া সে জুতাজোড়া ও জামাটা বদ্‌লাইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। সে ভাবিবার অবসর সন্ধান করিতেছিল।

কিন্তু সে অবসর সে পাইল না। কারণ, গৃহদ্বারেই তাহার সহিত প্রভাতকুমারের কনিষ্ঠ সহোদর বিনয়কুমারের সাক্ষাৎ হইল। সে তাহাকে ডাকিতেই আসিয়াছিল। সে বলিল, “চলুন, বিভূতিবাবু, দাদা ডাকতে বল্‌লেন। সে দিন যে আমাদের লক্ষ্ণৌয়ের নবাবী খাবারের কথা হচ্ছিল, বৌদিদি আজ তা'র ক'রকম রেঁধেছেন—চা'র সঙ্গে খেতে হ'বে।”

বিভূতিভূষণ তাহার সঙ্গে গেল।

চা'র টেবলে খাবার শিখরবাসিনীই দিয়া গেল—অন্য দিনের মত আজ সে চা প্রস্তুত করিল।—সে নমিত হইয়া যখন চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, তখন তাহার পিনদ্ধ বেশে তাহার সুগঠিত দেহের লীলায়িত ভঙ্গী দেখা যাইতে লাগিল।

শিখরবাসিনীকে বিভূতিভূষণ ইতঃপূর্ব্বে অনেক বার দেখিয়াছে—কিন্তু সে অন্যভাবে। সে যত উচ্ছৃঙ্খলই কেন হউক না, ভদ্রঘরের গৃহস্থকন্যার প্রতি লোলুপ বা সমালোচকের দৃষ্টিপাত সে কখন করে নাই। আজ মা'র কথা তাহার মনে ছিল—“ঘর-আলো-করা সোনার পুতলী”—তাই সে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—তাহাই বটে।

৪

বিভূতিভূষণ বাড়ী ফিরিয়া গেলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিস? আমি কা'ল ওদের বলব—অগ্রাণ মাসেই বিয়ে।”

“না! না!” বলিয়া বিভূতিভূষণ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

দিদি বলিলেন, “তবে চল, কালই আমরা বৃন্দাবনে যা'ব।”—তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বিভূতিভূষণ ভাবিতে লাগিল—সত্যই যদি মা ও দিদি বৃন্দাবনে যায়েন, তবে—? সব যেন শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

কলিকাতার সঙ্গ—“পাপসঙ্গ” হইতে দূরে আসাতেই হউক, আর মা'র ও দিদির এই কাতর ভাব দেখিয়াই হউক—অথবা শিখরবাসিনীর অসাধারণ রূপলাবণ্য দেখিয়াই হউক—বিভূতিভূষণের মন অনেকটা নরম হইয়া আসিয়াছিল। সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিল—বিবাহ করিবে না। সে ভাবিতে লাগিল—তাহার পক্ষে বিবাহ করা কি সঙ্গত? চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে

তাহার অতীত জীবনের কথা মনে করিতে লাগিল—সে বিবাহ করিবে? কিন্তু তাহার মত তাহার বন্ধুরা ত সকলেই বিবাহিত! সে তাহাদিগকে সে জন্য মনে মনে নিন্দা করিয়াছে। কিন্তু—তাহারা কি নিরবচ্ছিন্ন নিন্দারই যোগ্য? সে ত তাহার অতীত জীবনকে অতীতের আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলিয়া দিয়া নূতন জীবনে প্রবেশ করিতে পারে। তাহা কি অসম্ভব?

এইরূপ নানা ভাবনার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাহার হৃদয়-তরী কোন সঙ্কল্পের বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না।

এই অবস্থায় পরদিন মা যখন বলিলেন, "আমি তোর কোন কথা শুনব না, বিভূতি। আমি আজই ওদের বলব —অগ্রাণের প্রথমে যে তারিখ আছে, সেই তারিখেই আমি তোর দিয়ে দেব।"—তখন কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া বিভূতিভূষণ বলিল, "তোমরা যা' ইচ্ছা কর।"

অগ্রহায়ণের তখনও প্রায় তিন সপ্তাহ বিলম্ব ছিল। সে তিন সপ্তাহ যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল, বিভূতিভূষণ যেন তাহা বুঝিতেই পারিল না। আর একবার বিবাহ স্থির হইয়া গেলে বিবাহে তাহার আপত্তির প্রাবল্য দিন দিন হ্রাস হইয়া শেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। মনকে সে যাহা বুঝাইল—মনও শেষে তাহাকে তাহাই বুঝাইতে লাগিল—অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্বন্ধ না রাখিলেও চলিবে।

অগ্রহায়ণের প্রথমেই বিবাহ হইয়া গেল। বিদেশে বিবাহ—সেই ছলে মা স্থির করিলেন, দেশে আত্মীয়-স্বজনকে আর নিমন্ত্রণ করিবেন না, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া পাকস্পর্শে সকলকে বলিবেন। দেশের সব আসিলে পাছে কোন অপ্রিয় কথা প্রকাশ পায়, সেই ভয়েই তিনি দিদির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোনরূপে চার হাত এক হইয়া যাইলেই হয়।

চার হাত এক হইয়া গেল। মা ও দিদি মনে করিলেন, ছেলের সুমতি হইয়াছে—এইবার তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু যে অদৃষ্ট-দেবতা এক দিন বিভূতিভূষণের বিদ্রূপে রুষ্ট হইয়া তাহাকে শাসন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, মা'র ও দিদির আনন্দে তিনি আজ তেমনই বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। মানুষ যাহা গড়ে, তাহা রাখা না রাখা কি তাহার ক্ষমতাধীন?

৮

ছেলে-বৌ লইয়া মা কলিকাতায় ফিরিলেন ও সমারোহে পাকস্পর্শ করিলেন। যে বৌ দেখিল, সে-ই প্রশংসা করিল—রূপ বটে।

বিভূতিভূষণও সত্য সত্যই যেন নূতন জীবনে প্রবেশের সঙ্কল্প করিয়াছিল। আফিসের কায সারিয়াই সে গৃহে ফিরিত এবং পুরাতন কুসঙ্গীদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিত। তবে শিখরবাসিনীর মনে হইত, প্রথম প্রণয়ের যে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কথা সে কবিতায় ও উপন্যাসে পাঠ করিয়াছিল এবং যে আবেগ ও উচ্ছ্বাস সে দাদাদের ব্যবহারে লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহা বিভূতিভূষণের ব্যবহারে পাইত না। বাস্তবিক অনাবিল প্রেম বিকাশকালে যে ভাব ধারণ করে—বিভূতিভূষণের স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে সে ভাবের বিকাশসম্ভাবনা ছিল না—তাহার সে উচ্ছ্বাস, সে আবেগ—সে সব পূর্ব্বেই ব্যয়িত—অপব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শিখররাসিনী সচ্চরিত্র পরিবারের পবিত্র পরিবেষ্টনে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, কাযেই স্বামীর সম্বন্ধে তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইত না।

শিখরবাসিনীর মনে সন্দেহ ছিল না বটে, কিন্তু বিভূতিভূষণের মনে সন্দেহের অভাব ছিল না। সে যেরূপ জীবন যাপন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে আপনার আদর্শে অপরকে বিচার করিয়া সন্দেহ করা স্বাভাবিক। শিখরবাসিনীর সময় সময় মনে হইত, তাহার পত্রগুলি তাহার হস্তগত হইবার পূর্ব্বে কেহ খুলিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু সেরূপ সম্ভাবনার কল্পনাও সে করিতে পারিত না। পত্রগুলি আসিত তাহার ভ্রাতাদিগের বা ভ্রাতৃবধূদিগের নিকট হইতে; কাযেই কোন পত্রে সন্দেহোদ্দীপক কোন কথাই থাকিত না।

শিখরবাসিনীর বড় বৌদিদির বাপের বাড়ী কলিকাতায়। সে আত্মীয়-স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে আসিয়াছিল বলিয়া বড় বৌদিদির অনুরোধে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা সর্ব্বদা তাহার সংবাদ লইতেন। তাঁহার ভ্রাতারা বহুবার লক্ষ্ণৌয়ে গিয়াছেন এবং বালিকাবয়স হইতেই শিখরবাসিনীকে দেখিয়া আসিয়াছেন—তাহাকে ভগিনীর মতই মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যে যখন

তখন আসিয়া শিখরবাসিনীকে দেখিয়া যাইতেন, তাঁহাদের সেই আত্মীয়তা বিভূতিভূষণের কাছে ভাল লাগিত না। তাঁহারা কে?—বৌদিদির ভাই; বলিতে গেলে কোন সম্বন্ধই নাই। অথচ তাঁহারা এত ঘনিষ্ঠতা করেন কেন? শিখরবাসিনীর অসামান্য রূপ-বহ্নি অনেক পুরুষপতঙ্গকে আকৃষ্ট করিয়া দগ্ধ করিতে পারে। স্ত্রীলোককে যাহারা পবিত্র দৃষ্টিতে দেখে নাই, পরন্তু তাহার প্রতি লালসা-কলুষিত দৃষ্টিপাতেই অভ্যস্ত, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ ব্যবহারে সন্দেহ করা অসম্ভব নহে। অথচ এই সন্দেহ সহসা প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। বিভূতিভূষণের মনে সন্দেহের সর্পডিম্ব চিন্তার তাপে ফুটিয়া গেল—সর্পশিশুরা দংশনে তাহাকে বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। শেষে এক দিন—আর সন্দেহ গোপন রহিল না।

আফিসে যাইবার সময় বিভূতিভূষণের পান লইয়া শিখরবাসিনী যখন দিতে আসিল, তখন টেবলের উপর রক্ষিত একখানা পত্র দেখাইয়া বিভূতিভূষণ বলিল, "তোমার পত্র।"

পত্রখানা তুলিয়া লইয়া শিখরবাসিনী দেখিল, খামখানি জল দিয়া খুলা হইয়াছে—তখনও সেখানি সিক্ত। সে জিজ্ঞাসা করিল, "খামখানা কি খোলা হয়েছে?"

পান মুখে পূরিতে পূরিতে বিভূতিভূষণ বলিল, "হাঁ।"

"কেন?"

"আমার ইচ্ছা।"

"তুমি আমার চিঠি দেখলে কেন?"

"তাতে কি দোষটা হয়েছে?"

"না ব'লে চিঠি খোলা—।"

"স্বামী যদি স্ত্রীর চিঠি দেখে, তবে সেটা দোষের হয়! আর রোজ রোজ বৌদিদির ভাইদের সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়াটা বড় ভাল কায?"

শিখরবাসিনী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল কি? ওঁরা যে আমাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখছেন!"

"কিন্তু এখন তুমি আর কচি খুকী নও। ও সব কথায় আমাকে ভুলাতে পারবে না। মেয়েমানুষকে জান্‌তে আমার বাকি নেই।"

শিখরবাসিনীর দিকে কোপকটাক্ষপাত করিয়া বিভূতিভূষণ চলিয়া গেল।

শিখরবাসিনীর মনে হইল, কে তাহার বুকে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সে সেই ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িল। দিদি পাশের ঘর হইতে সব কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি যখন আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন, তখন তাঁহার কথা তাহার কাছে ক্ষতে ক্ষারক্ষেপের মতই বোধ হইতে লাগিল।

সে কলিকাতায় আসিবার কয় দিন পরে এক দিন মধ্যাহ্নে একটি স্ত্রীলোক বাড়ীতে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই মা ও দিদি বিচলিত হইয়াছিলেন।—দিদি "তুই এখানে কেন রে?" বলিলেই সে ঠোঁট উল্টাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিয়াছিল, "কেন, এলে কি দোষ হয়?"—দিদি বলিয়াছিলেন, "যা, বল্‌ছি—এখ্‌নি বেরো।" সে ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া "যাচ্চি গো, যাচ্ছি"—বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে কে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিয়াছিলেন, "ওর মা আমাদের বাড়ী ঝি ছিল।" কিন্তু তাহার সহিত দিদির কথা যেন রহস্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। শিখর বাসিনী শুনিতে পাইয়াছিল, মা ও দিদি বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখলে ডাইনীর বুকের পাটা! আবার এসেছে। এখন ডাইনীর মোহটা কাটলে বাঁচি। আবার দেখেছ, এক গা গয়না—মাগী কি সর্ব্বনাশই করেছে!"

আজ স্বামীকে নির্লজ্জভাবে "মেয়মানুষকে জান্‌তে আমার বাকি নেই" বলিতে শুনিয়া সেই কথা শিখরবাসিনীর মনে পড়িল। সে দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আসবার ক' দিন পরে যে স্ত্রীলোকটা এসেছিল, আর আপনারা যা'কে তাড়াতে ব্যস্ত হয়েছিলেন, সে কে?"

দিদি বলিলেন, "ও সব কথা কেন, বৌ? স্বামীর উপর রাগ করলে কি চলে? বিভূর মেজাজটা বোধ হয় ভাল ছিল না। আমি তা'কে বুঝিয়ে বলব।"

শিখরবাসিনী কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারিল না—সে লক্ষ্ণৌয়ে দাদাকে আসিবার জন্য একখানা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিল। তবে সেটা দিদিকে ও মা'কে জানিতে দিল না।

মা ও দিদি বিশেষ জিদ করিয়া তাহাকে ভাতের কাছে বসাইলেন বটে, কিন্তু সে মুখে অন্ন দিল না। এ বাড়ীর অন্ন আজ তাহার কাছে কুক্কার বলিয়া মনে

হইতেছিল। সে সমস্ত দিন জলস্পর্শ করিল না। তাহার ভাব দেখিয়া মা ও দিদি শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা জানিতেন, শিখরবাসিনী নরম হইলে বিভূতিভূষণ হয় ত তাহার কথার জন্য দুঃখিত হইবে—কিন্তু সে কঠোর হইলে বিভূতিভূষণও কঠোর হইয়া উঠিবে। তাহাই তাহার স্বভাব। তবুও তাঁহারা মনে করিলেন, বিভূতিভূষণকে বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন।

কিন্তু রাত্রিতে বিভূতিভূষণ যখন ফিরিয়া আসিল—অর্থাৎ যখন তাহার সঙ্গীরা তাহাকে বাড়ীতে দিয়া গেল—তখন তাহার আর বুঝিবার মত অবস্থা ছিল না। অনতিদীর্ঘকালের সংযমের বন্ধন আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—সে মদ্যপানে বিহ্বল। তাহার পশুপ্রকৃতি আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দেখিয়া মা ও দিদি শিরে করাঘাত করিলেন—তাঁহারা বড় আশা করিয়াছিলেন, বিভূতিভূষণের মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এ কি হইল? দেবতার কাছে এত প্রার্থনা—এত "মানত" সবই কি ব্যর্থ হইল? ছেলে কি আবার ডাকিনীর মোহে আকৃষ্ট হইল? এখন উপায় কি?

মা ও দিদির শুশ্রূষায় খানিকটা পরে বিভূতিভূষণ ঘুমাইয়া পড়িল। তাঁহারা সহস্র চেষ্টা করিয়াও শিখর-বাসিনীকে বিভূতিভূষণের কাছে পাঠাইতে পারিলেন না।

৬

দ্বিতীয় দিনও শিখরবাসিনী জলস্পর্শ করিল না।

তৃতীয় দিন প্রভাতকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিভূতিভূষণ লজ্জিত হইল এবং "কায আছে" বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রভাতকুমার ভগিনীর কাছে সকল কথা শুনিলেন। এক দিকে ভগিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি যেমন ব্যথিত হইলেন, আর এক দিকে তেমনই তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তিনিও অপরাধী, তাঁহারা বিভূতিভূষণের সম্বন্ধে আবশ্যক সংবাদ না লইয়াই তাহাকে ভগিনীদান করিয়া-ছিলেন—ভগিনীর সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। তিনি বলিলেন, "শিখর, দোষ আমার—আমা-দের; আমরা যে খোঁজখবর নেওয়াও দরকার মনে করি নি!" বলিতে বলিতে তাঁহার গলাটা যেন ধরিয়া আসিল।

শিখরবাসিনী বলিল, "না দাদা, তোমরা ভাল ভেবেই কায করেছ। যা' হ'বার হয়েছে। এখন তুমি আমাকে নিয়ে চল। এ বাড়ীতে আমি আর এক দণ্ডও থাকতে পারব না। এ বাড়ীর ছাত থেকে, মেঝে থেকে, দেওয়াল থেকে যেন আগুনের শিখা বেরিয়ে আমায় পুড়িয়ে ফেল্‌ছে।"

"চল, যাই—আমার বুকের মধ্যে যেন আগুন জল্‌ছে।"

বিভূতিভূষণ বাড়ীতে ছিল না; প্রভাতকুমার মা'র ও দিদির কাছে প্রস্তাব করিলেন—তিনি ভগিনীকে লইয়া যাইবেন। তাঁহারা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—স্ত্রীলোকের স্বামী যদি দোষই করিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি স্বামীকে ত্যাগ করা যায়?

প্রভাতকুমার বলিলেন, "কিন্তু এ যে মুখে জলটুকুও না দিয়ে মরবে, সে ত সহ্য করতে পারব না! ও আমা-দের সাত ভাইয়ের এক বোন, বড় আদরের। তা' ওর সম্বন্ধে আমরা যে ভুল—যে অপরাধ করেছি, তা'র আর উপায় নেই—ক্ষমা নেই। সেই অপরাধ আর বাড়াতে পারব না।"

দিদি বলিলেন, "কিন্তু বিভূতি বাড়ী নেই!"

"তিনি বাড়ীতেই ছিলেন—ইচ্ছে করেই স'রে গেছেন।"

"গয়নার বাক্স সিন্দুকে আছে—চাবী তা'র কাছে।"

শুনিয়া শিখরবাসিনী ম্লানমুখে বিদ্রূপের হাসি হাসিল; বলিল, "গয়নায় আমার কোন দরকার নেই।"

দিদি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতায় এমন স্ত্রীলোক কখন দেখেন নাই—শিখরবাসিনী তাহার সীমন্তের সিন্দূররেখা মুছিয়া ফেলিয়াছে—তাহার প্রকোষ্ঠ অলঙ্কারশূন্য।

গহনার বাক্স ও কাপড়ের তোরঙ্গ সব ফেলিয়া শিখর-বাসিনী প্রায় একবস্ত্রেই দাদার সঙ্গে যাইয়া গাড়ীতে উঠিল।

সে যাইবার পূর্ব্বে দিদি তাহার দুইখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, "যেও না, বৌ, যেও না। স্বামী ছাড়া

স্ত্রীলোকের আর গতি নেই। স্বামী যদি অপরাধ করে, ক্ষমাই করতে হয়।"

শিখরবাসিনী বলিল,—"কিন্তু স্বামী ব'লে যে আর মনে করতে পারিনে—চাই নে।"

"অমন কথা মুখে এন না, বৌ।"

"দেখুন, আমার সাত ভাই—আদরেই হ'ক আর অনাদরেই হ'ক, এক মুঠো ক'রে ভাত দিলেও সাত মুঠো পাব। তা'র জন্য নরকে উচ্ছিষ্ট পাতে বসতে পারব না। আপনি আমায় সত্যিই ভালবেসেছেন—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন ভাইদেরও গলগ্রহ হয়ে থাকতে না হয়। এই পৃথিবীতে স্ত্রীলোক কি আপনার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ক'রে নিতে পারে না?"

সে কালের অভিজ্ঞতা ও মনোভাব লইয়া দিদি তাহার এই কথার উদ্দেশ্য যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, এই কিশোরীর মধ্যে যে দীপ্ত তেজ আছে, তাহা যতই অসাধারণ হউক, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

মা'র মুখে কথা ফুটিতেছিল না। তিনি কেবল অশ্রু-বর্ষণ করিতেছিলেন—সে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আর আপনার সব আশার অবসান দেখিয়া।

দিদি শিখরবাসিনীর সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত গেলেন এবং গাড়ী চলিয়া গেলে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর মাতা ও পুত্রী উভয়েই রোদন করিতে লাগিলেন—শিখরবাসিনী যেন তাঁহাদের সব সুখের আশা সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে—আশায় এই হতাশা!

তাঁহাদের উভয়েরই মনে হইতে লাগিল—এই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব না করিয়া পারা যায় না।

৭

শিখরবাসিনী চলিয়া যাইবার পর কয় দিন বিভূতিভূষণ বড় বাড়াবাড়ি করিল। মা ও দিদি সত্য সত্যই মনে করিলেন—আর কলিকাতায় থাকিবেন না। তাঁহারা বিভূতিভূষণকে বলিলেন, "যা' হ'বার হয়েছে—সবই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। এখন তুমি একটা কায কর, আমাদের বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দাও।"

শিখরবাসিনী চলিয়া যাইবার পর হইতে বিভূতিভূষণ কেবলই আপনার চিন্তা ডুবাইবার জন্য মদ্যপান করিতেছিল। এই কথায় একটা নূতন ভাবনার বিষয় পাইল। এ যে নূতন সমস্যা!

সে মনে করিল, তবে কি তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবে? কিন্তু সব শুনিয়া বুঝিল—সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তখন তাহার মনে অন্য ভাবনা দেখা দিল। সে ত চেষ্টা করিয়া বুঝিয়াছে, সে নূতন ভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে—পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিতে পারে। সে তাহাই করিবে।

বিভূতিভূষণ স্থির করিল—আর এক বার সে বিবাহ করিবে। যে নারী দর্পভরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু সে এখনও যেটুকু দিতে পারিবে, কোন নারী তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেও পারে।

তাহার আফিসের গাঙ্গুলী মহাশয় একটি মেয়ের সন্ধান দিলেন—দরিদ্রা বিধবার কন্যা, দেখিতে "পাঁচ-পাঁচি!" মা অর্থের অভাবে মেয়ের বিবাহ দিতে পারিতেছেন না; মেয়ের বয়সও ষোড়শ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ভাবনায় তাঁহার মুখে ভাত উঠিতেছে না। শুনিয়া বিভূতিভূষণ বলিল, "কিন্তু আপনি বলবেন, আমি সাধু পুরুষ নই।" গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তাও আবার বল্‌তে হয়?" বিভূতিভূষণ বলিল, "সেটা বল্‌তেই হ'বে।"

গাঙ্গুলী মহাশয় কথাটা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও প্রকারান্তরে জানাইয়া দিলেন; শুনিয়া মেয়ের মা বলিলেন, "আমার মত লোকের বড় বেশী আশা করা ভাল নয়। মেয়ের যদি ভাগ্য ভাল হয়—ওর সুখ হ'বেই; আর ভাগ্য যদি বিমুখ হয়, আমি যত চেষ্টাই কেন করি না, ও কষ্ট পা'বেই। সুখ-দুঃখ কি আমাদের হাতধরা? আপনি সম্বন্ধ করুন।"

সম্বন্ধ পাকা হইয়া গেল—শিখরবাসিনী চলিয়া যাইবার প্রায় এক মাসের মধ্যেই বিভূতিভূষণ আবার বিবাহ করিল। বসনভূষণাদি বাহিরের জিনিষ ব্যতীত বিভূতিভূষণের যেমন স্ত্রীকে দিবার অধিক কিছু ছিল না—সুহাসিনীর তেমনই অধিক পাইবার আশাও ছিল না। কাযেই অধিকাংশ পরিবার যেমন প্রেমহীন হইলেও একেবারে সুখহীন না হইয়া স্বচ্ছল হইলেই নির্ব্বিবাদে

ভাবাবেশে

শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশের সৌজন্যে]   [শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

চলিয়া যায়, বিভূতিভূষণের পরিবারও তেমনই চলিতে লাগিল।

মা ও দিদি পরামর্শ করিয়া সুহাসিনীর মা'কেও তাঁহাদের পরিবারভুক্ত করিয়াছিলেন—সুহাসিনীর আর কোন আশ্রয় রাখেন নাই।

বিভূতিভূষণও কতকটা উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অভিজ্ঞতা শেষ করিয়া, কতকটা সামাজিক হিসাবে লোকের সঙ্গে মিশিবার সঙ্কল্প হেতু শান্ত ও সংযত হইয়া পড়িল।

এইরূপে দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল এবং তাহার মধ্যে পুত্রকন্যার আবির্ভাবে সংসার পরিপূর্ণ হইল ও সুহাসিনীর স্বামীর ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর কমিয়া গেল।

ইহার পর মাদ্রাজে একটা বড় চাকুরীতে বিভূতিভূষণ বহাল হইল। তখন মা পুত্রকে সংসারী দেখিয়া শান্তিতে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সে বয়সে দিদির আর "অগঙ্গার" দেশে যাইতে ইচ্ছা হইল না—তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, তিনি কাশীবাসী হইবেন। সুহাসিনীর মাও সেই প্রস্তাবে যোগ দিলেন। শেষে তাহাই হইল। বিভূতিভূষণের সঙ্গে মাদ্রাজে যাইয়া—দক্ষিণ-ভারতের নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তাঁহারা দুই জন কাশীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সুহাসিনী একা ঘরের গৃহিণী হইল।

চাকরীতে বিভূতিভূষণ ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উপাধিতে ও সম্মানে তাহার নাম প্রচারিত হইতে লাগিল।

সুহাসিনী কখন বৎসরে একবার, কখন বা দুই বৎসরে একবার কাশীতে মা'র ও ননদের কাছে যাইয়া দেখা করিয়া আসিত—কিন্তু সংসারের জন্য কখন মাসাধিক কাল তাঁহাদের কাছে থাকিতে পারিত না। কারণ, তত দিনে তাহার সংসারটি আর ক্ষুদ্র ছিল না এবং সংসারের সব ভার তাহাকে দিয়া বিভূতিভূষণ তাহার চাকরীর কায ও সামাজিক কর্ত্তব্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিত।

৮

কাশীর বড় হাঁসপাতালে মহিলাদিগের অংশে প্রধানা ডাক্তার এক জন বাঙ্গালী মহিলার ইরিসিপেলাসদুষ্ট উরুর ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া আপনি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "আপনি যদি যেতে চান, আজই যেতে পারেন; সেরে গেছেন। আর যদি আরও দু'টা দিন থাকেন, ভাল হয়।"

রোগিণী বলিলেন, "আপনি যা' বল্‌বেন, তাই করব। আমার স্বামী মাদ্রাজে চাকরী করেন, তিনি এসেছেন—তাঁকেও বলেছি, আপনি না বললে আমি যা'ব না।"

"বাড়ীতে গেলেও ড্রেস করা চলতে পারে।"

"আপনি বাড়ীতে যা'বেন?"

"না। আমি কারও বাড়ী চিকিৎসা করতে যাই না।"

"তবে আমি হাঁসপাতালেই দু'দিন থাকব। আমি এসেছিলাম, মা'র সঙ্গে দেখা করতে। আমার মা আর ননদ কাশীবাস করেন। হঠাৎ যখন উরুতে ব্যথাটা রাতারাতি বেড়ে উঠল আর সকালে ডাক্তার বললেন—অসুখটা সহজ নয়, তখন আমরা তিন জনই কি করব ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। ডাক্তার বাবুই বললেন, হাঁসপাতালে এলে ভাল হয়। আর তিনিই বললেন, হাঁসপাতালের বড় মেয়ে ডাক্তার বাঙ্গালী। কিন্তু আমরা যে হাঁসপাতালে আসতে কত ভয় পাই, তা' আপনি বুঝবেন না। আপনাকে দেখেই আমার সব ভয় দূর হয়ে গেছল।"

ডাক্তার সপ্রতিভভাবে একটু হাসিমুখে বলিলেন, "দেখেই?"

"সত্য বল্‌ছি, দেখেই; মনে হ'ল, এমন যা'র রূপ—তা'র কাছে কি কখন ভয় থাক্‌তে পারে? তা'র পর দেখেছি, যেমন রূপ—তেমনই গুণ। রোগীরা যে বলে, আপনি ছুঁলে রোগ সেরে যায়, সে সত্যি কথা। আপনি ছেলেমানুষ, কিন্তু কি ভাল চিকিৎসা করেন!"

শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমাকে ছেলেমানুষ ঠাওরালেন কেমন ক'রে? আমার বয়স কত ব'লে আপনার মনে হয়?"

"কেন, পঁচিশ কি বড় জোর ত্রিশ।"

"আমার বয়স চল্লিশ বছর।"

"কখনই না।"

সত্য সত্যই দেখিয়া ডাক্তারের বয়স স্থির করা দুঃসাধ্য। বয়স রোগিণীর ও চিকিৎসকের প্রায় একই;

কিন্তু রোগিণীর দেহে স্বচ্ছল সংসারের অবসরজাত মেদের আধিক্য—যেন সমস্ত গঠনটি শিথিল করিয়া দিয়াছে; রূপের যেটুকু দুই তিনটি ছেলে-মেয়ে হইবার পরও অবশিষ্ট ছিল, তাহা বয়সে ধৌত হইয়া গিয়াছে—দেহে যেমন শিথিলতা, মনেও তেমনই। আর ডাক্তারের অসামান্য রূপ—যৌবনের লাবণ্যের জোয়ার আসিয়াছিল, কিন্তু ফিরিয়া যাইতে পারে নাই; গঠনের আঁট—কায করিবার শক্তিরই মত অটুট।

রোগীর কাছে বিদায় লইয়া, আর কয় জন রোগীর ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার পার্শ্বের ঘরে যাইয়া আবরণান্তরণ ফেলিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইলেন এবং তাহার পর আপনার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া টেবলের উপর রক্ষিত একখানি ডাক্তারী মাসিক পত্রের প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি হাঁসপাতালে কায করিতেন, কিন্তু কোন রোগীর বাড়ীতে যাইতেন না। তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া কোন কোন ধনী পরিবারে তাঁহাকে মোটা টাকা ফী দিয়া রোগী দেখিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু তিনি কোথাও গমন করেন নাই। তাঁহার এক ভ্রাতা কাশীর কলেজে অধ্যাপক। হয় ভ্রাতা, নহে ত ভ্রাতুষ্পুত্ররা এক জন তাঁহাকে হাঁসপাতালে রাখিয়া যাইত; আবার গাড়ী লইয়া বাড়ী হইতে কেহ না আসিলে তিনি কখন হাঁসপাতাল হইতে বাড়ী যাইতেন না। যে দিন হাঁসপাতালের কায শীঘ্র শীঘ্র শেষ হইয়া যাইত, সে দিন তিনি কোন সংবাদপত্র বা মাসিক পত্র পাঠ করিতেন, তবুও গাড়ী ডাকাইয়া একা ফিরিয়া যাইতেন না।

ডাক্তার একটি প্রবন্ধের অল্প ভাগ পাঠ করিবার পরই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, এক বাঙ্গালী "মাই" তাঁহার সঙ্গে "মোলাকাৎ" করিতে চাহেন।

তাঁহাকে আনিতে বলিয়া ডাক্তার প্রবন্ধটি পাঠ করিতে লাগিলেন; "কে—বৌ!" শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সহসা তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। চল্লিশের পর বিশ বৎসরেও মানুষের চেহারায় প্রায়ই এত পরিবর্ত্তন হয় না যে, দেখিলে চিনিতে কষ্ট হয়; বিশেষ কণ্ঠস্বর কখন পরিবর্ত্তিত হয় না। শিখরবাসিনী দেখিল—সম্মুখে বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে দৃষ্ট সেই ননদ!

সে কোন কথা না বলিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল এবং "জলদি গাড়ী লাও" বলিয়া ভৃত্যকে আদেশ দিয়া রোগীদের ঘরে চলিয়া গেল এবং গাড়ী আসিলে বাড়ী চলিয়া গেল।

তাহার ব্যবহারে দিদি অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। রোগিণী বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়া পত্নী। কাশীতে আসিয়া সহসা পীড়িতা হয়। পূর্ব্বদিন বিভূতিভূষণ মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছিল এবং হাঁসপাতালে পত্নীকে দেখিতে গিয়াছিল। সে যখন হাঁসপাতালের দ্বারের নিকটে, তখন শিখরবাসিনী কায সারিয়া বাড়ী যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিতেছিল। দেখিয়াই বিভূতিভূষণ চিনিতে পারিয়াছিল এবং চিনিয়াই হাঁসপাতালের লোকের কাছে তাহার পরিচয় লইয়াছিল। পরিচয় পাইয়া তাহার সন্দেহের আর অবকাশ ছিল না; কিন্তু শিখরবাসিনীর সম্মুখে যাইতে তাহার সাহসে কুলায় নাই; লজ্জাও করিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়া বিভূতিভূষণ দিদিকে সে কথা বলিয়াছিল এবং তাহা শুনিয়া দিদি আজ হাঁসপাতালে আসিয়াছিলেন। শিখরবাসিনী চলিয়া আসিবার পর বিভূতিভূষণের পক্ষ হইতে রটান হইয়াছিল, সে পিত্রালয়ে গিয়াছিল এবং তথায় তাহার জীবনান্ত হইয়াছে। সে আজ বিশ বৎসরের কথা। তাহার পর আজ সেই শিখরবাসিনীই চিকিৎসা করিয়া সুহাসিনীর জীবন রক্ষা করিয়াছে—এ কি অঘটনঘটন! দিদি মনে করিয়াছিলেন, যাহাই হউক, তিনি শিখরবাসিনীকে দেখিতে যাইবেন এবং তাহাকে সব কথা বলিবেন। তাই তিনি হাঁসপাতালে গিয়াছিলেন।

৯

শিখরবাসিনী যেন একটা কি আতঙ্কে সহসা হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বাড়ীতে ফিরিয়াই সে মনে করিতে লাগিল, কাযটা কি ভাল হইল? ভ্রাতার কল্যাণের জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, দিদি তাহাকে যে ভালবাসা দেখাইতেন, তাহার মধ্যে অনেকটা আন্তরিকতা ছিল বলিয়াই তাহার মনে হইত।

এত দিন পরে তিনি কি জন্য আজ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন? হয় ত কাশীতে কোনরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি তাহার কাছে আসিয়াছিলেন। সে ডাক্তার—হয় ত চিকিৎসার জন্যই তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আর তাহার ব্যবহার যে অত্যন্ত অশিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও আর সন্দেহ নাই। আপনার এই দৌর্ব্বল্যে সে আপনি লজ্জানুভব করিতে লাগিল।

এই দীর্ঘ বিংশ বর্ষের মধ্যে সে যে কখন তাহার সেই স্বল্পকালস্থায়ী নূতন জীবনের কথা ভাবে নাই, এমন নহে। কিন্তু কাযে সে সব ভাবনা ডুবাইয়া রাখিত; আর তাহার মানসিক বল ও সঙ্কল্পদৃঢ়তাও অসাধারণ ছিল। আজ সহসা কেন সে বল ক্ষুণ্ণ হইল, সে দৃঢ়তা বিচলিত হইল?

একবার তাহার মনে হইল, সে তখনই হাঁসপাতালে ফিরিয়া যাইবে, তথায় দিদির সন্ধান লইবে। কিন্তু তখনই মনে হইল, এতক্ষণও কি তিনি অপেক্ষা করিতেছেন? তাহা সম্ভব নহে। আর এই জনারণ্য কাশীতে সে কেমন করিয়া তাঁহার সন্ধান করিবে? যে বাঙ্গালী রোগিণীর চিকিৎসা সে করিতেছিল, তাঁহার সহিত যে দিদির কোন সম্বন্ধ আছে বা থাকিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারিল না।

তখন সে মনে করিল, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে—এখন আর সে জন্য ব্যস্ত হইয়া কোন ফল নাই। এইরূপ চিন্তায় সে শান্তি ও সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল দিদির আগমনের কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। বিধবার শ্বেতাম্বরপরিহিতা সেই বৃদ্ধাকে যেন সে সম্মুখে দেখিতে লাগিল। সে ভাল করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াও দেখে নাই; তাঁহার মুখভাব উৎকণ্ঠার কি বেদনার, কৌতূহলের কি প্রসন্নতার পরিচায়ক ছিল, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। সে কেন এমন ভুল করিল? তিনি কি মনে করিয়াছেন? সে কি আপনার মনকে এতটুকু বিশ্বাসও করিতে পারে না যে, তাঁহার কথা না শুনিয়াই ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে? সে যে এত দিন ধরিয়া মনকে দৃঢ় করিবার সাধনা করিয়াছে—এই কি তাহার সিদ্ধি?

শিখরবাসিনীর কাছে সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল।

সে দিন রাত্রিকালেও সে অন্য দিনের মত সুনিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারিল না।

১০

পরদিন প্রত্যূষে শিখরবাসিনী হাঁসপাতালে যাইবার আয়োজন কবিবার সময় তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রী আসিয়া বলিল, "পিসীমা, এক জন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

শিখরবাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"বললেন, 'বল গে দিদি এসেছেন'।"

"তাঁকে নিয়ে আয়।"—পূর্ব্বদিন সে যাঁহাকে দেখিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, আজ সে তাঁহার আগমন-সংবাদে যেন অশান্তির মধ্যে শান্তি পাইল—সে যেন তাঁহার আগ-গম প্রতীক্ষা করিতেছিল!

দিদি আসিলে সে তাঁহাকে প্রণাম করিল। দিদি আশীর্ব্বাদ করিলেন, সে তাড়াতাড়ি একখানা আসন আনিতে যাইতেছিল; দিদি মেঝেয় বসিয়া পড়িলেন; বসিয়াই বলিলেন, "কা'ল যে পালিয়েছিলে! কিন্তু কাশীতে কি তোমার লুকিয়ে থাকবার উপায় আছে, বৌ? তোমার প্রশংসা যে মুখে মুখে।"

শিখরবাসিনী মুখ নত করিয়া রহিল।

দিদি বলিলেন, "বিশ বছর পরে বিশ্বনাথের দয়ায় আবার তোমাকে দেখতে পেলাম। তোমার সঙ্গে আমার ক'টা কথা আছে।"

শিখরবাসিনী ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং আসিয়া দিদির পার্শ্বে বসিল।

দিদি তাহার বিভূতিভূষণের গৃহপরিত্যাগ হইতে সব ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শিখরবাসিনী সব শুনিতে লাগিল। সে কি কেবল অকারণ কৌতূহলবশে? দিদি বলিলেন, সে চলিয়া আসিবার পর বিভূতিভূষণও আত্মগ্লানি অনুভব করিয়াছিল, আর সুহাসিনীও অত্যন্ত সহিষ্ণুভাবে ভালবাসায় স্বামীকে সুপথের পথিক করিয়া আনিয়াছে। শেষে তিনি বলিলেন, "বিভূতি সে দিন

হাঁসপাতালে তোমাকে দেখতে পেয়েছিল; দেখেই চিনেছিল। কিন্তু লজ্জায় সে তোমার কাছে যায়নি; বাড়ীতে ফিরে আমাকে বলেছিল, 'দিদি, বিশ বছর পরে সে হ'তেই সুহাসিনীর জীবনরক্ষা হ'ল। এও একটা অঘটনঘটন।' তা'র কথায় যে ব্যথা ছিল, তা'তে আমার চোখে জল এল। আমি ভাবলাম, সন্ধান যখন পেয়েছি, তখন তোমার সঙ্গে দেখা করবই। তাই কা'ল তুমি অমন ক'রে পালিয়ে এলেও আমি আজ তোমাকে ধরতে এসেছি।"

শিখরবাসিনী বলিল, "আমার বড় অন্যায় হয়েছিল; আমায় মাপ করবেন।"

দিদি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলি দিয়া শিখরবাসিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আমি ত কোন দিন তোমার উপর রাগ করিনি—তোমার দোষ দিইনি—যে দিন তুমি চ'লে এসেছিলে, সে দিনও না, কা'লও না। তোমার মনের ভাবটা আমি বুঝতে পেরেছি।"

দিদির এই স্নেহব্যঞ্জক স্পর্শ যেন শিখরবাসিনীর মনে কেমন দৌর্ব্বল্য সঞ্চার করিতে লাগিল। সে আর কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। যে হ্রদের তলে সে তাহার অতীত ডুবাইয়া দিয়াছিল, আজ যেন প্রবল ঝড়ে তাহার বারিরাশি চঞ্চল হইয়া উঠিল—আবিল ও আন্দোলিত জলে স্মৃতি ও বিস্মৃতি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইল না—কর্ত্তব্য ও বাস্তব মিশাইয়া যাইতে লাগিল।

দিদি বলিলেন, "এক দিন বিভূতির কল্যাণ হ'বে মনে ক'রে, বড় আশা ক'রে মায়-ঝিয়ে তোমাকে বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে আশা পূর্ণ হয়নি—আমাদের কপালদোষে আর বিভূতির ব্যবহারদোষে তুমি সে অপবিত্র আসনে বসনি। আজও আবার তা'রই কল্যাণের আশায় আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। আমার স্নেহের অন্য অবলম্বন নেই, এইটুকু মনে ক'রে আমাকে ভিক্ষা দেবে কি?"

শিখরবাসিনী ভ্রাতার জন্য এই বালবিধবার স্বাভাবিক উৎকণ্ঠায় বিস্মিত হইল না বটে, কিন্তু তিনি কি চাহেন, বুঝিতে পারিল না।

দিদি আবার বলিলেন, "বল, তুমি আমায় ভিক্ষা দেবে?"

শিখরবাসিনী বলিল, "বলুন, কি করতে হ'বে—অসম্ভব না হ'লে আমি আপনার জন্য তা করব।"

"অসম্ভব অন্য লোকের কাছে হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু তোমাকে আমি যা' দেখেছি, তা'তে তোমার কাছে অসম্ভব নয়। তুমি পবিত্রতাকে স্বামীর চাইতেও বড় করেছ।"

শিখরবাসিনী নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

দিদি বলিলেন, "তুমি যা' ব'লে এসেছিলে, তাই হয়েছে—তুমি কারও গলগ্রহ হওনি। বিশ্বনাথ তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন। আমার অনুরোধ—আমার ভিক্ষা, যা'কে তুমি বাঁচিয়েছ, তা'কে মেরো না, সুহাসিনীর কাছে আত্ম-পরিচয় দিও না। সে যা' না জেনে সুখে আছে, তা' যেন আর জানতে না পারে।"

শুনিয়া শিখরবাসিনী স্বস্তির শ্বাস ফেলিল; বলিল, "এই কথা! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে আপনি কেন মনে করলেন, আমি হয় ত আত্ম-পরিচয় দেব? যা' মুছে ফেলেছি, তার কথা আর কেন?"

"বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করুন। আমার অপরাধ নিও না। আমি আমার দুর্ব্বল নারীহৃদয় দিয়ে তোমার বিচার করেছি, তাই অমন কথা মনে করেছি। তুমি যদি সত্যই মুছে ফেলতে পেরে থাক, তবে আমারই ভুল। অতি অল্পবয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল—বিয়ে কি, তা' বুঝতে পারবার আগেই বিধবা হয়েছিলাম। স্বামী কি,তা' বুঝিনি—তাঁ'র সঙ্গে পরিচয়ও হয়নি; কবে যে তাঁ'র ছবি এ বুকে পড়েছিল, তা' তখন অনুভব করতেও পারিনি। কিন্তু বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে আজ মিছে কথা বলব না, বৌ, যত দিন গেছে, তত সে ছবি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"

শিখরবাসিনী ভাবিতে লাগিল।

দিদি উঠিয়া বলিলেন, "তবে আজ আসি। কাশীতে মণিকর্ণিকায় পুড়ব আশা ক'রে এসেছি; যদি বিশ্বনাথ পায় রাখেন, তবে আর যে ক'টা দিন বাঁচব, এখানেই থাকব—তা' হ'লে আবার দেখা হ'বে।"

শিখরবাসিনীর মনের মধ্যে কেমন একটা নূতন অনুভূতি হইতেছিল। সে দিদিকে প্রণাম করিয়া দ্বার খুলিল।

তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারেই দাঁড়াইয়া ছিল; কহিল, 'পিসীমা, হাঁসপাতালে যেতে যে দেরী হয়ে গেল!"

"চল, বাবা, যাই"—বলিয়া শিখরবাসিনী তাহার অনুসরণ করিল; সে তখন কাযে ভাবনা ডুবাইতেই চাহিতেছিল।

*　　*　　*　　*　　*

হাঁসপাতালে সুহাসিনীর ক্ষত দেখিয়া শিখরবাসিনী বলিল, "কাল আপনি যেতে পারবেন; আর থাকবার দরকার হ'বে না। আপনার স্বামীও হয় ত ব্যস্ত হচ্ছেন। মা'র ত ব্যস্ত হ'বারই কথা।"

সে দিন হাঁসপাতাল হইতে ফিরিবার সময় সে বুঝিতে পারিল, তাহার মনে একটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে—দিদির কথায় তাহার উত্তর—মানুষ স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারে ত?—আর ঘৃণা ও ভালবাসা উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি বড়—কোন্‌টি আদরণীয়?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শ্যামহারা বৃন্দাবন

[ইন্দিরা দেবীর অপ্রকাশিত কবিতা]

গোকুলে শ্যাম ছাড়িয়া গেছে আঁধার করি বৃন্দাবন,
তাই একাকী রাধে দিতেছে বসি নয়ন-নীরে সন্তরণ।
সুবেশে আর নাহিক আশ, সুখ না দানে কুসুম-বাস,
অধীরে আঁখি করিছে শুধু যেন কি নিধি অন্বেষণ।
ডুবেছে শশী সলিলতলে, কমল-আঁখি ভাসিছে জলে,
অধরে নাহি সে সুখ-হাসি নাহি, সে সখী-সম্ভাষণ।
কাঁপালে পাতা মৃদুল বায়, চমকি উঠে শিহরে কায়,
তড়িৎলতা হৃদয়-নভে আশায় করে সঞ্চরণ।
কলসী কাঁখে স্নানের ছলে, চাহিয়া থাকে কদমতলে,
ডুবায়ে তনু যমুনাজলে ভাবে সে কালা মন্মোহন।
রাধার দুঃখে হইয়া দুঃখী, কাঁদিছে শাখে বনের পাখী,
ব্যথিত শ্বাসে চাহিয়া থাকে পাদপ লতা পুষ্পবন।
হাসে না শশী সে সুখ-হাসি, ঢালে না নিশি জ্যোৎস্নারাশি,
বাজে না আর শ্যামের বাঁশী বহায়ে সুধা-প্রস্রবণ।
অলস দেহ আকুল প্রাণ, কুঞ্জে নাহি সে সুখের গান,
ব্রজবাসী নয়নজল নয়নে করে সংবরণ।
কালার তরে ভূপাল-বালা, গাঁথে না ফুলে চিকণ মালা,
জ্যোছনা নিশি মলিন হ'ল নেহারি ম্লান চন্দ্রানন।
ফেলিয়া বারি গাগরী হাতে, কুলের নারী চলে না পথে,
অভয় পদে স্মরণ নিতে সরমে হয়ে বিস্মরণ।
খেয়ার তরী ভাসিছে জলে, ডাকে না বাঁশী "কে যাবি" ব'লে,
অকূল জলে কে দিয়ে পাড়ি করাবে পারে উত্তরণ।
কালার মত কঠিন কালো, কিশোরী তারে বেসেছে ভালো,
নহে সে শঠ শ্যামের মত হবে না দিন বিস্মরণ।
সকল দুঃখ লবে সে হরি, রাধিকা তারে লয়েছে বরি,
বেদনাহরা সে দিন স্মরি করিছে দিন গুঞ্জরণ।

মায়ের প্রাণ

১
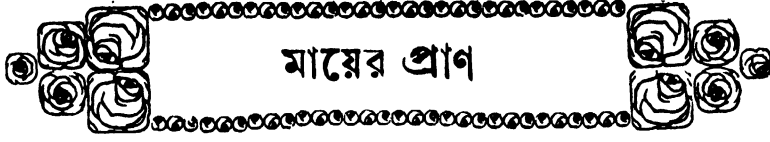
পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের রামনগর ষ্টেশনের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে আকন্দতলা একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। গ্রামে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। গ্রামবাসিগণের অধিকাংশই দরিদ্র; অনেকে চাষ-আবাদ ও মজুরী করিয়া সংসার প্রতিপালন করিত। গ্রামের বাজারখানি গ্রামের তুলনায় অনেক বড়; কারণ, চারিদিকে কয়েক ক্রোশের মধ্যে হাটবাজার না থাকায় নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামের লোক আকন্দতলাতেই বাজার করিতে আসিত। এই বাজারে রামযাদু পালের একখানি মুদীখানার দোকান ছিল।

গ্রামের অন্যান্য কৃষিজীবী গৃহস্থের মত রামযাদুর পিতা নবগৌর পালেরও কিছু জমীজমা ছিল; নবগৌর লাঙ্গল, বলদ ও কৃষাণ রাখিয়া সেই জমী আবাদ করিত; তাহাতে কষ্টে তাহার সংসার চলিত, অথচ সে জন্য তাহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইত। সেই জন্য নবগৌর সঙ্কল্প করিয়াছিল—রামযাদুকে সে চাষ-আবাদের কার্য্যে "লায়েক" না করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা অন্যরূপ করিবে।—সেই ব্যবস্থার কথা আমরা পরে বলিতেছি।

নানা প্রকার অনিয়মে ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে অল্প-বয়সেই নবগৌরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; তাহার মৃত্যুকালে রামযাদুর বয়স নিতান্ত অল্প। নবগৌর পুত্রের জন্য কোন সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারে নাই; এ জন্য রাম-যাদুকে অগত্যা তাহার ভগিনীপতির শরণাপন্ন হইতে হইল। তাহার ভগিনীপতি ধনঞ্জয় কুণ্ডু কলিকাতার হাটখোলায় মুদীখানার দোকান করিয়া কয়েক বৎসরেই ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাহার শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্ত্রীর অনুরোধে সে নিরুপায় শ্যালককে আশ্রয়দানে কুণ্ঠিত হইল না।—রামযাদু কলিকাতায় গিয়া ভগিনীর গলগ্রহ হইল বটে, কিন্তু সে সঙ্কল্প করিল—ভগিনীপতির দোকানে কিছু দিন কাযকর্ম্ম শিখিয়া পৈতৃক ভিটায় ফিরিয়া যাইবে, এবং গ্রামেই একখানা দোকান খুলিয়া বসিবে। তাহার দিদি ক্ষেত্রমণি স্বামীকে বলিল, "রামকে তোমার দোকানে রেখে দোকানের কাযকর্ম্ম শিখিয়ে দাও, যেন ও গাঁয়ে গিয়ে ব্যবসা ক'রে দু'পয়সা রোজগার করতে পারে; আমার বাপের ভিটেয় যাতে সাঁজের বেলা 'পিদিম্' জ্বলে—তার উপায় তোমাকে করতেই হ'বে।"—ধনঞ্জয় কুণ্ডু হাসিয়া বলিল, "তুমি কি ভেবেছো—ওকে আমি দু'বেলা বসিয়ে খাওয়াব, আর ও পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা মেরে বেড়াবে—এই জন্যে ওকে কল্‌কাতায় এনেছি? ধনঞ্জয় কুণ্ডু তেমন 'পাত্তর'ই নয়।"—সে রামযাদুকে তাহার দোকানে ভর্ত্তি করিয়া লইল এবং তেল, নুণ, ঘি, ময়দা বিক্রয়ের জন্য তাহার হাতে দাঁড়ি-বাটখারা দিল।

রামযাদুর পিতা যদিও চাষী গৃহস্থ ছিল, তথাপি কাল-মাহাত্ম্যে চাকরীটাকেই সে বড় মনে করিত। তাহার ছেলে লিখাপড়া শিখিয়া তাহার প্রতিবেশী দামোদর ঘোষের ছেলের মত মুন্সেফের পেস্কার কি ফটিক বিশ্বাসের জামাইএর মত রেলের "ইষ্টাসিনের" "ছোট বাবু" হয়—ইহাই তাহার উচ্চাভিলাষ ছিল। সে যখন তখন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিত, "রোদে পুড়ে, জলে ভিজে সারাদিন মাঠে মাঠে মুনিষ খাটানো, আর ক্ষেত-খামার দেখা কি সামান্যি ঝকমারির কায? 'শরীল' মাটী হয়ে যায়, পোড়া কাঠের মতন চেহারা হয়; সময়ে না পাওয়া যায় 'ছ্যান' করতে, না পাওয়া যায় এক মুঠো খেতে! রামা কোন গতিকে 'এনটেঞ্চো'টা (এনট্রান্স) পাশ করলেই ওকে আদালতে ঢুকিয়ে দেব। আমার মামার জামাই ভবতারণ মণ্ডল আদালতের পেয়াদাগিরি ক'রে শালিয়ানা বারো অর্দ্ধে ছ'শো টাকা 'উপজ্জোন' করে, তবু ত সে 'ছাত্তোরবিত্তি' ফেল। ঝাঁটা মার চাষের মুখে।"

ছেলেকে "চাকুরে" করিবার উচ্চাভিলাষে সে রাম-যাদুকে মাজ্‌দিয়ার ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল; সেখানে সে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত; কিন্তু লিখাপড়ায় তাহার অনুরাগ ছিল না। সে অতি কষ্টে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সেই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে সে বাড়ী যাওয়ার পর তাহার মাতা হঠাৎ কলেরায় প্রাণত্যাগ করিলেন; তখন তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন, "আর তোকে বিদ্যে শিখ্‌তে বিদেশে যেতে হবে না, বাবা! আমার সংসারের বাঁধন আল্‌গা

হয়ে গিয়েছে; তুই কাছে না থাক্‌লে কা'র মুখ দেখে সংসারে থাক্‌ব?—তোর দিদি ত তা'র নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত।—তবু তুই কাছে থাক্‌লে মনে একটু শান্তি পাব। চাষ-আবাদে যে দশ কাঠা 'খন্দকুটো' পাই, দুটো প্রাণীর তাতেই এক রকম ক'রে চ'লে যাবে।"

কিন্তু পত্নীশোকসন্তপ্ত বৃদ্ধকে আর অধিক দিন চাষ-আবাদ করিতে হইল না; পত্নী-বিয়োগের পর ছয় মাস না কাটিতেই রক্ত আমাশয়ে ভুগিয়া সে পরলোকে পত্নীর অনুসরণ করিল। লাঙ্গল, গরু ও চাষের জমী পড়িয়া রহিল।

এই ঘটনার পর সুদীর্ঘ পনের বৎসর অতীত হইয়াছে।

২

রামযাদু তিন বৎসর তাহার ভগিনীপতির দোকানে থাকিয়া ব্যবসায়কর্ম্মে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। সে সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী এবং খদ্দেরের মনোরঞ্জনে সুদক্ষ; তিন বৎসর সে ভগিনীপতির দোকান চালাইয়া দোকানের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। ছোট ভাইটির বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিবার জন্য ক্ষেত্রমণির আগ্রহ হইল। ধনঞ্জয় উদ্যোগী হইয়া তাহার কোন আত্মীয়া একটি দরিদ্রা বিধবার সুন্দরী ও সুশীলা কন্যার সহিত রামযাদুর বিবাহ দিল। ধনঞ্জয়ের ইচ্ছা ছিল, দোকানের প্রধান কার্য্যকারকের পদে নিযুক্ত করিয়া রামযাদুকে স্থায়িভাবে কলিকাতায় রাখে; কিন্তু রামযাদু এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। বাপের ভিটায় সাঁজের "পিদিম" জ্বলিবে না—ক্ষেত্রমণিও ইহা সঙ্গত মনে করিল না। ভাই-ভগিনীতে যখন অভিন্নমতাবলম্বী হইল—তখন অগত্যা ধনঞ্জয়কে হা'ল ছাড়িয়া দিতে হইল।—রামযাদু কলিকাতার ব্যবসায়ী সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিল; সে ভগিনীর নিকট কিছু টাকা লইয়া কতকগুলি পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিল, দেনাতেও কতক জিনিষ পাইল,—ধনঞ্জয়ের শ্যালকের নিকট টাকা মারা যাইবার আশঙ্কা ছিল না। অতঃপর রামযাদু পৈতৃক ভিটায় ফিরিয়া আসিল, এবং গ্রামের বাজারে মুদীখানার দোকান খুলিয়া বসিল।

কয়েক বৎসর ভগিনীপতির দোকানে কায করিয়া ব্যবসায়কার্য্যে রামযাদু যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা এ সময় তাহার খুব কাযে লাগিল। সে গ্রামে আসিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তাহাকে তেমন কোন অসুবিধা সহ্য করিতে হইল না। কিন্তু দোকানখানি খড়ের ঘর বলিয়া, অগ্নিকাণ্ডে কখন্ তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়—এই আশঙ্কায় সে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিত। বিশেষতঃ, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অগ্নিকাণ্ডে আকন্দতলার বাজারের সমস্ত খড়ের দোকান ভস্মীভূত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে অগ্নিভয় অত্যন্ত প্রবল; কখন কখন কোন গৃহস্থের রান্নাঘরে বা গো-শালায় আগুন লাগিয়া সমগ্র গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পাঁচ ছয় বৎসর ব্যবসায় করিয়া ও যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে সংসার চালাইয়া সে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা দিয়া দোকানঘরখানি "পাকা" করিল।

কিন্তু ইহাতেও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, এক দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে না করিতে আর একটা দায় তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। কন্যাদায় হিন্দু-গৃহস্থের বড় বিষম দায়। রামযাদুর কন্যা নয়নতারার বয়স দশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই দুশ্চিন্তায় তাহার স্ত্রী মোক্ষদার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া গেল, এবং কিরূপে এই দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিবে -তাহা স্থির করিতে না পারিয়া রামযাদু ভাবিয়া ভাবিয়া কাহিল হইয়া পড়িল।

নয়নতারার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া স্বামিস্ত্রীর মধ্যে মতভেদ হওয়ায় উভয়ের মানসিক অশান্তি আরও বাড়িয়া উঠিল। রামযাদুর ইচ্ছা, কোন ব্যবসায়ীর পুত্রের সহিত প্রাণাধিকা কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করে; সে সেরূপ দুই একটি পাত্রের সন্ধানও পাইয়াছিল, তাহারা সকলেই তাহার মত দোকানদার; কিন্তু দোকানদারের ঘরে মেয়ের বিবাহ দিতে মোক্ষদার ঘোর আপত্তি। মোক্ষদার এক মামা ডাক্তার; আর এক মামা দোকান-দার; সে বাল্যকালে যখন মামার বাড়ী যাইত, সেই সময় দেখিত—চাল-চলন, রুচি, প্রবৃত্তি, জীবনযাপনের প্রণালী প্রভৃতি সকল বিষয়েই দুই মামার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ডাক্তার মামা ভাল ভাল পোষাক পরে, টমটম চড়িয়া রোগী দেখিয়া বেড়ায়, চেয়ারে

বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খায়, কত ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আইসে; কত লোক দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে তাহার জন্য পাল্কী পাঠাইয়া দেয়, আর বেহারারা তাহাকে কাঁধে লইয়া "হুঁ হুঁ হাক্‌কা—হুম্ হুম্ হাক্‌কা" শব্দে নিস্তব্ধ পল্লী প্রতিধ্বনিত করিয়া গ্রামান্তরে ধাবিত হয়। অন্যদিকে তাহার দোকানদার মামা একখান "আট হেতে" ময়লা কাপড় হাঁটুর উপর তুলিয়া, ছেঁড়া চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া, খালি পায়ে সকালে দোকানে যায়, বেলা দুইটার আগে আহার করিতে বাড়ী আসিবার অবসর পায় না!—আর সে কি আহার?—সে গেলা!—দু'মুঠো ভাত-তরকারী নাকে মুখে গুঁজিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া সে তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়ে, একটা বিশ্রী ডাবা হুঁকায় 'ভড়র ভড়র' শব্দে খানিক ধোঁয়া উড়ায়; তাহার পর একটু বিশ্রাম নাই; পান চিবাইতে চিবাইতে দোকানে দৌড়ায়। রাত্রি দশটার আগে তাহার ছুটী নাই। আর সন্ধ্যার পর তাহার ডাক্তার মামার বৈঠকখানায় কত আমোদ, গ্রামের ভদ্রলোকরা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া গল্প করে,—কোন দিন তাস, পাশা, দাবা খেলা চলে, কোন দিন বা হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়া গান আরম্ভ হয়—

"দেখ লো সজনি, চাঁদিনী রজনী,
সমুজ্জ্বল যমুনা গাহত গান!"

এই সকল কথা স্মরণ হওয়ায় মোক্ষদা তাহার স্বামীকে বলিল, "আমি প্রাণ থাক্‌তে দোকানদারের ছেলের সঙ্গে আমার নয়নার বিয়ে দেব না।"

রামযাদু মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "হাঁ, আমি এখন ডাক্তার জামাই তৈয়েরী করতে যাই! তোমার যত বিদ্‌ঘুটে ফরমাস!"

মোক্ষদা নাকের নথ ঘুরাইয়া বলিল, "জন্মের মধ্যে কম্ম ত একটা মেয়ের বিয়ে দিবা। তা একটা উজবুক ধ'রে দিলে চল্‌বে না কি? আমি কি আর বল্‌চি, ডাক্তার জামাই না হ'লেই চল্‌বে না?—আমি চাচ্ছি 'ভদ্দোর নোকের' ছেলের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিতে। কেন, আপিস-আদালতের কোন কেরাণীর বিয়ের 'যুগ্যি' ছেলে নেই? দিবে-রাত্তির দোকানে খদ্দের নিয়ে মত্ত থাক্‌বে, ভাল পাত্তরের খোঁজ কর্‌বে কখন্?"

রামযাদু বলিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি!' কুড়ি পঁচিশ টাকা মাইনের কেরাণীর ছেলে 'কম্মিষ্টী' দোকানদারের ছেলের চেয়ে ভাল হ'ল বুঝি? চাকরী ত করেন বাবুরা বিশ ত্রিশ টাকার; কিন্তু জামা জুতো আর টেরির বাহার দেখলে মনে হয়, নবাব সেরাজদ্দৌলার নাতি!—এ দিকে আফিসে 'সায়েবের' গুঁতো খেতে খেতে লবেজান! 'ভদ্দোর নোক' সাজতে গিয়ে দু'বেলা পেট ভ'রে আহার মেলে না। হাজার হলেও দোকানদারী স্বাধীন ব্যবসা। কারও 'এন্তাজারি' করতে হয় না। মা লক্ষ্মীর টাট, বজায় থাক্‌লে ভাত-কাপড়ের দুঃখু কি? আমাদের কুণ্ডু মশায় পেটভাতায় মহাভারত দে'র দোকানে খরিদ-বিক্রী করত, আর আজ পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক! কেরাণীগিরি ক'রে কটা লোক কুণ্ডু মশায়ের মত সম্পত্তি করতে পেরেছে?"

মোক্ষদা বলিল, "তা হোক্, কুণ্ডু মশায়কে কেউ 'ধনা কুণ্ডু' ছাড়া ধনঞ্জয় বাবু বলে না। কোন বড় মানষের বাড়ী তাগাদায় গেলে চাকরে বাবুকে বলে, উঠোনদার মুদী তাগাদায় এসেছে। বাবুর সামনে গেলে বাবু বস্‌তেও বলে না। আর কুড়ি টাকার কোন চাক্‌রে বাবু সেই বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলে তা'র কত খাতির! বাবু কাছে বসিয়ে তামুক খাওয়ায়, কত গল্প করে। তোমাদের দোকানদারদের আবার মান!"

রামযাদু বলিল, "এই দোকানদারী করেই ইংরেজ জাতের এত মান। দোকানদারীর জোরেই আজ তা'রা এ দেশের রাজা। আমি যদি দোকানদারী না শিখে কেরাণীগিরি শিখতাম, তা হ'লে আজ আমার বাপদাদার ভিটেয় আলো জ্বলতো না; গোলামী ক'রে দু'বেলা হয় ত পেটের ভাতও জুটতো না। দোকানদারের পরিবার হয়ে দোকানদারের ছেলেব কথা শুনে নাক সিটকোচ্ছ?"

মোক্ষদা বলিল, "তা তুমি যা-ই বল, দোকানদারের ঘরে আমি এ কায করবো না, করবো না, করবো না।"

৩

পর্ব্বত মহম্মদের কাছে না যাওয়ায় মহম্মদকেই পর্ব্বতের কাছে আসিতে হইল! রামযাদু স্ত্রীর মতপরিবর্ত্তন করাইতে না পারায়, তাহাকেই স্ত্রীর মতাবলম্বী হইতে

হইল। সে দুই তিনটি কেরাণীর ছেলের সন্ধান পাইয়াছিল, কোন কোন ছেলে দুই একটা পাশও করিয়াছিল, কিন্তু রামযাদু তাহাদের আঁচ দেখিয়া কাছে ঘেঁসিতে সাহস করে নাই। দুই হাজার টাকার কমে কেহ কথা কহে নাই! কেহ বলিয়াছিল, "দোকানদারের মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে? বেয়াই ব'লে যা'র পরিচয় দিতে পার্ব না, তা'র সঙ্গে কায করি কি ক'রে? কোন 'ফ্রেণ্ড' যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার বেই কি করেন হা!' তা হ'লে মুখ চুলকিয়ে বল্‌তে হবে—'তেল-মুণ ব্যাচেন।' হা—হা—হি—হি!"

রামযাদু এক দিন রাগ করিয়া একটি পাত্রের সন্ধানে শান্তিপুরে গিয়াছিল। তাহার একটি আত্মীয় তাহার দূত হইয়া এক জন কেরাণীর নিকট উমেদারী করিতে গিয়াছিল। সে কেরাণী বাবুর নিকট এই উত্তর পাইয়াছিল।

রামযাদু আত্মীয়ের কাছে সকল কথা শুনিয়া বড় অপমান বোধ করিল, কিন্তু অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তাহার সেই আত্মীয় হরিতারণ বিশ্বাসকে বলিল, "হরিদা, আজ সন্ধ্যের পর আমাকে একবার সেই কেরাণী মশায়ের কাছে নিয়ে চল।"

হরিতারণ দারুণ বিস্ময়ে রামযাদুর মুখের দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, সে ভাল হ'বে না। এ রকম অপমানের পর আবার তা'র পায়ে তেল দিতে যাবে? বাবু ত জবাবই দিয়েছে, এ বিয়ে হ'বে না। তা তোমার মেয়েটি পরমা সুন্দরী, তা'র কি বর মিলবে না ঠাউরেছ?"

রামযাদু হাসিয়া বলিল, "তা অত বড় মানী 'ব্যক্তি' তিনি, কেরাণীগিরি ক'রে শালিয়ানা সাড়ে তিনশো টাকা রোজগার করেন, তিনি আমাদের মত কীটস্য কীটকে যদিস্যাৎ তাচ্ছীল্য ক'রে দুই একটা বিছুট কথাই বলেন, তা সহি না করলে চল্‌বে কেন? না, দাদা, আমাকে নিয়ে যেতেই হ'বে। ভয় নেই, আমি তাঁ'র লেজে তেল দিতে যা'ব না, তোমার বিশ্বেস না, হয় তেলের কেঁড়েটা বৌদিদির কাছে রেখে গেলেই চল্‌বে।"

রামযাদুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া হরিতারণ তাহাকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত কেরাণী জগবন্ধু সাহার গৃহে উপস্থিত হইল। জগবন্ধু সাহা মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে কলিকাতায় ম্যাক্‌লীন কোম্পানীর আফিসে কেরাণীগিরি করিত। আট টাকা খরচ করিয়া, মেডিকেল সার্টি-ফিকেট দিয়া ছুটী লইয়া তখন বাড়ী আসিয়াছিল; কারণ, একটা মামলার তদ্বির না করিলে অনেকগুলি টাকা মাঠে মারা যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

জগবন্ধু সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া আসিয়া, তাহার বাহিরের ঘরের ফরাসে বসিয়া কলিকাটি হুঁকার মাথায় স্থাপন করিয়াছে মাত্র—এমন সময় রামযাদু হরিতারণের সঙ্গে জগবন্ধুর সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিল।

হুঁকা হাতে লইয়া নমস্কার করিতে নাই; এ জন্য জগবন্ধু প্রত্যভিবাদন না করিয়া, হুঁকা টানিতে টানিতে বক্র দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর হরিতারণকে লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "আসুন, বসুন।" সে যেন রামযাদুকে দেখিতেই পাইল না।—হরিতারণ স্থানীয় কোন ঠিকাদারের সরকারী করিত, এ জন্য চাকুরে হিসাবে হরিতারণকে সে বাক্যালাপের অযোগ্য মনে করিত না।

হরিতারণ ফরাসের এক প্রান্তে বসিয়া বলিল, "ইনি আমার আত্মীয় রামযাদু পাল। এঁরই মেয়ের কথা ও বেলা আপনাকে বলেছিলাম; মেয়েটি পরমা সুন্দরী, আর উনিও অতি সজ্জন। আপনার বড় ছেলের বিয়ে হাল্‌-ফিল্‌ দেবেন শুনে আপনার কাছেই এসেছিলেন—"

জগবন্ধু কেরাণী মুখ তুলিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া এরূপ মুখভঙ্গী করিল, যেন হরিতারণের কথাগুলা সে তাহার মুখনিঃসৃত ধোঁয়ার সঙ্গেই উড়াইয়া দিয়াছে!

জগবন্ধু হুঁকাটা হরিতারণের হাতে দিয়া বলিল, "তা" ও বেলাই ত আপনাকে সে কথার জবাব দিয়েছি। এখন তাড়াতাড়ি আমার ছেলের বিয়ে দিচ্ছিনে, আমার ত আর কন্যেদায় নয়। তা ছাড়া, ওঁর সাক্ষেতে বলা হয় ত সঙ্গত হ'বে না—আমরা যে সমাজের লোক, যাঁদের সঙ্গে আমাদের কাঁধে মেলে—তাঁদের সঙ্গেই কাযকর্ম্ম করা সঙ্গত, অন্ততঃ বন্ধুবান্ধবকে বুক ফুলিয়ে বল্‌তে পারি অমুক—"

রামযাদু অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলিল—"অমুক কেরাণী বাবুর শালা আমারই ছেলে!"

জগবন্ধু রাগ করিয়া বলিল, "তুমি ত বড় ফাজিল লোক, মশায়!"

রামযাদু বলিল, "আজ্ঞে, কিঞ্চিৎ ফাজিল বটে, কিন্তু অসভ্য নই।—আপনার ছেলেটির সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করবার জন্য হরিতারণ দাদাকে অনুরোধ করেছিলাম; উনিও আপনার কাছে উমেদারী করতে এসেছিলেন, তা আমাকে বলেছেন।"

জগবন্ধু সা বলিল, "হাঁ, ওঁকে ত আমি জবাব দিয়েছি। তবে আবার কি জন্যে আসা হ'ল ?"

রামযাদু বলিল, "আপনি 'সায়েবদের' আফিসে কেরাণী-গিরি করেন, এই জন্যে ভদ্দোর লোক, আর আমি দোকান করি, এই জন্যে আমি ইতর চাষা। আপনার সঙ্গে আমার কুটুম্বিতে করা সাজে না। কিন্তু না সাজবার আরও একটু কারণ আছে, সেই কারণটা আপনি ভুলে গিয়েছেন, তাই স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি। উঠতে বসতে উপর-ওয়ালার কানমলা খেতে খেতে যাঁদের কানে কড়া প'ড়ে গিয়েছে, তাঁ'রা কি ক'রে আমার মত স্বাধীন ব্যবসাদারের সঙ্গে কুটুম্বিতে করেন, তাঁ'দের মানসম্ভ্রমই বা কি ক'রে তা'তে বজায় থাক্‌বে, এ কথা আপনি কেন বলেন নি, তা বুঝতে পারি নি। যা হোক, আপনি কি মেক্‌দারের লোক, তা বুঝতে পেরেছি। আপনি জন্ম জন্ম পরের গোলামীই করুন। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে আমি রাজী নই। হরিতারণ দা, ওঠ, আমার কথা শেষ হয়েছে।"

রামযাদু হরিতারণকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। সাহাজী গরম হইয়া খুব জোরে জোরে তামাকে দম্ দিতে লাগিল। দোকানদারের স্পর্দ্ধা দেখিয়া রাগে তাহার মুখ দিয়া ধোঁয়া ভিন্ন একটি কথাও বাহির হইল না। রামযাদু ভিন্ন গ্রামের লোক না হইলে জগবন্ধু সা তাহাকে একঘরে করিয়া রাখিবার জন্য নিশ্চয়ই "দশঠাকুরের" দ্বারস্থ হইত, এবং তাহাদিগকে লইয়া বাড়ীতে বৈঠক বসাইয়া দশ ছিলিম তামাক পুড়াইতেও কুণ্ঠিত হইত না।

৪

রামযাদু নানা স্থানে চেষ্টা করিয়াও মেয়ের বিবাহ দিতে পারিল না। নয়নতারার বয়স বারো বৎসর পার হইয়া গেল। এত বড় মেয়ে ঘরে রাখায় পাড়াপড়শীরা সকলেই তাহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী-গণের গঞ্জনার ভয়ে মোক্ষদাকে ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া বন্ধ করিতে হইল; কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই! তাহার প্রতিবেশিনী বর্ষীয়সী গৃহিণীরা কেহ এক হাতা আগুন লইতে, কেহ "ঘরে চাল বাড়ন্ত" বলিয়া এক পালি চাল, কেহ বা তরিতরকারীর অভাবে এক গোছা পুঁইয়ের ডাঁটা ও গোটাকত কুমড়োবড়ী সংগ্রহ করিতে মোক্ষদার ঘরে আসিয়া বসিত এবং এত বড় ধাড়ী মেয়ে ঘরে আই-বুড়ো রাখিয়া সে কিরূপে অন্নের গ্রাস গলাধঃকরণ করি-তেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, যে সকল শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিত, তাহা হইতে পরিত্রাণলাভের সে কোন উপায় খুঁজিয়া পাইত না। মোক্ষদা দিন দিন অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। নয়নতারার বয়স হইয়াছিল, সে সকলই বুঝিতে পারিত এবং প্রতিবেশিনীদের গঞ্জনায় তাহার পিতা-মাতা কি মনঃপীড়া সহ্য করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে লুকাইয়া লুকাইয়া কান্দিত। কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া পুড়িয়া মরিবার রেওয়াজ এ দেশের অনূঢ়া বালিকাসমাজে তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

যাহা হউক, রামযাদু নিরুপায় হইয়া অবশেষে তাহার ভগিনীপতি ধনঞ্জয় কুণ্ডুর শরণাপন্ন হইল। ধনঞ্জয় সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, তাহার আত্মীয় নরহরি দে পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য সুন্দরী মেয়ে খুঁজিতেছেন। নদীয়া জিলার আঁধারমাণিক গ্রামে নরহরির নিবাস। তিনি পাবনায় মোক্তারী করিতেন। তিনি অনেকগুলি জমীদারের আমমোক্তারও ছিলেন। অনেক দিন মোক্তারী করিয়া নানা কৌশলে তিনি বেশ গুছাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ছেলে পাবনা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে পড়িত। বাপের একই ছেলে, এ জন্য তাড়াতাড়ি তাহার বিবাহ দিতে নরহরির ও তস্য পত্নী রাইরঙ্গিণীর অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল।

নরহরি ধনঞ্জয়ের অনুরোধে রামযাদুর মেয়েটিকে দেখিতে সম্মত হইলেও তিনি রামনগর ষ্টেশনে নামিয়া গরুর গাড়ীতে তিন ক্রোশ যাইতে হইবে শুনিয়া বাঁকিয়া বসিলেন; মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ওরে বাপ রে, গরুর গাড়ীতে তিন কোশ পাড়ি দিতে হ'বে? আমার হাড়ে তা বরদাস্ত হ'বে না। আকন্দতলায় গিয়ে আমি মেয়ে দেখতে পারব না।"

ধনঞ্জয় নরহরি মোক্তারের কথায় বিস্মিত হইল;

সে জানিত, আঁধারমাণিক ভেড়ামারা ষ্টেশনের বারো ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। পূজার ছুটীতে বা কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে নরহরিকে কার্য্যস্থল পাবনা হইতে বাড়ী যাইতে হইলে তিনি অম্লানবদনে গরুর গাড়ীতে চাপিয়া এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেন; গরুর গাড়ীর সেই ঝাঁকুনী তাঁহার হাড়ে বিলক্ষণ বরদাস্ত হইত। কিন্তু মেয়ের পিসে হইয়া ছেলের বাপকে তাহার মুখের মত জবাব দিলে মেয়ের বিবাহ হয় না; এই জন্য ধনঞ্জয় কুণ্ডু নরহরি মোক্তারকে লিখিল, যদি তিনি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া "সাবকাশমত" কলিকাতায় আইসেন, তাহা হইলে সে তাহার শ্যালক-কন্যাকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া তাঁহাকে দেখাইতে পারে। নরহরি এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে রামযাদু কয়েক দিনের জন্য দোকানপাট বন্ধ করিয়া নয়নতারাকে কলিকাতায় লইয়া গেল।

মহরম উপলক্ষে কয়েক দিন আদালত বন্ধ ছিল; সেই সুযোগে নরহরি মোক্তার কলিকাতায় আসিয়া নয়নতারাকে দেখিলেন। নয়নতারার চেহারায় কোন খুঁত ছিল না, সকলেই তাহার রূপের প্রশংসা করিত। তাহাকে দেখিয়া নরহরির পছন্দ হইল। তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন, "হাঁ, চল্‌তে পারে। দেখ, ধনঞ্জয়, এক হিসাবে আমরাও ব্যবসাদার মানুষ, কিন্তু আমাদের পেশা হচ্ছে 'রেস্পেক্টেবল প্রোফেসন্'—অর্থাৎ বাঙ্গালায় যা'কে বলে সম্ভ্রান্ত ব্যবসা; তিন পয়সার নুণ আর পাঁচ পয়সার তেল বিক্রী করাকে আমরা তেমন সম্মানের কায মনে করি নে, কাযেই আমার ইচ্ছে ছিল—কোন ডেপুটী, সেফ, কি উকীল, ডাক্তার বা ইনজিনিয়রের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিই।—কিন্তু তত খোঁজাখুঁজি ক'রে উঠতে পারছিনে; বিশেষতঃ মেয়েটি যখন অচল নয়, তখন তেল-নুণ-বেচা দোকানদারের মেয়ে ব'লে তোমার প্রস্তাবে অসম্মত হ'ব, আমার এ রকম 'প্রেজুডিস্' অর্থাৎ কি না কুসংস্কার নেই; আর আমাদের হিন্দু আইনের প্রধান 'অথরিটী' মনুই ত লিখে গিয়েছেন, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' অর্থাৎ কি না, মেয়ের বাপ সামান্য লোক হলেও, তা'র মেয়েটি যদি ভাল হয়, তবে তা'কে গ্রহণ করা চলে। কিন্তু তুমি, বোধ করি, জান না, জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর আমার শ্রদ্ধা-বিশ্বাস খুব বেশী। পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র জ্যোতিষার্ণব বিদ্যাবাচস্পতি মশায় এই কল্‌কাতাতেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা করেন; তিনি এক জন উঁচুদরের তান্ত্রিক, সিদ্ধ পুরুষ; তিনি অমাবস্যার রাতে কালীঘাটে কেওড়াতলার শ্মশানে ব'সে মা কালীর পূজা করেন;—তখন শ্যামবাজারের পোলের ওপার থেকে তাঁ'র ভক্তিপূর্ণ 'মা মা' ধ্বনি শুন্‌তে পাওয়া যায়, আর দলে দলে শ্যাল তাঁ'কে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁ'র হাত থেকে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে! পাবনা জিলায় তিনি বিয়ে করেছেন, সেই সূত্রে তাঁ'র সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ জানা-শুনা আছে। আমার ছেলের ঠিকুজীখানাও তিনিই তৈয়েরী ক'রে দিয়েছিলেন। মেয়ের ঠিকুজীখানা তাঁ'কে একবার দেখাতে চাই; তিনি ছেলে-মেয়ের কোষ্ঠীবিচার ক'রে যদি মত দেন—তা হ'লে এ বিয়েতে আপত্তি হ'বে ব'লে ত মনে হয় না।"

নয়নতারার ঠিকুজী ছিল। নরহরি মোক্তার জ্যোতিষার্ণবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সেই ঠিকুজী দিয়া আসিলেন এবং পাবনায় ফিরিয়া গিয়া তাঁহার পুত্রের ঠিকুজীও তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। রামযাদু নয়নতারাকে লইয়া বাড়ী ফিরিল এবং জ্যোতিষার্ণবের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিল।

রামযাদুর স্ত্রী মোক্ষদা প্রত্যহ একবার তাহার গৃহ-প্রান্তবর্ত্তী কুলুইচণ্ডীতলায় গিয়া গলায় আঁচল দিয়া কুল-গাছের শাণ-বাঁধান বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া বলিত, "মা কুলুইচণ্ডী, মোক্তার বাবুর ছেলের সঙ্গে আমার নয়নার বিয়েটা দিয়ে দাও, জোড়া ঢাক দিয়ে তোমার পূজো দেব মা! দোহাই তোমার, আমার মেয়ে যেন দোকান-দারের ঘরে না পড়ে।"

৫

মাসখানেক পরে নরহরি মোক্তার পাবনা হইতে কলিকাতায় ধনঞ্জয় কুণ্ডুকে লিখিলেন. "ঠিকুজী মিল হইয়াছে, বিবাহে বাধা নাই; কিন্তু জ্যোতিষার্ণব মহাশয় লিখিয়াছেন, তিন মাসের মধ্যেই মেয়েটির একটা সাংঘাতিক ফাঁড়া আছে। সেই ফাঁড়া কর্ত্তন না করিয়া আমার ছেলের সঙ্গে এ মেয়ের বিবাহ দিলে শুভ হইবে না। গ্রহশান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদির জন্য জ্যোতিষার্ণব মহাশয়কে পূজার খরচ ও প্রণামী বাবদ পঞ্চাশ টাকা

পাঠাইতে হইবে; তদ্ভিন্ন মেয়েটিকে মন্ত্রপূত একটি সোনার কবচ ধারণ করিতে হইবে। পাঁচ ভরি গিনি সোনার একগাছা হার প্রস্তুত করাইয়া তাহাতেই কবচখানি ব্যবহার করিতে হইবে। কবচখানি দুই ভরি সোনায় প্রস্তুত করাইলেই চলিবে। অতএব যদি আমার পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ হার ও কবচ প্রস্তুত করাইয়া তাহা ও নগদ পঞ্চাশ টাকা শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবে। তাহার পর শুভকার্য্য সম্বন্ধে অন্যান্য কথা স্থির করা যাইবে।"

ধনঞ্জয় কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া নরহরি মোক্তারের পত্রখানি রামযাদুর নিকট পাঠাইয়া দিল।

রামযাদু পত্র পড়িয়া বিমর্ষভাবে বলিল, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! কোথায় বিয়ে, তা'র ঠিক নেই, এক কথায় আড়াই শো টাকার ধাক্কায় ফেলে দিল!"

সকল কথা শুনিয়া মোক্ষদা বলিল, "সাত নয় পাঁচ নয়—ঐ একটা মেয়ে! তা'র যা'তে ভাল হয়, তা করতে হ'বে না? টাকা নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? অত বড় ফাঁড়া, আড়াই শো টাকা খরচ না করলে সে ফাঁড়া কাট্‌বে কি ক'রে? হার আর সোনার কবচ ত তোমার মেয়েরই থাক্‌বে; ঠাকুর ত তা নিজে নিচ্ছেন না। না, তুমি আর অমত ক'র না। মোক্তার মশায় যা লিখেচেন, তা করতেই হ'বে। এ ছেলে কিছুতেই হাত-ছাড়া করা হ'বে না। তুমি টাকা না দাও, আমার 'নেকলেস্‌' ভেঙ্গে হার আর কবচ তৈয়েরী করতে দেব।"

রামযাদুকে অগত্যা সূচনাতেই আড়াই শত টাকা ব্যয় করিতে হইল। সে পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র মুদীখানার দোকান করিয়া অতি কষ্টে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল। দোকানখানি পূর্ব্বেই পাকা করিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা ছিল, আর কিছু জমিলে সে লাখ থাকেন ইট পোড়াইয়া পিতৃ-ভিটায় একখানি "দালান" দিবে। কিন্তু মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পূর্ব্বেই খরচের বহর দেখিয়া সে বড়ই দমিয়া গেল; হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, দেখছি, এই মেয়ের বিয়েতেই আমাকে ফতুর হ'তে হ'বে। দোকানঘরখানা বাঁধা দেওয়ার জন্যে শেষে 'মহামহিম' লিখতে না হয়!"

অবশেষে রামযাদুর এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। নরহরি মোক্তার কন্যার অলঙ্কার, বরাভরণ ও দানসামগ্রীর যে ফর্দ্দ দিলেন, তাহা দেখিয়াই রামযাদুর চক্ষু স্থির! তাহার উপর আর এক উপসর্গ।—নরহরি লিখিলেন, সহরের বিস্তর ভদ্রলোক উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, এমন কি, "হাকিমান" পর্য্যন্ত বরযাত্রী হইবেন, সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে লইয়া যাইবেন?—সকলকেই লইয়া যাইতে হইবে। তাঁহারা গরুর গাড়ীতে আকন্দতলায় যাইবেন না; সুতরাং পাত্রী কলিকাতায় লইয়া গিয়া বিবাহ দিতে হইবে এবং বর-যাত্রীদের পাথেয় তিন শত টাকা রামযাদুকেই বহন করিতে হইবে।

রামযাদু তাহার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা বলিলে মোক্তার বাবু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তখনই জানি, এ কায তুমি পেরে উঠবে না। উকীল-মোক্তারের সঙ্গে কুটুম্বিতে করতে হ'লে কিঞ্চিৎ ব্যয়ভূষণ করতে হয়; তেল-নুণ বিক্রীর পয়সায় কি হাতী কেনা যায়? তুমি যে মেক্‌দারের লোক—সেই রকম একটা ভ্যাড়া কিন্‌লেই পার্‌তে। তা অসাধ্য হয়, এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও। আমারও যেমন কায ছিল না, ধনঞ্জয়ের ধাপ্পায় প'ড়ে সম্বন্ধ করতে গেলাম তোমার মেয়ের সঙ্গে! ছিপ্নি দেখে অনেক দূর এগিয়েছ, এখন কোঁৎকা দেখে পেছুলে চল্‌বে কেন, পালজী!"

কলিকাতায় ধনঞ্জয়ের বাসায় বসিয়া এই সকল দর-দস্তুর চলিতেছিল। রামযাদু কয়েক দিনের সময় লইয়া বাড়ী আসিল। সে তাহার স্ত্রীকে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্যের কথা বলিলে মোক্ষদা বলিল, "তুমি মুড়ীর দর দিয়ে মিছরী কিন্‌তে চাও—তা কি কখনও হয়? না হয় কিছু দেনা হ'বে—তা ব'লে উপায় কি? এ বিয়ে আমি দেবই। নরহরি মোক্তারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া কত বড় ভাগ্যির কথা! নয়নার আমার যদি জন্মান্তরের 'তপিস্যে' থাকে—তবেই ও ঘরে পড়বে। এ ত কন্যেদায়ে উদ্ধার হওয়া নয়, কাশীতে মন্দির পিদিষ্টে!"

রামযাদু অবশেষে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কাশীতে "মন্দির প্রতিষ্ঠা" করিল। সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া, পনের দিনের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া নরহরি

মোক্তারের পুত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিল। সে চতুর্ভুজ হইল কি না বলা যায় না, তবে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে গিয়া তাহার সঞ্চিত অর্থ সমস্তই নিঃশেষিত হইল; তাহার জের দোকান-ঘরখানিও হাজার টাকায় বন্ধক দিতে হইল!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নরহরি মোক্তার অর্থোপার্জ্জনের নানা রকম ফন্দী-ফিকির জানিতেন। তাঁহার বন্ধুগণ উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, মুন্সেফ, ডেপুটী, এমন কি, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত বরযাত্রী হইবেন বলিয়া তিনি তাঁহাদের পাথেয় বাবদ নগদ তিন শত টাকা লগ্নপত্রের দিন রামযাদুর নিকট আদায় করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মস্থান পাবনা বা তাঁহার স্বগ্রাম আঁধারমাণিক হইতে নাপিত, পুরোহিত ভিন্ন অন্য বরযাত্রী নিতান্ত আত্মীয় দুই এক জন মাত্র কলিকাতায় আসিল। কলিকাতায় তাঁহার পরিচিত দশ পনের জন ভদ্রলোক "বিবাহে যোগদান করত সৌষ্ঠব সম্পাদন" করিলেন। তবে বিবাহের রাত্রিতে বরপক্ষ হইতে সাত রকমের সাতখানি "প্রীতি-উপহার" বিতরিত হইল বটে! ডেপুটী সদানন্দ বাবুই বিবাহের রাত্রিতে নরহরি মোক্তারের মুখ রক্ষা করিলেন। নরহরি তাঁহার এজলাসে মোক্তারী করিতেন, তিনি এই সময় তাঁহার পীড়িতা পত্নীর চিকিৎসার জন্য কয়েক দিনের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার দাদা হাইকোর্টের উকীল, ভবানীপুরে বাড়ী। নরহরি মোক্তারের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি ঘণ্টা-খানেকের জন্য বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং "হাকিমান" বরযাত্রী আসিবেন বলিয়া নরহরি যে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আংশিকভাবে সফল হইল।

রামযাদু সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া যে সকল অলঙ্কার ও দানসামগ্রী দিয়াছিল, তাহা খেলো বা নিন্দার যোগ্য নহে; তবে সাইকেলখানি তেমন উৎকৃষ্ট হয় নাই এবং সোনার ঘড়ীর পরিবর্ত্তে রূপার ঘড়ী দিয়াছিল। নরহরি মোক্তার ক্রোধান্ধ হইয়া বিবাহসভাতেই বৈবাহিককে "জোচ্চোর" "ফড়ে" "ইতর" প্রভৃতি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। রামযাদু কোঁচার খুঁট দিয়া নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

বিবাহের পর পুত্র ও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া নরহরি মোক্তার আঁধারমাণিকে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সুদীর্ঘ ও দুর্গম বারো ক্রোশ পথ সনাতন গরুর গাড়ীতে পাড়ি দিতে তাঁহার একটুও কষ্ট হইল না; দেহের সমুদয় "হাড়ই আস্ত" রহিল। তাঁহার পুত্রবধূর চাঁদমুখ দেখিয়া পল্লীবাসিনী রমণীগণ যথেষ্ট প্রশংসা করিল বটে, কিন্তু অলঙ্কারাদি ও দানসামগ্রী মনের মত না হওয়ায় নরহরি-গৃহিণী রাইরঙ্গিণী তক্ষকের মত গর্জ্জন করিতে লাগিল। "দোকানদার মিন্‌ষের ছোট নজরে"র সমালোচনা শুনিয়া নয়নতারার সঙ্গিনী ঝি মুখ ভার করিয়া ঘরের এক কোণে বসিয়া রহিল এবং নয়নতারার সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠন তাহার চোখের জলে ভিজিয়া গেল।

রাইরঙ্গিণীর, বোধ হয়, আশা ছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়া সে অর্দ্ধরাজ্য ও এক রাজকন্যা লাভ করিবে; কিন্তু সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় তাহার মনস্তাপের সীমা রহিল না। রামযাদু কন্যা-জামাতাকে যে যৌতুক দিয়াছিল, তাহা তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত; নরহরি মোক্তার অলঙ্কারাদির যে ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী দানসামগ্রী সংগ্রহ করিতে বেচারাকে তাহার দোকানখানি পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইল, ইহা শুনিয়াও রাইরঙ্গিণী তাহার স্বামীকে বলিল, "তখনই বলেছিলাম, ওখানে কায ক'রে সুখ হ'বে না, ও কায ক'র না। তা সে কথা 'গ্রাজ্জি' হ'ল না! ভাবলে, তোমারই যেন কন্নেদায়! তোমাকে 'আবোধ' পেয়ে ফড়ে দোকানদার মিন্‌ষে কি ঠকানটা ঠকিয়েছে, তা বুঝতে পারছ? মনের দুঃখে আমার গালে মুখে চড়িয়ে মর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।"

গৃহিণীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য নরহরি বলিলেন, "যা হবার হয়েছে, সে জন্যে এখন আর আক্ষেপ ক'রে ফল কি? বৌর ত কেউ নিন্দে করতে পারবে না। ও রকম রূপবতী মেয়ে এ তল্লাটে নেই। পাঁচ জন আত্মীয়কুটুম্ব এসেছে, তাদের সামনে আর ও রকম ক'রে যা তা বল না। লোক তোমারই নিন্দে করবে।"

স্বামীর কথায় গৃহিণী আগুন হইয়া বলিল, "তা নিন্দে করে করবে। সাধে কি বকুনি বেরোয়? তোমার আক্কেল দেখে 'সব্ব শরীল' জ'লে যাচ্ছে। রূপ! ভারী ত রূপ! রূপ নিয়ে আমি ধুয়ে খাব? ঝি মাগী চ'লে যাক,

আমি আর বৌকে তা'র বাপের বাড়ী যেতে দিচ্চিনে। দেখি, বজ্জাত মিন্‌ষেকে জব্দ করতে পারি কি না।"

কিন্তু গৃহিণীর এই জিদ বজায় রহিল না। নরহরি লোকনিন্দার ভয়ে নববধূকে কয়েক দিন পরে তাহার পিতৃগৃহে পাঠাইলেন বটে। তবে এক মাস পরেই তাহাকে লইয়া আসিলেন। তাহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গেল, রামযাদু এই দীর্ঘকালের মধ্যে নয়নতারাকে কতবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার আবেদন-নিবেদন, আগ্রহ, ব্যাকুলতা সকলই নিষ্ফল হইল। দুই বৎসরের মধ্যেও নয়নতারা মা-বাপের কাছে যাইতে পারিল না। মেয়ের মুখখানি দেখিবার জন্য মায়ের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত; কিন্তু নরহরি অশিক্ষিত অসভ্য দোকানদার বৈবাহিককে পত্র লিখিয়া কুশলবার্ত্তা জ্ঞাপন করাও অসম্মানের বিষয় মনে করিতেন। সামান্য দোকান-দার রামযাদু পাল তাঁহার বৈবাহিক! এ কথা স্বীকার করিতে তাঁহার লজ্জা হইত।

৬

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শরৎকাল। আশ্বিন মাসের প্রথমেই পূজা। কিন্তু সে বার বর্ষান্তে আকন্দতলা ও তাহার সন্নিহিত পল্লীসমূহে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। ভাদ্রমাসের শেষে রামযাদুর স্ত্রী মোক্ষদা জ্বরে পড়িল। জ্বর ছাড়িলে উঠিয়া খানিক কুইনাইন খায়, সংসারের কাযকর্ম্ম করে, হয় ত দুই দিন একটু ভাল থাকে, তাহার পর আবার হঠাৎ জ্বর আইসে, সর্ব্বাঙ্গে দুইটা লেপ চাপাইলেও সে কাঁপুনি থামে না! বর্ষার শেষে বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীতেই এই দৃশ্য। কে কাহার মুখের দিকে চাহিবে? অনেক পরিবারে রোগীর মুখে জল দেওয়ার লোক পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

কয়েক দিন জ্বরে ভুগিয়া মোক্ষদার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইল, শয্যাত্যাগের শক্তি রহিল না। সে নয়নতারাকে দুই বৎসর দেখিতে পায় নাই। তাহাকে আনাইয়া কয়েক দিন কাছে রাখিবার জন্য সে কত চেষ্টা করিয়াছে। রামযাদু নরহরি বাবুকে কতবার লিখিয়াছে, তিনি অনুমতি করিলে সে স্বয়ং পাবনায় যাইয়া কয়েক দিনের জন্য মেয়েটিকে লইয়া আইসে; কিন্তু বৈবাহিক মহাশয় তাহার পত্রের উত্তর দেওয়াও আবশ্যক মনে করেন নাই!

নয়নতারা তাহার মা'কে লিখিল, "মা, পূজোর ছুটীতে আমরা দেশে যাচ্ছি। বাবাকে আমার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠিয়ে দিও। বাবা নিজে এসে চেষ্টা করলে আমার শাশুড়ী কয়েক দিনের জন্যে আমাকে পাঠাতে পারেন। মা, তোমাকে বাবাকে কত দিন দেখিনি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।"

মোক্ষদা তখন উত্থানশক্তিরহিতা। রামযাদু পত্র-খানি খুলিয়া তাহাকে পড়িয়া শুনাইল; মোক্ষদা পত্র-খানি হাতে লইয়া বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া রহিল, তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "ওগো, তুমি নিজেই যাও, বেয়াই মশায় ত কোন চিঠিরই উত্তর দেন না। তুমি গিয়ে পড়লে, আর আমার এই অবস্থার কথা বল্‌লে বাছাকে আমার তোমার সঙ্গে না পাঠিয়ে থাকতে পারবে না। আহা, কত দিন তা'কে দেখিনি! তা'কে দেখতে পেলেই আমি সেরে উঠবো। আর দেরী ক'র না, কালই তুমি বেরিয়ে পড়।"

রামযাদু বলিল, "যদি পাঠায়, অদিনে ত পাঠাবে না। পূজোর মধ্যে ভাল দিন আছে কি না, পুরুত-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করি।"

পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিতে পারিল—মহালয়ার পর যে দিন ইচ্ছা সে মেয়ে আনিতে পারে। 'দুর্গাপক্ষে' মেয়ে আনিবার জন্য দিন দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

একটা ব্যাগে থান দুই কাপড়, একটি জামা ও এক-খানি গামছা পূরিয়া লইয়া রামযাদু পদব্রজে রামনগর ষ্টেশনে চলিল, এবং "সান্তাহার প্যাসেঞ্জার" ট্রেণে চাপিয়া সেই দিন অপরাহ্ণে ভেড়ামারা ষ্টেশনে নামিল। ষ্টেশনের বাহিরে কয়েকখানি গরুর গাড়ী ছিল, যাতায়াতের ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া একখানি গাড়ীতে সে বারো ক্রোশ দূর-বর্ত্তী আঁধারমাণিকে যাত্রা করিল।

ক্রোশের পর ক্রোশব্যাপী মাঠের ভিতর দিয়া জিলা বোর্ডের সুদীর্ঘ পথ প্রসারিত; বর্ষার অবিরল ধারাপাতে পথের অধিকাংশ স্থানেই এক হাঁটু কাদা। বর্ষার অব-সান হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সেই দুস্তর কর্দ্দম-রাশি শুষ্ক হয় নাই। সেই দুর্গম পথে গরুর গাড়ী অতি

মন্থর গতিতে চলিয়া পরদিন বেলা ৩ টার সময় আঁধার-মাণিকে উপস্থিত হইল। নরহরি মোক্তার গ্রামের প্রধান লোক, তাঁহার বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইল না। বাড়ীর সম্মুখে একটা বকুলগাছের তলায় গাড়ী রাখিয়া রামযাদু ব্যাগটি হাতে লইয়া ভয়ে ভয়ে তাহার বৈবাহিকের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

নরহরি বাবু তিন চারি দিন পূর্ব্বে পাবনা হইতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। তিনি মধ্যাহ্নভোজনের পর শয়ন করিয়া একখানি মাসিক পত্রিকায় চোখ বুলাইতে বুলাইতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন; নিদ্রাভঙ্গে গড়গড়ায় ধূমপান করিতে করিতে বারান্দায় কাহার পদশব্দ শুনিয়া তিনি আড়চোখে দ্বারের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, এক অপরিচিত মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত! হাতে ব্যাগ, মুখখানি চেনা-চেনা; কিন্তু তাহাকে কোথায় দেখিয়াছেন, হঠাৎ স্মরণ হইল না।

মোক্তার বাবু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই রামযাদু ব্যাগটা ফরাসের উপর রাখিয়া, উভয় হস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "বেয়াই মশায়, নমস্কার হই। প্রাণগতিক সব কুশল ত?"

নরহরি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, বিস্মিতভাবে বলিলেন. "আরে, বৌমার বাপ যে! হঠাৎ কি মনে ক'রে, তা বোস।—আরে কে আছিস্, বাড়ীর মধ্যে খবর দে—বৌমার বাপ এসেছে।"

রামযাদু বসিয়া পড়িয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "মা আমার আজ দু' বছর এসেছে; কতবার তা'কে নিয়ে যাবার জন্যে আকিঞ্চন করেছি, কিন্তু আপনার আদেশ পাইনি, তাই একবার তা'কে নিয়ে যা'ব ব'লে এসেছি।"

নরহরি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "নিয়ে যা'বে ব'লে এসেছ? কৈ, তা'কে পাঠাব ব'লে সম্মতি জানিয়ে তোমাকে কোন চিঠি লিখেছি, এ কথা ত স্মরণ হয় না। তা'কে নিতে এলেই আমি পাঠিয়ে দেব—এ রকম সাংঘাতিক অনুমানের কারণ কি?"

রামযাদু সকাতরে বলিল, "আজ্ঞে, অনেকবার চিঠি-চাপাটি লিখেছি, আমরা ক্ষুদ্দুর প্রাণী, কোন জবাব-টবাব পাই নি। মা আমার জন্ম-এয়স্ত্রী হয়ে এই ঘরই করুক, ভগবানের কাছে 'দিবে-রাত্তির' এই প্রার্থনাই করি। তবে তা'র মা বড়ই কাহিল, 'শয্যাগতো,' মেয়েটিকে দেখবার জন্যে বড়ই অধোয্য হয়েচে, এই জন্যেই হঠাৎ নিতে আসা।"

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! আজ মহাষষ্ঠী, কা'ল সপ্তমী পূজো, আর এই পূজোকালের দিন আমার পুত্রবধূকে তোমার সঙ্গে পাঠাব? ক্ষেপেছ না কি?"

রামযাদু বলিল, "আজ্ঞে, আমার পরিবার বড়ই কাতর, মেয়েটিকে দেখবার জন্যে ছটফট করছে; একবার দশ দিনের জন্যে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন দে মশায়! আমি আবার নিজে মাথায় ক'রে রেখে যাব।"

নরহরি বলিলেন, "নিয়ে যে যাবে, পাল্কীটাল্কী কিছু নিয়ে এসেছ? বৌমা তোমার মেয়ে, তা জানি, কিন্তু সে যে আমার পুত্রবধূ, এ কথা ভুল্লে চল্বে কেন? আমি তা'কে ছোট লোকের বৌঝির মত গরুর গাড়ীতে এই বারো কোশ নিয়ে যেতে দেব—এ রকম অন্যায় আশা করবারও তোমার সাহস হ'ল?"

রামযাদু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, হুকুম হয় ত পাল্কী করেই নিয়ে যা'ব। আমি এখানে আর কখনও আসি নি, কাকেও চিনি নে। পাল্কীর জোগাড়টা আপনাকেই ক'রে দিতে হ'বে।"

নরহরি বলিল, "সে পরে দেখা যা'বে, গরুর গাড়ীতে অনেক পথ এসেছ, হাড় কখানা যে আস্ত আছে, সে কেবল তোমাদের দোকানদারের শরীর বলেই! গরুর গাড়ীর নাম শুন্লেই আমার আতঙ্ক হয়, চড়া দূরের কথা। তা হাত-মুখ ধোও, খাওয়া-দাওয়া কর, তার পর দেখা যা'বে।"

এই সময় ঝি আসিয়া বলিল, "বৌর বাপকে মা বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেতে বল্লেন।"

রামযাদু পরিচারিকার সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিল। নয়নতারা দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহাকে দেখিবামাত্র সরিয়া আসিয়া "বাবা" বলিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল; তাহার পর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রামযাদু মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া গাঢ় স্বরে বলিল, "কেঁদো না, মা, আমি তোমার পত্র পেয়েই তোমাকে নিতে আসছি। এবার তোমাকে না নিয়ে যাচ্ছি নে, মা!"

কথাটা নয়নতারার শাশুড়ীর কর্ণে প্রবেশ করিল, সে ঝিকে ডাকিয়া সক্রোধে বলিল, "বাপকে আস্‌বার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি লেকা হয়েছে!—ঐটুকু মেয়ে, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতী!—আমার বেটার বৌ যেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে—বলা নেই, কওয়া নেই—এলেন আর নিয়ে চল্লেন। দোকানদারে 'বুদ্ধি' কি না!"

গৃহিণী রামযাদুর জলখাবারের যোগাড় করিয়া দিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, মুখ ভার করিয়া বলিল, "দোকানদার মিন্‌ষে মেয়ে নিতে এসেছে! 'কতাটতা' কিছু হয়েছে না কি? তা তুমি যা-ই বল, বছরকার দিনে আমি বৌ পাঠাচ্ছি নে!"

নরহরি বলিলেন, "ও পাগলের কথা শোন কেন? আমি পাঠাতে চেয়েছি বটে, কিন্তু আট মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচ্‌বে না। আমি বলেছি—পাল্কী-বেহারা ঠিক ক'রে নিয়ে যা'ক। এ আঁধারমাণিকে পাল্কী-বেহারা কোথায় পাবে?—বুদ্ধি থাক্‌লে কৌশলে কায উদ্ধার হয়, গিন্নি!—মোক্তারী ব্যবসা করি কি না, নানা রকম ফন্দী-ফিকির চট্ ক'রে মাথায় গজিয়ে উঠে। মক্কেলগুলো কি সাধে পয়সা দিয়ে খোসামোদ করে?"

গৃহিণী খুসী হইয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার খুব 'বুদ্দি,' কেবল ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে ঐ দোকানদার মিন্‌ষের কাছেই যা ঠ'কে এসেছ! তা আজ থাক, হাজার হোক, কুটুম্ব ত বটে, রাত্তিরে খাইয়ে দাইয়ে কা'ল এক সময় বিদেয় ক'রে দিও।"

পরদিন সকালে নরহরির আদেশে পাল্‌কী-বেহারার সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল; মোক্তার বাবু পাল্‌কীর জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন! তিন চারি ঘণ্টাকাল ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও পাল্কী বা বেহারা কিছুই মিলিল না। নরহরি বাবু আঁধারমাণিকে পাল্‌কী-বেহারা খুঁজিতেছেন শুনিয়া অনেকেই গভীর বিস্ময়ে এই কথার আলোচনা করিতে লাগিল।

নরহরি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কি করব বল? তুমি মেয়ে নিয়ে যা'বে ব'লে নিজে এসেছ, তা'র ওপর তোমার পরিবারের অসুখের কথাও বল্‌লে। এ অবস্থায় বৌমাকে পাঠাতে আমাদের অনিচ্ছে ছিল না; পাল্‌কী-বেহারার খোঁজে কি রকম হয়রাণ হওয়া গেল, তা ত তুমি দেখ্‌তে পেলে। পাল্‌কী-বেহারা না মিল্‌লে কি ক'রে বৌমার যাওয়া হয়? গরুর গাড়ীতে পাঠিয়ে আমার মানসম্ভ্রম ত নষ্ট করতে পারি নে!"

নরহরি বাবু কুটুম্বকে আহার না করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন না। রামযাদু নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত কিছু খাইয়া মেয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। নয়নতারা বাপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; রামযাদু প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; মেয়েকে সান্ত্বনাদানের জন্য একটা কথাও বলিতে পারিল না।—অবশেষে সে মাতালের মত টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কান্দিতে লাগিল।

রামযাদু মহাষ্টমীর প্রত্যূষে বাড়ী ফিরিল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে তাহার পা উঠিতেছিল না। সে ম্লানমুখে শয্যাশায়িনী পীড়িতা পত্নীর মাথার কাছে হতাশভাবে বসিয়া পড়িল, যথাসাধ্য চেষ্টায় উচ্ছ্বসিত অশ্রুরাশি দমন করিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "মা'কে আন্‌তে পারলাম না, মোক্ষ! তারা পাঠালে না।"

মোক্ষদা কোন কথা বলিল না, বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু মুদিত করিল; কিন্তু তাহার মুদিত নেত্র হইতে অশ্রুর ধারা বহিয়া শীর্ণ গাল দু'খানি প্লাবিত করিতে লাগিল। একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস তাহার মর্ম্মভেদী হাহাকার ব্যক্ত করিল।

আকাশ নির্ম্মল, সোনার মত প্রভাত-রৌদ্রের রং, শিশিরসিক্ত ঝরা ফুলে তখনও শিউলীগাছের তলা আচ্ছন্ন; পাপিয়ার দল তখনও "পিউ পিউ" স্বরে আকাশ সঙ্গীতমুখর করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল; দহিয়াল পুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া, ঘরের "মট্‌কা"য় বসিয়া শিষ দিতেছিল। এমন সময় এক জন ভিখারী রামযাদুর প্রতিবেশী মণ্ডলদের দরজায় দাঁড়াইয়া সারিঙ্গে বাজাইয়া করুণ-সুরে গাহিতে লাগিল :—

"সারা বরষ দেখি নি, মা, মা তুই আমার
কেমন ধারা,
তারা-হারা হয়ে আমার অন্ধ হ'ল
নয়নতারা!"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রাস
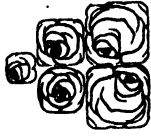
মদন-মোহনরূপে এস রাসে, রসেশ্বর!
মূরছি পড়ুক পদে ফুলধনু ফুলশর।
আজি নিশি পৌর্ণমাসী বিপিনে জ্যোছনা-হাসি
ধবল অঞ্চল যেন শ্যামাঙ্গীর অঙ্গপর;
বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে ফুল পুঞ্জে পুঞ্জে;
পবনে কুসুমবাস ভাসি' আসে নিরন্তর;
গোপীর যৌবন-প্রায় যমুনা উছলি' যায়
পুলিনে তরঙ্গ-ভঙ্গে উঠে মৃদু তর তর।
মদন-মোহনরূপে এস রাসে, রসেশ্বর।

মদন-মোহন বেশে এস রাসে, বসেশ্বর!
নিখিলের চিতচোর নবশ্যামজলধর।
অধরে মধুর হাসি পরশে মধুর বাঁশী—
উথলিত প্রেমে বাজে—রাধা! রাধা! রাধা! স্বর;
বনমালা দোলে গলে, উরে পীতধড়া-ছলে
চঞ্চলা চপলা ঝলে অচঞ্চল-কলেবর;
শিরে চূড়া শিখিপাখা, বচন অমিয়-মাখা;
চরণে কমল ফুটে কি শোভায় মনোহর!
মদন-মোহন-বেশে, এস রাসে, রসেশ্বর!

মদন-মোহন এস, হৃদি-কুঞ্জে গোপিকার;
লহ তা'র হৃদিভরা প্রেম-ভক্তি উপহার।
তোমারে লভিবে বলি' লাজ-ভয় পদে দলি'
এসেছে যে—প্রেমে কর মোহডোর ছিন্ন তা'র।
তুমি লজ্জা, তুমি মান, তুমি গোপিকার প্রাণ,
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি মোক্ষ সারাৎসার।
যে জন মুক্তির লাগি' এসেছে তোমারে মাগি'
সে কি ফিরে গৃহে আর?—গৃহ তা'র কারাগার।
তোমার চরণে ছাড়া স্থান নাই গোপিকার।

মদন-মোহন-রূপে এস, রাসে, রসেশ্বর!
স্বর্ণবর্ণ গোপীমাঝে তুমি নবজলধর—
আঁখি নাহি ফিরে আর, তৃষ্ণা নাহি মিটে তা'র,
হেম-অলঙ্কারে দীপ্ত মরকত মনোহর।
কঙ্কণ নূপুর মাঝে কনক-কিঙ্কিণী বাজে—
মিশিছে সে স্বরসঙ্গে বাদিত্রের মধুস্বর;
এলায়িত কেশরাশি পবনে চলিছে ভাসি'
চঞ্চল অঞ্চল সাথে মিশিবে ও পীতাম্বর।
পূর্ণকাম হ'বে ব্রজ লভি' তোমা, ব্রজেশ্বর।

মদন-মোহন-রূপে এস ব্রজে, ব্রজনাথ—
লহ ভক্তিপ্রিয় তুমি গোপিকার প্রণিপাত।
লহ তা'র লাজ ভয়; মোহ সে করিবে জয়;
গোপী-হৃদে রবে শুধু গোপীনাথ প্রতিভাত।
প্রেমধূপগন্ধে ভরা ভক্তিদীপে আলো করা,
হৃদয়-মন্দিরে তা'র বহিবে পুলক-বাত;
যমুনা-প্রবাহ প্রায় প্রেম-স্রোত বহি' যায়—
তরঙ্গে তরঙ্গে তা'র উঠে ঘাত-প্রতিঘাত।
মদন-মোহন-রূপে এস ব্রজে, ব্রজনাথ।

বিরহ-ব্যাকুল ব্রজে এস, ব্রজচিত্তচোর।
জীবন-বল্লভ, এস, ছিন্ন কর মোহ-ডোর।
শ্যামা, শৈব্যা, চন্দ্রাবলী, রাধা কৃষ্ণ-পদ্ম-অলি,
ললিতা, বিশাখা, ভদ্রা, পদ্মা ফেলে আঁখিলোর।
বিরহে কি এই নিশি প্রভাতে যাই'ব মিশি'—
ব্রজ-চন্দ্র বিনা হবে ব্রজের রজনী ভোর?
আজি এই পৌর্ণমাসী, এই জ্যোছনার হাসি,
ঢাকিবে কি হতাশার সীমাহীন ঘনঘোর?
গোপিকা দরশ যাচে, এস তা'র চিত্তচোর।

শারদ মধুর নিশি মেঘহীন নভস্থল;
দু'কুল চুমিয়া চলে উছল যমুনা-জল।
অধরে মধুর হাসি, বাজাও মোহন বাঁশী—
ফুটুক প্রেমের সরে গোপী-হৃদি-শতদল।
গোপীপূর্ণ বনভূমি, এস, জলধর তুমি
জড়িত তড়িতলতা শোভা পাক ঝল ঝল
তোমার প্রণয়ে বাঁধা বিশ্বপতি, বিশ্ব-রাধা,
নিখিলের গতি মুক্তি তোমার চরণতল—
তুমি ছাড়া কেবা আর দিতে পারে মোক্ষ-ফল?

দীননাথ, প্রণিপাত করে ভক্ত নিবেদন;
শুন দীন হৃদয়ের প্রার্থনা, সাধন-ধন—
অন্তিমে নয়ন যবে মরণে মুদিত হ'বে
ব্রজের রাখালরূপে দিও আসি দরশন—
বরণ জলদঘটা তাহে বিজলীর ছটা,
অধরে মুরলী-খেলা ভক্তহৃদিবিনোদন;
রাধারে লইয়া বামে দাঁড়ায়ো বঙ্কিম ঠামে;
দগ্ধ মরু স্নিগ্ধ শ্যাম হবে মোর এ জীবন—
মরণের কূলে করি ও চরণ আলিঙ্গন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

অভিসারের মূল্য

১

"দাদু ! দাদু !"

বৃদ্ধ রামতারণ মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর একটু গড়াইয়া লইয়া বাতায়নের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রাবণের আকাশ ছিদ্রশূন্য মেঘে আচ্ছন্ন। অনেকক্ষণ হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, শীঘ্র থামিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। আজ জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণ এমনই দিনে, এই তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে দিনও আকাশ এমনই মেঘমেদুর, বিজলীর দীপ্তরেখা এমনই ভাবে ঘন ঘন মেঘের বুকের উপর তীব্র হাস্য ছড়াইয়া দিতেছিল। জীবনসায়াহ্নে. আকাশের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ কি সুদূর অতীতযুগের যবনিকা তুলিয়া সেই চিরগৌরব মগ্ন দিনের কাহিনী ধ্যাননেত্রে দেখিতেছিলেন ?

প্রিয়তমা পৌত্রী আত্ম-বিস্মৃত দাদামহাশয়ের বাহু স্পর্শ করিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল, "কি ভাব্ছ তুমি, দাদু ?"

রামতারণ তাহার দিকে ফিরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "বল্ .দেখি, দিদি, কি ভাব্ছিলুম ? তুই না কি আজকাল লোকের মনের কথা বল্‌তে ভারী মজবুত হয়েছিস্ শুনছি। নাতজামাই তোর গুণের কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে আমায় পাগল ক'রে তুলেছে !"

কিশোরীর প্রফুল্ল আনন লজ্জার অরুণিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কৃত্রিম রোষভরে পিতামহের দিকে বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্টু !—আমি বল্‌ব না।"

রামতারণ প্রসন্ন হাস্যে নাতিনীকে কাছে টানিয়া আনিলেন। কাল একে একে বৃদ্ধের আর সকল স্নেহাশ্রয় চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু সংসারে একমাত্র বিপত্নীক পুত্র রাখালচন্দ্র ও তাহার একটিমাত্র কন্যা মীনুরাণী ছাড়া বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবার আর কেহ ছিল না।

মীনুরাণী স্নেহময় দাদামহাশয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রামতারণ সম্মুখস্থ মোড়াটিতে বসিয়া পড়িলেন।

বৃষ্টি আরও জোরে নামিয়া আসিল। গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি দূরদিগন্তে মিলাইবার আবকাশও পাইতেছিল না।

মীনুরাণী দাদামহাশয়ের শুভ্র কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে হাসিয়া বলিল, "তুমি কি ভাব্‌ছিলে বল্‌ব, দাদু ?"

বৃদ্ধ বাহিরের দিকে চাহিয়া অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ দেখিতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া লইয়া সহাস্যে বলিলেন, "তা আর বল্‌তে হয় না।"

কিশোরী তাহার এলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশদামে তরঙ্গ তুলিয়া, স্নেহাপ্লুত, মধুর দৃষ্টি দাদামহাশয়ের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "তুমি বর্ষার কথা—কবি কালিদাসের মেঘদূতের কথা ভাবছিলে ! বল, সত্যি কি না ?"

তরুণী মীনুরাণীর এমন অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। বৃদ্ধ রামতারণ চিরদিন সাহিত্যের ভক্ত, অনুরাগী। সকল সময়েই সে তাঁহাকে গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত দেখিয়া থাকে। দাদামহাশয়ের কাছেই সে ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত শিখিয়াছে। কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইবার পর হইতে তিনি আরও নিবিষ্টভাবে গ্রন্থরাজির মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। বড় বড় ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নের অবকাশেও সে প্রায়ই তাঁহাকে নানাপ্রকার কবিতার পুস্তক পড়িতে দেখিয়াছে। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকসমূহের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবিদিগের গ্রন্থগুলি সযত্নে স্থান পাইয়াছিল। বিশেষতঃ এ বয়সেও দাদামহাশয়কে সে কখনও কবিতাচর্চ্চায় উদাসীন দেখে নাই।

শ্রাবণের এই স্তিমিত অপরাহ্নে, নিরবচ্ছিন্ন বাদলধারার মধুর সঙ্গীতচ্ছন্দ ও মেঘগর্জ্জনের দ্রুততালে মানুষের মনে কাব্য ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা যে আসিতে পারে, মদির যৌবনের স্বপ্নসৌন্দর্য্যে নিমগ্না তরুণীর মনে সে সন্দেহের ছায়াপাত হইবার অবকাশ কোথায় ?

বিজয়গর্ব্বে মীনুরাণীর মুখে যে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, বৃদ্ধ নিমেষহীন নেত্রে তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

তরুণী আকাশের দিকে তাহার কালো চক্ষু দুইটি তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, দাদু, কবি দুটি ছত্রে বর্ষার কেমন ছবি এঁকেছেন বল ত—

"রাতদিন গুম্ গুম্ ঘন গরজন,
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!"—

"দাদামশায়, দেখুন ত কি অন্যায়!"

পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের এক সুস্থ, সবল যুবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ললাটে ভ্রূকুটি, আননে ক্ষোভের গাম্ভীর্য্য। মীনুরাণী তাড়াতাড়ি তাহার অঞ্চলের অগ্রভাগ মাথার উপর টানিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে একটা চাপা হাসি, নয়নে চঞ্চলা বিদ্যুৎ-শিখা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

"কি হয়েছে, ভাই?"

"এই দেখুন, আপনার নাত্‌নীর কীর্ত্তি!"

যুবক একখানি রুলটানা কাগজের বাঁধান খাতা খুলিয়া বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করিল। সযত্নলিখিত খাতার প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপর লাল কালীতে নানারকমের মন্তব্য দেখা গেল। "এ বর্ণনাটা বঙ্কিম বাবুর নকল", "রবি-বাবুর অক্ষম অনুকরণ এখানে সুস্পষ্ট," "বানানগুলি শুদ্ধ করিয়া লেখা উচিত", "ক্রিয়াপদকে হাতুড়ির ঘা মারিয়া ছোট করিলে ভাষা প্রাঞ্জল হয় না", "ছাই হয়েছে", ইত্যাদি মন্তব্য পড়িতে পড়িতে দাদামহাশয়ের গুম্ফশ্মশ্রু-হীন আননে হাস্যরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"বাঃ, রাণি! তুই দেখ্‌ছি মল্লিনাথ হয়ে উঠেছিস্! দাদা, তোমার ভাগ্য ভাল, তাই ঘরে এমন সমালোচক পেয়েছ।"

ত্বরিতপদে তরুণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

যুবকের মুখে ক্ষোভ ও বেদনার যে রেখাগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, দাদামহাশয়ের বিপুল হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহারা কোথায় মিলাইয়া গেল।

২

পূর্ব্বকথা এইরূপ;—

রামতারণ রায় যুক্তপ্রদেশের কোনও বড় সহরে ওকালতী করিতেন। বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া জীবিকা-র্জ্জনের জন্য প্রবাসজীবন যাপন করিতে হইয়াছিল, এ দুঃখ রায়মহাশয়ের মনে বেদনা দিত। বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনা যে সকল বাঙ্গালীর হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল, রামতারণ তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বিদেশে থাকিয়াও তিনি এ জন্য জন্মভূমিকে বিস্মৃত হয়েন নাই, মাতৃভাষার চর্চ্চায় কোনও দিন অবহেলা করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, একমাত্র পুত্র রাখালচন্দ্রকে তিনি কলিকাতায় রাখিয়া লিখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন।

পিতৃভক্ত পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় করিলেও স্ত্রী ও কন্যাকে পিতার নিকট হইতে সরাইয়া আনেন নাই। রায়মহাশয় আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের সকলেই তাঁহাকে চিনিত, রাজদরবারেও তাঁহার প্রভূত প্রতি-পত্তি ছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি কৃতী পুত্রকে সরকারে বড় চাকরী জুটাইয়া দিতে পারিতেন, নিজের কাছে রাখিয়াও আইন-ব্যবসায়ে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিতেন; কিন্তু নিজে প্রবাস-জীবনের দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, জন্মভূমির অঙ্ক হইতে নির্ব্বাসিত থাকিবার মহাক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাই পুত্রকে সে দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করা তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

পুত্রের বাসের জন্য রামতারণ কলিকাতায় শ্যামবাজার অঞ্চলে একটি বাড়ী তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। আদালত বন্ধ হইলে তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন; দেশের পল্লীভবনেও পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে যাইতেন। তিনি যে বাঙ্গালী, সে কথাটা নিজে যেমন সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতেন, পরিবারস্থ সকলকেও তাহা কায়মনে স্মরণ করাইয়া দিতেন।

মীনুরাণী এইরূপ ভাবেই দাদামহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল। অধিকাংশ সময় পশ্চিমাঞ্চলে বাস করার ফলে সে কিছু স্পষ্টবাদিনী, নির্ভীক এবং তথা-কথিত সঙ্কোচের সংস্কার হইতে মুক্ত হইলেও দাদা-মহাশয়ের জীবনের প্রভাব তাহার হৃদয়কে বঙ্গনারীসুলভ মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে পৌছিবার পর রামতারণের

সুখের সংসারে অকস্মাৎ শোকের ঝটিকা বহিয়া গেল। স্ত্রী ও পুত্রবধূ উভয়েই কয় মাসের মধ্যে ইহলোক হইতে সরিয়া গেলেন। বৃদ্ধ রামতারণ সে শোক সহ্য করিয়া আত্মস্থ হইলেন বটে, কিন্তু কর্ম্মজীবন'হইতেও সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লইলেন। ব্যাঙ্কে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত ছিল, দোকানপাট তুলিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসিলেন। মীনুরাণীর অশ্রুম্লান মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তিনি নিজের গভীর দুঃখ তরল হাস্য ও প্রফুল্লতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিতেন।

পুত্র রাখালচন্দ্র সকল রকমে পিতার মনোবৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজের প্রতিভা ও চেষ্টার ফলে হাইকোর্টে পসারও করিয়াছিলেন। বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণের জন্য যথেষ্ট যুক্তি দিতে কৃপণতা করেন নাই; কিন্তু স্বল্পভাষী রাখালচন্দ্র বন্ধুজনের সে সুপরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পত্নীবিয়োগের পর মাংসাশী রাখালচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে নিরামিষাশী হইয়াছিলেন; একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় একবারমাত্র আহার করিতেন। ভোগবিলাসের বালাই তাঁহার কোনও দিন ছিল না, বাহুল্যগুলিও ক্রমশঃ তিনি পরিত্যাগ করিলেন। পিতা ও কন্যার তৃপ্তি, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য তিনি সমগ্র মন দিয়া কর্ত্তব্যপালনে অবহিত হইলেন।

রামতারণ পুত্রের এই ব্রহ্মচর্য্যে বিস্মিত হয়েন নাই, বরং তৃপ্ত হইয়াছিলেন। রাখালচন্দ্রের দুই চারি জন বন্ধু এবং আত্মীয় বৃদ্ধের নিকট অনতিক্রান্তযৌবন পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব করিবার পর যে উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহাতে ভরসা করিয়া আর কেহ তাঁহার কাছে অগ্রসর হয় নাই।

এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে মহাত্মা গন্ধীর অমোঘ বাণী একটা নূতন জীবনের সন্ধান আনিয়া দিল। দেশবন্ধুর আত্মোৎসর্গ দেশবাসীকে চমৎকৃত করিল। দেশের জন্য কার্য্য করিবার যে প্রবল ইচ্ছা এত দিন ধরিয়া রাখালচন্দ্রের হৃদয়ে ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, অনুকূল বাতাসে সেই ধূম্রজাল হইতে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ওকালতী ত্যাগ করিলেন। রামতারণ আপত্তি করিলেন না।

কিন্তু পুত্র যখন দেশের সেবায় একেবারে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, তখন তাঁহার নির্ব্বিরোধ হৃদয় একটু শঙ্কা অনুভব করিল। রামতারণ দেশকে ভালবাসিতেন জন্মভূমির গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিবার কামনা রাখিতেন কিন্তু রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। পুত্রকে সে কথা তিনি খুলিয়া বলিলেন রাখালচন্দ্র বুঝাইয়া দিলেন, তিনি রাজনীতির সংস্পর্শে নাই। তিনি শুধু দেশের গঠনকার্য্যে মন দিয়াছেন আত্মবিস্মৃত জাতির মনে জাতীয়তার মর্য্যাদা জাগাইয়া তুলিতে হইবে, পরপ্রত্যাশী দেশবাসীকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে, আত্মকলহনিরত ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করিতে হইবে। ইহা রাজনীতি নহে—ধর্ম্মনীতি। তবে কেহ ইহাকে যদি রাজনীতির অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, রাখালচন্দ্র নিরুপায়।

রামতারণ নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু নাতিনী বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে পাত্রস্থা করা দরকার। কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা দেশসেবার বিপুল কর্ম্মোৎসাহে মাতিয়াও কন্যার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না।

যতীশচন্দ্র মেসে থাকিয়া এম্. এ. ও আইন পড়িতেছিল। দেশে বাড়ী-ঘর, কিছু জমীজমা আছে। সংসারে শুধু একমাত্র ভ্রাতা, রাজসাহীতে ব্যবসায়ে লিপ্ত। মীনুরাণীর সহিত শুভদিনে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ধনবান্ শ্বশুরের একমাত্র দুহিতা, বিদুষী তরুণীকে পাইয়া সে আপনাকে নিশ্চয় ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিল।

ঠিক শ্বশুরালয় বলিতে যাহা বুঝায়, মীনুরাণীর তাহা ছিল না। যতীশচন্দ্রের ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূকে আপাততঃ পিত্রালয়ে থাকিতেই অনুমতি দিয়াছিলেন।

মেসে আড্ডা ঠিক রাখিয়াই যতীশচন্দ্র, সময়ে অসময়ে তরুণী পত্নীর সাহচর্য্যলাভে ধন্য হইত।

৩

"না, তুমি এখন যেতে পাবে না।"

তরুণী দ্বারের সম্মুখে পথ রুদ্ধ করিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

ঘরের মধ্যে সৌদামিনীর আলোকধারা বিচ্ছুরিত হইতেছিল; সেই উজ্জ্বলালোক তরুণীর যৌবনপুষ্পিত দেহে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল।

যতীশচন্দ্র উড়ানীখানা গলদেশে বিলম্বিত করিয়া, সোনার চশমা জোড়া নাকের উপর চড়াইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ অপ্রসন্ন—ললাটে বিরক্তির রেখা। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেখ রাণি! সকল সময় ছেলেমানুষী ভাল দেখায় না! আমি এখনই যা'ব, মেসে দরকার আছে।"

তরুণী তখনও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সে বলিল, "রাত ৮টার সময় মেসে তোমার কিসের দরকার?"

"সব কথা তোমাকে বল্‌তে হ'বে?"

"এই রকমই ত মনে হয়।"

যুবক আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না। তিক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন? সে সম্বন্ধ তুমি রাখছ কই? আমি কিছু বুঝতে পারিনে মনে কর? তুমি বড় লোকের মেয়ে, ভাল লিখাপড়া শিখেছ, তায় সুন্দরী; আমায় তাই তুমি ঘৃণা কর, উপেক্ষা কর। কেন এত ঘৃণা সহ্য ক'রে আমি থাকব?"

তরুণীর হাস্যপ্রফুল্ল মুখ মুহূর্ত্তে একটু ম্লান হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে সরিয়া আসিল। যতীশচন্দ্র তখন সম্মুখের মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছিল।

"লক্ষীটি, রাগ করো না। তোমার লেখার সমালোচনা করি ব'লে তুমি আমাকে এত হীন ভাব কেন?"

যতীশচন্দ্র জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই কথাগুলির অন্তরালেও তাহার রচনার সম্বন্ধে যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের তীক্ষ্মমুখ শলাকার সমাবেশ আছে। সে তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি না হয় অক্ষম লেখক, কিন্তু তোমার স্বামী ত বটি! সে দিন দাদামহাশয়ের কাছে আমার একটা লেখা নিয়ে তুমি এমন ভঙ্গীতে পড়ছিলে যে, ছেলেমানুষেও বুঝতে পারে, তুমি আমায় কেমন তুচ্ছ কর। তা বেশ করেছ, ভালই হয়েছে।"

তরুণী একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সে আমি কেন করি—থাক্; আচ্ছা, তুমি রাগ করো না, আমায় মাপ কর।"

কিন্তু স্বামীর উদ্যত ও উত্তেজিত অভিমান এই কথায় শান্ত হইল না; যুবক বলিল, "তুমি কেন ও রকম কর, তা কি আর আমি বুঝি না? আজকালকার দিনে স্বামীকে ছোট ক'রে দেখা যে তোমাদের ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে—"

সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু দুঃখে, ক্ষোভে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। আজ তাহার একটা রচনার উপর মীনুরাণী লাল কালিতে সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছিল, "বটতলার লেখকের ভাষাও ইহার তুলনায় সাহিত্যরসে ভরা", এই কথাটাই যতীশচন্দ্রকে অতি কঠোরভাবে আহত করিয়াছিল।

যতীশচন্দ্র তাড়াতাড়ি গৃহকোণ হইতে ছড়িগাছটা সংগ্রহ করিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণী ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "আজ তুমি যেও না। বাবা কা'ল ফিরে এসে তোমাকে না দেখতে পেলে আমার উপর রাগ করবেন, আর দাদুই বা জান্‌তে পার্‌লে কি বল্‌বেন বল ত!"

ও! দাদামহাশয় কি বলিবেন, কি ভাবিবেন, পিতা শুনিয়া রাগ করিবেন!—আর কিছু নয়! শুধু চক্ষুলজ্জা? অন্য কোনও প্রেরণা নাই?

বিদ্রূপের হাস্যে যতীশচন্দ্রর অধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। দুঃখের বেদনায়, বোধ হয়, তরুণ প্রেমিকের নয়নেও দুই বিন্দু অশ্রু আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দ্রুতপদে নীচে নামিয়া সে সদর-দরজা খুলিয়া একেবারে নিঃশব্দে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। পাড়ার পথে তখন লোকজন বড় ছিল না। সে কোনও দিকে না চাহিয়া ট্রাম ধরিবার জন্য বড় রাস্তার দিকে চলিল। ট্রামের রাস্তা নিকটেই। পথিমধ্যে কাহারও সহিত তাহার দেখা হইল না। আকাশে মেঘ থম্‌থম্ করিতেছিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে সে কাহার আকর্ষণ অনুভব করিল। মুখ ফিরাইবামাত্র বিস্ময়ে তাহার প্রথমতঃ কথা ফুটিল না। তাহারই পত্নী মীনুরাণী!

"তুমি? তুমি এখানে এসেছ কেন? ছিঃ, বাড়ী যাও! লোক কি বল্‌বে?"

পথের আলোক-রেখা তরুণীর ম্লান মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয়, সদ্যোমার্জ্জিত অশ্রুরেখাও নয়ন-পল্লবে একটা দাগ রাখিয়া গিয়াছিল। যতীশচন্দ্র একটু বিচলিত হইল।

তরুণী স্বামীর হাত দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর। ফিরে এস।"

নয়ন যদি মানুষের হৃদয়ের দর্পণ হয়, তবে পত্নীর দৃষ্টিতে যতীশচন্দ্র তখন যাহা পাঠ করিল, তাহাতে অভিনয়ের ছলনামাত্র নাই। পত্নীর নয়নে এমন দৃষ্টি সে কখনও দেখে নাই। অনাবিল স্নেহ ও প্রেমের আলোক তরুণীর উদ্বেগাকুল মুখমণ্ডলকে এক অপূর্ব্ব সুষমায় অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিল।

"চল ফিরে যাই, এখনই কে দেখে ফেলবে।"

যুবক পত্নীর হাত ধরিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। লোকলোচন হইতে সে তখন পত্নীকে অনাহত রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

"এ দিক দিয়ে গেলে দাদামশাই হয় ত দেখে ফেল্‌বেন ; কি মুস্কিল !"

মীনু বলিল, "চল, এই গলিপথটা দিয়ে যাই, কলতলার পাশের দরজা ঝিকে দিয়ে খুলিয়ে নেব, দাদু তা হ'লে জান্‌তেই পারবেন না।"

রামতারণ বাবুর বাড়ীর দক্ষিণ দিয়া সদর রাস্তা, উত্তর দিক দিয়া আর একটা সরু গলি। উভয় পথ দিয়াই স্বতন্ত্রভাবে ট্রামের রাস্তায় পৌছান যায়।

গলিপথ হইলেও তাহা ইট দিয়া বাঁধান এবং করপোরেশনের আলোর বন্দোবস্তও আছে। উভয়ে দ্রুতপদে বাড়ীর ধারে আসিয়া কলতলার দিকের দরজায় কড়া নাড়িল। পুরাতন পরিচারিকা রান্নাঘরে ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিল। আলো লইয়া সে দরজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

"অত চীৎকার করিস্ নে, নারাণী, আমি মীনু। দরজা খোল।"

জামাই বাবুর সঙ্গে দিদিমণিকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মীনুরাণী দুই কথায় তাহাকে একটা কিছু বুঝাইয়া দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

৪

যে পল্লীতে রামতারণ বাবুর বাড়ী, তাহা খুব বৃহৎ নহে—রাস্তার অপর পারে একটা ছোট পার্ক। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে এই নূতন রাস্তাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। রামতারণ বাবুর বাড়ীটি নিতান্ত ছোট ছিল না। পার্শ্বের বাড়ীর রোয়াকের উপর সন্ধ্যার পর হইতে একটি যুবক বসিয়া ছিল। আকাশে মেঘ ছিল বলিয়া গুমট করিয়াছিল। বাতাসের আশায় সে বাহিরে খালি-গায় একা বসিয়া কি ভাবিতেছিল। পথের আলো রোয়াকের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

সে দেখিল, রামতারণ বাবুর বাড়ী হইতে এক জন সুসজ্জিত পুরুষ বাহির হইয়া গেল, পরক্ষণেই এক জন যুবতী তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল। যুবক কলেজে পড়ে। তাহার মস্তিষ্ক উর্ব্বর। বিশেষতঃ আধুনিক যুগের প্রেমের কবিতা, অপাঠ্য কুপাঠ্য উপন্যাসের বন্যাপ্লাবনে অবগাহন করিয়া সে পাকা হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতীচ্য জগতের পুরুষ ও নারী-সমস্যামূলক উপন্যাসের অবাস্তব অনুকরণজাত বহু বাঙ্গালা ছোট গল্প ও উপন্যাসের মদির নেশা তাহার হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেও এক ভদ্র ঘরের যুবতী কন্যা এই বাদল-সন্ধ্যায় পদব্রজে অভিসারে চলিয়াছে, ইহা মনে হইবামাত্র তাহার চিরন্তন সংস্কার গর্জ্জিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ রামতারণ ও তাঁহার পুত্র রাখালচন্দ্রের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও জানাশুনা অবশ্যই ছিল। পাড়ার যুবকগণ রাখালচন্দ্রের কর্ম্মপ্রাণতা, দেশভক্তি এবং আত্মত্যাগে মুগ্ধ ও তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ হেন রাখাল বাবুর কন্যা (অন্ধকারে ভাল চিনিতে না পারিলেও সে অনুমান করিয়াছিল, যুবতী রাখাল বাবুরই কন্যা ; কারণ, সে বাড়ীতে চাকরাণী ছাড়া অপর কোনও স্ত্রীলোক যে ছিল না, তাহা সে জানিত) কোনও দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় গৃহ ত্যাগ করিতেছে, ইহা কখনই উপেক্ষা করা চলে না।

যুবক তখনই দলে সংবাদ দিবার জন্য দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল। কিছু দূরেই একটা ক্লব ছিল। পাড়ার যুবকগণ সেখানে মিলিত হইয়া নাট্যাভিনয় প্রভৃতি করিত। ব্যায়াম, নানাবিধ খেলা এবং প্রয়োজন হইলে নানা প্রকার অনুষ্ঠানেও তাহারই অগ্রণী ছিল।

ক্লবে সে দিন বেশী লোক ছিল না। পার্শ্বের পল্লীতে একটা আনন্দোৎসব উপলক্ষে অনেকে সেখানে গিয়াছিল। যুবক যখন সংবাদ দিল, তখন ক্লবঘরে ৪।৫ জন মাত্র সভ্য ছিল। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া দলপতি তখনই স্বদলের

লোকগুলিকে সংবাদ জানাইবার জন্য এক জনকে পাঠাইয়া কয় জনে মিলিয়া ট্রাম-রাস্তার দিকে চলিল।

তোড়জোড় করিতে প্রায় পনর মিনিট সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছিল। তাহারা যখন ট্রাম-রাস্তার ধারে আসিল, তখন কাহাকেও দেখা গেল না। এক জনকে মোড়ের উপর পাহারায় রাখিয়া যুবকগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে দৌড়াইয়া গেল। কিছু দূর গিয়া একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইবার আড্ডায় তাহারা পৌঁছিল। ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে তাহারা জানিতে পারিল যে, আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই আড্ডা হইতে কোনও গাড়ী বা ট্যাক্সি কেহ ভাড়া লয় নাই। দক্ষিণ দিকে যাহারা গিয়াছিল, তাহারাও সন্ধান লইয়া আসিল যে, কোনও গাড়ী বা ট্যাক্সি কোনও পুরুষ ও নারী শীঘ্র ভাড়া লয় নাই। অন্ততঃ তাহাদের বর্ণনার মত কোন পুরুষ বা নারীকে কোনও গাড়োয়ান দেখে নাই।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় যুবকদল তখন পরামর্শ আরম্ভ করিল। যদি চল্‌তি কোনও গাড়ী বা ট্যাক্‌সি করিয়া তাহারা অন্তর্হিত হইয়া থাকে, অথবা অন্যত্র হইতে পূর্ব্বাহ্নেই গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিয়া থাকে!

তাই ত! এখন উপায়? পুলিসে সংবাদ দিলে হয় না? যুবকগণ বিষম সমস্যায় পড়িল। একটা মহৎ ভাবের প্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া তাহারা প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া এত চেষ্টা করিল; কিন্তু ভদ্রকন্যাকে পাপাত্মার কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিল না? তাহারা কেমন করিয়া ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইবে?

এক জন বাতাসে ঘুষি মারিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "রাস্কেলটাকে একবার হাতের মাথায় পেতাম!"

আর এক জন বলিল, "বাঙ্গালা দেশটা হ'ল কি?"

স্যাণ্ডোর ব্যায়ামে দক্ষ যুবকটি সক্ষোভে বলিয়া উঠিল, "আমাদের চোখের উপর দিয়ে, আমাদেরই পাড়ার মেয়েকে এক বেটা নিয়ে গেল—কোন প্রতীকার করতে পারলাম না!"

আক্ষেপ ও ব্যর্থ ক্রোধ বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে পরামর্শ স্থির হইল যে, অগ্রে রামতারণ বাবুর বাড়ী যাইয়া বাড়ীর লোকজনদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিতে হইবে; তাহার পর পুলিসে গিয়াই হউক অথবা অন্য কোনও উপায়েই হউক, একটা ব্যবস্থা করা যাইবে।

দলের অন্য যুবকগণও সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিল। প্রায় ২০।২৫ জন যুবক তখন দৃঢ়পদে রামতারণ বাবুর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

৮

"মশায়, দরজা খুলুন!"

সদর দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া যুবকগণ বাহিরের ঘরের রুদ্ধ দরজায় আঘাত করিতে লাগিল। তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। বাহিরের ঘরে তখনও আলোক জ্বলিতেছিল। বৃদ্ধ রামতারণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়া থাকেন, পাড়ার যুবকরা তাহা জানিত।

বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দকে অতিক্রম করিয়া দ্বারের ঝন্ ঝন্ শব্দ বৃদ্ধকে চকিত করিয়া তুলিল। এত রাত্রিতে কে দ্বারে আঘাত করে? প্রায় পনের কুড়ি দিন পূর্ব্বে এই পল্লীরই কোনও ধনী গৃহস্থের গৃহে ডাকাইতী হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালীবেশে সজ্জিত দস্যুগণকে লোক পঞ্জাবী বলিয়া বুঝিতে পারিলেও সরকারী ঘোষণায় সেটা স্বদেশী ডাকাইতী বলিয়া বিবৃত হইয়াছিল, পুলিসের রিপোর্ট তাহাই। তাহার পর হইতেই পল্লীর গৃহস্থরা ৯টার পর আর গৃহদ্বার মুক্ত রাখিত না।

রামতারণ ভাবিতে লাগিলেন।

দ্বারে পূর্ব্বাপেক্ষা সবলে আঘাত হইল—"শীঘ্র দরজা খুলে ফেলুন, মশাই!"

বৃষ্টির ধারা যুবকদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

উত্তেজিত রুক্ষ কণ্ঠ-স্বরে রামতারণ শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, বাহিরে অনেকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর যেন শুনা যাইতেছে। বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। সত্যই কি ডাকাইত পড়িল? উপরের ঘরে যে তাঁহার প্রাণাধিকা নাতিনী রহিয়াছে!

"দরজা খুল্‌বেন, না ভেঙ্গে ফেল্‌ব?"

সর্ব্বনাশ! তবে ডাকাইতই পড়িয়াছে!—নির্ব্বিরোধ শান্তস্বভাব বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আজ যদি রাখাল বাড়ী থাকিত! তাহার বলিষ্ঠ বাহু, যতীশের সঙ্গে মিলিত হইলে মীনুরাণীকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারিত! হায়! বার্দ্ধক্যের অক্ষমতা!

কিন্তু রাজধানী কলিকাতা—সশস্ত্র পুলিস-রক্ষিত রাজধানীর বুকের উপর ; এ কি অরাজকতা !

মুহুর্মুহুঃ পদাঘাতে দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল। অমনই বৃষ্টিধারাসিক্ত যুবকের দল প্রশস্ত ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধ রামতারণ তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার দরজার দিকে ছুটিয়া চলিলেন। দস্যুগণ সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করুক ; কিন্তু মীনুরাণীর কোন ক্ষতি না করিতে পারে, এই দুর্ভাবনায় বৃদ্ধের স্বাভাবিক বিবেচনাশক্তি তখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

"ও মশায়, কোথায় যান ?"

বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে এতগুলি মনুষ্যকে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইল। সত্যই তবে দস্যুদল তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে !

কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমরা কি করেছি, বাপু ! আমার কি অপরাধ—"

"শুনুন না, মশাই !"

রামতারণ দেখিলেন, এক জন দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ দস্যু তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ! দ্বারপথ আগুলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "যতীশ !"

"কি দাদামশাই !—এ সব ব্যাপার কি ? কে আপনারা ?"

দীর্ঘাকার যতীশচন্দ্র অপর দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে আরও একটি মূর্ত্তির ছায়া দেখা গেল ; কিন্তু সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল না।

আহারাদির পর স্বামী ও স্ত্রী বসিয়া আরামে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিল। দম্পতিকলহের সকল অশান্তির মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল। বৃষ্টিধারার সঙ্গে তরুণ প্রেমিকযুগলের অস্ফুট কলগীতি সঙ্গীতের মতই মধুর।

সহসা নিম্নতলে দরজা ভাঙ্গিবার শব্দ, দাদামহাশয়ের চীৎকার উভয়কে চমকিত করিয়া দিল। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় আলোর সুইচ টানিয়া দিয়া যতীশচন্দ্র দ্রুতপদে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিল।

এতগুলি যুবককে দরজা ভাঙ্গিয়া দাদামহাশয়ের ঘরের মধ্যে আসিতে দেখিয়া যতীশ একটু ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি পরিচিত মুখ দেখিয়া সে একটু আশ্বস্ত হইল। তাহারা এই পাড়ারই ছেলে। শ্বশুরালয়ে ঘন ঘন যাতায়াতে সে অনেকের মুখ চিনিত।

"আপনাদের মতলব কি বলুন ত ?"

এক জন অগ্রসর হইয়া বলিল, "এ রকম ভাবে আসাটা আমাদের অন্যায় হয়েছে, মাপ করবেন ; কিন্তু ব্যাপারটা যে রকম গুরু—"

"আঃ মশাই, আসল কথাটাই ব'লে ফেলুন না !"

রামতারণ তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। পাড়ার যুবকদিগকে চিনিতে পারিয়া তিনি কতকটা সুস্থির হইয়া বলিলেন, "তা তোমরা বাবারা, এ রকম ক'রে দরজা ভেঙ্গে, দুপুর রাতে কি মনে ক'রে ?"

ভট্টাচার্য্যদের হরিচরণ বলিল, "আপনি কিছুতেই দরজা খুলবেন না, অথচ ব্যাপারটা সঙ্গীন, তাই আমরা অনধিকারপ্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছি।"

সে তখন ব্যাপারটা গুছাইয়া বলিয়া ফেলিল।

যতীশচন্দ্রর অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "ঘটনাটা কখন্ হয়েছিল ?"

"৮টার সময়।"

"এখন প্রায় ১০টা বাজে। তা খুব তাড়াতাড়ি সংবাদ এনেছেন বটে !"

রামতারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়বিহ্বলভাবে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিলেন, "এরা বলে কি ?"

"কিছু না, দাদামশাই, আপনি শোবেন চলুন। আচ্ছা, আপনারা এখন বাড়ী যেতে পারেন। বৃষ্টিতে ভিজে আপনাদের ভারী কষ্ট হয়েছে। এতগুলি লোককে শুকনো কাপড় দেবার সুবিধা হবে না, মাপ করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।"

যুবকের দল হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এমন ভীষণ ঘটনার কথা শুনিয়া কেহ কোন ব্যবস্থাই করিল না !

যতীশচন্দ্র তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া মৃদু হাস্য করিল ; তাহার পর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ঘুরাইয়া আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "সে লোকটি আমি,

মশাই আমি।—আপনাদের শঙ্কার কোন কারণ নেই। ধন্যবাদ—আপনাদের সাধু উদ্দেশ্যের জন্য সহস্র ধন্যবাদ। তবে আসুন, নমস্কার!”

যতীশচন্দ্র দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। যুবকের দল ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। এতটা উদ্যম সবই নিষ্ফল!

* * * * *

আলোকিত সিঁড়ির ধারে নিশ্চল প্রতিমার মত পত্নীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া যতীশচন্দ্র তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

“ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা!”

পত্নীকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া যতীশ বলিল, “লজ্জা তোমার কিসের রাই, অত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? এ লজ্জা আমার, আমিই তা নিয়েছি। আর তোমার এ অভিসারের ফলে আজি যা পেয়েছি, তার দাম রাণি! রাণি!—”

বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দে শেষ কথাটা শুধু মীনু রাণীরই কর্ণে প্রবেশ করিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মুকুলের মিনতি

কোথায় তুমি দখিণ হাওয়া গো
আজকে এসো মুকুল ফোটাবে!
অনেক দিনের আকুল চাওয়া গো
এসো হিয়ায় জোয়ার ছোটাবে।
এসো মধুর মলয় পরশন,
বুকে এসো চোখের অদর্শন,
এসো আশা আকাঙ্ক্ষারি ধন
পাওয়ার পুলক হাওয়ায় ফোটাবে।

এসো করুণ অরুণ আলোক হে
এসো ভাঙ্গাও আঁখির জড়িমা,
এমন ভাল বাস্‌বে বল কে
এসো পরিমলের গরিমা।
এসো চেতন এসো মোদের জ্ঞান,
এসো মোদের যুগের যুগের ধ্যান,
এসো বিপুল জ্যোতির্ম্ময়ের দান
ঘুমন্তকে জাগিয়ে ওঠাবে।

নবঘনের নয়নধারা গো
এসো সুদূর মধুর নিরমল,
এসো সরিৎ হরিৎ হিয়ায় গো
এসো শীতল ফুলের ফটিকজল।
এসো পীযূষ বিন্দু লয়ে গো
মুক্তি, তরল মুক্তা হয়ে গো
বিনা তোমার সোহাগ পরশন
অস্ফুটেরা ধূলায় লোটাবে।
কোথায় তুমি দখিণ হাওয়া গো
আজকে এসো, মুকুল ফোটাবে!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কি অপূর্ব বেশ,
কি মহিমা!
জ্যোতিহীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি'
যায় গলি',
গড়ে' তোলে অসীমের অলঙ্কার।
হয় সে অমৃত পাত্র, সীমার ফুরালে অহঙ্কার।
শেষের দীপালি রাত্রে, হে অশেষ
অমা-অন্ধকাররন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ॥

ভোরের আভাসে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,
তারা-হারা রাত্রির চীবর
চরম মঞ্জীর।
যামিনীর অন্তহীন দীর্ঘপথ ঘুরি
প্রভাত আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী
শেষ করে' যায় তার,
উদয় সূর্যের পানে শান্ত নমস্কার।
যখন কর্মের দিন
ম্লান ক্ষীণ,
গোষ্ঠে-চলা ধেনুসম সন্ধ্যার সমীরে
চলে ধীরে আঁধারের তীরে -

এমন সোনার মন্ত্র হতে
কি অমৃতস্রোতে
তাহারে করাও স্নান অন্তরের সৌন্দর্য-শিখায়?
যখন চোখের মেঘ কি-মোহে হারায়,
চপলের সকল সম্বল,
সরাতে নিশ্বর রূপ দাও তারে শুভ্র সমুজ্জ্বল;—
হে অশেষ তোমার অঙ্কে
চাপামুখ তার মাঝে ক্ষণে ক্ষণে
খেলায়ে রঙের মেলা,
ভাসায়ে আলোর ভেলা,
বিচিত্র করিয়া তোলো তার শেষ বেলা।

কারু আমি, তারি লাগি অন্তর তৃষিত,—
কত দূরে আছে সেই খেলা-ভরা মুক্তির অমৃত।
বধূ যথা গোধূলিতে শেষ ঘট ভরে,—
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
সেইমত, হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
সুধাস্রোতে
ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।

হে জীবন, তব স্পর্শাঘাত
অকস্মাৎ
মোর সুপ্ত চিত্ত হতে কবে
চরম বেদনা-উৎস মুক্ত করি' অগ্নি-মহোৎসবে
অতীতের যত দুঃখ, যত অসম্মান
উচ্ছ্বসিত রুদ্র হাস্যে করি দিবে শেষ দীপ্যমান ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

২৭ অক্টোবর
১৯২৪
স্টীমার্ এণ্ডিস্
Equator পার হয়ে
সারা দক্ষিণ মেরুর
মুখে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব রচনা

এক সময়ে কোনও একখানি ইংরাজি পত্রে একটি নূতন কবিতা পাঠ করিয়া গিরিশচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটি অনুবাদ করেন। অনুবাদটি এ পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। 'বার্ষিক বসুমতীর' পাঠকবর্গকে অদ্য তাহা উপহার প্রদত্ত হইল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

(মূল কবিতা)

"What is a kiss, my pretty Miss,
Grammatically defined?"
"It is a conjunction, Sir," she said,
"And can not be declined."

(অনুবাদ)

"চুম্বনের সার তত্ত্ব, ব্যাকরণগত অর্থ
জান যদি কহ লো কুমারী?"
"চুম্বন চির অব্যয়, পদার্থের যোগ হয়,
বিভক্তি বা পদ নাহি তার(ই)॥"

আমার দ্বিতীয় পক্ষ

১

কুলীন পূর্ব্বপুরুষদিগের নবগুণের প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ থাকুক বা না থাকুক, তাঁহাদের দশম গুণের উপর অর্থাৎ বহুবিবাহপ্রবণতার উপর আমার বিষম বিরাগ ছিল। এই অভ্যাস তাঁহাদিগের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। তেমন তেমন সুযোগ পাইলে তাঁহারা একেবারে গণ্ডায় গণ্ডায় প্রবীণা, নবীনা, বালিকার পাণি-পীড়ন করিতেন, তাহা ছাড়া দমে দমে যতগুলিকে পার করিতেন, তাহাদিগের বেলায় আর গণ্ডায়, এমন কি, কুড়িতেও কুলাইত না, ৫০।৬০ হইতে শতাধিক পর্য্যন্ত উঠিত, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। যাহা হউক, সেই বংশে জন্মিয়া আমি উক্ত প্রথার উপর খড়্গ-হস্ত ছিলাম, ইহাতেই ইংরাজী শিক্ষার শক্তি প্রণিধান করা যায়। কিন্তু নিজের প্রবৃত্তির বশে (অথবা পূর্ব্বগামীদিগের স্বভাবের প্রভাব অনতিক্রমণীয় বলিয়া) আমাকেও ঘটনাচক্রে পড়িয়া এক পত্নী বিদ্যমানে আবার দারপরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সেই কথাই আজ বলিতে বসিয়াছি। তবে দ্বিতীয় পক্ষ আশ্রয় করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা নামে মাত্রই রহিয়া গেল, সেটা এ অধমের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, পাঠকবর্গ সমস্ত অবগত হইয়া সে প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন।

পূজ্যপাদ মাতুল মহাশয় (কুলীনের সন্তানের মাতুলালয়েই বাস) যথাসময়ে একটি মনের মত সম্বন্ধ করিয়া আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহে নগদে ও দানসামগ্রী, নমস্কারী প্রভৃতিতে যথেষ্ট প্রাপ্তি হইয়াছিল, সুতরাং মাতুল-মাতুলানী খুবই খুসী হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় নববধূর সহিত দৃষ্টিবিনিময় করিবামাত্র আমার চিত্ত একেবারে তিক্ত হইয়া গেল। কেন না, তিনি 'স্ত্রীরত্ন' হইতে পারেন, কিন্তু 'কালোমাণিক'; বর্ণে এ পক্ষের সহিত সমান খুঁটের হইলেও 'সজাতৌ পরমা প্রীতিঃ' এই বাক্য সকল ক্ষেত্রে খাটে না। বাসর-ঘরে কন্যাপক্ষীয়াগণ এবং গৃহে ফিরিলে আমার আত্মীয়াগণ এই খুঁতটুকু ঢাকিবার জন্য, নবোঢ়ার মুখশ্রীর, অঙ্গসৌষ্ঠবের ও নানা সুলক্ষণের অনেক সুখ্যাতি করিলেন বটে, তাঁহার পটোলচেরা চোখ, তুলি দিয়া আঁকা ভুরূ, বাঁশীর মত নাক, বেলুন বেলুন গড়ন, শ্যামাঠাকুরাণীর মত এক রাশ কেশ প্রভৃতির দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু সে সব কথায় আমার মন উঠিল না।

যাহা হউক, আত্মপ্রশংসা হইলেও এটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমি নিতান্ত 'গোঁয়ার-গোবিন্দ' নহি, বরণের সময় ও ফুলশয্যার রাত্রিতে কোনওরূপ 'কেলেঙ্কারি' না করিয়া যথারীতি নিয়মপালন করিয়াছিলাম; এমন কি, নিতান্ত ভাসাভাসা রকমে হইলেও নববধূর সহিত কিঞ্চিৎ বাক্যালাপও করিয়াছিলাম। যদিও তাঁহার চর্ম্মের বর্ণে মর্ম্মে বেদনা পাইয়াছিলাম, তথাপি তাঁহার অল্প দুই চারিটি কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে এটুকু অনুভব করিয়াছিলাম যে, তিনি মৃদু-মধুরভাষিণী। তবে লোকে না কি বলে যে, কথায় চিঁড়া ভিজে না, তাই তাঁহার কথাবার্ত্তায় আমার হৃদয় আর্দ্র হইল না।

আমার বিরাগের প্রতিবাদ-হিসাবেই হউক, আর মাতাঠাকুরাণীর কন্যাসন্তান না থাকার জন্যই হউক, নববধূর উপর তাঁহার ইহারই মধ্যে একটু মায়া বসিয়াছিল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, 'ক'নে-বৌ'কে ২।৫ দিন পরেই পিত্রালয়ে বিদায় না দিয়া প্রায় মাসখানেক রাখা হইয়াছিল। এ জন্য আমাকেও অবস্থার গতিকে নব-পরিণীতার সহিত একটু পরিচয় স্থাপন করিতে হইয়াছিল, তবে সেটা কেবল মৌখিক, তাহাতে প্রাণের সাড়া ছিল না। অবশ্য আমার মনের আসল ভাবটা একেবারে চাপা ছিল না। ইহা লইয়া পুরনারীদিগের মধ্যে বেশ একটু আলোচনা চলিত, সুতরাং 'ক'নে-বৌ' আমার মনের অবস্থাটার আঁচ পাইয়াছিলেন, কিন্তু অবোলা নারীর, বিশেষতঃ বিয়ের ক'নের ত আর মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই।

এই ভাবে হয় ত এক মাস কাল সুশৃঙ্খলায় কাটিয়া যাইত। কিন্তু একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমার একটি বন্ধু এই বিবাহ-সম্বন্ধের উত্থাপন করিয়াছিলেন, অথচ বিবাহরাত্রিতে অথবা বৌভাতের দিন তিনি, কি জানি কেন, আসিতে পারেন নাই। মাস ফুরাইবার

পূর্ব্বেই কিন্তু তিনি দর্শন দিলেন এবং যথাকালে শুভবিবাহে যোগদান করিতে পারেন নাই, সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনিই এ বিবাহের এক প্রকার ঘটক, সুতরাং এখন আমার যত আক্রোশ পড়িল তাঁহার উপর। বিশেষতঃ একটু দম লইয়া তিনি যখন দন্তবিকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—'কি রে হরেন, বৌ মনে ধরেছে ত?' তখন আর আমি বরদাস্ত করিতে পারিলাম না। জানি না, দুষ্টসরস্বতী আমার স্কন্ধে ভর করিলেন কি না, আমি সরোষে বলিয়া ফেলিলাম, "আমি আর তোরও মুখদর্শন করিব না, তোর যোটান বৌয়েরও মুখদর্শন করিব না।" এই বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে গিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্রে মাতৃদেবীকে আমার মনের খেদ জানাইয়া, কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া গৃহত্যাগ করিলাম। নববধূর কথা ত ধর্ত্তব্যই নহে, এই ব্যবহারে স্নেহময়ী জননীর ও আজন্ম অন্নদাতা মাতুল-মহাশয়ের মনে যে কি কষ্ট হইবে, রাগের মাথায় সে কথা একবারও ভাবিলাম না। এই জন্যই বলে, রাগ চণ্ডাল।

২

দিদিমা কাশীবাস করিতেন। তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আহার-নিদ্রার পর একটু ঠাণ্ডা হইলে দিদিমা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া আমার পেটের কথা বাহির করিয়া লইলেন। আমার অবশ্য কোনও কথা গোপন করিবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন ছিল না। কয়েক দিন পরে মাতৃদেবীর পত্র পাইলাম, দিদিমা'র নিকট আমার সংবাদ পাইয়া অনেক আক্ষেপ করিয়া আমাকে বাটী ফিরিতে লিখিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে এ কথাটাও জানাইয়াছেন যে, বধূকে পিত্রালয়ে পাঠান হইয়াছে। নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতাপ হইয়াছিল, মাতৃদেবী ও মাতুল-মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গৃহে ফিরা উচিত, সে কথাও বুঝিয়াছিলাম, আর জুজুর ভয় নাই, সে জন্যও চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছিল; কিন্তু কেমন লজ্জা করিতে লাগিল, সঙ্কোচবোধ হইল, কিছুতেই মা-জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে মন সরিল না।

কাশীতেই রহিয়া গেলাম, একটা সুবিধার চাকরী যুটিয়া যাওয়াতে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনও হইতে লাগিল। কিন্তু মনে সর্ব্বদা একটা অস্বস্তি ও কেমন একটা শূন্যতা বোধ হইত। অথচ মাতৃচরণে যাইতেও পা উঠিত না।

এক দিন শূন্যমনে, অশান্তচিত্তে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে বাহির হইয়া খুব একটা 'চক্র' দেওয়ার পর ক্লান্তিবোধ হওয়াতে দশাশ্বমেধ-ঘাটে বিশ্রামের জন্য বসিলাম। কিন্তু কথায় বলে, 'তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।' এক দিকে মুখ ফিরাইতেই আমার সেই 'ঘটক' বন্ধুটির সহিত চোখোচোখি হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং এমন কাতরভাবে আমার দিকে চাহিলেন যে, আমি আর তাঁহার উপর রাগ করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইতে ও মুখ ফিরাইতে পারিলাম না। বুঝিলাম, তাঁহার মনে অনুতাপ ও দয়ার উদয় হইয়াছে। বন্ধুটি চিরদিনই সপ্রতিভ, আমার ভাব দেখিয়া একেবারেই কাযের কথা পাড়িলেন; বলিলেন, "ভাই, আমাকে মাপ কর। তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়াছি, তোমার বিষম অনিষ্ট করিয়াছি। কিন্তু তোমার জীবনটা আমার দোষে জন্মের মত ব্যর্থ হইবে, ইহা আমি কিছুতেই হইতে দিব না। তুমি, ভাই, আবার বিবাহ কর। আমি তোমার জন্য পাত্রী স্থির করিয়াছি; সেটি গৌরবর্ণ, সুশ্রী ও বয়ঃস্থা, এই কাশীতেই মাসীর কাছে আছে। তোমার মত হইলে তোমার মাতাঠাকুরাণী ও মাতুল-মহাশয়ের এ বিবাহে আপত্তি হইবে না, আমি তাঁহা-দিগের অনুমতি লইয়াছি। তাঁহাদিগের নিকট তোমার ঠিকানা জানিয়া তোমার সন্ধানেই এখানে আসিয়াছি। তবে সাহস করিয়া তোমার বাসায় এখনও পর্য্যন্ত যাইতে পারি নাই। এখন পাত্রী যদি এ বার স্বয়ং দেখিতে চাও ত আমার সঙ্গে চল। আর এ বারও যদি আমার উপর বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তোমাকে জোর করিয়া বলিতেছি, এ বার ঠকিবে না। আমি এই তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, মেয়েটি সাকারা সুন্দরী।"

বন্ধুবর এক নিশ্বাসে এত কথা বলিয়া গেলেন, আমি স্থির হইয়া শুনিলাম। উত্তর দিতে অনুরুদ্ধ হইয়া, একটু সামলাইয়া লইবার জন্য ও নিজের মন পরীক্ষা করিবার জন্য, তিন দিনের সময় চাহিলাম।

মন পরীক্ষা করিয়া বেশই বুঝিলাম, এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কেন না, এমন করিয়া জীবনের ভার বহন করা অসম্ভব। তিন দিন পরে বন্ধুকে গম্ভীরমুখে সম্মতি জানাইলাম ও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া পাত্রী দেখিতে চাহিলাম না। শুনিলাম, পাত্রীর মাতা-পিতা দূরদেশে থাকেন, বিশেষ কারণ-বশতঃ শুভ-বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, মাসীই সম্প্রদান করিবেন। আমার পক্ষেও অভিভাবক মাতুল-মহাশয় আসিতে পারিলেন না বা আসিলেন না, মাতৃদেবী অবশ্য প্রাণের টানে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

যথাদিনে যথানিয়মে সম্প্রদান, শুভদৃষ্টি, বাসর জাগা, ফুলশয্যা, সবই হইল। নববধূর রূপে এবার মোহিত হইলাম। হৃদয়ের অশান্তি, অবসাদ, শূন্যতা সরিয়া গেল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে পরিপূর্ণ আনন্দে মন-প্রাণ ভরিয়া গেল। এ বিবাহে মাতাঠাকুরাণী অসন্তোষ ত প্রকাশ করিলেনই না, বরং সাহ্লাদে নববধূকে কোলে টানিয়া লইলেন। সুতরাং আমার এ সুখে লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিবার কিছুই থাকিল না।

৩

শুভদৃষ্টির সময় হইতেই কিন্তু একটা খট্‌কা আমার মনে উদয় হইল; যতই ঘনিষ্ঠভাবে দ্বিতীয় পক্ষের সহিত মিশিতে লাগিলাম, ততই সেটা জোর ধরিতে লাগিল। তাঁহার মুখের আদলটা যেন প্রথম পক্ষের সেই 'ক'নে বৌ'এর মত, গলার স্বর চলনবলনও যেন কতকটা সেই রকম, অথচ এই কনকচম্পকগৌরাঙ্গী যুবতী ও সেই শ্যামাঙ্গী কিশোরীতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। যাহা হউক, ইহার জন্য বিশেষ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বুঝিলাম না। তবে বন্ধুবর যে দিন একমুখ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি রে, হরেন, এবার মনে ধরেছে ত?" সে দিন সেই সুযোগে আমার সন্দেহের কথা তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম। তাহা শুনিয়া তিনি মুরুব্বিয়ানা চা'লে জবাব দিলেন, "ভাই-রে, দ্বিতীয় পক্ষ যাহারা করে, তাহাদের বুলিই এই। সবাই যেন শিবতুল্য, বলিতে ও বুঝিতে চাহে সতীই আবার ফিরিয়া পার্ব্বতী হইয়া আসিয়াছেন।"

এই টিপ্পনীতে অবশ্য সন্দেহভঞ্জন হইল না। আরও মনোযোগের সহিত দ্বিতীয় পক্ষের মুখ-চোখ, কথাবার্ত্তা, চলন-বলন লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। শেষে এক দিন দ্বিতীয় পক্ষ মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, এত নিরীক্ষণ করিয়া আমার এই ছাই মুখের কি দেখ?" আমি তখন আমতা আমতা করিতে লাগিলাম; একটা খুব মিঠা জবাব দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কেমন যেন আটকাইয়া গেল। শেষটা তিনি যখন জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলেন, তখন আর কথাটা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বুঝিলাম, কাজটা অন্যায় হইল, এবং আশঙ্কা করিলাম, হয় ত একটা অপ্রিয় মন্তব্য শুনিতে হইবে। উত্তর শুনিয়া তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমি অপ্রস্তুত হইলাম, একটু ভয় ভয়ও করিতে লাগিল। যাহা হউক, খানিক পরে তিনি এ ভাবটা সামলাইয়া লইলেন, আমিও এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহার মনে অকারণ ব্যথা দিয়াছি বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম।

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবনতমুখে ও সাশ্রু-লোচনে বলিতে লাগিলেন, "তুমি ত কোনও দোষ কর নাই। আমিই তোমার কাছে অপরাধী। কিন্তু সে অপরাধ নিতান্ত আত্মীয়দিগের অনুরোধে করিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমার সন্দেহ ঠিক; বাস্তবিক আমিই সেই হতভাগী। তোমাদের বাড়ী হইতে আমি ফিরিয়া আসিলে মা-বাবা সব কথা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন; মনে একটু শান্তি পাইবার আশায় তাঁহারা কাশী-যাত্রা করিলেন, এ অভাগীকেও সঙ্গে লইলেন। তাহার পর এক দিন দেবমন্দিরে সাধুদর্শন হইল; তিনি আমাকে দেখিয়াই আমার ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা বুঝিতে পারিলেন এবং মা'কে ও আমাকে আড়ালে ডাকিয়া একটি গাছের শিকড় দিলেন, বলিলেন—'এইটি গঙ্গাজলে বাঁটিয়া শুদ্ধ ও উপবাসী অবস্থায় খাইলেই ইহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে।' আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শিকড় খাইবার পরদিনই প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, আমার গায়ের রং একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কিছু দিন গেলে যখন বুঝা গেল রংটা পাকা, তখন সকলের মনেই আনন্দ হইল। তাহার পর তোমার বন্ধুরত্নটির সহিত বাবা-মা পরামর্শ আঁটিয়া যে যোগাযোগ

ঘটাইয়াছেন, তাহা বুঝিয়া লইতে পার। অবশ্য, শাশুড়ী ঠাকুরাণীও ইহার ভিতর আছেন।”

এই কাহিনী শুনিয়া আমি বিস্ময়ে ও আনন্দে এতই অধীর হইলাম যে, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই সেই অবনতমুখী গলদশ্রুলোচনা স্বর্ণপ্রতিমাকে হৃদয়ে ধারণ করিলাম ও সযত্নে সেই শ্বেতপদ্মপলাশচ্যুত শিশির-বিন্দু মুছাইয়া দিলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম, জানি না। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন একটু রসিক-তার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম, “সন্ন্যাসী ঠাকুরের কোন্ দেবতার মন্দিরে অধিষ্ঠান, আমাকে বলিয়া দেও না, আমিও এই কালো বরণ ঘুচাইব।” তিনি একটু লজ্জার সঙ্গে সুখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “বালাই, তুমি কেন ভোল বদলাইতে যাইবে? আমি ত সে জন্য অসুখী নই। তুমি যে আমার ‘কেলেসোণা’।” আমিও তাঁহার মুখের মত জবাব দিলাম, “আর তুমি বুঝি আমার ‘রাধাবিনোদিনী?’ তবে এস, কবির পদাবলি সার্থক করি।

‘ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।
কনকলতিকা রাই তমালকোলে॥
দীপসমীপে যেন ইন্দ্রনীল মণি।
জলদ জড়ায়ল যেন সৌদামিনী।’

‘তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনকলতায় জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥’ ”

এই মিলনানন্দে অনেকক্ষণ কাটাইয়া আমি দ্বিতীয় পক্ষের নিকট পূর্ব্বপক্ষ-অবস্থায় কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলাম এবং এই সুখের নিশিতে আর কোনও আক্ষেপ রাখিব না মনে করিয়া ‘অপরাধ করিয়াছি’ বলিয়া আবার তাঁহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিলাম এবং অপরাধভঞ্জনের জন্য জয়দেব-কবির উদারবাণী—‘দেহি পদপল্লবমুদারম্’ স্মরণ করিয়া মহাজনের পন্থাঃ অনুসরণ করিতে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু আনন্দসাধ্বস-মুকুলিতাঙ্গী বধূটি আমার উদ্যত হস্ত নিবারণ করিলেন এবং অমোঘ উপায়ে আমার মুখও বন্ধ করিয়া দিলেন। *

(যবনিকা-পতন)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* দুই বৎসর পূর্ব্বে ৺কাশীধামে রোগশয্যায় পড়িয়া এক রাত্রিতে এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। ইহাকে পাঠকসম্প্রদায় যেন লেখকের আত্মকাহিনী বলিয়া ভ্রম করিবেন না।

গিরিশচন্দ্রের বাল্যকালের কবিতা

(কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুকরণে)

১ম কবিতা।

ধরিয়া মানব-কায়, সমভাবে নাহি যায়,
সুখ-দুখ-মাঝে হেলে দুলে।
কেমন লোকের মন, দুঃখ নামে অচেতন,
সুখলাভে সকলেই ঢলে॥

২য় কবিতা।

নীরব মানব সব নিশি ঘোরতর,
তমোময় সমুদয় মহা ভয়ঙ্কর।
রণ বেশে ঘন এসে ঘেরিল গগন,
ঘন ঘন ঘোর নাদে গভীর গর্জ্জন।
চমকে চপলা, করে আঁধার হরণ,
কড় কড় কুলিশের কঠোর নিঃস্বন।

সরস্বতীর কমল বনে

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বন্ধু

১

মনের ক্ষোভে কথাগুলা শেষ করিয়া, উত্তর শুনিবার জন্য আর অপেক্ষায় না থাকিয়া মৃগাঙ্ক গৃহের বাহিরে আসিয়া উদ্যানের মধ্যস্থিত রক্তবর্ণ স্বল্পপরিসর পথের উপর এক বার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ীখানির দিকে আর এক বার চাহিতে সেই কথাটাই কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল—আজ হইতে এ গৃহের দ্বার তাহার কাছে চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া গেল।

প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের প্রশস্ত ফটক—অদূরে; তাহার পরেই রাজপথ।

নিশ্বাস ফেলিয়া মৃগাঙ্ক চলিতে আরম্ভ করিল। ডানদিকে কতকগুলি ঘন সবুজ গাছে একটা কুঞ্জ রচিত ছিল। মৃগাঙ্ক অত্যন্ত চিন্তিতভাবে সেই কুঞ্জে যাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অল্পক্ষণ পরেই রেখা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া সেই কুঞ্জে প্রবেশ করিল। মৃগাঙ্ককে সম্মুখে দেখিয়া রেখা একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল—"তুমি যেও না।"

মৃগাঙ্ক বলিল—"আর থেকে কি হ'বে?"

রেখা মিনতি করিয়া বলিল—"তা' হোক্, তবু তুমি যেও না।"

"ছেলেমানুষী কোরো না, রেখা; থেকে আর কোন লাভ নেই।"

"বাবা এক দিন হয় ত মত বদলাতে পারেন—"

"সে আশা একেবারেই নেই। মিথ্যা আশার চেয়ে নিরাশা ঢের ভালো।"

অত্যন্ত আহত হইয়া রেখা বলিল, "তুমি তা হ'লে আর আস্‌বে না?"

"না। আমি কল্‌কাতাতেই আর থাকব না।"

রেখার মুখ হইতে যেন রক্তের চিহ্ন মুছিয়া গেল। সে বলিল—"তা হ'লে আমি কি করব!"

কথাটায় এমন একটা হতাশায় সুর ধ্বনিত হইতেছিল যে, তাহাতে মৃগাঙ্কের চিত্তে ব্যথা বাজিল। ব্যথাটাকে সহনীয় করিয়া লইবার জন্য মৃগাঙ্ক বলিল—"অত অল্পে ভেঙ্গে পড়ো না, রেখা। ভেবে দেখ, তোমাকে ভালবাসেন বলেই তোমার বাবা আমার হাতে তোমাকে দিতে আর ইচ্ছুক নন। আমি আজ কত দরিদ্র ও কত অসহায়, তা ত তুমি শুনেছ। মাথা গুঁজবার একটা যায়গা, তা-ও আমার আর নেই। এ অবস্থায় এমন লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কোন বাপেরই ইচ্ছা হ'তে পারে না। হয় ত আমার নিজেরই বিয়ে করতে অস্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল।"

কশাঘাতের মত কথার আঘাতে রেখার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল। সে কাতর হইয়া বলিল—"তুমি এ কথা বোলো না, মৃগাঙ্কদা। তুমি আগে আমায় কি বলেছ, কি রকম ক'রে তৈরী করেছ, সে সব আজ একেবারে ভুলে যেও না।"

রেখা মৃগাঙ্কের পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িয়া উদ্যত রোদন সংবরণ করিবার জন্য দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

মৃগাঙ্ক নত হইয়া ধীরে ধীরে রেখার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিল; কম্পিত স্বরে বলিল—"রেখা, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। আমার জীবনের সব চেয়ে দুর্ভাগ্য তোমাকে হারান। কিন্তু তা-ও আমাকে সহ্য করতে হ'বে। কারণ, উপায় নেই। আর তোমাকেও এখন এ সহ্য ক'রে নিতে হ'বে। তোমার বয়স অল্প, এ আঘাত দুঃসহ হলেও, আশা করি, অসহ্য হ'বে না। আশীর্ব্বাদ করি, ধীরে ধীরে তুমি এ দুঃখ ভুলে যেতে পারবে আর সুখী হ'বে।"

রেখা মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; চক্ষুর বিগলিত অশ্রু জোর করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল—"আমাকে কি তুমি এতই নীচ ভাব, মৃগাঙ্কদা, যে, আমি এর পরে সুখী হ'ব? তোমার উপদেশ আর আমি শুনতে চাইনে। তবে দোহাই তোমার, আমাকে হারানো দুর্ভাগ্য, এ সব কথা আর বোলো না। এর পরে আমার হাত থেকে বাঁচা সৌভাগ্য বল্লেই বোধ হয় সত্য কথা বলা হ'বে। আমি চল্লুম; আর কখনও তোমাকে বিরক্ত করতে আস্‌ব না।" বলিয়া রেখা যাইতে উদ্যত হইল।

রেখার হঠাৎ ক্রোধোদয়ে মৃগাঙ্ক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার কথা শেষ হইবামাত্র তাহার কণ্ঠে আর্ত্তস্বর ফুটিয়া উঠিল—"রেখা!"

রেখা মুখ ফিরাইয়া মৃগাঙ্কের কথা শুনিবার জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

মৃগাঙ্ক বলিল,—"শেষ বিদায়ের সময় আর নিষ্ঠুর হয়ো না। হয় ত জীবনে আর দেখা হ'বে না। অন্ততঃ এই কথা মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা কর, রেখা।"

রেখার ক্ষণিক ক্রোধ অশ্রুর মধ্যে যেন হারাইয়া গেল। ছুটিয়া আসিয়া সে মৃগাঙ্কের একখানি হাত আপনার দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"আমি অন্যায় করেছি, আমায় ক্ষমা কর। কিন্তু বল, তুমি এখান থেকে চ'লে যা'বে না?"

মৃগাঙ্ক রেখার হাত ধরিয়া তাহাকে তৃণাসনে বসাইয়া নিজে তাহার কাছে বসিয়া গাঢ় স্বরে বলিল—"রেখা, আমার দুঃসময়ে তুমি আমায় অবিশ্বাস করো না, তুমি আমার অবাধ্য হয়ো না। এ বারের মত নিজের ইচ্ছা ও সুখকে বলি দিই—যা'তে এ জীবনের পরে আমাদের দুঃখের শেষ হ'তে পারে।"

রেখা মৃগাঙ্কের হাত আবেগভরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"মৃগাঙ্কদা!"

সে স্বরে ও সে স্পর্শে মৃগাঙ্ক চকিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল; বলিল,—"কি রেখা!"

রেখার মুখ-চক্ষুর ভাব অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"তুমি চ'লে গেলে আমি থাকতে পারব না, মৃগাঙ্কদা। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

অতি কোমল স্বরে মৃগাঙ্ক বলিল—"তাতে যে তোমার অন্যায় করা হবে, রেখা! তোমার বাবার কথা তুমি যে এখন অবহেলা করতে পারবে না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, তোমাকে সঙ্গে পাওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে আমার কাম্য আর কিছুই নেই; কিন্তু ন্যায় অন্যায়ের বিচারে আমাকে সে কাম্য জিনিষও ত্যাগ করতে হ'বে।"

রেখা মৃগাঙ্কের হাত ছাড়িয়া দিয়া একটু উত্তেজিত-ভাবে বলিল—"কেন, মৃগাঙ্কদা, আমি কি মানুষ নই? আমার নিজের ভাল মন্দ বুঝবার বুদ্ধি বা বয়স কি আমার হয়নি? আর, আমার ইচ্ছের কি কোন মূল্যই নেই?"

ব্যথিত কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলিল—"ও কথা তোমার মুখে শোভা পায় না, রেখা! এ ক্ষেত্রে তোমার বাবার ইচ্ছাই বড় ক'রে দেখতে হ'বে। আমি চিরদিন তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী, তোমার বড় ভাইয়ের মত থাকব। তোমার বাবার ইচ্ছামত বিবাহ ক'রে তোমাকে সুখী হ'তে হ'বে, আর এক জনকে ক্ষমা করতে হ'বে। বল, রেখা, আমার কথা রাখবে?"

রেখার বক্ষঃস্থল আবেগে তরঙ্গবাহিত তরণীর মত আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার মনের কথা মুখে প্রকাশ পাইল না।

এক হাতে রেখার দক্ষিণ হাত ধরিয়া, অপর হাত-খানি পরম স্নেহভরে রেখার কাঁধের উপর রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃগাঙ্ক আবার বলিল—"বল, রেখা, বল, আমার শেষ কথা রাখবে?"

মৃগাঙ্কের দৃষ্টির সম্মুখে রেখা আর বিদ্রোহ করিতে পারিল না। জল ফুটিয়া যেমন বাষ্পে পরিণত হয়, তাহার গভীর দুঃখ অন্তরের তাপে তেমনই অভিমান-রূপে দেখা দিল। রুদ্ধ ওষ্ঠাধর দিয়া দুঃখের একটি কথাও বাহির হইল না। সে শুধু বলিল—"রাখব।" তাহার পর তৃণ-শয্যা হইতে উঠিয়া ধীর পদে রেখা সে স্থান ত্যাগ করিল।

মৃগাঙ্ক ব্যথিত দৃষ্টিতে রেখার গতিশীল মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বলিল—"রেখা, আমার দুঃখ বুঝে পার ত আমাকে ক্ষমা করো। শুধু এইটুকু বিশ্বাস করো, আজ আমার মত নিঃস্ব কেউ নেই, আমার মত সর্ব্বস্ব খুইয়ে আজ কেউ পথে বা'র হচ্ছে না।"

মৃগাঙ্ক সেখানে আর দাঁড়াইল না। উদ্যান অতিক্রম করিয়া বাহিরের রাজপথে আসিয়া সে তাহার অশ্রুবাষ্পে সমাচ্ছন্ন দৃষ্টি রেখাদের অট্টালিকার উপর ক্ষণেকের জন্য নিবদ্ধ করিল; তাহার পর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

অর্দ্ধপথে তাহার গতি সংহত করিয়া রেখা সেই সময়ে আবার সেই কুঞ্জের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কতকগুলি পত্র ও ক্ষুদ্র শাখা হাত দিয়া সরাইয়া

স্থির দৃষ্টিতে রেখা মৃগাঙ্কের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার ব্যাকুল অন্তর চরণ দ্বারা মৃগাঙ্কের পানে ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। তাহার নয়ন নদীর তীরের মত অন্তরের জলধারাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

মৃগাঙ্ক দৃষ্টিপথের বাহিরে যাইবামাত্র রেখার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু বহিল। সে তখন সেই তৃণাসনের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, যেখানে মৃগাঙ্ক দাঁড়াইয়া ছিল, সেই স্থানটি অশ্রুসিক্ত ও ওষ্ঠাধরস্পৃষ্ট করিয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে কহিল—"তুমি এস, তুমি এস, আমায় এমন একা ও অসহায় ক'রে যেও না।"

২

রেখার পিতা জীবনকৃষ্ণ বসু পাবলিক ওকার্কসের অধীনে কন্‌ট্রাক্টরি করিয়া বিশেষ ধনশালী হইয়াছিলেন। এখনও তিনি কলিকাতার মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ কন্‌ট্রাক্টর। যখন তাঁহার বয়স বৎসর চৌদ্দ, তখন তিনি পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার জন্মভূমি বাগমারী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চাকুরীর সন্ধানে আইসেন। দুই দিন অনাহারে থাকার পর এক সন্ধ্যায় একটা চৌমাথা পার হইবার সময়ে একখানি চলন্ত যানের সম্মুখে পড়িয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া যায়েন। যানের অধিকারী তাঁহার ৭ বৎসরের এক কন্যা লইয়া সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। কৃপাপরবশ হইয়া তিনি বালককে তুলিয়া লইয়া আপন গৃহে লইয়া যায়েন।

ইনি কলিকাতায় সেই সময়কার এক জন বিখ্যাত একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। সুদর্শন জীবনকৃষ্ণকে তাঁহার স্বজাতি জানিয়া ইনি বালককে আশ্রয় দেন। জীবন-কৃষ্ণ আশ্রয়দাতারই সাহায্যে কিছু লিখাপড়া শিখিয়া তাঁহারই ইচ্ছামত কন্‌ট্রাক্টরী সুরু করেন। অল্পসময়ের মধ্যেই পূর্ত্ত-বিভাগের কার্য্যে জীবনকৃষ্ণ বেশ সুদক্ষ হইয়া উঠেন। এই সুচরিত্র সুদর্শন বালক যখন যৌবনে বিশেষ কার্য্যদক্ষ ও অর্থবান্ হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারই সহিত আশ্রয়দাতা আপনার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরূঢ় করিয়া দেন।

জীবনকৃষ্ণের আশ্রয়দাতা ও শ্বশুর একটু য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন লোক ছিলেন। শ্বশুরের সাহচর্য্যে জীবনকৃষ্ণও যৌবন হইতে সেইরূপ ভাবে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। শ্বশুরের কাছে তিনি এ শিক্ষাও পাইয়াছিলেন যে, মানুষের হৃদয় চর্ম্ম, রক্ত ও মাংসের নিম্নে থাকে; সে জন্য হৃদয়ের মর্য্যাদা রাখিবার আগে উপরকার জিনিষ-গুলির মর্য্যাদা রক্ষা করা দরকার এবং তাহা করিতে গেলে অর্থের একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ শ্বশুর ইহাও বলিতেন যে, জীবনকৃষ্ণকে তিনি আশ্রয় দিয়া-ছিলেন—অসহায় দেখিয়া; কিন্তু মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন তিনি রীতিমত কর্ম্মঠ ও ধনবান হইবার পর।

মৃগাঙ্ক জীবনকৃষ্ণের বন্ধুপুত্র। বন্ধু মুরসিদাবাদ জিলার এক জন মাঝারী জমীদার ও কলিকাতার একটা বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক হইলেও তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। সাধারণ জমীদারদিগের মতই ঋণ করিয়া ঠাট বজায় রাখিতে তিনি কোন দিন পশ্চাৎ-পদ ছিলেন না। মৃগাঙ্ক এন্‌ট্রান্স পাশ করিবার পরই জীবনকৃষ্ণ মৃগাঙ্ককে তাঁহার কাছে রাখিতে বলিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে ব্যবসা শিখাইয়া "মানুষ" করিয়া তুলি-বেন। কিন্তু সে প্রস্তাব বন্ধুর মনোমত হয় নাই। মৃগাঙ্ক এই বয়সেই লিখাপড়া না শিখিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবে, এ কল্পনাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কাযেই মৃগাঙ্ক ব্যবসা না শিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল।

বন্ধুপুত্র বলিয়া জীবনকৃষ্ণের বাড়ীতে মৃগাঙ্কের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাহার ফলে রেখার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছিল। বিবাহের কথা তুলিলেই যে জীবনকৃষ্ণ সম্মত হইবেন, সে বিষয়ে মৃগাঙ্ক বা রেখা কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। বি, এ, পাশ করার পর মৃগাঙ্ক পিতার অনুমতি লইয়া জীবনকৃষ্ণের নিকট রেখার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করে। জীবনকৃষ্ণ উত্তর দেন, যদি সে আপনার চেষ্টায় দুই বৎসরের মধ্যে অর্থ-বান্ হইতে পারে, তাহা হইলে বিবাহে কোন আপত্তি তাঁহার থাকিবে না। এ কথাটাও তিনি মৃগাঙ্ককে ইঙ্গিতে জানাইয়া দেন যে, পড়া ছাড়িয়া এখনও যদি সে তাঁহার কাছে ব্যবসা শিখিতে আরম্ভ করে, তবে দুই

বৎসরে যথেষ্ট অর্থ উপায় করা তাহার পক্ষে মোটেই কষ্টকর হইবে না। কিন্তু পুত্রের এম, এ, হইবার মোহ পুত্রকে এবং পুত্রকে এম, এ, দেখিবার মোহ পিতাকে সমানভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ বড় লোক হইবার আশায় এই সময় মৃগাঙ্কের পিতা ধার করিয়া কয়টা speculationএ অনেক টাকা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সর্ব্বস্ব ঋণের দায়ে বিক্রয় হইয়া গেল এবং তাহাতেও ঋণ শোধ না হওয়ায় উত্তমর্ণরা তাঁহাকে দস্তক করিলে তাঁহাকে দেউলিয়া হইতে হয়।

এই সময় মৃগাঙ্ক এম্, এ, পাশ করে। সেই সংবাদ ও পিতার কাছ হইতে পত্র লইয়া সে জীবনকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করে। মৃগাঙ্কের পিতা পত্রে সেই বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কারণ, মৃগাঙ্ক এখন শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম।

জীবনকৃষ্ণ এই চিঠি পড়িয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন; মৃগাঙ্ককে বলেন, যাহার পিতার এমন দুরবস্থা, তাহার সহিত মেয়ের বিবাহ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব রেখার সহিত তাহার এখন দেখাশুনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রেখার বিবাহ হইয়া গেলে মৃগাঙ্ক আসিলে তখন তাহাকে তিনি যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন। বন্ধুকেও তিনি এই মর্ম্মের পত্র দিবেন বলেন।

এই উত্তর শুনিবার পরই মৃগাঙ্ক জীবনকৃষ্ণের গৃহ ত্যাগ করে। সেই সময়ে রেখার চেষ্টাতেই রেখার সহিত তাহার শেষ সাক্ষাৎ হয়।

৩

জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী—রেখার মা'র নাম—প্রতিভা। মৃগাঙ্ক চলিয়া যাওয়ার কয়েক দিন পরে এক দিন প্রাতে স্বামি-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

প্রতিভা। রেখা এই ক'দিনে কি রকম হয়ে গিয়েছে, দেখেছ?

জীবন। দেখিছি।

"তার কি উপায় ঠাউরেছ?"

"উপায় ঠিক করবে তুমি।"

"তা বেশ! উপায় দূর ক'রে দিয়ে এখন বলছ উপায় ঠিক কর। সত্যি, মৃগাঙ্কের হাতে রেখাকে দিলে কি সুন্দর মানায়!"

"দেখ, যা' হ'বে না, তা'র জন্ত অনুশোচনা বৃথা।"

"অনুশোচনা কেন? বল বেকুবি।—তোমার টাকার অভাব নেই; তোমার মেয়ে যে বে.করবে, তা'র টাকা না-ই বা থাকল?"

"না থাকলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যা'র সঙ্গে আমার একমাত্র মেয়ের বে দেব, এটা ত দেখতে হ'বে যে, সে যেন সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে। জানই ত, মৃগাঙ্ককে নিয়ে কাযের লোক ক'রে তুলব ব'লে কত চেষ্টা করেছিলুম। ওর বাপের মত হ'ল না। তা'র পর সর্ব্বস্বান্ত হ'ল—তেমন লোকের ছেলের সঙ্গে আমি রেখার বে কি ক'রে দেব বল!"

"কিন্তু মেয়ে যে আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। সে যে আর কাউকে বে করবে, তা' ত আমার মনে নেয় না।"

"যা'তে করে, সে ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

"দেখ, হাজার হ'ক তুমি পুরুষমানুষ—এ জিনিষটা তুমি কিছুতেই বুঝবে না। ভালবাসাটা তোমাদের সখ বা খেয়াল—আমাদের প্রাণ, এটা অতি সত্যি।"

"বেশ, তা'তে তুমি কি প্রমাণ করতে চাও?"

"প্রমাণ কিছু করতে চাইনে। এই বলতে চাই যে, আমার সঙ্গে তোমার বে ঠিক হয়ে যাবার পরও যদি আর একটি ডাগর সুন্দরী মেয়ে দেখে তোমার বে দেওয়া হ'ত, তোমার পক্ষে সে বে করা শক্ত হ'ত না এবং তা'কে ভালবাসাও তোমার পক্ষে অতি সহজ হ'ত। কিন্তু আমার তুমি ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।"

"দেখ, ও সব কল্পনার কথা। কি যে হ'তে পারত, কি যে পারত না, তা' নিয়ে তর্ক করা অনর্থক। কেন না, তা'র কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে জগতে সবই সম্ভব—এই আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার ফল।"

"আচ্ছা, সে তর্ক ছেড়েই দিলাম। তুমি আমার রেখাকে সুখী ক'রে দেও। আমার ঐ একটি মেয়ে, সে যদি অসুখী হয়, আমার জীবন বৃথা।"

"এই ত তোমার দোষ, তর্কে টিকতে পার না। এই কথায় চোখে জল এল! আমার কি অসাধ, আমার মেয়ে সুখে থাকে? কিন্তু আমার মেয়ে, আমার সম্পত্তি

—দুই-ই আমি ভালবাসি। দু'টিই আমার প্রাণের জিনিষ—দু'টিকেই আমায় বাঁচাতে হ'বে।"

"দেখ, তুমি পুরুষমানুষ, তা'র উপর তোমার মনের জোর বেশী—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পার। কিন্তু হাজার হ'ক, আমি মা ও মেয়েমানুষ, মেয়ের অকল্যাণ ভেবে আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করবেই। কি ক'রে তুমি সব দিক্ সাম্‌লাবে?"

"আমার অর্থের জন্য, আমার রেখার রূপ-গুণের জন্য অনেকে রেখাকে পেতে লালায়িত হ'বে। তা'দের মধ্যে ক'জন অযোগ্য ও অসহিষ্ণু লোককে আমি মাঝে মাঝে রেখার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেব। মৃগাঙ্ককে মনে ক'রে তা'দের উপর রেখার মন আরও বিরূপ হবে। তা'র পর এমন এক জনের সঙ্গে রেখার পরিচয় করিয়ে দিতে হ'বে, যে সুন্দর, সহিষ্ণু আর গুণান্বিত। আগেকার লোকগুলিকে তাড়াবার জন্যও রেখা তা'কে পচ্ছন্দ করবে। ধীরে ধীরে তা'কে ভালবাসাও রেখার পক্ষে শক্ত হ'বে না।"

"হয় ত এ সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু এতে রেখাকে বড় জ্বালাতন করা হ'বে না কি?"

"একটু যে হ'বে, তা'তে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন এর চেয়ে আর সহজ উপায় নেই, তখন একেই ভাল ব'লে মনে ক'রে নিতে হ'বে।"

"দেখ, তুমি করলে তার আর কি বল্‌ব—কিন্তু মৃগাঙ্কের হাতে রেখাকে দিলে সে বেশী সুখী হ'ত।"

"যেটা আর হ'তে পারে না, তা'র জন্যে নিশ্বাস ফেলাটাই নিশ্বাসের অপব্যয়। এখন অন্য উপায়ে যা'তে তা'কে সুখী করা যেতে পারে, তা'রই চেষ্টা করতে হ'বে। তুমি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হও না—আমি ক্রমশঃ সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দেব।"

"যা-ই বল, আমার মন এ উপায় নিচ্ছে না। তোমার বুদ্ধি বাইরের দিকে খুব খেলে; কিন্তু মানুষের, বিশেষতঃ মেয়েমানুষের, অন্তরের কাছে তা'র পরাজয় হয়েছে, এই আমার বিশ্বাস। তুমি ইট-কাঠের সঙ্গে এক হিসাবেই মানুষের মনের দর কষ্‌তে গিয়ে এই বিভ্রাট ঘটিয়েছ।"

"এ বিষয়ে শেষ না দেখে কোন মীমাংসাই আস্‌তে পারে না। কাযেই যত দিন তোমার কথাটাই ঠিক প্রমাণিত না হচ্ছে, তত দিন আমাকে দোষ দিও না। এখন আমি বাইরে চল্‌লাম। রেখার দিকে তুমি শুধু একটু দৃষ্টি রেখ, তা' হ'লেই আমি সব শুধ্‌রে নিতে পার্‌ব।"

জীবনকৃষ্ণ কাযে বাহির হইয়া গেলেন। প্রতিভা কিছুক্ষণ সেই কক্ষে বসিয়া অন্যমনে রেখার কি হইবে, কি করিয়া সে এ ধাক্কা সাম্‌লাইবে, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

প্রতিভার সংসারে যত অপোষ্য ও কুপোষ্য ছিলেন, একটু পরে সকলেই এক এক করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা জীবনকৃষ্ণের দূরসম্পর্কীয় বা অনাত্মীয়। জীবনকৃষ্ণ অতি অনিচ্ছায় কেবল স্ত্রীর অনুরোধে ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ আসিয়া যে সব কথা বলিয়া গেলেন, তাহার ভাষা ভিন্ন হইলেও ভাব এক। সকলেরই এক কথা—জীবনকৃষ্ণ তাঁহাদের পরম আত্মীয়। তিনি যখন স্বয়ং তাঁহাদের রেখার জন্য একটা পাত্র খুঁজিবার ভার দিয়াছেন, তখন কি আর তাঁহাদের কাহারও আহার-নিদ্রা থাকে! সেই দিন হইতে—সেই দিন কেন, সেই ক্ষণ হইতে তাঁহারা পাত্র দেখা আরম্ভ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে দুর্লভ পাত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা থাকিতে রেখার বিবাহের জন্য কোন ভাবনা নাই।

প্রতিভা কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। শুধু এই কথাটি জানাইলেন—যেন রেখাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলা হয়।

সকলে চলিয়া গেলে রেখার কথা ভাবিয়া তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

৪

রেখা আসিয়া কাঁদিয়া কহিল—"তোমরা কি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়াবে, মা?"

প্রতিভা রেখাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলি-লেন—"কেন, মা, কি হয়েছে?"

মা'র আদরে রেখার কান্না আরও বাড়িল। মা'র বুকে মুখ লুকাইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সে তবে শান্ত হইল।

প্রতিভা আপনার উদ্গত অশ্রু রুদ্ধ করিয়া বলিলেন —"কি হয়েছে, মা? আমায় বল্।"

রেখা মুখ তুলিয়া—চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"ওরা সব কেন আসে, মা! সে দিন নূতন পিসীর কে এক জন এসেছিল, আমার সঙ্গে তা'র দেখা করবার কি দরকার ছিল, মা? আজ আবার সেজ কাকীমা'র কে এসেছিল। আমি রাগ করতে তাঁরা বল্লেন, 'তোমার বাপ-মা বলেছেন, তাই ত আমরা এদের খবর দিয়ে এনেছি!' আমি কি সত্যিই তোমাদের এত বোঝা হয়েছি, মা?"

"ছিঃ মা, এমনি ক'রে কি বল্‌তে আছে? তুই ছাড়া আর আমাদের কে আছে বল্। তুই এক জন যদি এসে দেখেই যায় তবু সত্যিকার সুপাত্র না হ'লে ত আমরা কিছুতেই বে হ'তে দেব না।"

"না, মা, তোমাদের সুপাত্র কুপাত্র কিছুই দেখ্‌তে হ'বে না। আমাকে একটু শান্তিতে থাক্‌তে দাও।"

"বেশ, মা, তাই তুই থাক্। আমি কালই ব'লে দেব।"

"এখানে থেকে শান্তি আমি পাব না, মা। বাবা যদি ঘৃণাক্ষরেও একটা কথা ওঁদের ব'লে থাকেন, ওঁরা কিছুতেই আমাকে নিষ্কৃতি দেবেন না। তা'র চেয়ে আমায় নিয়ে তুমি কিছু দিন পুরীতে চল। যাবে, মা?"

"সেই ত কথা!—তোকে ছেড়ে যে উনি থাক্‌তে পারেন না। তবু আমি ওঁকে ব'লে দেখ্‌ব যদি মত করেন।"

"আমায় কিছু দিনের জন্য নিয়ে চল, মা; এখানে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

প্রতিভা বুঝিলেন, মৃগাঙ্কের স্মৃতি রেখাকে এখানে সর্ব্বদা ব্যথিত করিতেছে। তাহার উপর এই আত্মীয়াদের উপদ্রব। রেখাকে কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। এখন স্বামীর মত হইলেই হয়। স্বামী যে কি ভাবিয়া কি করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। কত দিনে যে রেখার মন স্থির হইবে, কি করিলে যে সে সুখী হইবে, ইহা ভাবিয়া প্রতিভা আকুল হইলেন।

প্রতিভা স্বামীকে পুরী যাইবার কথা বলিতেই তিনি পাঠাইতে সম্মত হইলেন; বলিলেন,—"কা'লই সেখানে টেলিগ্রাম ক'রে দেব।"

প্রতিভা রেখাকে বলিলেন যে, পুরীযাত্রায় তাহার পিতা সম্মতি দিয়াছেন। দিন তিনেক পরে যাওয়া হইবে।

রেখা রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া অনেক কথাই ভাবিল। মৃগাঙ্ককে কঠোর কথা বলিয়া বিদায় দিবার দুঃখ, মৃগাঙ্কের বিরহ-দুঃখকে তাহার কাছে দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছিল। কত প্রভাত, কত সন্ধ্যা সে মৃগাঙ্কের নয়নের দৃষ্টির আলোকে তাহার প্রতি তাহার গভীর অনুরাগ উপলব্ধি করিয়াছে; মৃগাঙ্কের কণ্ঠে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শুনিয়াছে। দিনের পর দিন সে আপনা ভুলিয়া রুচি, ব্যবহার, কার্য্য সর্ব্ববিষয়ে মৃগাঙ্কের অনুকরণ করিয়াছে। মৃগাঙ্কের নির্ব্বাচিত পুস্তক পড়িয়া, তাহারই রচিত বা মনোনীত গান গাহিয়া—তাহার সন্দেহনিরাসক সুচিন্তিত মতামত শুনিয়া—সর্ব্বোপরি তাহার সাহচর্য্যলাভ করিয়া রেখার চিত্ত মৃগাঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছিল। কত রাত্রিতে সে কল্পনায় দেখিত, মৃগাঙ্ক ও সে দুই জনে পাশাপাশি বসিয়া জীবনতরী বাহিয়া চলিয়াছে। আকাশে নক্ষত্রোদয়ের মত দুইটি মিলিত তরুণ হৃদয়ে কত ভাব—কত অনুরাগ ফুটিয়া উঠিত। সে সব কথা ভাবিয়া আজ এই ব্যবধান ও বিচ্ছেদের দিনে রেখার চক্ষু বার বার সজল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মৃগাঙ্ক যেমন এক কথায় রেখার উপর তাহার সমস্ত দাবী নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, রেখার চিত্ত কিছুতেই তাহা করিতে পারে নাই। মৃগাঙ্ক যে স্বেচ্ছায় এমন নিঃস্বত্ব—রিক্ত হইয়া যায় নাই,তাহা তাহার বক্ষের যে বেদনা মুখে প্রকট হইয়াছিল, হৃদয়ের যে রক্ত চক্ষুতে অশ্রুরূপে ছুটিয়াছিল, তাহা হইতে রেখা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিল।

কিন্তু কেন মৃগাঙ্ক এমন করিয়া চলিয়া গেল?—তাহার আপনার প্রেমকে ত্যাগের দ্বারা মহৎ করিয়া রেখার প্রেমকে সে কেন এমন খর্ব্ব করিয়া দেখিল? রেখা যখন নারী হইয়া তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিল, তখনও মৃগাঙ্ক তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! এই কি ভালবাসা! এতই ক্ষীণ তাহার দাবী?

কিসের ভয়ে মৃগাঙ্ক তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিল না? রেখার কলঙ্ক হইবে আর সে পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইবে, এই ভয়ে? কি ভুল ধারণা! সে এইটুকু বুঝিল না যে, রেখার কাছে পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্য এক দিকে আর মৃগাঙ্ক এক দিকে! এ কথাটা মৃগাঙ্ক বুঝিতে পারিল না, না রেখা তাহাকে বুঝাইতে পারিল না?

রেখার মনে অনুশোচনা জাগিল, কেন সে অভিমানবশে মৃগাঙ্ককে ছাড়িয়া দিল? কেন সে জোর করিয়া বলিল না—"না,—আমি তোমাকে যেতে দেব না; বাবার একটা নিষেধে তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পা'বে না। তুমি এখানে থেকে চেষ্টা কর, বাবার মত নিশ্চয়ই বদ্‌লাবে।"

বহুক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়া রেখা একটু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল; অশ্রু মুছিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল; তাহার পর লিখিবার উপকরণ বাহির করিয়া মৃগাঙ্ককে চিঠি লিখিতে বসিল।

রেখা লিখিল:—

কলিকাতা
সোমবার। শ্রাবণ—

প্রিয়তমেষু, মৃগাঙ্কদা,

তোমাকে প্রিয়তম লিখিতে আমার কোন দ্বিধা নাই। তাই এই নূতন সম্বোধন লিখিলাম। লোক নিন্দা করিবে? তা' করুক্। তোমাকে না পাওয়ার দুঃখ যদি আমি সহ্য করিতে পারি, লোক-নিন্দা আমার কিছুই করিতে পারিবে না। যে অগ্নিশিখায় পুড়িতেছে—রৌদ্র-তাপে তাহার বেশী আর কি হইবে?

তুমি উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে; কোথায় গেলে, তাহাও বলিয়া গেলে না; আমার কি দশা হইবে, তাহাও ভাবিলে না; মনে করিলে, শিশু যেমন একটা খেলানা হারাইয়া ফেলিয়া নূতন খেলানা পাইয়া পুরাতন খেলানার কথা ভুলিয়া যায়, আমিও তেমনই করিব। উদাসীনের মত আমাকে বুঝাইয়া গেলে, ইহা করিও না, কারণ, ইহা অন্যায়;—ইহাই করিও, কারণ, উহা ন্যায়। এক বার ভাবিলে না, মানুষের হৃদয় একটা যন্ত্র মাত্র নহে যে, ইচ্ছামত কল টিপিয়া চালাইবে, আবার ইচ্ছা হইলেই কল টিপিয়া বন্ধ করিবে।

তুমি চলিয়া যাইবার পর হইতে এ গৃহ আমার পক্ষে কারাগৃহ হইয়াছে। তুমি চলিয়া গিয়াছ জানিয়া দুই এক জন আমার বিবাহের সম্বন্ধের চেষ্টায় আসিয়া আমার কারাগৃহের যন্ত্রণা অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অনেক করিয়া মা'র সঙ্গে দিন কতক পুরী যাইয়া থাকিবার অনুমতি পাইয়াছি। ৩।৪ দিনের মধ্যে সেখানে রওনা হইব। পুরীতে আমাদের নির্জ্জন নিবাসখানি তুমি বোধ হয় জান। তুমি যেখানে থাক, এক বার গিয়া আমাকে দেখা দিয়া আসিও। আমি তোমাকে আমার সব কথা নিবেদন করিব। তা'র পর তোমার যাহা ইচ্ছা করিও। এ কথা তুমি স্থির জানিও, তুমি আইস বা না আইস, দেখা দেও বা না দেও, পত্রের উত্তর লিখ বা না লিখ, আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না। অপরকে সুখী করার ক্ষমতা আমার নাই। যদি দরকার হয় বাবাকে মা'কে আমার মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব। যদি তাহাতেও তাঁহাদের দয়া না হয়—যদি জোর করিয়াই তাঁহারা আমার বিবাহ দেন, আমি তবুও তোমাকে ভালবাসিব, তোমাকে পূজা করিব।

তোমার পায়ে পড়ি, আসিও। না আসিয়া আমাকে দুঃখসাগরে ভাসাইও না।

তোমার চরণাশ্রয়প্রার্থিনী
হতভাগিনী রেখা।

লিখা শেষ হইলে রেখা চিঠি খামে বন্ধ করিয়া, মৃগাঙ্কের দেশের ঠিকানা তাহাতে লিখিয়া, উপাধানের তলে রাখিয়া, আলো নিভাইয়া শয়ন করিল। চক্ষু মুদিয়াও রেখা মৃগাঙ্কেরই কথা ভাবিতে লাগিল।

৫

কথাবার্ত্তার এক সপ্তাহ পরে জীবনকৃষ্ণ রেখার মা ও রেখাকে এক জন কর্ম্মচারীর সঙ্গে পুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে একটি ঝি, একটি চাকর ও একটি পাচক। জীবনকৃষ্ণের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া ষ্টেশনে এক প্রিয়দর্শন যুবক রেখাদের নামাইয়া লইয়া গেল।

সমুদ্রের ধারে নির্জ্জন প্রান্তে সুরচিত "নির্জ্জন-নিবাস।" সমুদ্রের অবিশ্রান্ত তীরাহত তরঙ্গের গম্ভীর শব্দ, মুক্ত বিমল বায়ুর অবাধ প্রবেশাধিকার, স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকের অব্যাহত গতি গৃহখানি মনোরম ও গৃহবাসী-দের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিত। উদয় ও অস্তসময়ের সূর্য্যের মনোহর মূর্ত্তি, বর্ষণ ও ঝটিকার সময় সমুদ্রের অপরূপ মূর্ত্তি গৃহ হইতে দর্শকের চিত্তবিনোদন করিত।

রেখা এখানে আসিয়া কয়েক দিন যেন একটু শান্তি পাইল; তাহার পর মৃগাঙ্কের স্মৃতি তাহাকে আবার পূর্ব্ববৎ উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। কিছু দিন ধরিয়া সে মৃগাঙ্কের পত্রের প্রতীক্ষায় রহিল। পত্র যখন আসিল না, তখন রেখা ভাবিল, মৃগাঙ্ক বোধ হয় স্বয়ংই আসিবে। আশায় আশায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল—সে আসিল না।

পাশের ছোট একটি বাড়ীতে একা এক যুবক থাকিত—সে-ই রেখার পিতার টেলিগ্রাম পাইয়া রেখাদের নামাইয়া আনিয়াছিল। যুবকের নাম মনোহর। ধনীর সন্তান, বি, এস্‌-সি, পাশ করিয়া মাইনিং পড়িতে যায়; ৪।৫ বৎসরের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যানেজারী পাশ করিয়া মাসিক ৩ শত টাকা বেতনে জীবনকৃষ্ণেরই কয়লার খনিতে ম্যানেজার নিযুক্ত হয়। পরে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সে নিজে পৃথক্ খনি ক্রয় করিয়া স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে।

মৃগাঙ্ক চলিয়া যাইবার পর হইতে মনোহরের দিকে জীবনকৃষ্ণের লক্ষ্য পড়ে এবং তাঁহারই চেষ্টায় মনোহর পুরীতে এক পক্ষ হইল আসিয়াছে। বিজ্ঞানের সেবক হইলেও মনোহর চারু শিল্পের আদর বুঝিত ও করিত। সে সুন্দর ছবি আঁকিত, বড় মধুর গান গাহিত ও সেতার বাজাইত। মনোহরই রেখা ও রেখার মাতাকে বিগ্রহাদি দর্শন করাইত, সমুদ্রতীরে বেড়াইয়া আনিত এবং অবসরকালে গল্প করিয়া, গান গাহিয়া বা সেতার বাজাইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিত।

এ দিকে মৃগাঙ্ক না আসায় বা কোন পত্র না দেওয়ায় রেখার মনে দারুণ অভিমান জন্মিল। নারী হইয়া সে যখন এমন চিঠি লিখিল, তবুও সে নিষ্ঠুর আসিল না; এক ছত্র লিখিয়াও মনের কথা জানাইল না! মৃগাঙ্ক তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছে। কিন্তু তাহা মনে করিতেই রেখার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। ক্রোধ ও অভিমান সম্মুখের সমুদ্রের তরঙ্গের মত তাহার হৃদয়-তটে আসিয়া আঘাত করিত।

অল্পসময়ের মধ্যেই মনোহর রেখার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। রেখার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে যাহাতে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই জন্য জীবনকৃষ্ণ তাহাকে পূর্ব্বে পুরীতে পাঠাইয়া তাহার পর রেখাকে পাঠাইয়াছেন এবং রেখাদের সর্ব্ববিধ ভারই তাহার হাতে দিয়াছেন, এই চিন্তা প্রথম দর্শনেই মনোহরের চিত্তকে রেখার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। রেখাকে প্রথম দিন দেখিয়াই এ কথাটা মনোহরের মনে হইয়াছিল। তাহার পর সে যতই রেখার সহিত পরিচিত হইয়াছে, ততই সে ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

মনোহর বাল্যে পিতৃহীন হইয়া কেবলমাত্র মা'র দ্বারা লালিত-পালিত হয়। একমাত্র সন্তান বলিয়া মা অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই। ৯ বৎসর বয়সে মনোহরের বর্ণপরিচয় হয়। বন্ধুবান্ধব মনোহরের বড় একটা কেহ ছিল না—মা-ই ছিলেন তাহার সব। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মনোহর মা'র আঁচল এমন করিয়া ধরিয়া থাকিত যে, বাহিরের অপর কোন নারীর দিকে সে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখে নেই। সর্ব্বপ্রথম মনোহর যখন যৌবনের দৃষ্টি দিয়া রেখার মুখপানে চাহিয়াছিল, তখনই তাহার সমস্ত অন্তর সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, বসন্তের প্রথম বাতাসে পুষ্প-পরাগের মধ্যে যেমন গন্ধ জাগিয়া উঠে, তাঁহার অন্তরে তেমনই প্রেম জাগিয়াছিল। জীবনকৃষ্ণ পূর্ব্বে মনোহরের মাতার কাছে বিবাহের একটু কথা পাড়িয়া রাখিয়াছিলেন এবং আজকালকার দিনে পাত্র-পাত্রীতে পরস্পরের পরি-চয় ভাল বলায় মা-ই দরকার বলিয়া মনোহরকে উদ্যোগ করিয়া পুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। পুত্র মা'র কথা রাখিয়াছিল; কিন্তু মা'কে বলিয়া গিয়াছিল, সে সেখান হইতে চিঠি লিখিলেই মা'কে যাইতে হইবে।

প্রথম প্রথম রেখা মনোহরের সঙ্গে কথা কহিত না; এমন কি, মনোহরের উপস্থিতিকালে নির্ব্বাক্ থাকিয়া
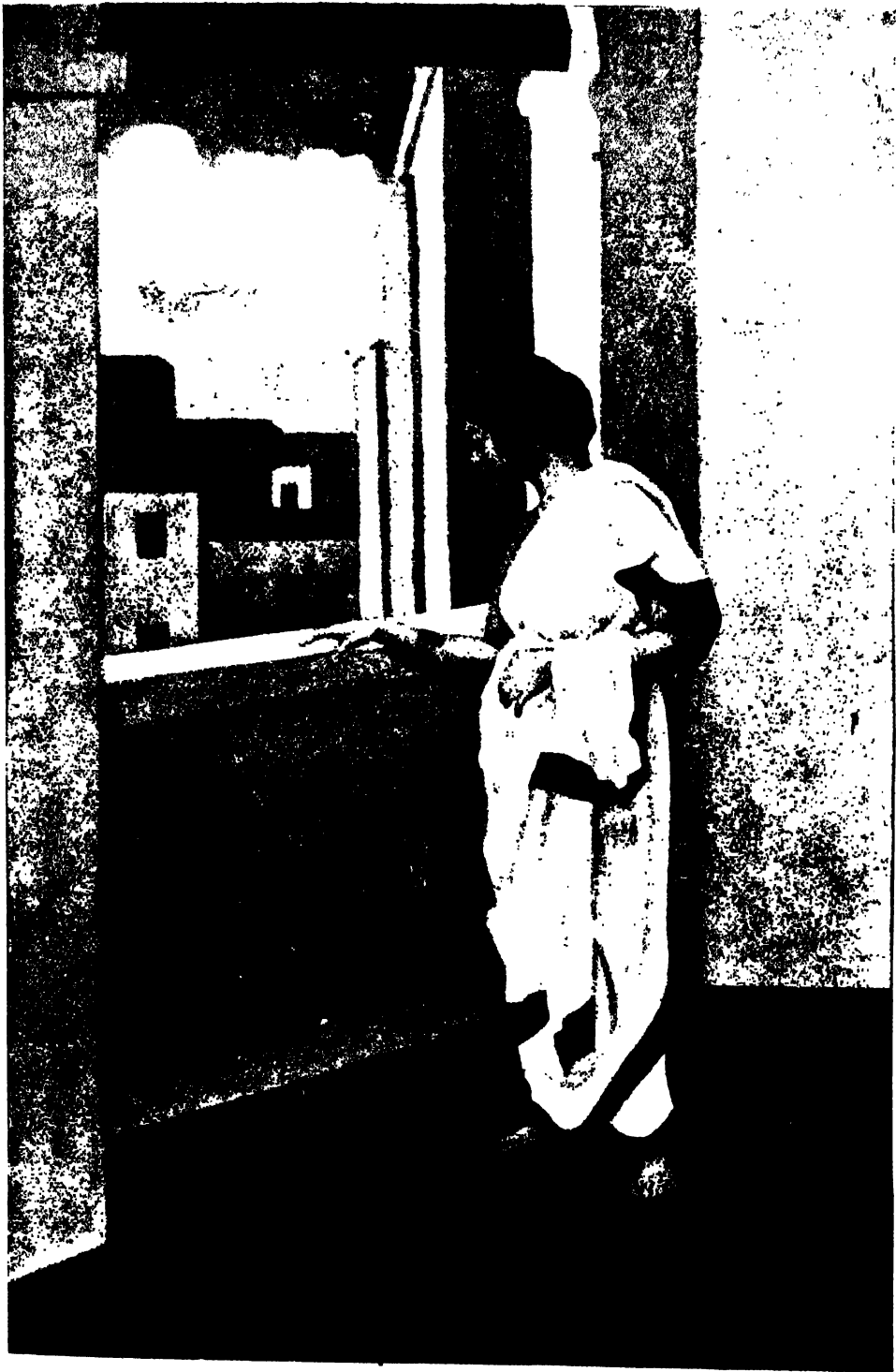
ঘরে ও বাহিরে

বসুমতী প্রেস | | শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ |

কেবল কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইত। কিন্তু ক্রমশঃ সে ব্যবধান ও সঙ্কোচ কাটিয়া গেল; রেখা মনোহরের প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং নিজেও কখন কখন ২।১টি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

এক দিন মনোহর রেখাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জোৎস্না-রাত্রিতে আপনি কখন সমুদ্র ভাল ক'রে দেখেছেন?"

রেখা বলিল—"না।"

"আজ পূর্ণিমা, যদি যেতে চা'ন, আজ আপনাকে ও মা'কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'ব। সে কিন্তু সত্যই দেখবার জিনিষ। যা'বেন?'

রেখা মৃদু স্বরে বলিল—"যদি আপনারা সবাই যান, যা'ব।"

"আজ শরীর কেমন আছে?"

"ভালই আছে।"

"মা বল্‌ছিলেন—কা'ল নাকি palpitation একটু বেড়েছিল?"

"এখন কমেছে।"

"কিন্তু দেখে শরীর ভাল আছে ব'লে মনে হয় না। আচ্ছা আমি মা'কে জিজ্ঞাসা ক'রে আস্‌ছি।"

রেখা ও মনোহর বারান্দায় বসিয়া কথা কহিতেছিল। রেখার মা সম্মুখের ঘরে একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন; দুই জনেরই কথাবার্ত্তা প্রায় সবই শুনিতে পাইতেছিলেন।

মনোহর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"মা!"

রেখার মা মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি বাবা!"

"রেখা বল্‌ছেন, আজ সে palpilationএর ভাবটা কমেছে!"

"বল্‌ছে ত একটু কমেছে! তবে সব সময়ে ওর কথা বিশ্বাসও করা যায় না। শরীরকে যে অগ্রাহ্য করে!"

"রেখার যা' অসুখ, তা'তে সকালে সন্ধ্যায় একটু একটু বেড়ান আর প্রচুর নির্ম্মল হাওয়ায় থাকা একান্ত দরকার। আপনি যদি বলেন, আপনাদের দু'জনকে আমি রোজ সকালে বিকালে সঙ্গে ক'রে বেড়িয়ে আনতে পারি।"

"তা' বেশ। তোমার ত, বাবা, চেষ্টার যত্নের ত্রুটি নেই। আমাদের জন্য ঢের কচ্ছ।"

"আমি আপনাদের জন্য এর চেয়ে ঢের বেশী করবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকি—কিন্তু আপনাদের কত-টুকু কাযের ভার আমার উপর দেন?"

"না, বাবা, সে কথা বলো না। তুমি যা' কর্‌ছ, খুব কর্‌ছ।"

"আজ পূর্ণিমা জানেন ত, মা। পূর্ণিমা-রাতে তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র অতি সুন্দর দেখায়। আজ বিকালে বেড়াতে না গিয়ে সন্ধ্যার পর আপনাদের নিয়ে যা'ব। আপনি গেলে রেখাও যাবেন বলেছেন।"

"বেশ, তাই যা'ব। হ্যাঁ, তুমি যে সে দিন বল্‌ছিলে, তোমার মা'কে আনাবে; তা'র কি হ'ল?"

"মা'কে চিঠি লিখেছি। দু'এক দিনের মধ্যেই তিনি এসে পৌঁছোবেন।"

"বেশ হ'বে; তিনি এলে আমিও একটু হাঁফ ছেড়ে কথা কয়ে বাঁচব।"

"হ্যাঁ, মা, এলে দেখ্‌বেন, আপনাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। রেখাকেও তিনি এমন ক'রে ঘরের কোণে মুখ কালো ক'রে ব'সে থাক্‌তে দেবেন না। মা যেখানে থাকেন, তা'র ত্রিসীমায় দুঃখ-কষ্ট আস্‌তে পারে না।"

মা'র কথা বলিতে বলিতে মনোহরের মুখ-চোখ দীপ্ত ও সুন্দর হইয়া উঠিল।

মনোহর আবার বলিল—"দেখবেন, মা এলে আপনার খুব ভাল লাগবে। বাবা যখন মারা যান, মা তখন এক হাতে বিষয়ের কায দেখেছেন, অপর হাতে আমাকে মানুষ করেছেন—মা'র চোখের জল ফেল্‌বার সময় ছিল না। এ দিকে তাঁ'র অন্তরটা দুঃখের আগুনে দিন-রাত পুড়েছে। মা'র এই অসহায় অবস্থা দেখে আমাদের কত জ্ঞাতি-শত্রু কত রকমে শত্রুতা কর্‌তে চেষ্টা করেছে; কিন্তু মা কাউকে ত্যাগের দ্বারা, কাউকে শক্তির দ্বারা, কাউকে বা স্নেহের দ্বারা জয় করেছেন। মা'র স্নেহ যে একবার পেয়েছে, সে-ই মা'র কাছে মাথা নীচু করেছে—মুহূর্ত্তে মা'র কাছে বশ মেনেছে। মা'রই কাছে শুনিছি, দশ বৎসর বয়সে আমার একবার শক্ত অসুখ হয়। ডাক্তার

বলেছিলেন, একটু নড়লে চড়লে পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু হ'তে পারে। অথচ আমার যন্ত্রণা, অস্থিরতা এত বেশী যে, বিছানায় চুপ ক'রে শোয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যত কষ্টই হ'ক না কেন, মা'র কোলে গেলে শরীর-মন যেন জুড়িয়ে যেত; মা'র কোলে চুপ ক'রে শুয়ে মা'র মুখ পানে চেয়ে থাকৃতাম। শুনূলে অসম্ভব মনে হ'বে, তিন দিন তিন রাত মা আমাকে কোলে ক'রে ঠায় ব'সে ছিলেন; তিন তিনটে দিন একবার সেখান থেকে উঠেননি, কিছু খাননি, একবার চোখ পর্য্যন্ত বুজেননি। সবাই বলেছিলেন, আমার মা'র অপূর্ব্ব ক্ষমতায় আমি বেঁচেছি।"

মনোহরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এমন সময় ভৃত্য মনোহরের মা'র টেলিগ্রাম লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। সাদা কাগজখানিতে প্রভুর সহি লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। মনোহর লালচে খামখানি ছিঁড়িয়া টেলিগ্রাম পড়িল। আনন্দে তাহার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল—"মা ভোরের ট্রেণে আস্‌ছেন।" বলিতে বলিতে তাহার আনন্দোজ্জ্বল চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

৬

সন্ধ্যার ঠিক পরেই মনোহর আসিয়া ডাকিল—"মাসীমা!"

উত্তর না পাইয়া মনোহর পুনরায় ডাকিল, "মাসীমা আছেন?"

ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ ছিল, খুলিয়া দিয়া রেখা বলিল—"মা আর মাসীমা দু'জনে একটু সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছেন। আপনি আসুন।"

সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দুই জনে দুইখানি আসনে বসিল।

মনোহর বলিল, "আপনি কেন সঙ্গে যাননি?"

"শরীরটা আজ ভাল নেই, তাই বা'র হইনি।"

"আপনি মোটে বাইরে যাবেন না, কেবল ব'সে ব'সে বই পড়বেন, আপনার শরীর কি ক'রে সারবে, বলুন?"

"কেন, মাসীমা আসার পর থেকে ত রোজই প্রায় বেড়াতে বা'র হই।"

"কোথায় যান রোজ? আগে কালেভদ্রে যেতেন, আজকাল তবু মাঝে মাঝে যান; তাও আবার একটু থেকেই চ'লে আসেন। আমি সঙ্গে থাকলে যদি আপনার সঙ্কোচ হয়, সেই জন্য আজকাল মা'কে পাঠিয়ে দিই। তাতেও আপনি না গেলে কি ক'রে চলবে?"

"না, আমি ত সঙ্কোচ করিনে। আমার সব সময়ে যেতে ভাল লাগে না, তাই যাইনে। আর এক এক সময়ে শরীর এমন অবসন্ন হয়ে আসে যে, পড়তেও ইচ্ছা করে না।"

কথাগুলা এত অবসন্ন হৃদয় হইতে আসিল যে, মনোহর চমকিয়া রেখার মুখের দিকে চাহিল—সে মুখে গভীর অবসাদের গাঢ় চিহ্ন যেন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

মনোহরের একবার মনে হইল, এ অবসাদ কিসের? শুধু কি শরীরের? না, ইহাতে মনের আঘাতের কোন প্রতিচ্ছবি আছে? মনোহর ভাবিল—যদি তাহাই হয়, সে আঘাত, সে ব্যথা দূর করিবার কি কোন উপায় নাই?

কিন্তু সে প্রসঙ্গ না তুলিয়া মনোহর বলিল—"আপনি ত আমার কথা শুনবেন না। প্রায় দু'মাস হ'ল চেঞ্জে এসেছেন, আসল যা' দরকার—একটু বেড়ানো টেড়ানো—নিয়মমত খাওয়া-দাওয়া, সে আপনি করেন না। একটা মাস আপনি আমার কথা শুনুন দিকি; দেখুন, কি পরিবর্ত্তন হয়।"

বলিয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার বলিল—"কা'ল থেকে খুব ভোরে এসেই আপনাকে ডেকে নিয়ে যা'ব, কিন্তু যাবেন ত?"

মনোহরের এই আগ্রহকে রেখা উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহাকে ঘাড় নাড়িয়া ছোট্ট একটি "হাঁ" বলিতে হইল। কিন্তু রেখা মনে শান্তি পাইতেছিল না। এই যে ধীরে ধীরে পরিচয়ের মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গ হওয়া,ইহার ভিতর স্মৃতির একটা গভীর ব্যথা আছে। তাহার ও মৃগাঙ্কের মধ্যে পরিচয়ফলে প্রেম জন্ম লাভ করিয়াছিল। সে ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। পুরীতে আসিবার আগে সে এত করিয়া পত্র লিখিয়া আসিল, মৃগাঙ্ক এক ছত্র লিখিয়াও তাহার উত্তর দিল না। মৃগাঙ্কেরই দৃষ্টি সে আজ মনোহরের চক্ষুতে দেখিতেছে। অথচ আজ পর্য্যন্ত

মনোহর এমন একটি কথা বলে নাই—যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র দোষ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কলিকাতায় তাহার পিসীমা ইত্যাদির যে কয় জন আত্মীয় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দিকে চাহিলেই তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যাইত; কিন্তু মনোহরের ব্যবহারে বিতৃষ্ণার কোন অবসর ছিলই না; বরং তাহার দুর্ভাগ্যময় চিত্ত যদি মৃগাঙ্কের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ না থাকিত, তাহা হইলে সেখানে হয় ত মনোহরের স্থান হইত।

রেখার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া মনোহর বলিল—"আচ্ছা, আপনার—কলকাতা ভাল লাগত, না পুরী ভাল লাগে?"

রেখা মৃদুস্বরে বলিল, "আমার কাছে দু'যায়গাই সমান।"

মনোহর বলিল, "আমার কাছে কিন্তু পুরীই খুব ভাল লাগে।"

"আপনার দেশের চেয়েও ভাল লাগে কেন?"

"এখানে এমন সমুদ্র, এমন চাঁদের আলো, তা'র পর আপনাদের সঙ্গে পরিচয়—এততেও ভাল লাগবে না?"

জ্যোৎস্না আসিয়া বারান্দা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। রেখার মুখে-চোখে ও ললাটে জ্যোৎস্না যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। মনোহর একবার রেখার জ্যোৎস্নাফুল্ল মুখের দিকে কিছুক্ষণের জন্য চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল। তাহার মনে হইল, দৃষ্টিতেও যেন এ সৌন্দর্য্য মলিন হইতে পারে।

এই জ্যোৎস্না-পুলকিত ধরণীর এক প্রান্তে রেখা যে তাহার কাছে বসিয়া, ইহারই অপার্থিব সুখে মনোহরের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে রেখার মা ও মনোহরের মা ফিরিয়া আসিলেন। মনোহরকে দেখিয়া রেখার মা বলিলেন, "এই দেখ, বাবা, আমরা দু'বোনে যাবার আগে রেখাকে ডাক্‌লুম—'চ যাবি', ও যেতে রাজী হ'ল না; কিন্তু আমাদের জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলে। তুমি এসেছিলে, তাই তবু দু'দণ্ড কথা ক'য়ে বাঁচল—নইলে ত এতক্ষণ একলাটি মুখ বুজে থাকতে হ'ত।"

মনোহর বলিল, "কা'ল থেকে আমি এসে আপনাদের সবাইকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'ব। কি বল, মা?"

মনোহরের মা মধুর হাসিয়া বলিলেন, "তা' বেশ।"

তাহার পর রেখার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "না বেড়ালে-টেড়ালে কি শরীর ভাল থাকে, মা?"

তিনি মনোহরকে বলিলেন, "এখন তা' হ'লে চ' আমরা যাই।"

রেখার মা বলিলেন, "আর একটু বোসো না, দিদি।"

"না ভাই, এবার উঠি" বলিয়া তিনি উঠিয়া অগ্রসর হইলেন।

মনোহর মা'র অনুসরণ করিল। বাহিরে আসিয়া মনোহর বলিল, "মা, আমি একটু সমুদ্রের ধার হয়ে যা'ব?"

"তা' বেশ, তুই ঘুরে আয়—আমি ততক্ষণ রান্নাটা ক'রে নিই গে।"

মনোহরের মা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে মনোহর একা সমুদ্রের ধারে গেল।

সমুদ্রের জলে ও তীরে তখন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি! শুভ্র স্নিগ্ধশান্ত জ্যোৎস্নাধারা যেন অনন্ত বিরাট আকাশের সঙ্গে দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রের মিলনের রাখি বাঁধিয়া দিয়াছে। চন্দ্র-কিরণের অমৃতধারার স্পর্শে সাগর-বক্ষ দুলিয়া কাঁপিয়া ফুলিয়া ফলিয়া উঠিতেছে। আর চারি দিক উপরের বিরাট আকাশের সঙ্গে স্থির মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া আছে।

মনোহর অপলকনেত্রে জ্যোৎস্নাধারার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চিত্ত এই বিগলিত জ্যোৎস্না, এই উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-বক্ষ ও তরঙ্গাহত বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া রেখার শান্ত, সুন্দর ও মধুর মুখশ্রীর দিকে কল্পনার শত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিল। যে জ্যোৎস্নাধারা রেখাকে স্পর্শ ও সিক্ত করিয়া সমুদ্রের বারিরাশিকে আলোড়িত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে—সেই জ্যোৎস্নাই তাহার মুখে ও ললাটে রেখার স্পর্শের মত—ভাবিতে মনোহরের দেহ বার বার শিহরিয়া উঠিল।

রেখা তখন ভাবিতেছিল—মৃগাঙ্ক কোথায়?—সে কি তবে আসিবে না?

৭

এক পক্ষ পরে অন্ধকার রাত্রিতে মাতা ও পুত্রে কথা হইতেছিল।

"মনো। ঘুমুলি, মনো?"

"কি বল্‌ছ, মা?"

"ঘুমুচ্ছিলি?"

"না—মা, জেগেই ছিলাম।"

"তবে প্রথম ডাকে উত্তর দিলিনে যে?"

"অন্যমনস্ক ছিলাম, মা, তাই।"

"কি ভাবছিলি, বাবা? চুপ ক'রে রইলি যে? রেখার কথা ভাবছিলি?"

"হ্যাঁ, মা।"

মা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে বলিলেন, "মনো"—

ছেলে উত্তর দিল, "মা!"

"আমি যদি একটা শক্ত কথা বলি, সহ্য করতে পার্‌বি?"

"সহ্য করতে চেষ্টা কর্‌ব, মা,—বল।"

"রেখার কথা যদি তোকে ভাবতে বারণ করি, পার্‌বি?"

পুত্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কেন, মা, এ কথা কেন বল্‌ছ?"

"তুই কি কিছু বুঝতে পারিস্‌নি, মনো?"

"না, মা! কিসের কথা তুমি বল্‌ছ?"

মা'র একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "৩।৪ মাস তোরা একসঙ্গে রয়েছিস্‌—রেখাকে দেখে মনে হয়নি যে, তা'র মনে একটা গভীর দুঃখ রয়েছে?"

"না, আমি ভেবেছি, তা'র শরীর খারাপ, তাই অমন বিষণ্ণ।"

"পাগল! তা কি হয়? এ কি শরীরের দুঃখ? আমি যে প্রথম দিন ওকে দেখেই বুঝেছি!"

"তবে কিসের দুঃখ, মা?"

"মনের দুঃখ। বাছা বড় বিষম আঘাত পেয়েছে। তা নইলে দু'মাস তোর সাহচর্য্যে থেকেও ওর মুখে হাসি ফোটে না!"

"তুমি ওর দুঃখের কথা সব জান্‌তে পেরেছ, মা?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"কি বল না, মা?"

"বল্‌ব? কিন্তু বড় দুঃখ পাবি, বাবা!"

"দুঃখ যদি পেতেই হয়, তবে তা' থেকে কি ক'রে বাঁচাবে? সে ত শোনাই ভাল।"

"রেখার বাবা বড় অবুঝের কায করেছেন। তাঁ'র এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে রেখার অনেক দিনের পরিচয়। বিয়ে হবার কথাও প্রায় ঠিক হয়ে থাকে। সেই বন্ধুর সঙ্গে রেখার বাপের দুই এক বিষয়ে মতের অমিল হয়—তাঁ'রই ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে। বন্ধু বলেন, 'ওকে ব্যবসা শিখতে দাও।' বাবা বলেন, 'না, ও পড়ুক, বিদ্বান্‌ হোক।' শেষে বন্ধু ব্যবসা কর্‌তে যেয়ে সর্ব্বস্বান্ত হলেই রেখার বাবা বলেন, তিনি আর কিছুতেই ও ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। ছেলেটিকে তিনি বাড়ীতে আর আস্‌তে পর্য্যন্ত নিষেধ ক'রে দিলেন। রেখা সে ছেলেটিকে সত্যিই বড় ভালবাসত। সে চ'লে যাওয়ার পর থেকে রেখার মন একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে।"

অনেকক্ষণ মাতা-পুত্র নিস্তব্ধ রহিলেন। মা-ই প্রথমে কথা কহিলেন, "মনো, তোকে বড় ব্যথা দিলাম?"

"না, মা; এ ত জানতেই হ'ত। আগে জেনে বরং ভাল হ'ল।"

"কি ভাবছিস্‌, মনো?"

"রেখার কথা। ভাবছি, বাপ হয়ে মেয়েকে এমন কষ্ট দেয়?"

মা'র শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল; কেবল রেখার কথা ভাবিয়া নহে, তাঁহার নিজের ছেলের কথা ভাবিয়াও। মা হইয়া তিনিও ত পুত্রকে কম দুঃখ দিলেন না।

"মা!"

"কি, বাবা?"

"আলোটা নিবিয়ে দাও না! চোখে বড় লাগছে।"

মা আলো নিভাইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া দিলেন। বহুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিলেন না।

"এবার কি কর্‌বি, বাবা?"

"রেখাকে আর নির্যাতন না ক'রে কি ক'রে সে সুখী হ'বে, তা'রই চেষ্টা কর্‌ব।"

"কি ক'রে সে চেষ্টা কর্‌বি?"

"যা'র তা'র সঙ্গে প্রথম বিয়ের কথা হয়, তাঁ'কে আগে জান্‌তে হ'বে; পরে যা'তে বিয়ে হয়, তাই কর্‌তে হ'বে।"

"তা'র পর তুই কি কর্‌বি?"

"এটা আগে শেষ হ'ক। আমার কথা পরে হ'বে, মা।"

"এই ত তোর উপযুক্ত কথা, বাবা। কিন্তু আমি তোকে বড় দুঃখ দিলাম।"

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মা পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। পুত্রের চক্ষুতেও অশ্রু। অন্ধকারে দুই জনের অশ্রু দুই জনেরই অজ্ঞাত রহিল; বাহির হইতে সমুদ্রের উদার গম্ভীর অবিশ্রান্ত শব্দ আসিতে লাগিল। অন্ধকার আকাশের বুকে দীপ্ত নক্ষত্র বাতায়নপথ দিয়া মাতা ও পুত্রের অশ্রুপূর্ণ নেত্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

৮

পরদিন প্রাতে মনোহর আসিয়া রেখাকে ডাকিল। রেখা পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল। মনোহরের দিকে চাহিয়া সে বলিল—"আপনাকে ও রকম দেখাচ্ছে কেন? অসুখ করেছে?"

মনোহর একটু হাসিয়া বলিল—"কই, না। তাড়াতাড়ি এলাম, চলুন, আজ একবার বেড়িয়ে আসি।"

রেখা কি একটা কথা কহিবার জন্য মনোহরের দিকে অসহায়ের মত চাহিল; তাহার পর তাহা না বলিয়া ঘরের ভিতর গেল ও গায়ের একটা চাদর লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল।

আজ মনোহর নির্জ্জনে তাহাকে ভালবাসার কথা বলিয়া বিবাহের প্রস্তাব তুলিবে, ইহা অনুমান করিয়া রেখা আপনাকে বিপন্ন মনে করিল।

পাশাপাশি চলিতে চলিতে উভয়ে সমুদ্রতীরে আসিল, পূর্ব্বাকাশে তখনও স্বর্ণকলস দেখা দেয় নাই। দুই চারি জন লোক কূলে সমবেত হইয়াছে—কেহ বেড়াইতেছে, কেহ বসিয়া আছে, যে স্থানে কোন লোক নাই—সেই স্থানে দুই জনে বালির উপর বসিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নির্ব্বাক্।

মনোহর প্রথম কথা কহিল—"আপনার শরীর ত সার্‌ছে না।"

রেখা লজ্জিতভাবে বলিল—"আগেকার চেয়ে ত ভাল আছি।"

"কোথায় ভাল আছেন! দেখুন, আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে। আপনার মনে যে দুঃখ আছে, আমি তা' জান্‌বার বা দূর কর্‌বার মোটেই চেষ্টা করিনি।"

রেখা স্পন্দিত বক্ষে ও অবনত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মনোহর আবার বলিল—"কা'ল রাত্তিরে আমি মা'র মুখে আপনার কথা কিছু শুনেছি। শুনে আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। অবিশ্যি সেই সঙ্গে আমার নিজের উপর শ্রদ্ধা সেই পরিমাণে কমে গেছে।"

রেখা কি বলিবে, ঠিক করিতে না পারিয়া পূর্ব্বের মতই নির্ব্বাক্ রহিল।

মনোহর বলিয়া যাইতে লাগিল—"যাঁ'র সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা ছিল, তাঁ'র নাম ও ঠিকানা আমায় দিন, আমি চেষ্টা কর্‌ব,—যদি আপনার দুঃখ দূর কর্‌তে পারি।"

রেখা প্রথমে এক বার চমকিয়া উঠিল; তাহার পর কাঁদিয়া ফেলিল।

মনোহর কাতর ভাবে বলিল—"আপনি কাঁদ্‌বেন না। আপনার চোখের জল দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়, আর মস্ত একটা আত্মগ্লানি হয় যে, দু'টা মাস আপনার কথা আমি একটুও ভাবিনি, খালি নিজের কথা ভেবেছি। আপনি তাঁ'র নাম বলুন।"

রেখা চোখ মুছিয়া বলিল—"সে চেষ্টা বৃথা হ'বে। বাবার ওতে অমত।"

তাহার চোখে আবার জল আসিল।

মনোহর রেখার সজল চোখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তা' হ'ক। তবু আপনি বলুন।"

রেখা তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মনোহর তখন তাহার পকেট হইতে নোট-বই ও পেন্‌সিল রেখার হাতে দিয়া বলিল—"আপনি এতে লিখে দিন।"

রেখা ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে পেন্‌সিল ও নোট-বই লইয়া নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিল।

পড়িয়া মনোহর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"অ্যাঁ, মৃগাঙ্ক! সে যে আমার বন্ধু! নামটা যদি আগে আমায় বল্‌তেন!"

তাহার পর স্বর নামাইয়া মনোহর বলিল—"আপনাকে আমি যেটুকু অন্য ভাবে দেখেছি, তা'র জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রথমতঃ দেখুন, আমি এর কিছু বুঝতে পারিনি। তা'র পর আপনি যে মৃগাঙ্কের অনুরক্ত, সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। তা' হ'লে কি আপনাকে কোন কষ্ট পেতে দিই।"

রেখা সজল নেত্রে চাহিয়া বলিল,—"আপনি আমার কাছে কিছু অন্যায় করেন নি। আমার অদৃষ্টে দুঃখ। আমার জন্য আপনিও যে আমার মত দুঃখ পেলেন, এও আমার আর একটা দুঃখ।"

মনোহর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আপনি সে কথা কিছু ভাববেন না। আপনাকে ব'লে যাচ্ছি, আজই আমি মৃগাঙ্কের সন্ধানে যা'ব। যে রকমে পারি, আমি আপনাকে সুখী করবার চেষ্টা করব। আপনি একটা কায করবেন, আমি যে এখান হ'তে চ'লে গেছি, এ কথা আপনার বাবাকে এখন লিখবেন না; আর এক মাসের মধ্যে আপনি এখান হ'তে কল্‌কাতায় যাবেন না। মনে থাকবে ত?"

রেখা মৃদু স্বরে বলিল—"হ্যাঁ।"

"আর দেখা হ'লে মৃগাঙ্ককে এ কথা কিছু বলবেন না।"

রেখা ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল।

পূর্ব্ব-গগনে তখন স্বর্ণকলস ভাঙ্গিয়া বালারুণ উদিত হইল। দুই জন কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর উভয়ে বাসার দিকে ফিরিল।

মনোহরের চিত্তে তখন আশার সূর্য্য অস্তমিত। রেখার চিত্ত অরুণোদয়ে উজ্জ্বল।

৯

ছয় মাস পুরীতে থাকিয়া রেখারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। জীবনকৃষ্ণ জানিয়াছিলেন, মনোহরের বিবাহে মত নাই। তিনি অন্য পাত্র দেখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বুঝাইয়াছিলেন যে, রেখা বার বার বড় আঘাত পাইয়াছে; মন স্থির করিবার জন্য তাহাকে অন্ততঃ আরও ছয় মাস সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। কাযেই বিবাহের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

রেখা প্রথমে আশা করিয়াছিল, হয় ত মনোহর মৃগাঙ্ককে খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং পিতাকে বলিয়া মৃগাঙ্ককে ফিরাইয়াও আনিবে। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে আশা ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। রেখা দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়িল। রেখার অবস্থা দেখিয়া জীবনকৃষ্ণের মনে অনুতাপ জন্মিল। জিদের বশে একমাত্র মেয়ের এমন ক্ষতি কেন তিনি করিলেন? কি ভাবিয়া তিনি একবার মৃগাঙ্কের সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধানই মিলিল না।

হঠাৎ এক দিন মৃগাঙ্কের একখানি পত্র আসিল; তাহার সঙ্গে ২০ হাজার টাকার চেক। পত্রে লিখা ছিল—

শ্রীচরণেষু,

কাকা, আপনার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি নানা স্থানে ঘুরিয়াছি। শেষে আপনার উপদেশ গ্রহণ করিয়া ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছি। আপনার আশীর্ব্বাদে কিছু সুবিধাও হইয়াছে। যে ঋণদায়ের জন্য আমার পিতা দেউলিয়া হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা পরিশোধের জন্য আপনার নামে ২০ হাজার টাকার চেক্ পাঠাইলাম। বাবার কাছে যে ১০ হাজার টাকা পাইতেন, সেই টাকা আপনি গ্রহণ করিবেন ও বাকী টাকা নিম্নলিখিত পাওনাদারদের দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আপনি আমার পিতৃবন্ধু—পিতৃতুল্য, সেই জন্য আপনার উপর এই ভার অর্পণ করিলাম।

আর একটা কথা। রেখার কাছ হইতে দূরে থাকিবার আদেশ পাইবামাত্র আমি দূরে অজ্ঞাতবাসে চলিয়া আসিয়াছিলাম। এত দিন পরে কেবল আপনাকে আমার ঠিকানা জানাইলাম। তবে এ কথা সত্য যে, রেখার প্রতি আমি এখনও অনুরক্ত এবং এ অনুরাগ না মরিলে যাইবে না। আমার বিশ্বাস, আমার নির্ব্বাসন-দণ্ডে রেখাও সুখী হয় নাই। রেখার যদি বিবাহ না হইয়া থাকে, আমি এই শেষবার রেখাকে প্রার্থনা

করিতেছি। যে কারণে আপনি আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন, সে কারণ আমি দূর করিয়াছি। এখনও কি আপনার পূর্ব্ব-স্নেহ ফিরিয়া পাইব না ?

আপনার স্নেহপ্রার্থী

মৃগাঙ্ক।

জীবনকৃষ্ণ পত্র পড়িয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মনে পড়িল, মৃগাঙ্কের অর্থ ছিল না, তাই তিনি মৃগাঙ্কের মত যোগ্য পাত্রকেও খেয়ালের বশে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। যে প্রেমের শক্তিতে মৃগাঙ্ক রেখার কাছ হইতে আপনাকে বহু দূরে লইয়া যাইয়া ঐকান্তিক চেষ্টায় বৎসরখানেকের মধ্যে পৈতৃক ঋণ শোধ করিয়া ফেলিয়াছে, তিনি শুধু অর্থের অহঙ্কারে সে প্রেমের অমর্য্যাদা করিয়াছিলেন। ইট-কাঠ লোহা ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তিনি হৃদয়ের জ্ঞান হারাইয়াছিলেন, তাই এত বড় একটা অন্যায় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যে দিন তাঁহার তরুণ নয়নের সম্মুখে প্রতিভাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই দিনের কথা স্বপ্নের মত তাঁহার স্মৃতিপটে এক বার ভাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তিনি অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। সেই দিনই তিনি মৃগাঙ্ককে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন—"শীঘ্র ফিরিয়া আইস। আসিলেই তোমার সহিত রেখার বিবাহ হইবে।"

মৃগাঙ্কের পত্রখানি ও তাঁহার টেলিগ্রামের নকল তিনি বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া রেখা চিঠিখানি চোখের জলে ভিজাইয়া তুলিল।

১০

প্রফুল্ল চন্দ্রকিরণে জীবনকৃষ্ণের পত্রপুষ্প-সজ্জিত বিশাল অট্টালিকা ধৌত স্নাত হইয়া শোভা পাইতেছে। অট্টালিকার অধিকাংশ বৈদ্যুতিক আলো নিভাইয়া দেওয়ায় অট্টালিকা ভরিয়া শান্ত স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

আজিকার প্রফুল্ল সন্ধ্যায় মৃগাঙ্ক ও রেখার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের কোলাহল নিবৃত্ত। গৃহের প্রায় সব নরনারী আপন আপন কক্ষে নিদ্রামগ্ন। শুধু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুসজ্জিত একটি কক্ষে মৃগাঙ্ক ও রেখা উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। মৃগাঙ্ক বলিতেছিল—"আজকের এ আনন্দের যে মূল, আজ তা'র কথা কেবলই মনে হচ্ছে।"

রেখা চমকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"তিনি কে ?"

"সে আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু—তা'র কথা তোমায় বলা হয় নি।"

রেখা জিজ্ঞাসু নয়নে মৃগাঙ্কের দিকে চাহিয়া রহিল।

মৃগাঙ্ক বলিয়া যাইতে লাগিল—"সেই যে তোমার কাছ থেকে একরকম নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাই—তখন ভাবিনি যে, আর কখন ফিরে আসতে পারব। মনের দুঃখে একটা চাকরী পেয়ে ব্রহ্মে চ'লে যাই। মনে ধিক্কার জন্মেছিল যে, যে টাকার জন্য তোমাকে হারালাম, সেই টাকা রোজগার না ক'ল্লে জীবনই বৃথা। কিন্তু উপায়-কিছুই কর্ত্তে পারিনে। মাইনের টাকা বাবাকে পাঠিয়ে যা' থাক্‌ত, তা'তে নিজের খরচই চল্‌ত না। টাকা জমাবার বদলে মনে ধিক্কারই কেবল জমা হয়ে উঠতে লাগল। মাস দুই এমনই ক'রে কেটে যেতে হঠাৎ এক দিন দেখি, আমার সেই বন্ধু এসে উপস্থিত। সে খুব ধনী। ভাবলাম, সে বুঝি বেড়াতেই এসেছে। আমার কাছেই সে রইল। বহু দিন পরে দু'জনে কত কথাই হ'ল। কথায় কথায় সে আমার সব দুঃখ জেনে নিল। তা'রই কথামত চাকরী ছেড়ে কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করলাম। ৩।৪ মাসের মধ্যে অনেক টাকা লাভ হ'ল। সে তখন বল্লে—তোমার হাতেই এই ব্যবসার ভার থাকবে; কারণ, আমি ত কিছু দিন পরেই চ'লে যা'ব। তবে একটা কথা—তোমাকে তা'র আগে অঋণী হ'তে হ'বে। তোমারও কিছু টাকা জমেছে; বাকী আমার কাছ থেকে নিয়ে তোমার পৈতৃক দেনা শোধ কর। সে-ই মনে করিয়ে দিলে,—হয় ত তোমার বিয়ে এখনও হয় নি। টাকা পাঠিয়ে সমস্ত দেনা শোধ ক'রে বিয়ের জন্য প্রার্থনা তা'রই কথামত করেছিলাম। সে আমার জীবনটাকে সফল করেছে। তা'র ঋণ জীবন দিলেও শোধ যা'বে না।"

রেখা রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁ'র নাম ?"

"মনোহর।—এ কি, তুমি কাঁদছ যে ?"

"তাঁ'র কথা ভেবে। তিনি এলেন না কেন ?"

রেখা চক্ষু মুছিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

মৃগাঙ্ক বলিল, "দু'জনে এলে কাযের ক্ষতি হ'বে, তাই সে সেখানেই রইল। কেবল আস্‌বার সময় এই মুক্তার মালাছড়াটি তোমার জন্য দিল।"

বহুমূল্য মুক্তার মালাছড়াটি রেখার গলদেশে নির্ম্মল জ্যোৎস্নারেখার মত শোভা পাইতেছিল। রেখার মনে হইল, ইহা যেন মনোহরের নির্ম্মল উদার হৃদয়ের অভিব্যক্তি।

রেখার মন চাহিতেছিল, মনোহরের গোপন কথাটি বলিয়া আপনার মনটা শান্ত করে; কিন্তু মনোহর নিষেধ করিয়া গিয়াছে বলিয়া সে কথাটা তখনকার মত সে চাপিয়া গেল। শুধু উপহৃত মালাগাছটি দক্ষিণহস্তে স্পর্শ করিয়া রেখা মনোহরের উদ্দেশে ঘরের মেঝেয় মাথা ঠেকাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

যখন রেখা মুখ তুলিল, তাহার দুই চক্ষুতে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া রহিয়াছে।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

দাম্পত্য-চণ্ডীপাঠ

(প্রথম কল্প)

হে আমার "ওগো!" হে আমার "শুনছো?"
হে আমার "বুঝে পেলে" হে আমার "গুণ্‌ছো?"
হে আমার "আহা আহা" হে আমার "তাই তো।"
হে আমার "হেঁ-হেঁ-হেঁ দেখি যদি পাই তো।"
হে আমার "অতুলনা" হে আমার "চুল-খুলনা",
হে আমার "চুমোময়ী" ওগো আমার "ঘুম-ভুলোনা"
হে আমার "রাগ্‌ রাগ্‌" ওগো আমার "মুখভার।"
হে আমার "অসুখ অসুখ"—মুখপোড়া ডাক্তার॥
প্রাতে তুমি চায়ের কাপ্‌, হুইস্কি সন্ধ্যাবেলা।
কাব্য তোমার বকাবকি, তুমি "হকি খেলা"॥
বাবা আমায় বে'র বাজারে—
বেচেছেন তোমায় পাঁচ হাজারে॥
তার ওপরে চেহারা মোলাম।
করেছে আমায় তোমার গোলাম॥
তোমার কালো ফুলো এলো কেশ।
আমার ভারতবর্ষ আমার স্বদেশ॥
আমার মাম্‌লা শাম্‌লা ওকালতী;
তোমার জন্য-ই সব, মালতী।
তুমি আমার হাসি, টিয়ার, ফিয়ার, কেয়ার।
অসার "ডে-ড্রিম্‌" আর "নাইট মেয়ার॥"
তোমার তরে পকেট ভ'রে নিত্য আনি নোট।
কিনবে তুমি ব্লাউজ জ্যাকেট সিল্কের পেটি-কোট॥
নূতন পাটে শিক্ষা দিতে তুমি শিশুবোধ।
দিতে দক্ষিণা সে শিক্ষাদানে বিয়ের দেনা শোধ॥
জগতে দেখিনি আমি সুন্দরী ঈদৃশা।
(তাই) তোমার তরে অধর ভ'রে এনেছি লো তৃষা
(আর) এনেছি খানকত এই নূতন উপন্যাস।
কাব্য-জ্যোতি বিজলী বাতি সুইট অয়েল গ্যাস॥
বুক-ভরা প্রেম এনেছি—গলায় গদগদ্‌।
গোয়ার বাড়ীর চোরাই মাল, নূতন পরিচ্ছদ॥
যুক্ত করে ভক্তিভরা আছে আকিঞ্চন।
চক্ষু-গর্ত্তে জল, কর্ণ্তে চরণে সিঞ্চন॥
দৃঢ় বাহু জোড়া আছে গাঢ় আলিঙ্গন।
হৃদয়-ভরা উচ্চ আশা সমুদ্র ডিঙ্গন॥
চোখের চশমা ঠোঁটের সিগার বুকের তুমি পাঁজরা।
ললিতলবঙ্গলতা হে মালতী হাজরা॥
প্রেমে তুমি মডারেট আমি একষ্ট্রিমিষ্ট।
তবু যুগল মিলে গেছে বিউটী এণ্ড বীষ্ট॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

শোধ-বোধ

প্রথম দৃশ্য

মিষ্টার লাহিড়ির ড্রয়িংরুম

তাঁর কন্যা নলিনী ও নলিনীর বন্ধু চারুবালা।

চারু। ভাই নেলি, তোর হয়েছে কি বল্ ত?

নেলি। মরণ-দশা।

চারু। না, ঠাট্টা নয়। তোকে কেমন এক রকম দেখ্‌চি।

নেলি। কি রকম বল্ ত?

চারু। তা বল্‌তে পারব না। রাগ না অনুরাগ, না বিরাগ, তোর ভাব দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই; কেবল এইটুকু বুঝি, তোর ঈশেন কোণে যেন মেঘ উঠেছে।

নেলি। শিলাবৃষ্টি, না জলবৃষ্টি, না ফাঁকা ঝড়, কী আন্দাজ করচিস্ বল্ ত।

চারু। তোমার আলিপুরের weather report ভাই আমার হাতে নেই। আজ পর্য্যন্ত তোমাকে বুঝতেই পারলুম না।

নেলি। তবে বুঝিয়ে দিই কেন যে মন চঞ্চল হয়েছে। ধৈর্য্য আর রাখ্‌তে পারচিনে। ওরে পত্তুলাল, ডেকে দে ত লালবাজার থেকে কে চিঠি নিয়ে এসেচে।

চারু। মিষ্টার নন্দীর চিঠি? কী লিখেচে?

নেলি।

গান

সে আমার গোপন কথা, শুনে যাও ও সখি!
ভেবে না পাই বল্‌ব কী?

চারু। হাঁ ভাই, বল্ ভাই বল্, কিন্তু সাদা কথায়।

নেলি। অবস্থাগতিকে সাদা কথা যে রাঙা হয়ে ওঠে।

গান

প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে
নীল গগনে,
গান হয়ে যায় মনে মনে যাহাই বকি।

চারু। তুই ভাই এই সব সখীকে-ডাকপাড়া সেকেলে ধরণের গান কোথা থেকে জোগাড় করিস বল্ ত?

নেলি। খুব একেলে ধরণের কবির কাছ থেকেই।

চারু। মিষ্টার লাহিড়ি রাগ করেন না?

নেলি। বাংলা সাহিত্যে কোন্‌টা একেলে কোন্‌টা সেকেলে, সে তাঁর খেয়ালই নেই। একটি গান সব চেয়ে তাঁর পছন্দ, সেইটে তাঁকে শুনিয়ে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বোঝেন যে, ইহকাল পরকাল কোনো কালই যদি আমার না থাকে, অন্তত modern কালটা আছে—

Love's golden dream is done
Hidden in mist of pain.

চারু। তোর মত অদ্ভুত মেয়ে আমি দেখিনি—সবই উল্টো-পাল্টা। তুই যদি ভাটপাড়ার পণ্ডিতের ঘরে জন্মাতিস্, তা'হলে চটেমটে মেমসাহেব হয়ে উঠ্‌তিস। মিষ্টার লাহিড়ির ঘরে জন্মেছিস্ বলেই বুড়ি ঠাকুরমার চাল প্র্যাক্‌টিস্ চল্‌চে। কোন্ দিন এসে দেখ্‌বো, জ্যাকেট ছেড়ে নামাবলী ধরেছিস্।

নেলি। আগাগোড়া ছুবিয়ে রাখ্‌বো—মিষ্টার নন্দী বার-এট-ল।

চাপরাশির প্রবেশ

তোমারা সাবকো বোলো, জবাব পিছে ভেজ দেউঙ্গী।

সেলাম করিয়া প্রস্থান।

দেখ্‌লি, একবার চাপরাশের ঘটা দেখ্‌লি—গিল্টি তক্‌মার ঝলমলানিতে চোখ ঝল্‌সে গেল।

চারু। ভয় করিস্‌নে নেলি, গিল্টি সোনার চাপরাশ জোটে চাপরাশির ভাগ্যে কিন্তু—

নেলি। হাঁ গো, আর খাঁটি সোনার চাপরাশ পরবেন মিসেস্ নন্দী। তাঁর কি সৌভাগ্য।

চারু। দেখ্ নেলি, ন্যাকামি করিস্‌নে। মিষ্টার নন্দীর মত পাত্র যেন অম্‌নি—

মিসেস্ লাহিড়ির প্রবেশ

মিসেস্ লাহিড়ি। নেলি, ছি ছি, তুই এই কাপড় পরে মিষ্টার নন্দীর বেয়ারার—

নেলি। কেন, এ ত মন্দ কাপড় নয়।

মিসেস্ লাহিড়ি। কী মনে করবে বল্ ত? ওদের বাড়ীতে সব—

নেলি। বেহারা হয়ে জন্মেচে বলেই কী এত শাস্তি দিতে হবে? বেচারা মনিব-বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টা যা দেখে, আজ তার থেকে নতুন কিছু দেখে বেঁচে গেল। এত খুসি হল যে বকশিষ চাইতে ভুলে গেল।

মিসেস্ লাহিড়ি। চিঠি দিতে এসে আবার বকশিষ চাইবে কী? তোর সব অদ্ভুত কথা।

নেলি। এমন আশ্চর্য্য চিঠি, মা, তাতে এত—

মিসেস্ লাহিড়ি। এত কী?

নেলি। সোনালি ক্রেষ্ট আঁকা,—আর তাতে লেখা আছে তিনি স্বয়ং এখানে আসবেন—আমাকে—

মিসেস্ লাহিড়ি। কী করতে?

নেলি। বেশি আশা ক'রে বোসো না মা। Propose করতে না, আমার জন্মদিনের জন্যে congratulate করতে। সেই বা ক'জনের ভাগ্যে—

মিসেস্ লাহিড়ি। যা আর বকিস্‌নে, শীঘ্র যা, dress ক'রে নে, এখনি লোক আসতে আরম্ভ হবে। মিষ্টার নন্দী তোর সেই ধূপছায়া রঙের সাড়িটা খুব admire করেন, সেটা—

নেলি। সে হবে, মা, আমি এখনি যাচ্চি।

মিসেস্ লাহিড়ি। যাই, হোটেল থেকে খানসামাগুলো এলো কি না দেখিগে। প্রস্থান।

নেলি। দেখ্‌বি? এই দেখ্ চিঠি। সশরীরে আস্‌বেন তার announcement। সেকালে বিশু ডাকাত এই রকম খবর পাঠিয়ে ডাকাতি করত।

চারু। ডাকাতি?

নেলি। নয় ত কি? একজন সরলা অবলার হৃদয়ভাণ্ডার লুঠ। তার সিঁধকাঠিটা দেখ্‌বি? এই দেখ্।

চারু। ইস্। এ যে হীরে দেওয়া ব্রেসলেট্। যা বলিস্ তোর কপাল ভালো। এ বুঝি তোর জন্মদিনের—

নেলি। হাঁ. হাঁ, জন্মদিনের উপহার—আমার জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনকেই ঘিরে ফেলবার সুদর্শন চক্র।

চারু। সুদর্শন চক্র বটে। যা বলিস্, মিষ্টার নন্দীর taste আছে।

নেলি। আজ যে বড় ঠাট্টার সুর ধরেছিস। তোর ছলাকলা যার উপর খাট্‌বে, সে তো আর আমি না।

নেলি। তা'হলে গম্ভীর সুর ধরি।

গান

সে যেন আসবে আমার মন বলেছে।
হাসির পরে তাই ত চোখের জল গলেছে।
দেখ্‌লো তাই দেয় ইসারা
তারায় তারা;
চাঁদ হেসে ঐ হল সারা তাহাই লখি॥
শুনে যা ও সখি।

চারু। আমি যদি পুরুষ হতুম, নেলি, তা'হলে তোর ঐ পায়ের কাছে পড়ে'—

নেলি। জুতোর লেস লাগাতিস বুঝি? আর ব্রেসলেট্ পরাত কে?

মিষ্টার লাহিড়ির প্রবেশ

মিষ্টার লাহিড়ি। আজ বরুণ নন্দীর আসবার কথা আছে না?

নেলি। হাঁ, তাঁর চিঠি পেয়েছি।

মিষ্টার লাহিড়ি। তা'হলে এখনো যে ড্রেস কর নি?

নেলি। কি ড্রেস পরব, তাই ত এতক্ষণ চারুর সঙ্গে পরামর্শ করছিলুম।

মিষ্টার লাহিড়ি। দেখ, ভুলো না, সার হারকোর্ট তোমাকে কী চিঠি লিখেছেন, সেইটে বরুণ নন্দী দেখ্‌তে চেয়েছিল—সেটা—

নেলি। হাঁ, সেটা আমি বের করে' রাখব, আর জেনেরাল্ পর্কিন্সের ভাইঝি তার অটোগ্রাফ-ওয়ালা যে ফোটো আমাকে দিয়েছিল, সেটাও—

মিষ্টার লাহিড়ি। হাঁ হাঁ সেটা, আর সেই যে—

নেলি। বুঝেছি, গবর্মেণ্ট হাউসে নেমন্তন্নে গিয়েছিলুম, তার নাচের প্রোগ্রামটা।

মিষ্টার লাহিড়ি। আজ কোন্ গানটা গাবে বল ত?

নেলি। সেই যে ঐটে,

Love's golden dream is done
Hidden in mist of pain.

মিষ্টার লাহিড়ি। হাঁ, হাঁ, first class। ওটা তোমার গলায় খুব মানায়, আর সেইটে—মনে আছে ত? In the gloaming, oh my darling.

নেলি। আছে।

মিষ্টার লাহিড়ি। আর সব শেষে গেয়ো Good bye, sweet heart।

নেলি। কিন্তু ওগুলো যে পুরুষের গান।

মিষ্টার লাহিড়ি। (হাসিয়া) তাতে ক্ষতি কী নেলি—আজকাল মেয়েরাও—

নেলি। ভুলতে আরম্ভ করেছে যে, তারা মেয়ে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাতে পুরুষদের একটুও ভুল হচ্চে না।

মিষ্টার লাহিড়ি। Bravo, well said। যাও এবার ড্রেস করতে যাও। অমনি সেই তোমার অটোগ্রাফ বইটা, সেই যেটাতে—

নেলি। বুঝিছি, যেটাতে লর্ড বেরেসফোর্ডের কার্ড আঁটা আছে। আচ্ছা বাবা, সে হবে এখন। তুমি তৈরি হওগে, আমি যাচ্চি।

লাহিড়ির প্রস্থান।

লাহিড়ি। (ফিরিয়া আসিয়া) দেখ, একটা জিনিষ নোটিস্ করচি নেলি, সেটা তোমাকে বলা ভালো। তুমি অনেক সময়ে বরুণের সঙ্গে এমন টোনে কথা কও যে, সে মনে করে, তুমি তাকে একটুও সীরিয়াসলি নিচ্চ না, তাই সে ভেবে পায় না যে, তুমি—

নেলি। বুঝেছি, বাবা। সুবিধে পেলেই বুঝিয়ে দেব আমি খুব সীরিয়াস।

লাহিড়ি। আর একটা কথা। আমি ঠিক বুঝতে পারিনে তুমি সতীশকে কেমন যেন একটুখানি indulgence দাও।

চারু। না। মিষ্টার লাহিড়ি, নেলি ত তাকে কথায় কথায় নাকের জলে চোখের জলে করে। পৃথিবীতে ওর কুকুর টম্‌কে ছাড়া নেলি আর যে কাউকে একটুও indulgence দেয়, এ তো আমি দেখিনি।

লাহিড়ি। কিন্তু সে আসতেও ছাড়ে না। সে দিন চা পার্টিতে এমন একটা জুতো পরে' এসেছিল, যে তার মচ্ মচ্ শব্দে দেয়ালের ইঁটগুলোকে পর্য্যন্ত চম্‌কিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এক এক সময় ভারি awkward হয়। তা ছাড়া ওর ট্রাউজারগুলো—থাক্‌গে, লোরেটোতে ছোটবেলায় তোমার সঙ্গে ও এক সঙ্গে পড়েছিল, ওকে আমি কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু যে দিন বরুণরা আস্‌বে, সে দিন বরঞ্চ ওকে—

নেলি। ভয় কী, বাবা, সে দিন বরঞ্চ সতীশকে ট্রাউজার না পরে' ধুতি পরে' আস্‌তে বল্‌ব, আর দিল্লির জুতো, সে মচ্ মচ্ করবে না।

লাহিড়ি। ধুতি? পার্টিতে? আবার দিল্লির নাগরা?

নেলি। পৃথিবীতে যে-সব বালাই অসহ্য, সেগুলো ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া ভালো।

চারু। ওর সঙ্গে কথায় পারবেন না। এদিকে লোক আসবার সময় হয়ে আস্‌চে। নেলি, তুই যা ভাই, কাপড় পরে' আয়, যদি কেউ লোক আসে, আমি তাদের সাম্‌লাব।

নেলির প্রস্থান।

লাহিড়ি। এই বুঝি ওর সব জন্মদিনের প্রেজেন্ট? বরুণের ব্রেসলেটটা কী এমনি টেবিলের উপরেই থাকবে?

চারু। থাক্ না, আমি ওর উপর চোখ রাখ্‌ব।

লাহিড়ি। এটা কার? একটা মকমলের মলাটের এল্‌বম্। এ দেখ্‌চি সতীশের। দাম লেখা আছে. মুছে ফেল্‌তেও হুঁস্ ছিল না। এক টাকা বারো আনা। ইন্‌সলভেন্সির মাম্‌লা আনতে হবে না। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সেলে কেনা। এটাও কী এখানে থাক্‌বে নাকি?

চারু। সরাতে গেলে নেলি রক্ষা রাখ্‌বে না।

লাহিড়ি। থাক্ তবে, তুমি এখানে একটু বোসো, আমি ড্রেস করে' আসি।

প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

চারু। এত সকাল সকাল যে?

সতীশ। (লজ্জিত হয়ে) দেখচি আমার ঘড়িটা ঠিক চলছিল না। যাই, বরঞ্চ আমি একটু ঘুরে আসিগে।

চারু। না, আপনি বসুন। সময় হয়ে এসেচে। নেলির প্রেজেণ্টগুলো দেখুন না। এই দেখবেন?

সতীশ। এ যে হীরের ব্রেসলেট্। এ কে দিয়েচে?

চারু। মিষ্টার নন্দী। চমৎকার না?

সতীশ। বেশ।

চারু। এই মুক্তো দেওয়া হেয়ার পিন্‌টা আমার ভাই অমূল্যর দেওয়া। আর এই রূপোর দোয়াতদান—ও কি সতীশবাবু, যাচ্চেন না কী?

সতীশ। ভাব্‌চি, এই বেলা আমার কাজ সেরে আসি।

চারু। আপনার এলবম্‌টি নেলির কাজে লাগ্‌বে। এই দেখুন না, মিষ্টার নন্দী ওকে তাঁর সই করা ফোটো পাঠিয়ে দিয়েচেন।

সতীশ। হাঁ, তাই ত দেখচি। আমার কিন্তু বিশেষ কাজ আছে, আমি যাই। আর দেখুন্, এখনকার মত এই এল্‌বম্‌টা আমি নিয়ে যাচ্চি—তার পরে—

চারু। কী করবেন?

সতীশ। না, ওটা—একবার—একটুখানি ঐ—আপনি দয়া করে' নেলিকে বল্‌বেন যে, বিশেষ একটু কারণে এখনকার মত—তার পরে আবার—এখন যাই—কাজ আছে। (প্রস্থান)

চারু। যাক্, বিদায় করে' দেওয়া গেল। মা গো, কী টাই পরেই এসেচে! এলবম্‌টাও গেল। এই যে মিষ্টার লাহিড়ি, শুনে যান, সুখবর আছে, বক্‌শিস্ চাই।

নেপথ্যে। একটু পরেই যাচ্চি, আমার বাটন হুকটা খুঁজে পাচ্চিনে।

সতীশকে লইয়া নলিনীর প্রবেশ

চারু। ও কি, নেলি, তোর ভালো করে' ত সাজা হল না।

নলিনী। হঠাৎ কোতোয়ালি করতে হল। ড্রেসিংরুমের জানলা দিয়ে দেখি চোর পালাচ্চে একটা মাল বগলে নিয়ে, তখনি নেমে গিয়ে বমাল সুদ্ধ গ্রেফতার করে' নিয়ে এসেছি।

চারু। বাস্‌রে, কী কড়া পাহারা? মালটা কি খুবই দামী, আর চোরটাও কী খুবই দাগী?

নলিনী। (সতীশকে) তুমি এসেই তখনি পালাচ্ছিলে যে, আর আমার একখানা এলবম্ নিয়ে? (সতীশ নিরুত্তর)।

চারু। ওঃ বুঝেছি, প্রাইভেট্ কামরায় বিচার হবে। নেলি, আমি তা'হলে তৈরি হয়ে আসিগে। তোর নাবার ঘরে টয়লেট ভিনিগার আছে ত?

নলিনী। আছে। (চারুর প্রস্থান) তোমার এ কী রকম দুর্ব্বুদ্ধি? আমার এলবম্ নিয়ে—

সতীশ। লক্ষ্মীছাড়ার দান লক্ষ্মীকে পৌছয় না। যেটা যার যোগ্য নয়, সে জিনিষটা তার নয়, আমি এই বুঝি।

নলিনী। আর বগলে করে' যে নিয়ে যায়, সেটা যে তারই এই বা কোন্ শাস্ত্রে লেখে?

সতীশ। তবে সত্যি কথাটা বলি। আমি যে ভীরু, বেশ জোরের সঙ্গে কিছুই দিতে পারিনে। সেই জন্যে দিয়ে লজ্জা পাই।

নলিনী। তোমার এই এলবমের মধ্যে কম জোরের লক্ষণটা কী দেখ্‌লে? এ ত টক্‌টকে লাল।

সতীশ। লজ্জায় লাল। কতবার মনে হয়েছিল, এই এলবমের মধ্যে নিজের একখানা ছবি পূরে দিই, "আমাকে মনে রেখো" এই করুণ দাবীটুকু বোঝাবার জন্যে। কিন্তু ভয় হল, তুমি মনে করবে ওটা আমার স্পর্দ্ধা; খালি রেখে দিলুম, তুমি নিজে ইচ্ছে করে' যার ছবি রাখবে, ওর মধ্যে তারি স্থান থাক্।

নলিনী। খুব ভালো বল্‌চ, সতীশ, ইচ্ছে করচে বইয়ে লিখে রাখি।

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না।

নলিনী। আমার আর-এক জনের কথা মনে পড়চে। সে দিয়েছিল একখানা খাতা—তোমার এলবমের মধ্যে যে-কথাটা না-লেখা অক্ষরে আছে, সেইটে সে গানে লিখে দিয়েছিল—শুধু তাই নয়, পাছে চোখে না পড়ে, তাই নিজে এসে গেয়ে শুনিয়েছিল—

পাতা খানি শূন্য রাখিলাম,
নিজের হাতে লিখে রেখো শুধু আমার নাম।

সতীশ। কে লোকটা কে?

নলিনী। তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে যাবে না কী? আমাদের কবি গো—কিন্তু কবিত্বে তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গেছ—তোমার এ যে unheard melody। আমি শুন্‌তে পাচ্চি—

এই এলবম শূন্য রইল সব-ই,
নিজের হাতে ভ'রে রেখো শুধু আমার ছবি।

কিন্তু তোমার সব কথা বলা হয় নি।

সতীশ। না, হয়নি। বলি তা'হলে। এসে দেখলুম—সবাই আমার মত ভীরু নয়। যার জোর আছে, সে নিজের ছবিতে নিজের নাম লিখে পাঠাতে সঙ্কোচ করে না। মনে বুঝলুম, আমি দিয়েছি শূন্য পাতা, আর তারাই দিলে পূর্ণ করবার জিনিষ।

নলিনী। তোমাকে এখনি বুঝিয়ে দিচ্চি ভুল করেছে সে। ছবি দিতে সবাই পারে, ছবি রাখবার জায়গা দিতে ক'জন পারে। ভীরু, তোমার অদৃশ্য ছবিরই জিৎ থাক্। (নন্দীর

ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিল) ও কি, অমন করে' লাফিয়ে উঠলে কেন ? মৃগী রোগে ধরল নাকি ?

সতীশ। কোন্ রোগে ধরেছে, তা অন্তর্যামী জানেন। নেলি, একবার তুমি আমাকে স্পষ্ট করে'—

নলিনী। এই বুঝি নাটক স্থরু হল ? চোখের সাম্নে দেখ্‌লে ত যে-ছবি চেঁচিয়ে কথা কয়, তার কী দশা। যে-মানুষ চুপ করে' থাকতে জানে না, তারো—

সতীশ। আর কাজ নেই, নেলি, থাক্। তোমাকে কত ভয় করি, তুমি জানো না।

নলিনী। ভয় যদি কর' তা'হলে এলবম্ চুরি কোরো না। আমি কাপড় ছেড়ে আসিগে।

সতীশ। একটি অনুরোধ। Unheard melody আমার মুখে খুবই মিষ্টি, কিন্তু তোমার মুখে নয়। তোমার জন্মদিনে তোমার মুখে একটি গান শুনে যাব।

নলিনী। আচ্ছা।

গান

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে'
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে'
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙীন হোলো।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক্ তব নিশ্বাস
নবীন উষার পুষ্প সুবাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

চারুর প্রবেশ

চারু। এ কি করছিস, নেলি ? মিষ্টার নন্দীর ফোটো—

নেলি। যে মাটির গর্ভে হীরে থাকে, যে মাটির বুকে ভুঁইচাঁপা ফুল ফোটে, সেই মাটির হাতে ওকে সমর্পণ করে' দিয়েছি। এর চেয়ে আর কত সম্মান হবে ?

চারু। ছি ছি; নেলি, মিষ্টার নন্দী জানতে পারলে কী মনে করেবেন? এ যে একবারে ছিঁড়ে ফেলেছিস্।

নেলি। ইচ্ছে করিস ত তোর ঘরের আটা দিয়ে তুই জোড়া দিয়ে নিতে পারিস্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিধুমুখী ও সতীশ

সতীশ। মা, কোনমতে টাকাটা পেয়েছি, নেকলেস্‌ও নেলির ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাবার সেকালের আমলের সোনার গুড়গুড়িটা সিন্দূরেপটির মতি পালের ওখানে যে বাঁধা রেখে এলুম, নিশ্চিন্ত হতে পারচিনে।

বিধুমুখী। তোর কোনো ভয় নেই, সতীশ। তিনি এ সব জিনিষের পরে কোনো মমতাই রাখেন না। কেবল ওঁর ঠাকুরদাদার জিনিষ বলেই আজ পর্য্যন্ত লোহার সিন্দুকে ছিল। এক দিনের জন্যে খবরও রাখেন নি। সেটা আছে কী গেছে, সে তাঁর মনেও নেই।

সতীশ। সে আমি জানি। কিন্তু ভারী ভয় হচ্ছে, যারা বন্ধক রেখেছে, তারা হয় ত বাবাকে চিঠি লিখে খোঁজ করবে। তুমি কোনমতে তোমার গহনাপত্র দিয়ে সেটা খালাস করে' দাও।

বিধুমুখী। হায়রে কপাল, গহনাপত্র কিছু কী বাকি আছে। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস্‌নে। যাই হোক, আমি ভয় করিনে—প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে নলিনীর সঙ্গে আগে তোর কোনমতে বিয়ে হয়ে যাক্, তার পরে তোর বাবা যা বলেন, যা করেন, সব সহ্য করতে হবে। কথাবার্ত্তা কিছু এগিয়েচে?

সতীশ। সর্ব্বদা যে রকম লোক ঘিরে থাকে, কথা কব কখন্? জানো ত সেই নন্দী—সে যেন বিলিতি কাঁটা গাছের বেড়া। তার বুলিগুলো সর্ব্বাঙ্গে বিঁধতে থাকে। সেই দৈত্যটার হাত থেকে রাজকন্যার উদ্ধার করি কী উপায়ে?

বিধুমুখী। আমি মেয়েমানুষ, মেয়ের মন বুঝতে পারি—মনে মনে সে তোকে ভালোবাসে।

সতীশ। সে আমি জানিনে। কিন্তু বরুন নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেল। বাবা একটু দয়া করলেই কোনো ভাবনা ছিল না। কিন্তু—

বিধুমুখী। তোর কী চাই বল না।

সতীশ। ভালো বিলিতি সুট। চাঁদনীর কাপড় পরলেই ভরসা কমে যায়; নন্দীর মত করে' সজোরে নলিনীর সঙ্গে কথাই কইতে পারিনে। বাড়িসুদ্ধ সব্বাই আমার দিকে এমন করে তাকায় যেন আমার গায়ে কাপড়ই নেই, আছে নর্দ্দমার পাঁক।

বিধুমুখী। আমি তোর কাপড়ের দুর্দ্দশা তোর মাসীকে আভাসে জানিয়ে রেখেছি। আজ এখনই তাঁর আসবার কথা। আজই হয় ত একটা কিনারা হয়ে যাবে।

সতীশ। ঐ যে মেসোমশায়কে নিয়েই তিনি আসচেন মা, যেমন করে' পারো আজই যেন—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি—বাবা যদি জানতে পারেন, মেরে ফেলবেন।

বিধুমুখী। আমি বলি কি—কোনো ছুতোয় সেই নেক্‌লেস্‌টা যদি নলিনীর কাছ থেকে—

সতীশ। সে কথাও ভেবেছি। তা হলেই আমার লজ্জা পুরো হয়। এক একবার মনে করি, সংসারে যত মুস্কিল, সব আমারই! বরুণ নন্দীর বাপ কি কোনো কালে ছিল না? যে রকম দেখ্‌চি, একটা কোনো গল্প বলে' নেক্‌লেস্‌টা ফিরিয়ে আন্‌তে হবে, তার পরে আমার নিজের গলায় পরবার জন্যে গয়না মিল্‌বে!

বিধুমুখী। সে আবার কী?

সতীশ। এক গাছা দড়ি।

বিধুমুখী। দেখ্, আমাকে আর রোজ রোজ কাঁদাস্ নে। আমার রক্ত শুকিয়ে গেল, চোখের জলও বাকি নেই। একদিকে তোর বাবা, আর একদিকে তুই—উপরে সরার চাপ আর নীচে আগুন, আমি যে গুমে গুমে—

সতীশের মাসি সুকুমারী ও মেসোমশায় শশধর বাবুর প্রবেশ

এস দিদি, ব'স। আজ কোন্ পুণ্যে রায়মশায়ের দেখা পাওয়া গেল। দিদি না আস্‌লে তোমার আর দেখা পাবার জো নেই।

শশধর। এতেই বুঝবে তোমার দিদির শাসন কি কড়া। দিন-রাত্রি চোখে চোখে রাখেন!

সুকুমারী। তাই বটে, এমন রত্ন ঘরে রেখেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমনো যায় না।

বিধুমুখী। নাক ডাকার শব্দে।

সুকুমারী। সতীশ, ছি ছি, তুই এ কি কাপড় পরেছিস্? তুই কি এই রকম ধুতি পরে' কলেজে যাস্ না কি? বিধু, ওকে যে লাউঞ্জ সুটটা কিনে দিয়েছিলাম, সে কি হ'ল?

বিধুমুখী। সে ও কোন্‌কালে ছিঁড়ে ফেলেছে!

সুকুমারী। তা ত ছিঁড়বেই। ছেলেমানুষের গায়ে কাপড় কত দিন টেঁকে! তা তাই বলে' কি আর নূতন সুট তৈরি করাতে নেই! তোদের ঘরে সকলি অনাসৃষ্টি!

বিধুমুখী। জানই ত' দিদি, তিনি ছেলের গায়ে সভ্য কাপড় দেখলেই আগুন হয়ে ওঠেন। আমি যদি না থাকতেম ত তিনি বোধ হয় ছেলেকে দোলাই গায়ে দিয়ে কোমরে ঘুন্‌সি পরিয়ে ইস্কুলে পাঠাতেন—মা গো! এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দও কারো দেখিনি!

সুকুমারী। মিছে না! এক বই ছেলে নয়, একটু সাজাতে গোজাতেও ইচ্ছা করে না। এমন বাপও ত দেখিনি! সতীশ, আমি তোর জন্য একসুট কাপড় র‍্যামজের ওখানে অর্ডার দিয়ে রেখেছি। আহা, ছেলেমানুষের কি সখ্ হয় না?

সতীশ। এক সুটে আমার কি হবে, মাসিমা। লাহিড়ি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে—সে আমাকে তাদের বাড়িতে টেনিস খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে, আমি নানা ছুতো করে' কাটিয়ে দিই। আমার ত কাপড় নেই!

শশধর। তেমন জায়গায় নিমন্ত্রণে না যাওয়াই ভালো, সতীশ!

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। ওর তোমার মতন বয়স যখন হবে, তখন—

শশধর। তখন ওকে বক্তৃতা দেবার অন্য লোক হবে, বৃদ্ধ মেসোর পরামর্শ শোনবার অবসর হবে না।

সুকুমারী। আচ্ছা, মশায়, বক্তৃতা করবার অন্ত লোক যদি তোমাদের ভাগ্যে না জুটত, তবে তোমাদের কি দশা হ'ত বল দেখি।

শশধর। সে কথা বলে' লাভ কি! সে অবস্থা চোখ বুজে কল্পনা করাই ভালো!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কর্ত্তাবাবু লোহার সিন্দুকের চাবি চেয়েছেন।

সতীশ। (কানে কানে) সর্ব্বনাশ, মা, সর্ব্বনাশ। গুড়গুড়ির খোঁজ পড়েচে।

বিধু। একটু চুপ কর তুই। কেন রে, চাবি কেন?

ভৃত্য। কাল কোথায় যাবেন, চেক-বইটা চান।

বিধু। আচ্ছা, একটু সবুর করতে বল্, চাবি নিয়ে এখনি যাচ্চি।

ভৃত্যের প্রস্থান।

সতীশ। মা, লোহার সিন্দুক খুল্লেই ত—

বিধু। একটু থাম্! আমাকে একটু ভাবতে দে।

সতীশ। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) না, না, এখানে আসতে হবে না, আমি যাচ্ছি!

প্রস্থান।

সুকুমারী। সতীশ ব্যস্ত হয়ে পালাল কেন, বিধু?

বিধুমুখী। থালায় করে' তার জলখাবার আন্‌ছিল কি না, ছেলের তাই তোমাদের সামনে লজ্জা।

সুকুমারী। আহা, বেচারার লজ্জা হতে পারে। ও সতীশ, শোন্ শোন্।

সতীশের প্রবেশ

তোর মেসো মশায় তোকে পেলেটির বাড়ী থেকে আইস্‌ক্রিম্ খাইয়ে আন্‌বেন, তুই ওঁর সঙ্গে যা! ওগো, যাও না—ছেলেমানুষকে একটু—

সতীশ। মাসিমা, সেখানে কী কাপড় পরে' যাব?

বিধুমুখী। কেন, তোর ত চাপকান আছে।

সতীশ। চাপকান ত পেলেটির খানসামাদেরও আছে। বেমালুম দলে মিশে যাব।

সুকুমারী। আর যাই হোক্ বিধু, তোর ছেলে ভাগ্যে পৈতৃক পছন্দটা পায় নি, তাই রক্ষা! বাস্তবিক, চাপকান দেখলেই খান্‌সামা কিম্বা যাত্রাদলের ছেলে মনে পড়ে। এমন অসভ্য কাপড় আর নেই!

শশধর। এ কথাগুলো—

সুকুমারী। চুপি চুপি বল্‌তে হবে? কেন ভয় করতে হবে কা'কে? মন্মথ নিজের পছন্দ মত ছেলেকে সাজ করাবেন আর আমরা কথা কইতেও পাব না?

শশধর। সর্ব্বনাশ! কথা বন্ধ করতে আমি বলি নে। কিন্তু সতীশের সাম্‌নে এ সমস্ত আলোচনা—

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা বেশ! তুমি ওকে পেলিটির ওখানে নিয়ে যাও!

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, লোহার সিন্দুকের চাবি বাবাকে কিছুতেই দিয়ো না—বরঞ্চ আমার সেই ঘড়ির কথাটা তুলে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ভুলিয়ে রেখো।

সুকুমারী। এই যে মন্মথ আস্‌চেন। এখনি সতীশকে নিয়ে বকাবকি করে' অস্থির করে' তুলবেন। আয় সতীশ, তুই আমার সঙ্গে আয়—আমরা পালাই।

প্রস্থান।

মন্মথের প্রবেশ

বিধু। সতীশ ঘড়ি ঘড়ি করে' ক'দিন আমাকে অস্থির করে' তুলেছিল। দিদি তাকে একটা রূপোর ঘড়ি দিয়েছেন। আগে থাক্‌তে বলে' রাখলেম, তুমি আবার শুনলে রাগ ক'রবে।

মন্মথ। আগে থাকতে বলে' রাখলেও রাগ করব।—শোনো, লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধু। তুমি একলা বসে' বসে' রাগ কর। আমি চল্‌লুম, আমি আর সইতে পারচি নে।

প্রস্থান।

মন্মথ। শশধর, সে ঘড়িটা তোমায় ফিরে নিয়ে যেতে হবে।

শশধর। তুমি যে লোহার সিন্দুক খুল্‌তে যাচ্ছিলে, যাও না।

মন্মথ। সে পরে হবে, কিন্তু ঘড়িটা এখনি তুমি নিয়ে যাও!

শশধর। তুমি ত আচ্ছা লোক। ঘড়ি ত নিয়ে গেলুম; তার পর থেকে আমার সময়টা কাটবে কি রকম? ঘরের লোকের কাছে জবাবদিহী করতে গিয়ে আমাকে যে ঘর-ছাড়া হতে হবে।

মন্মথ। না শশধর, ঠাট্টা নয়, আমি এ সব ভালবাসি নে!

শশধর। ভালবাস না, কিন্তু সহ্যও কর্‌তে হয়। সংসারের এই নিয়ম।

মন্মথ। নিজের সম্বন্ধে হলে নিঃশব্দে সহ্য কর্‌তেম। ছেলেকে মাটি কর্‌তে পারি না।

শশধর। সে ত ভালো কথা। কিন্তু স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে খাড়া উল্টোমুখে চলতে গেলে বিপদে পড়বে।—তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে ঘুরে গেলে ফল পাওয়া যায়! বাতাস যখন উল্টো বয়, জাহাজের পাল তখন আড় করে' রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

মন্মথ। তাই বুঝি তুমি গৃহিণীর সকল কথাতেই সায় দিয়ে যাও! ভীরু!

শশধর। তোমার মত অসমসাহস আমার নেই। যাঁর ঘরকন্নার অধীনে চব্বিশ ঘণ্টা বাস কর্‌তে হয়, তাঁকে ভয় না কর্‌ব ত কা'কে কর্‌ব? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে' লাভ কি? আঘাত করলেও কষ্ট, আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিকে অকাট্য বলে' কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সৎপরামর্শ—গোঁয়ার্তুমি কর্‌তে গেলেই মুস্কিল বাধে। আমি চল্লেম, যা ভালো বোঝো কর।

শশধরের প্রস্থান।

বিধুর প্রবেশ

মন্মথ। তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোষাক পরাতে আরম্ভ করেছ, সে আমার পছন্দ নয়।

বিধু। পছন্দ বুঝি একা তোমারই আছে। আজকাল ত সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিয়েছে।

মন্মথ। (হাসিয়া) সকলের মতেই যদি চল্‌বে, তবে সকলকে ছেড়ে একটিমাত্র আমাকেই বিয়ে কর্‌লে কেন?

বিধু। তুমি যদি একমাত্র নিজের মতেই চল্‌বে, তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিয়ে কর্‌বার কি দরকার ছিল?

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্যও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্য ধোবার দরকার হয় গাধাকে—কিন্তু আমি ত আর—

মন্মথ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম; তুমি আমার সংসার-মরু-ভূমির আরব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণিবৃত্তান্তের তর্ক এখন থাক। তোমার ছেলেটিকে সাহেব করে' তুলো না!

বিধু। কেন কর্‌ব না? তাকে কি চাষা কর্‌ব?

মন্মথ। লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

বিধবা জায়ের প্রবেশ

জা। ভাই, তোমরা এখানে ভালো হয়ে বসেই কথা কও না! দাঁড়িয়ে কেন? আমি পাশের ঘরে আছি ব'লে বুঝি আলাপ জম্‌ছে না? ভয় নেই ভাই, আমি নীচের ঘরে যাচ্চি।

প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ ও বাপকে দেখিয়াই পলায়ন

মন্মথ। ও কি ও, তোমার ছেলেটাকে কি মাখিয়েছ?

বিধু। মূর্চ্ছা যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এসেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি!

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার বলেছি, ছেলেদের তুমি এ সমস্ত সৌখীন জিনিষ অভ্যাস করাতে পার্‌বে না।

বিধু। আচ্ছা, যদি তোমার আরাম বোধ হয় ত কাল থেকে মাথায় কেরোসিন মাখাব, আর গায়ে কাষ্টর অয়েল্।

মন্মথ। সে-ও বাজে খরচ হবে। কেরোসিন কাষ্টর অয়েল্ গায় মাথায় মাখা আমার মতে অনাবশ্যক।

বিধু। তোমার মতে আবশ্যক জিনিষ কটা আছে, তা ত জানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে বসতে হয়।

মন্মথ। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ-প্রতিবাদ একেবারেই বন্ধ হবে। এত কালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ-বয়সে হয় ত সহ্য হবে না! যাই হোক্, এ-কথা আমি তোমাকে আগে থাক্‌তে ব'লে রাখছি, ছেলেটিকে তুমি সাহেব কর বা নবাব কর, তার খরচ আমি জোগাব না। আমার মৃত্যুর পরে সে যা পাবে, তাতে তার সখের খরচ চল্‌বে না।

বিধু। সে আমি জানি। তোমার টাকার উপরে ভরসা রাখলে ছেলেকে কপ্নি পরানো অভ্যাস করাতেম।

মন্মথ। আমিও তা জানি! তোমার ভগিনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা। তার সন্তান নেই বলে' ঠিক করে' বসে' আছ, তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিখে পড়ে, দিয়ে যাবে। সেই জন্যই যখন তখন ছেলেটাকে ফিরিঙ্গি সাজিয়ে এক গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও! আমি দারিদ্র্যের লজ্জা অনায়াসেই সহ্য কর্‌তে পারি; কিন্তু ধনী কুটুম্বের সোহাগ যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।

বিধু। ছেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গায়ে সয় না, এত বড় মানী লোকের ঘরে আছি, সে ত পূর্ব্বে বুঝতে পারি নি।

বিধবা জার ঘরে প্রবেশ

জা। ভাবলুম, এতক্ষণে কথা ফুরিয়ে গেছে, এইবার ঘরে এসে পানগুলো সেজে রাখি। কিন্তু এখনো ফুরোলো না। মেজ-বৌ, তোদের ধন্য! আজ সে তোর ন বছর বয়স থেকে সুরু হয়েচে, তবু তোদের কথা যে ফুরোল না! রাত্রে কুলোয় না, শেষকালে দিনেও দুইজনে মিলে ফিস্ ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এত মধু দিন-রাত্রি জোগান্ কোথা থেকে, আমি তাই ভাবি। রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে ব্যাঘাত করব না।

বিধু। না দিদি, আমাদের মধুরালাপ লোকালয় থেকে অনেক দূরে গিয়েই করতে হবে, নইলে সবাই দৃষ্টি দেবে। ওগো, এসো—ছাতে এস, গোটাকতক কথা বলে' রাখি। তুমি আবার নাকি হঠাৎ কাল লঙ্কাদ্বীপে যাচ্চ—এখান্‌কার হাওয়া তোমার সহ্য হচ্চে না।

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। জেঠাইমা!

জেঠাইমা। কি বাপ।

সতীশ। বাবা কাল ভোরে জাহাজে করে' কলম্বো যাবেন, তাই কালই লাহিড়ি সাহেবের ছেলেকে মা চা খাওয়াতে ডেকেছেন, তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না।

জেঠাইমা। আমার যাবার দরকার কি, সতীশ!

সতীশ। যদি যাও ত তোমার এ কাপড়ে চলবে না, তোমাকে—

জেঠাইমা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই, আমি এই ঘরেই থাকব, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চা খাওয়া না হয়, আমি বা'র হব না।

সতীশ। জেঠাইমা, আমি মনে করছি, তোমার ওই সামনের ঘরটাতেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত করব। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক—চা খাবার ডিনার খাবার মত ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মা'র শোবার ঘরে সিন্দুক ফিন্দুক কত কি রয়েচে, সেখানে কা'কেও নিয়ে যেতে লজ্জা করে।

জেঠাইমা। আমারও ঘরে ত জিনিষপত্র—

সতীশ। ওগুলো বা'র করে' দিতে হবে। বিশেষত তোমার ঐ বঁটি চুপড়ি বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

জেঠাইমা। কেন বাবা, ওগুলোতে এত লজ্জা কিসের? তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিয়ম নেই?

সতীশ। তা জানিনে জেঠাইমা, কিন্তু চা খাবার ঘরে ওগুলো রাখা দস্তুর নয়। এ দেখলে নরেন লাহিড়ি নিশ্চয় হাসবে, বাড়ি গিয়ে তার বোনদের কাছে গল্প করবে।

জেঠাইমা। শোন একবার ছেলের কথা শোন। বঁটি চুপড়ি ত চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে ভাই-বোনে মিলে গল্প করতে ত শুনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর এক কাজ করতে হবে, জেঠাইমা—আমাদের নন্দকে তুমি যেমন করে' পার এখানে ঠেকিয়ে রেখো। সে আমার কথা শুনবে না, খালি গায়ে ফস করে' সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাইমা। তাকে যেন ঠেকালেম, কিন্তু তোমার বাবা যখন খালি গায়ে—

সতীশ। তিনি ত কাল কলম্বোয় যাবেন।

জেঠাইমা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস্, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ খানাটানা-গুলো—

সতীশ। সে ভালো করে' সাফ করিয়ে দেব' এখন।

জেঠাইমার প্রস্থান ও বিধুর প্রবেশ

বিধু। পারলুম না, জান ত সতীশ, তিনি যা ধরেন, তা কিছুতেই ছাড়েন না! কত টাকা হ'লে তোমার মনের মত পোষাক হয় শুনি।

সতীশ। একটা মর্ণিং স্যুট ত মাসি অর্ডার দিয়েচেন, আর একটা লাউঞ্জ স্যুটে একশো টাকার কাছাকাছি লাগবে। একটা চলনসই ইভনিং ড্রেস দেড়শো টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

বিধু। বল কি সতীশ। এ ত আড়াইশো টাকার ধাক্কা, এত টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের দোষ। এক ফকিরি করতে চাও, সে ভালো, আর যদি ভদ্র সমাজে মিশতে হয় ত খরচ করতে হবে। সুন্দরবনে পাঠিয়ে দাও না কেন, সেখানে বনের বাঁদররা ড্রেস কোট পরে না।—কিন্তু মা, সেই গুড়গুড়ি! একটা প্ল্যান ভেবেছি, তুমি বাবাকে বল যে, কাল রাত্রে তোমার লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

বিধু। দেখ সতীশ, এ দিকে তোর বাবার বিষয়বুদ্ধি একটুও নেই—কিন্তু ওঁকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। ধরা পড়ে' যাবি।

সতীশ। ধরা ত এক সময়ে পড়বই। আপাতত কোনো রকম করে'—তা ছাড়া কাল ত উনি কলম্বোয় যাচ্চেন, ইতিমধ্যে যা হয় একটা উপায় করা যাবে। যথেষ্ট সময় পেলে নেক্‌লেস্‌টা চাই কি ফিরিয়েও নিতে পারি। অনেক ভেবে দেখলুম শেষকালে—ঐ যে বাবা আসচেন। মা, এখনি, আর দেরি কোরো না।

সতীশের প্রস্থান।

শশধর ও মন্মথের প্রবেশ

বিধু। ওগো শুনচ, সর্ব্বনাশ হয়েচে। কাল রাত্রে লোহার সিন্দুকের চাবি চুরি গেছে।

শশধর। সে কি কথা বউ। কোথায় চাবি রেখেছিলে, কে করলে এমন কাজ?

বিধু। তাই ত ভাবছি, হয় ত নতুন বেহারাটা—

শশধর। মন্মথ, তুমি যে একেবারে অবিচলিত? একবার খোঁজ করে' দেখো।

মন্মথ। কোনো লাভ নেই।

শশধর। কি গেল না গেল, সেটা ত একবার দেখাও চাই।

মন্মথ। কিছু নিশ্চয় গেছে, শুধু চাবি নিয়ে ঝমঝমিয়ে বেড়াবে, চোরের এমন সখ প্রায় থাকে না।

শশধর। কিন্তু কে চোর, সেটা ত বের করা চাই।

মন্মথ। সাধুর চেয়ে যার দরকার অনেক বেশি, সেই হয় চোর।

শশধর। আমি কি তোমার কাছে চোরের definition চাচ্চি? বলচি সন্ধান করা চাই ত?

মন্মথ। (উত্তেজনার সহিত) না, চাইনে, না, চাইনে। ভিতরে যে আছে, তাকে বাইরে সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

শশধর। কি বলচ মন্মথ। চল না একবার দেখেই আসা যাক্।

মন্মথ। নিষ্ফল, নিষ্ফল, আমার দেখা শেষ হয়ে গেছে।

শশধর। অন্তত কালকে কলম্বো যাওয়াটা স্থগিত রাখো, একটা পুলিস তদন্ত করাও।

মন্মথ। কলম্বোর চেয়ে আরও অনেক দূরে যাওয়া দরকার—সাউথ পোলে, সেখানে থাকে পেঙ্গুয়িন পাখী, সেখানে থাকে সিন্ধুঘোটক, সেখানে চাবিও চুরি যায় না, আর পুলিস তদন্তর ঠাট বসাতে হয় না।

শশধর। বউ যে একেবারে চুপ, মুখ হয়ে গেছে সাদা। চল বরঞ্চ তোমাতে আমাতে একবার—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। সাহেববাড়ি থেকে এই কাপড় এসেছে।

মন্মথ। নিয়ে যা, কাপড় নিয়ে যা, এখনি নিয়ে যা।

ভৃত্যের প্রস্থান।

শশধর। আহা, আহা, করচ কি মন্মথ। কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে তুমি আমাকেই—

মন্মথ। ঐ কাপড়গুলোতেই আছে চাবিচুরির ব্যাকটীরিয়া—টাকাচুরির বীজ—এই আমি তোমাকে বলে' গেলুম। (প্রস্থান। বিধুমুখীর মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কান্না)

শশধর। বউ, ছি, ছি, এমন করে' কাঁদতে নেই। ওঠ ওঠ।

বিধু। রায় মশায়, আমার বেঁচে সুখ নেই।

শশধর। কিছুই বুঝতে পারচি নে। মন্মথ কাকে সন্দেহ করচে। সতীশকে না কি?

বিধু। নিজের ছেলেকে যদি সন্দেহ না করবে, তবে বাপ কিসের? যদি মা হ'ত, ছেলেকে গর্ভে ধারণ করত, তা'হলে বুঝত ছেলে বলতে কী বোঝায়। গেছে ত গেছে না হয় সোনার গুড়গুড়িটাই গেছে, আমার সতীশ কি ওঁর সোনার গুড়গুড়ির চেয়ে কম দামের?

শশধর। সোনার গুড়গুড়ির কথা কি বল্‌চ? সিন্দুক থেকে কী গেছে, দেখেচ না কি?

বিধু। হাঁ; তা,— না দেখিনি। আমি বলচি, ওঁর সিন্দুকে সেই গুড়গুড়ি ছাড়া আর ত দামী জিনিষ নেই,—তা সেটা যদি চুরি হয়েই থাকে, তাই বলেই কি ছেলেকে সন্দেহ?

শশধর। তোমার সন্দেহটা কাকে, বউ?

বিধু। কেন? ওঁর ত সেই বড় ভালবাসার উড়ে বেয়ারা আছে, বনমালী। তার হাতেই ত ওঁর সব। সে হ'ল ভারী সাধু, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। একটু ইসারাতেও বল দেখি, পুলিস দিয়ে তার বাক্সো তল্লাস করতে, হাঁ হাঁ করে' মারতে আসবেন—সে তো ওঁর ছেলে নয়। ওঁর বেয়ারা, তাই তার পরে এত ভালবাসা।

শশধর। কিছু মনে কোরো না বউ, আমি যাচ্চি, ওকে বুঝিয়ে বলচি।

প্রস্থান।

সতীশের দ্রুত প্রবেশ

সতীশ। মা, ভয়ানক বিপদ।

বিধু। আবার কি হ'ল? বুকের ধড়ধড়ানি এক মুহূর্ত্ত থাম্‌তে দিল না।

সতীশ। সেই যে মতি পাল, যার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলুম, সে বাবার কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছে দেখ্‌লুম—এতক্ষণে বোধ হয়—

বিধু। সর্ব্বনাশ! যা তুই রায় মশায়কে শীগ্‌গির আমার কাছে পাঠিয়ে দে, এখনো তিনি যান নি।

সতীশের প্রস্থান।

মন্মথর প্রবেশ

মন্মথ। এই দেখ চিঠি। পড়ে' দেখ।

বিধু। না, আমি পড়তে চাইনে।

মন্মথ। পড়তেই হবে।

বিধু। (চিঠি পড়িয়া) তা কি হয়েছে?

মন্মথ। বেশি কিছু না, চুরি হয়েছে, আমার গুড়গুড়ি চুরি।

বিধু। নিজের ছেলে নিয়েছে, তাকে বল চুরি? বল্‌তে তোমার জিব্‌ টাক্‌রায় আট্‌কে গেল না?

মন্মথ। যে কথা বলতে জিব আট্‌কে যাওয়া উচিত ছিল, সে কথা তুমিই বলেচ।

বিধু। কি বলেচি?

মন্মথ। সেই চাবি চুরির মিথ্যে গল্প।

বিধু। বেশ করেচি। নিজের ছেলের জন্য বলেচি,—তার বাপের হাত থেকে তার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বলেচি।

মন্মথ। প্রাণ বাঁচালেই কি বাঁচানো হ'ল?

বিধু। অনেক হয়েচে; আর ধর্ম্ম উপদেশ শুন্‌তে চাইনে। এখন ছেলের উপর কোন্‌ জল্লাদী করতে চাও, খোলসা করে' বল।

মন্মথ। পুলিসে খবর দেব।

বসুমতী প্রেস]

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের মাঝে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।

[শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দোস্তিদার।

বিধু। দাও না। চাবি আমার হাতে ছিল, আমিই ত চুরি করে' ওকে দিয়েচি। যাক্ আমাকে নিয়ে জেলে, সেখানে আমি সুখে থাকব। অনেক সুখে, এর চেয়ে অনেক সুখে ; মনে হবে স্বর্গে গেচি।

মন্মথ। দরকার নেই ; তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, অনেক দিন আগেই যার যাওয়া উচিত ছিল, সেই একলা যাবে।

প্রস্থান।

শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখ্‌লে মন্মথ ভয় পায়। ভাবে, কালো কোর্ত্তা ফরমাস দেবার জন্য ফিতা হাতে তার ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেচি। ওর আবার বুকের ব্যামো, ভয় হয়, পাছে আমাদের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওর বিপদ ঘটে। যা হোক, এ ব্যাপারটা কি হ'ল? তুমি বল্‌লে চাবি চুরি, যে রকমটা দেখা যাচ্চে, তাতে কথাটা—

বিধু। সবই ত শুনেছ। বল্‌তে গেলে সতীশেরই জিনিষ, ওরই আপন প্রপিতামহের। আজ বাদে কাল ওরই হাতে আসত, সেইটে নিয়েচে বলেই—

শশধর। তা যা বল বউ, কাজটা ভাল হয়নি, ওটা চুরিই বটে।

বিধু। তাই যদি হয়, তবে প্রপিতামহের দান সতীশকে নিতে না দিয়ে উনি সেটা তালাবন্ধ করে' রেখেচেন, সে-ও কি চুরি নয়? এ গুড়গুড়ি কি ওঁর আপন উপার্জ্জনের টাকায়?

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কি সতীশ, খরচপত্র বিবেচনা করে' কর না, এখন কি মুস্কিলে পড়েছ দেখ দেখি!

সতীশ। মুস্কিল ত কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি। ফাঁস কর নি।

সতীশ। কিছু ত আছেই।

শশধর। কত?

সতীশ। আফিম কেনবার মত।

বিধু। (কাঁদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কি কথা তুই বলিস্, আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমাকে আর দগ্ধাসনে।

শশধর। ছি ছি, সতীশ। এমন কথা যদি বা কখনো মনেও আসে, তবু কি মা'র সামনে উচ্চারণ করা যায়? বড় অন্যায় কথা।

সতীশ। (জনান্তিকে) মা, তোমাকেও বলে' রাখি, আমি যেমন করে' পারি, সেই নেকলেস্‌টা ফিরিয়ে এনে বাবার গুড়গুড়ি উদ্ধার করে' তাঁর হাতে দিয়ে তবে এ বাড়ি থেকে ছুটি নেব। বাবার সম্পত্তি যে আমার নয়, এ কথাটা খুব স্পষ্ট করে' বুঝতে পেরেছি। আর যাই হোক, আমার প্রাণটা ত আমার, এটা ত বাবার লোহার সিন্দুকে বাঁধা পড়েনি, এটা ত রাখ্‌তেও পারি, ফেল্‌তেও পারি।

সুকুমারীর প্রবেশ

বিধু। দিদি, সতীশকে রক্ষা কর। ও কোন্ দিন কি করে' বসে। আমি ত ভয়ে বাঁচি নে। ও যা বলে, শুনে আমার গা কাঁপে।

সুকুমারী। কি সর্ব্বনাশ! সতীশ, আমার গা ছুঁয়ে বল্, এমন সব কথা মনেও আন্‌বি নে। চুপ করে' রইলি যে? লক্ষ্মী বাপ আমার। তোর মা মাসির কথা মনে করিস্।

সতীশ। জেলে বসে' মনে করার চেয়ে এ সমস্ত হাস্যকর ব্যাপার জেলের বাইরে চুকিয়ে ফেলাই ভালো!

সুকুমারী। আমরা থাক্‌তে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে?

সতীশ। পেয়াদা।

সুকুমারী। আচ্ছা, সে দেখব কত বড় পেয়াদা; ওগো, এই টাকাটা ফেলে দাও না, ছেলে-মানুষকে কেন কষ্ট দেওয়া!

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন্মথ আমার মাথায় ইঁট ফেলে না মারে!

সতীশ। মেসোমশায়, সে ইঁট তোমার মাথায় পৌঁছবে না, আমার ঘাড়ে পড়বে। একে একজামিনে ফেল করেছি; তার উপর দেনা, এর উপরে জেলে যাবার এত বড় সুযোগটা যদি মাটি হয়ে যায়, তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ করবেন না।

বিধু। সত্যি দিদি। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েচে শুনলে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি থেকে বা'র করে' দেবেন।

সুকুমারী। তা দিন না। আর কি কোথাও বাড়ি নেই না কি? ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে না! আমার ত ছেলেপুলে নেই, আমিই না হয় ওকে মানুষ করি? কি বল গো?

শশধর। সে ত ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাঘের বাচ্চা, ওকে টানতে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচান দায় হবে।

সুকুমারী। বাঘ মশায় ত বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ করে' দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই, এখন তিনি কোনো কথা বলতে পারবেন না।

শশধর। বাঘিনী কি বলেন; বাচ্ছাই বা কি বলে?

সুকুমারী। যা বলে, আমি জানি, সে-কথা আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তুমি এখন দেনাটা শোধ করে' দাও।

বিধু। দিদি।

সুকুমারী। আর দিদি দিদি করে' কাঁদতে হবে না। চল্ তোর চুল বেঁধে দিই গে। এমন ছিরি করে' তোর ভগ্নীপতির সাম্‌নে বা'র হ'তে লজ্জা করে না?

শশধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মন্মথের প্রবেশ

শশধর। মন্মথ, ভাই, তুমি একটু বিবেচনা করে' দেখ—

মন্মথ। বিবেচনা না করে' ত আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো কর! ছেলেটাকে কি জেলে দেবে? তাতে কি ওর ভাল হবে?

মন্মথ। তা জানিনে, কিন্তু যার যেটা প্রাপ্য, সে তাকে পেতেই হবে।

শশধর। প্রাপ্যের চেয়েও বড় জিনিষ আছে, তার পরেও মানুষের দাবী থাকা অন্যায় নয়।

মন্মথ। মিথ্যে আমাকে বল্‌চ। হয় ত সব দোষ আমারই, একলা আমারই। তার শাস্তিও যথেষ্ট পেয়েচি। এখন তোমরাই যদি সংশোধনের ভার নাও ত নাও, আমি নিষ্কৃতি নিলুম।

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের বেগে প্রবেশ

সতীশ। (উচ্চস্বরে) মা, মা!

বিধুর প্রবেশ

বিধু। কী সতীশ, কী হয়েছে?

সতীশ। ঠিক করেছি, যেমন করে' হোক্ নেক্‌লেসটা নেলির কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবই।

বিধু। কী ছুতো করবি?

সতীশ। কোনো ছুতোই না। সত্যি কথা বল্‌ব। নেলির কাছে আমি কিছু লুকোবো না।

বিধু। না, না, সে কি হয়?

সতীশ। বল্‌ব গুড়গুড়ির কথা—বলব আমার অবস্থা কত খারাপ। আমি নেলিকে ফাঁকি দিতে পারব না।

বিধু। সতীশ, আমার কথা শোন্, বিয়েটা আগে হোক্, তার পরে সত্যি মিথ্যে যা ইচ্ছে তোর তাই বলিস্।

সতীশ। সে আমি কিছুতে পারব না। আমি জানি, নেলি একটুও মিথ্যে সইতে পারে না। আমি কিচ্ছু লুকোবো না। আগাগোড়া সব বলব।

বিধু। তার পরে?

সতীশ। (ললাট আঘাত করিয়া) তার পরে কপাল।

তৃতীয় দৃশ্য

মিষ্টার লাহিড়ির বাড়িতে টেনিস্‌ক্ষেত্র

নলিনী। ও কি সতীশ, পালাও কোথায়?

সতীশ। তোমাদের এখানে টেনিসপার্টি জান্‌তেম না, আমি টেনিস্‌সুট পরে' আসিনি।

নলিনী। জন্‌বুলের যত বাছুর আছে, সকলেরই ত এক রঙের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিন্যাল বলেই নাম রটবে। আচ্ছা, আমি তোমার সুবিধা করে' দিচ্ছি। মিষ্টার নন্দী, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

নন্দী। অনুরোধ কেন, হুকুম বলুন না—আমি আপনার সেবার্থে।

নলিনী। যদি একেবারে অসাধ্য বোধ না করেন ত আজকের মত আপনারা সতীশকে মাপ করবেন—ইনি আজ টেনিস্‌সুট পরে' আসেন নি। এত বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা।

নন্দী। আপনি ওকালতি করলে খুন, জাল, ঘর জ্বালানও মাপ করতে পারি। টেনিস্‌সুট না পরে' এলেই যদি আপনার এত দয়া হয়, তবে আমার এই টেনিস্‌সুটটা মিষ্টার সতীশকে দান করে' তাঁর এই—এটাকে কি বলি! তোমার এটা কি সুট, সতীশ? খিচুড়ী সুটই বলা যাক—তা আমি সতীশের এই খিচুড়ী সুটটা পরে' রোজ এখানে আস্‌ব। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত সূর্য্য চন্দ্র তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তবু লজ্জা করব না। সতীশ, এ কাপড়টা দান করতে যদি তোমার নিতান্তই আপত্তি থাকে, তবে তোমার দর্জ্জির ঠিকানাটা দিয়ো। ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস্ লাহিড়ির দয়া অনেক মূল্যবান্।

নলিনী। শোন, শোন সতীশ, শুনে রাখ। কেবল কাপড়ে ছাঁট নয়, মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিষ্টার নন্দীর কাছে শিখতে পার। এমন আদর্শ আর পাবে না। বিলাতে ইনি ডিউক্ ডাচেস্ ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন নাই। মিষ্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালী ছাত্র কে কে ছিল?

নন্দী। আমি বাঙালীদের সঙ্গে সেখানে মিশিনি।

নলিনী। শুন্‌চ সতীশ! রীতিমত সভ্য হ'তে গেলে কত ছোঁওয়া বাঁচিয়ে চলতে হয়। তুমি বোধ হয় চেষ্টা করলে পারবে। টেনিস্‌সুট সম্বন্ধে তোমার যে রকম সূক্ষ্ম ধর্ম্মজ্ঞান, তাতে আশা হয়। (অন্যত্র গমন)

সতীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নেলিকে আজ পর্য্যন্ত বুঝতেই পারলেম না।

চারুবালা নন্দীর কাছে আসিয়া।

চারু। মিষ্টার নন্দী, সুশীলের সঙ্গে আমার একটা কথা নিয়ে ঘোর তর্ক হয়ে গেছে, আপনাকে তার নিষ্পত্তি করে' দিতে হবে—আমি বাজি রেখেছি—

নন্দী। যদি আমার উপরেই নিষ্পত্তির ভার থাকে, তা'হলে বাজিতে আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন।

চারু। না, না, আগে কথাটা শুনুন,—তার পরে বিচার করে'—

নন্দী। যাদের faith নেই, সেই নাস্তিকরাই সব কথা আগাগোড়া শোনে, বিচার করে—কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ আছে, শাস্ত্রে যাদের বলে অন্ধ। আমি দেবী-worshipper, অন্ধ-ভক্ত।

চারু। আপনার কথা শুন্‌লেই স্পষ্ট বুঝতে পারি, আপনি অক্সফোর্ডে পড়েছেন। এখন আমাদের বাজে কথাটা শুনুন। সুশীল বল্‌তে চায়, আমার এই শাড়ির রঙের সঙ্গে আমার এই জুতোর রং মানায় না।

নন্দী। সুশীল নিশ্চয় রংকাণা। আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর চমৎকার ম্যাচ হয়েচে। যদি মাপ করেন ত বলি, আপনার এই রুমালটার রঙ—

চারু। এ বুঝি আমার রুমাল? এ যে নেলির,—সে জোর করে' আমাকে দিলে—

বহরমপুর না কোথা থেকে এই ফুলকাটা মুসলমানী ফ্যাশানের রুমাল কিনেচে। আমাকে বল্‌লে, সাজের মধ্যে অন্তত একটা দিশী জিনিষ থাক।

নন্দী। I see—মিস্ বোস্, আপনি টেনিসের next setএ পার্টনার ঠিক করেচেন?

চারু। না।

নন্দী। আমাকে যদি select করেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন, আপনার শাড়ির সঙ্গে জুতোর যে রকম ম্যাচ হয়েচে, টেনিসে আপনার সঙ্গে আমার তার চেয়ে খারাপ ম্যাচ হবে না।

চারু। আপনাকে পার্টনার পেলে ত জিৎবই। আমি ভেবেছিলেম, next setএ আপনি বুঝি নেলির সঙ্গে engaged.

নন্দী। না, she wanted to be excused.

চারু। ওঃ, বোধ হয় সতীশের সঙ্গে কথা আছে। আমি ত বুঝতে পারিনে সতীশের মধ্যে নলিনী কী যে দেখেচে।

নন্দী। দেখেছে ওর monumental absurdity আর তার চেয়ে absurd ওর—থাক্, সে কথা থাক্।

চারু। কিন্তু ওর মত অত বড় অযোগ্য লোককে—

নন্দী। অযোগ্যতা হচ্চে শূন্য পেয়ালা, কৃপা দিয়ে ভরা সহজ।

চারু। শুধু কেবল কৃপা! ছিঃ! শ্রদ্ধা কি তার চেয়েও বড় নয়? চলুন্ খেলতে। কিন্তু আপনি ত জানেন, আমি ভারি বিশ্রী খেলি।

নন্দী। খেলায় আপনি হারতে পারেন; কিন্তু বিশ্রী খেলতে কিছুতেই পারেন না।

চারু। Thanks. উভয়ের প্রস্থান।

নলিনী। (পুনরায় আসিয়া) কি সতীশ, এখনও যে তোমার মনের খেদ মিটল না। টেনিস্ কোর্ত্তার শোকে তোমার হৃদয়টা যে বিদীর্ণ হয়ে গেল। হায়, হায়, কোর্ত্তাহারা অভাগা হৃদয়ের সান্ত্বনা জগতে কোথায় আছে—দর্জ্জির বাড়ি ছাড়া!

সতীশ। আমার হৃদয়টার ঠিকানা যদি জানতে, তা'হলে খুব বেশি করে' তাকে খুঁজে বেড়াতে হ'ত না।

নলিনী। (করতালি দিয়া) Bravo! মিষ্টার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিষ্ট কথার আমদানি সুরু হয়েছে। উন্নতি হবে ভরসা হচ্ছে। এস একটু কেক খেয়ে যাবে; মিষ্ট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না, আজ আর খাব না, আমার শরীরটা—

নলিনী। সতীশ, আমার কথা শোন,—টেনিস্ কোর্ত্তার খেদে শরীর নষ্ট কোরো না। কোর্ত্তা জিনিষটা জগতের মধ্যে সেরা জিনিষ, কিন্তু এই তুচ্ছ শরীরটা না হ'লে সেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার সুবিধা হয় না।

সতীশ। নেলি, আজ তোমাকে একটা খুব বিশেষ কথা বল্‌তে এসেছি—

নেলি। না, না, বিশেষ কথার চেয়ে সাধারণ কথা আমি ভালোবাসি।

সতীশ। যেমন করে' হোক বল্‌তেই হবে, নইলে বাঁচব না, তার পরে যদি বিদায় করে' দাও, তবে মাথা হেঁট করে' জন্মের মতই—

নেলি। সর্ব্বনাশ! সহজে বল্‌বার কথা পৃথিবীতে এত আছে যে, চমক লাগানো কথা না বললেও সময় কেটে যায়। আমারও বলবার কথা একটা আছে, তার পরে যদি সময় থাকে, তুমি বোলো।

সতীশ। আচ্ছা, তাই আগে বলে' নাও, কিন্তু আমার কথা শুনতেই হবে।

নেলি। বল্‌বার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি, বলে' নিই ; রাগ কোরো না।

সতীশ। তুমি ডেকেচ বলে' রাগ কর্‌ব, আমি এত বড় savage ?

নলিনী। সকল সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি কোরো না। বল দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিষ কেন দিলে ? সেই তোমার নেক্‌লেস্ ?

সতীশ। নেক্‌লেস্ ? সেটা কি তবে—

নলিনী। ভুল বোঝো না—জিনিষটা খুব ভাল। কিন্তু তুমি যে ঐ-টে কেনবার জন্যে—

সতীশ। নেলি, চুপ চুপ, তোমার মুখে আমি সে কথা শুনতে পার্‌ব না। কে তোমাকে কী বলেচে, সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—

নলিনী। হঠাৎ অমন ক্ষেপে উঠলে ? কি মিথ্যে কথা ? নেক্‌লেস্‌টা তুমিই আমাকে দিয়েচ, সে-ও কী মিথ্যে কথা ?

সতীশ। না, না। হাঁ, তা হতেও পারে, এ রকম করে' দেখলে হয় ত—

নলিনী। নেক্‌লেস্ এক রকম করে' ছাড়া আর ক'রকম করে' দেখা যায় ? কথা উঠতে না উঠতেই আগে থাকতেই তুমি যেন—

সতীশ। আচ্ছা, তা বল, কি বল্‌ছিলে বল।

নলিনী। কিচ্ছু না, খুব সাদা কথা, অমন দামী জিনিষ আমাকে কেন দিলে ?

সতীশ। আচ্ছা বেশ, তা'হলে আমাকে ফিরিয়ে দাও।

নলিনী। ঐ দেখ, আবার অভিমান!

সতীশ। আমার মত অবস্থার লোকের অভিমান কিসের ? দাও তবে ফিরিয়েই দাও।

নলিনী। অমন সুর কর যদি, তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা কওয়াই শক্ত হয়। একটু শান্ত হয়ে শোনো আমার কথা। মিষ্টার নন্দী আমাকে নির্ব্বোধের মত একটা দামি ব্রেস্‌লেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্ব্বুদ্ধিতার সুর চড়িয়ে তার চেয়ে দামি একটা নেক্‌লেস্ পাঠাতে গেলে কেন ?

সতীশ। সেটা বোঝবার শক্তি থাকলেই ত মানুষের কোনো মুস্কিল ঘটে না। যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না, সে অবস্থাটা তোমার একেবারে জানা নেই বলে' তুমি রাগ কর নেলি।

নলিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কিন্তু ও নেক্‌লেস্ তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশ। ফিরে দেবে ?

নলিনী। দেব'। বাহাদুরি দেখাবার জন্য যে দান, আমার কাছে সে দানের মূল্য নেই!

সতীশ। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে! এমন কথা তুমি বল্‌লে ? অন্যায় বল্‌ছ, নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্যায় বল্‌চিনে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে, আমি ঢের বেশি খুসি হতেম। তুমি যখন-তখন প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু না কিছু দামি

জিনিষ পাঠাতে আরম্ভ করেছ। পাছে তোমার মনে লাগে বলে' আমি এত দিন কিছু বলিনি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে, আর আমার চুপ করে' থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেক্‌লেস্।

সতীশ। আচ্ছা তবে নিলুম। (হাতে লইয়া অনেকক্ষণ নাড়া' চাড়া করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল)

নলিনী। ও কী হ'ল ?

সতীশ। ভেবেছিলুম, ওর দাম আছে, ওর কোনো দাম নেই।

নলিনী। (তুলিয়া লইয়া) তুমি রাগই কর আর যাই কর, আমার যা বলবার, তোমাকে বলবই। আমি ত তোমাকে ছেলেবেলা থেকেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িয়ো না। সত্য করে' বল, তোমার কি অনেক টাকা ধার হয় নি ?

সতীশ। (চম্‌কিয়া উঠিয়া) কে বল্‌লে ধার হয়েছে ? কে বল্‌লে তোমাকে ? এক জন কেউ আছে, সে লাগালাগি করচে। তার নাম বল ; আমি তাকে—

নলিনী। আজ তোমার কী হয়েছে বল ত ?

সতীশ। বল্‌তেই হবে তোমাকে কে বলেছে আমার ধারের কথা ? আমি তাকে দেখে নিতে চাই।

নলিনী। কেউ বলে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমার জন্য তুমি এমন অন্যায় কেন করচ ?

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্যে মানুষ প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে ; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার ভদ্র উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তত ধার করার দুঃখটুকু স্বীকার করবার যে সুখ, তাও কি ভোগ করতে দেবে না ? আমার পক্ষে যা মৃত্যুর চেয়েও দুঃসাধ্য, আমি তোমার জন্য তাই করতে চাই নেলি, এ'কে যদি তুমি নন্দী সাহেবের নকল বল, তবে আমার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হয়।

নলিনী। আচ্ছা, তোমার যা করবার, তা ত করেচ—তোমার সেই ত্যাগস্বীকার-টুকু আমি নিলেম—এখন এ জিনিষটা ফিরে নাও।

সতীশ। তবে দাও, তাই দাও। যদি আমার অন্তরের কথাটা বুঝে থাক, তাহ'লে—

নলিনী। থাক্ থাক্, অন্তরের কথা অন্দরমহলেই থাক। নেকলেসটা এই নিয়ে যাও।

সতীশ। (হাতে লইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) সেই ভালো, তবে যাই। (কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) দয়া কর নেলি, দয়া কর—যদি আমাকে ফিরিয়ে নিতে হয়, তবে ওটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ করে' আমার পক্ষে মরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ করবে কি করে' ?

সতীশ। মা'র কাছ থেকে টাকা পাব।

নলিনী। ছি ছি, তিনি মনে করবেন, আমার জন্যই তাঁর ছেলের দেনা হচ্চে। সতীশ, তোমার এই নেক্‌লেসটা হাতে করে' নেওয়ার চেয়ে ঢের বেশি করে' নিয়েচি, এই কথাটা তোমাকে বুঝে দেখতে হবে। নইলে কখনই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতুম না। দিলে অপমান করা হ'ত। বুঝতে পারচ ?

সতীশ। সম্পূর্ণ না।

নলিনী। তোমার দান করাকেই আমি বেশি মান দিয়েছি বলেই তোমার দানের জিনিষকে

অনায়াসে ত্যাগ করতে পারি। মনে কর না, এটা হারিয়ে গেছে, সেই হারানোতে তোমার দান ত একটুও হারায় না।

সতীশ। ঠিক বলচ, নেলি?

নলিনী। ঠিক বলচি। আমি যেমন সহজে এটি তোমার হাতে ফিরিয়ে দিচ্চি, তেমনি সহজে তুমি এটি আমার হাত থেকে ফিরে নাও। তাহ'লে আমি ভারি খুসি হব।

সতীশ। খুসি হবে? তবে দাও। (নেকলেস্ লইয়া) কিন্তু যে হাত দিয়ে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে, সেই হাতেই তুমি আর এক জনের ব্রেসলেট পরেচ, সে যেন আমাকে—

নলিনী। ওতে কন্যার হাত নেই সতীশ, আছে কন্যাকর্ত্তার হাত। বাবা বিশেষ করে বলেছিলেন, আজ—

সতীশ। আচ্ছা, ঐ ব্রেসলেট চিরদিনই তোমার হাতে থাকে—এই নেকলেস কেবল কিছুক্ষণের জন্যে গলায় পর, তার পরে আমি নিয়ে যাব।

নলিনী। পরলে বাবা রাগ করবেন।

সতীশ। কেন?

নলিনী। তা'হলে এই ব্রেসলেট পরার দাম কমে' যাবে।—ফের মুখ গম্ভীর করচ?

সতীশ। কথাটা কি খুব প্রফুল্ল হবার মত?

নলিনী। নয় ত কি? তোমার কাছে যে আমি এত খুলে কথা বলি, তার কোনো দাম নেই? অকৃতজ্ঞ! মিষ্টার নন্দীর সঙ্গে আমি এমন করে' কইতে পারতুম? এবার কিন্তু টেনিস্ কোর্ট থেকে যাও।

সতীশ। কেন যেতে বল্‌চ, নেলি? এখানে আমাকে মানায় না?

নলিনী। না, মানায় না।

সতীশ। চাঁদনির কাপড় পরি বলে'?

নলিনী। সে একটা কারণ বই কি?

সতীশ। তুমি আমাকে এমন কথা বল্‌লে?

নলিনী। আমি যদি তোমাকে সত্যি কথা বলি, খুসি হোয়ো, অন্যে বল্‌লে রাগ করতে পারো।

সতীশ। তুমি আমাকে অযোগ্য বলে' জানো, এতে আমি খুসি হব?

নলিনী। এই টেনিস কোর্টের অযোগ্যতাকে তুমি অযোগ্যতা বলে' লজ্জা পাও? এতেই আমি সব চেয়ে লজ্জা বোধ করি। তুমি ত তুমি, এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব এসে যদি দাঁড়াতেন, আমি দুই হাত জোড় করে' পায়ের ধুলো নিয়েই তাঁকে বলতুম, ভগবান্, লাহিড়িদের বাড়ির এই টেনিস কোর্টে আপনাকে মানায় না, মিষ্টার নন্দীকে তার চেয়ে বেশী মানায়। শুনে কি তখনই তিনি হার্ম্মানের বাড়ি ছুটতেন টেনিস্ সুট অর্ডর দিতে?

সতীশ। বুদ্ধদেবের সঙ্গে—

নলিনী। তোমার তুলনাই হয় না, তা জানি। আমি বলতে চাই, টেনিস কোর্টের বাইরেও একটা মস্ত জগৎ আছে—সেখানে চাঁদনির কাপড় পরেও মনুষ্যত্ব ঢাকা পড়ে না। এই কাপড় পরে' যদি এখনি ইন্দ্রলোকে যাও ত উর্ব্বশী হয় ত একটা পারিজাতের কুঁড়ি ওর বাটন্ হোলএ পরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না—অবিশ্যি তোমাকে যদি তার পছন্দ হয়।

সতীশ। বাটন্ হোল্ ত এই রয়েচে, গোলাপের কুঁড়িও তোমার খোঁপায়—এবারে পছন্দর পরিচয়টা কি ভিক্ষে করে' নিতে পারি?

নলিনী। আবার ভুলে যাচ্ছ, এটা স্বর্গ নয়, এটা টেনিস কোর্ট?

সতীশ। এটা যে স্বর্গ নয়, সেইটে ভুলতে পারিনে বলেই ত—

নলিনী। এইবার ত নন্দীর সুর লাগচে গলায়—

সতীশ। তার একটিমাত্র কারণ—আমি টেনিস্ কোর্টেরই যোগ্য হ'তে চাই। উর্ব্বশীর হাতের পারিজাতের কুঁড়ির পরে আমার একটুও লোভ নেই।

নলিনী। বড় দুঃসাধ্য তোমার তপস্যা, সতীশ—স্বর্গে তোমার কম্পিটিশন কার্ত্তিককে নিয়ে চাঁদকে নিয়ে—এখানে আছেন স্বয়ং মিষ্টার নন্দী। পেরে উঠবে না, কন্যাকর্ত্তাদের সব দামি দামি অর্কিড ওঁরি বাটন্ হোলে গিয়ে পৌঁচচ্ছে। ছেড়ে দাও আশা।

সতীশ। অর্কিডের আশা ছেড়েছি, কিন্তু ঐ গোলাপের কুঁড়ি—

নলিনী। ওটা বাবা যখন দোকান থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কামনা করেছিলেন, ওর সদ্গতি হয় যেন—

সতীশ। অর্থাৎ—

নলিনী। ঐ অর্থাতের মধ্যে অনেকখানি অর্থ আছে।

সতীশ। আর আমি যে তোমার স্তব করে' মরি, তার মধ্যে যতটা শব্দ আছে, ততটা অর্থ নেই।

নলিনী। যদি কিছু থাকে, সে কন্যাকর্ত্তাদের অমর লোকের উপযুক্ত নয়।

সতীশ। অতএব আমাকে সদ্য স্বর্গপ্রাপ্তির চেষ্টা করতে হবে। চল্লেম তবে সেই তপস্যায়।

নন্দীর প্রবেশ

নন্দী। Hallo সতীশ বাবু। ও কি ও! সেই নেকলেসটা নিয়ে চলেচ যে। সে দিন ত এলবাম নিয়ে সরে' পড়েছিলে, আজ নেকলেস? Bravo! you know how to eat pudding and yet to keep it!

সতীশ। বুঝতে পারচিনে আপনার কথা।

নন্দী। আমরা যা দিই, তা ফিরে নিই নে, তার বদলেও কিছু ফিরে পাই নে। দেবার হাত নেবার হাত দুই হাতই খালি থাকে। You are lucky, বিনা মূলধনে ব্যবসা ক'রে এত enormous profit!

নলিনী। ও কি সতীশ, হাতের আস্তিন গুটচ্চো যে, মারামারি করবে না কি? তা'হলে মাঝের থেকে আমার নেকলেস্‌টা ভাঙবে দেখচি। দাও ওটা গলায় পরে' নিই। (নেকলেস লইয়া গলায় পরা) অমনি নেব না, সতীশ, এর দাম দেব। (গোলাপের কুঁড়ি সতীশের বাটন হোল্-এ পরাইয়া দেওয়া) মিষ্টার নন্দী, আপনার ব্রেসলেট আপনি নিয়ে যান।

নন্দী। কেন?

নলিনী। এর দাম আমার কাছে নেই।

নন্দী। বিনা দামেই ত আমি—

নলিনী। আপনার খুব দয়া। কিন্তু আমার ত আত্ম-সম্মান আছে। এস সতীশ, তোমাদের দুজনের লড়াই দেখবার সময় আমার নেই। তার চেয়ে এস বেড়াতে বেড়াতে গল্প করি, সময়টা কাটবে ভালো।

উভয়ের প্রস্থান।

চারুবালার প্রবেশ

চারু। মিষ্টার নন্দী, আপনার নৈবেদ্য দেখতে পাচ্চি, কিন্তু সামনে দেবতা নেই যে।

নন্দী। কে বল্‌লে নেই?

চারু। সাকার দেবতার কথা বলচি, নিরাকারের খবর জানিনে।

নন্দী। পূজা যদি নেন, তা'হলে করকমলে—

চারু। আপনি মাঝে মাঝে চোখে ভুল দেখেন না কি? আমি ত—

নন্দী। হাঁ, ভুল ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছই—

চারু। তার পরে redirected হয়ে—

নন্দী। ঘুরে আসতে হয়।

চারু। আজ আপনার কপালে তারি ছাপ দেখতে পাচ্চি।

নন্দী। ছাপের সংখ্যা আর বাড়াবেন না, তা'হলে কলঙ্কের চিহ্নটাই জাগবে; ঠিকানাটাই পড়বে চাপা।

চারু। আপনার মত আলাপ করতে আমি কাউকে শুনিনি—চমৎকার কথা কইতে পারেন।

নন্দী। শুধু যে কেবল কানে শোনার কথাই আমার সম্বল, তা নয়, হাতে সোনাও জোগাতে পারি, এইটে প্রমাণ করতে দিন।

চারু। আপনি বাংলাতেও pun করতে পারেন—ক্ষমতা আছে। কিন্তু মিষ্টার নন্দী, ও ব্রেসলেট ত নেলির—

নন্দী। সেইটেই ত হয়েছিল মস্ত ভুল। শোধরাবার opportunity যদি না দেন, তা'হলে উদ্ধার হবে কি ক'রে?

চারু। ঐ নেলি আস্‌চে, চলুন আমরা ঐ দিকে যাই।

নেলি ও সতীশের প্রবেশ

উভয়ের প্রস্থান।

নেলি। যথেষ্ট হয়েছে সতীশ, আজ যদি মিষ্ট কথা বলবার চেষ্টা কর, তা'হলে কিন্তু রসভঙ্গ হবে।

সতীশ। আচ্ছা, আমাকে যদি একেবারে চুপ করিয়ে রাখতে চাও, তা'হলে ঐ গানটা আমাকে শোনাও।

নেলি। কোন্‌টা?

সতীশ। যেই সে—"উজাড় ক'রে দাও হে আমার সকল সম্বল।"

নেলির গান

উজাড় করে' লও হে আমার সকল সম্বল।
শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।
চৈত্র রাতের বেলায়
না হয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপন-স্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে।
তবে ভাঙা খেলার ঘরে
না হয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ধূলায় ধূলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল।

লাহিড়ি সাহেবের প্রবেশ

লাহিড়ি। নেলি, এই দিকে এসো। শুনে যাও। (জনান্তিকে)সতীশের বাপ মারা গেছেন।

নেলি। সে কি কথা ?

লাহিড়ি। মাদ্রাজে। সে-ও আজ তিন দিন হ'ল। Heartএর weakness থেকে।

নেলি। সতীশ জানে না ?

লাহিড়ি। না—মন্মথ বাড়ির লোককে কাছে ডাকতে মানা করেছিলেন। সেখানে ওঁর বাড়ির ঠিকানাও কেউ জানতো না। দৈবাৎ পূজোর ছুটিতে এক জন বাঙালী উকীল সেখানে ছিল, মৃতুশয্যায় সেই তাঁর উইল তৈরি করেছে; সে আজ এসে পৌছেচে। আমাকে সে জানে—আমার কাছেই প্রথম এসেছিল, আমি মন্মথর বাড়িতে তাকে এইমাত্র রওনা ক'রে দিলুম। তুমি সতীশকে শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দাও।

প্রস্থান।

নলিনী। সতীশ, চা প'ড়ে রয়েচে, খেয়ে নাও।

সতীশ। আমার ইচ্ছে করচে না।

নলিনী। আমার কথা শোনো, শুধু চা নয়, কিছু খাও। এই নাও রুটি।

সতীশ। মনে রেখো নেলি, গরীব বলেই আমার দানের দাম অনেক বেশি।

নলিনী। দেখ, ও কথা আজ থাক্। কাল হবে। এখন তুমি খেয়ে নাও।

সতীশ। তাড়া দিচ্চ কেন—আমার ত আপিস নেই।

নলিনী। চুপ চুপ, কথা কোয়ো না, খাও। আরেকটু খাও। এই নাও।

সতীশ। আর পারচিনে—আমার হয়েচে। আমার খাবার রুচি চ'লে গেছে।

নলিনী। আচ্ছা, তা'হলে এসো—শোনো। তোমাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌছিয়ে দিই।

সতীশ। আমার এমন সৌভাগ্য ত আর কখনো—

নলিনী। চুপ চুপ। চ'লে এসো। প্রস্থান।

লাহিড়ি ও লাহিড়ির জায়ার প্রবেশ

লাহিড়ি-জায়া। সতীশের বাপ হঠাৎ মারা গেছে?

মিষ্টার লাহিড়ি। হাঁ।

জায়া। কে যে বললে সমস্ত সম্পত্তি অনাথ আশ্রমে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মা'র জন্য জীবিতকাল পর্য্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ। এখন কি করা যায়!

লাহিড়ি। এত ভাবনা কেন তোমার?

জায়া। বেশ লোক যা হোক তুমি। তোমার মেয়ে যে সতীশকে ভালবাসে, সেটা বুঝি তুমি দুই চক্ষু খেয়ে দেখতে পাও না! তোমার নেলি এ দিকে লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে নন্দীকে দেশছাড়া করে' দিয়েছে। নন্দী ত ভয়ে ওর কাছেই ঘেঁষতে চায় না। জানো বোধ হয়, চারুর সঙ্গে সে engaged.

লাহিড়ি। সে দিন টেনিস্ কোর্টেই সেটা বোঝা গিয়েছিল।

লাহিড়ি-জায়া। এখন উপায় কি করবে?

লাহিড়ি। আমি ত মন্মথর টাকার উপর কোনো দিন নির্ভর করি নি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির উপর নির্ভর করে' বসেছিলে? অন্নবস্ত্রটা বুঝি অনাবশ্যক?

লাহিড়ি। সম্পূর্ণ আবশ্যক। সতীশের একটি মেসো আছে বোধ হয় জান।

জায়া। মেসো ত ঢের লোকেরই থাকে; তাতে ক্ষুধা শান্তি হয় না।

লাহিড়ি। এই মেসোটি আমার মক্কেল—অগাধ টাকা।—ছেলেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতান্ত অল্প নয়। সে ত সতীশকেই পোষ্যপুত্র নিতে চায়।

জায়া। মেসোটি ত ভালো। তা চটপট নিক্ না। তুমি একটু তাড়া দাও না।

লাহিড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের মধ্যেই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিক্‌ঠাক্ এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে—এক ছেলেকে পোষ্যপুত্র লওয়া যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হয়ে গেছে।

জায়া। আইন ত তোমাদেরই হাতে—তোমরা চোখ বুজে একটা বিধান দিয়ে দাও না।

লাহিড়ি। ব্যস্ত হয়ো না—পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্য উপায় আছে।

জায়া। আমাকে বাঁচালে। আমি ভাবছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কি ক'রে। আবার আমাদের নেলি যে রকম জেদালো মেয়ে, সে যে কি করে' বসত, বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে' গরীবের হাতে ত মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ দেখ, তোমার মেয়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

লাহিড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালবাসে, সে ত দেখে মনে হয় না। ও ত সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। এক সময়ে আমি ভাবতুম, নন্দীর ওপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—সে যাকে ভালবাসে, তাকেই জ্বালাতন করে। দেখ না বিড়ালছানাটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করে! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তবু ত ওকে কেউ ছাড়তে চায় না।

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি যাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে যেতে চাই।

চতুর্থ দৃশ্য

শশধরের ঘর

সম্মুখেই বাগান

সতীশ। বাবার শাপ এখনো ছাড়ে নি, মা, এখনো ছাড়েনি। তিনি আমার ভাগ্যের উপরে এখনো চেপে বসে আছেন।

বিধু। আমাদের যা করবার, তা তো করেচি, গয়াতে তাঁর সপিণ্ডীকরণ হয়ে গেল—তোর মাসীর কল্যাণে ব্রাহ্মণবিদায়েরও ভালো আয়োজন হয়েছিল।

সতীশ। সেই পুণ্যফল মাসির কপালেই ফল্‌ল। নইলে—

বিধু। তাই ত। নইলে এত বয়সে তাঁর ছেলে হবে, এমন সর্ব্বনেশে কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

সতীশ। অন্যায়। অন্যায়। বাবার সম্পত্তি পেতে পারতুম, তার থেকে বঞ্চিত হলুম; তার পরে আবার—কি অন্যায়!

বিধু। অন্যায় নয় ত কি? নিজের বোনপোকে এমন করেও ঠকালে? শেষকালে দয়াল ডাক্তারের ওষুধ ত খাটল, আমরা কালীঘাটে এত মানত করলুম, তার কিছুই হ'ল না। একেই বলে কলিকাল। একমনে ভগবানকে ডাক্—তিনি যদি এখনো—

সতীশ। মা এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল, কিন্তু যে রকম অন্যায় হ'ল, তাতে—ঈশ্বরের কাছে—তিনি দয়া করে' যেন—

বিধু। আহা, তাই হোক্—নইলে তোর উপায় কি হবে, সতীশ? হে ভগবান্, তুমি যেন—

সতীশ। এ যদি না হয়, ঈশ্বরকে আমি আর মান্‌ব না; কাগজে নাস্তিকতা প্রচার করব। কে বলে তিনি মঙ্গলময়।

বিধু। আরে চুপ চুপ, এখন অমন কথা মুখে আনতে নেই! তিনি দয়াময়, তাঁর দয়া হ'লে কি না ঘটতে পারে। সতীশ, আজ বুঝি ওদের ওখানে যাচ্চিস্?

সতীশ। হাঁ।

বিধু। তোর সেই সাহেবের দোকানের কাপড় পরিস নি যে বড়?

সতীশ। সে সব পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিধু। সে আবার কবে হ'ল?

সতীশ। অনেক দিন। টেনিস্ পার্টিতে নলিনীকে কথা দিয়ে এসেছিলেম।

বিধু। সে যে অনেক দামের!

সতীশ। নইলে পোড়াবার মজুরী পোষাবে কেন? স্বর্ণলঙ্কারও ত অনেক দাম ছিল।

বিধু। তোমাদের বোঝা আমার কর্ম্ম নয়। যাই, দিদির খোকাকে নাওয়াতে হবে।

প্রস্থান।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। সতীশ!

সতীশ। কি মাসিমা!

সুকুমারী। কাল যে তোমাকে খোকার কাপড় কিনে আনবার জন্য এত করে' বল্লেম, অপমান বোধ হ'ল বুঝি!

সতীশ। অপমান কিসের, মাসিমা! কাল লাহিড়ি সাহেবের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই—

সুকুমারী। লাহিড়ি সাহেবের ওখানে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কি, তা ত ভেবে পাইনে। তারা সাহেব মানুষ; তোমার মত অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সাজে? আমি ত. শুনলেম, তোমাকে তারা পোঁছে না, তবু বুঝি ঐ রঙীন টাইয়ের উপর টাইরিং প'রে বিলাতি কার্ত্তিক সেজে তাদের ওখানে আনাগোনা করতেই হবে! তোমার কি একটুও সম্মানবোধ নেই! এ দিকে একটা কাজ করতে বল্‌লে মনে মনে রাগ করা হয়, পাছে ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে করে' ভুল করে! কিন্তু সরকারও ত ভালো—সে খেটে উপার্জ্জন করে' খায়।

সতীশ। মাসিমা, আমিও হয় ত অনেক আগেই তা পারতেম, কিন্তু তুমিই ত—

সুকুমারী। তাই বটে! জানি, শেষকালে আমারি দোষ হবে! এখন বুঝচি, তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিনতেন! আমি আরো ছেলেমানুষ বলে' দয়া করে' তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম, জেল থেকে বাঁচালেম, শেষকালে আমারি যত দোষ হ'ল। এ'কেই বলে কৃতজ্ঞতা! আচ্ছা, আমারই না হয় যত দোষ, তবু যে ক'দিন এখানে আমাদের অন্ন খাচ্চ, দরকারমত দুটো কাজই না হয় করে' দিলে। এমন কি কেউ করে না? এ'তে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়!

সতীশ। কিছু না, কিছু না, কি করতে হবে বল, আমি এখনি করচি।

সুকুমারী। আজ তোমার আপিসের ছুটি আছে, তোমাকে দোকানে যেতে হবে। খোকার জন্য সাড়ে সাত গজ রেনবো সিল্ক চাই—আর একটা সেলার সুট। (সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোন শোন, ওর মাপটা নিয়ে যেয়ো। জুতো চাই। (সতীশ-প্রস্থানোন্মুখ) ব্যস্ত হচ্চ কেন—সবগুলো ভালো করে' শুনেই যাও! আজও বুঝি লাহিড়ি সাহেবের রুটি বিস্কিট খেতে যাবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট করচে। খোকার জন্য ষ্ট্র-হ্যাট্‌ এনো—আর তার রুমালও এক ডজন চাই! (সতীশের প্রস্থান। তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া) শোন সতীশ, আর একটা কথা আছে। শুন্‌লেম তোমার মেসোর কাছ থেকে তুমি নূতন সুট কেনবার জন্য আমাকে না বলে' টাকা চেয়ে নিয়েছ। যখন নিজের সামর্থ্য হবে, তখন যত খুসি সাহেবিয়ানা কোরো, কিন্তু পরের পয়সায় লাহিড়ি সাহেবদের তাক্‌ লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে' দিয়ো না। সে টাকাটা আমাকে ফেরৎ দিয়ো। আজকাল আমাদের বড় টানাটানির সময়।

সতীশ। আচ্ছা, এনে দিচ্চি।

সুকুমারী। এখনো দোকান খুলতে দেরী আছে। কিন্তু টাকা বাকি যা থাকে, ফেরৎ দিয়ো যেন। একটা হিসাব রাখতে ভুলো না। (সতীশের প্রস্থানোদ্যম) শোন সতীশ—এই ক'টা জিনিষ কিনতে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়ি ভাড়া লাগিয়ে বসো না! ঐ জন্যে তোমাকে কিছু আনতে বলতে ভয় করে। দু'পা হেঁটে চলতে হলেই অমনি তোমার মাথায় মাথায় ভাবনা পড়ে—পুরুষ মানুষ এত বাবু হলে ত চলে না! তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিয়ে নতুন বাজার থেকে মাছ কিনে আনতেন—মনে আছে ত? মুটেকেও তিনি এক পয়সা দেন নাই।

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাকবে—আমিও দে'ব না! আজ হ'তে তোমার এখানে মুটে ভাড়া বেহারার মাইনে যত অল্প লাগে, সে দিকে আমার সর্ব্বদাই দৃষ্টি থাকবে। (সুকুমারীর প্রস্থান) সেই চিঠিটা এই বেলা শেষ করি, নইলে সময় পাব না (চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত)।

হরেনের প্রবেশ

হরেন। দাদা, ও কি লিখচ, কা'কে লিখচ, বল না?

সতীশ। যা, যা, তোর সে খবরে কাজ কি, তুই খেলা করগে যা!

হরেন। দেখি না কি লিখচ—আমি আজকাল পড়তে পারি।

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস্‌নে বলচি—যা তুই।

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালবাসা। দাদা কি ভালবাসার কথা লিখচ, বল না। কাঁচা পেয়ারা?

সতীশ। আঃ হরেন, অত চেঁচাস্‌নে, ভালবাসার কথা আমি লিখিনি।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যা কথা বলচ। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালবাসা। আচ্ছা, মাকে ডাকি, তাঁকে দেখাও।

সতীশ। না, না, মাকে ডাকতে হবে না! লক্ষ্মীটি, তুই একটু খেলা করতে যা, আমি এইটে শেষ করি।

হরেন। এটা কি দাদা! এ যে ফুলের তোড়া! আমি নেব।

সতীশ। ওতে হাত দিস্‌নে—হাত দিস্‌নে, ছিঁড়ে ফেলবি।

হরেন। না, আমি ছিঁড়ে ফেলব না, আমাকে দাও না!

সতীশ। খোকা, কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেব, এটা থাক্।

হরেন। দাদা, এটা বেশ, আমি এইটেই নেব!

সতীশ। না, এ আর এক জনের জিনিষ, আমি তোকে দিতে পারব না।

হরেন। অ্যাঁ, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লজঞ্জুস্ আনতে বলেছিলেম, তুমি সেই টাকায় তোড়া এনেছ—তাই বই কি, আরেকজনের জিনিষ বই কি!

সতীশ। হরেন, লক্ষ্মী ভাই, তুই একটুখানি চুপ কর, চিঠিখানা শেষ করে' ফেলি। কাল তোকে আমি অনেক লজঞ্জুস্ কিনে এনে দেব'।

হরেন। আচ্ছা, তুমি কি লিখচ, আমাকে দেখাও।

সতীশ। আচ্ছা দেখাব, আগে লেখাটা শেষ করি।

হরেন। তবে আমিও লিখি। (শ্লেট লইয়া চীৎকার স্বরে) ভয়ে আকার ভা,—

সতীশ। চুপ চুপ, অত চীৎকার করিস্ নে!—আঃ থাম থাম!

হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও।

সতীশ। আচ্ছা নে, কিন্তু খবরদার ছিঁড়িস্‌নে!—ও কি করলি! যা বারণ করলেম, তাই, ফুলটা ছিঁড়ে ফেল্লি। এমন বদ্ ছেলেও ত দেখিনি! (তোড়া কাড়িয়া লইয়া চপেটাঘাত করিয়া) লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার। যা এখান থেকে—যা বল্‌চি! যা!

হরেনের চীৎকার স্বরে ক্রন্দন সতীশের সবেগে প্রস্থান।

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েচে, দিদি টের পেলে সর্ব্বনাশ হবে। হরেন, বাপ আমার, কাঁদিস্‌নে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

হরেন। (সরোদনে) দাদা আমাকে মেরেচে।

বিধু। আচ্ছা, চুপ কর, চুপ কর, আমি দাদাকে খুব করে' মারব এখন।

হরেন। দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেল।

বিধু। আচ্ছা, সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আস্‌চি! (হরেনের ক্রন্দন) এমন ছিঁচ-কাঁদুনে ছেলেও ত আমি কখনো দেখিনি। দিদি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্চেন। যখন যেটি চায়, তখন সেটি তাকে দিতে হবে। দেখ না, একেবারে নবাবপুত্র! ছি ছি, নিজের ছেলেকে কি এমনি করেই মাটি করতে হয়! (সতর্জ্জনে) খোকা, চুপ কর বলচি, ঐ হাম্‌দোবুড়ো আস্‌চে।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। বিধু, ও কি ও! আমার ছেলেকে কি এমনি করেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়। আমি চাকর-বাকরদের বারণ করে' দিয়েচি, কেউ ওর কাছে ভূতের কথা বল্‌তে সাহস করে না।—আর তুমি বুঝি মাসি হয়ে ওর এই উপকার করতে বসেচ! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কি অপরাধ করেচে! ওকে তুমি দুটি চক্ষে দেখতে পার না, তা আমি বেশ বুঝেচি! আমি বরাবর তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মত মানুষ করলেম আর তুমি বুঝি আজ তারই শোধ নিতে এসেচ।

বিধু। (সরোদনে) দিদি, এমন কথা বোলো না। আমার কাছে সতীশ আর তোমার হরেনে প্রভেদ কি আছে!

হরেন। মা, দাদা আমাকে মেরেচে!

বিধু। ছি ছি খোকা, মিথ্যা বল্‌তে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলই না, তা মার্‌বে কি করে'।

হরেন। বাঃ—দাদা যে এইখানে বসে' চিঠি লিখছিল—তাতে ছিল ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল।

সুকুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেচ বুঝি। ওকে তোমাদের সহ্য হচ্চে না! ও গেলেই তোমরা বাঁচ। আমি তাই বলি, খোকা রোজ ডাক্তার-কবরাজের বোতল বোতল ওষুধ গিল্‌চে, তবু দিন দিন এমন রোগা হচ্চে কেন। ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেল।

সকলের প্রস্থান।

সতীশ ও নেলীর প্রবেশ

সতীশ। এ কি, তুমি যে এ বাড়িতে ?

নেলি। শশধর বাবু বাবাকে কি একটা আইনের কাজে ডেকেচেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি।

সতীশ। আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে চাই নেলি।

নলিনী। কেন, কোথায় যাবে ?

সতীশ। জাহান্নামে।

নলিনী। যে লোক সন্ধান জানে, সে ত ঘরে বসেই সেখানে যেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন ? কলারটা বুঝি ঠিক হাল ফেশানের হয় নি !

সতীশ। তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কলারের কথাই দিন-রাত্রি চিন্তা করি।

নলিনী। তাই ত মনে হয়। সেই জন্যই ত হঠাৎ তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাশীলের মত দেখায় !

সতীশ। ঠাট্টা কোরো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়টা দেখতে পেতে—

নলিনী। তা হ'লে ডুমুরের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে পেতাম !

সতীশ। আবার ঠাট্টা ! তুমি বড় নিষ্ঠুর। সত্যই বল্‌চি নেলি, আজ বিদায় নিতে এসেছি।

নলিনী। দোকানে যেতে হবে ?

সতীশ। মিনতি করচি নেলি, ঠাট্টা করে' আমাকে দগ্ধ কোরো না। আজ আমি চিরদিনের মত বিদায় নেব !

নলিনী। কেন, হঠাৎ সে জন্য তোমার এত বেশি আগ্রহ কেন ?

সতীশ। সত্য কথা বলি, আমি যে কত দরিদ্র, তা তুমি জান না !

নলিনী। সে জন্য তোমার ভয় কিসের। আমি ত তোমার কাছে টাকা ধার চাইনি।

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল—

নলিনী। তাই পালাবে ? বিবাহ না হতেই হৃৎকম্প !

সতীশ। আমার অবস্থা জান্‌তে পেরে মিষ্টার লাহিড়ি আমাদের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

নলিনী। অমনি সেই অপমানেই কি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে। এত বড় অভিমানী লোকের কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা শোভা পায় না। সাধে আমি তোমার মুখে ভাল-বাসার কথা শুনলেই ঠাট্টা করে' উড়িয়ে দি।

সতীশ। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাখতে বল !

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে বলো না, আমার হাসি পায়। আমি তোমাকে আশা রাখতে বলব কেন ? আশা যে রাখে, সে নিজের গরজেই রাখে, লোকের পরামর্শ শুনে রাখে না।

সতীশ। সে ত ঠিক কথা ! আমি জানতে চাই, তুমি দারিদ্র্যকে ঘৃণা কর কি না ?

নলিনী। খুব করি, যদি সে দারিদ্র্য মিথ্যার দ্বারা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা করে।

সতীশ। নেলি, তুমি কি কখনো তোমার চিরকালের অভ্যস্ত আরাম ছেড়ে গরীবের ঘরের লক্ষ্মী হ'তে পারবে ?

নলিনী। নভেলে যে রকম ব্যারামের কথা পড়া যায়, সেটা তেমন করে' চেপে ধর্‌লে আরাম আপনি ঘরছাড়া হয়।

সতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নলিনী। সতীশ, তুমি কখনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হ'তে পারলে না। স্বয়ং নন্দী সাহেবও বোধ হয় অমন প্রশ্ন তুল্‌তেন না। তোমাদের এক চুলও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিন্‌তে পারলেম না, নেলি।

নলিনী। চিনবে কেমন করে'? আমি ত তোমার হাল ফেশানের টাই নই—কলার নই—দিন-রাত যা নিয়ে ভাব, তাই তুমি চেন।

সতীশ। আমি হাত যোড় করে' বল্‌চি নেলি, তুমি আজ আমাকে এমন কথা বলো না। আমি যে কি নিয়েভাবি, তা তুমি নিশ্চয় জান।

নলিনী। ঐ যে বাবা ডাক্‌চেন। তাঁর কাজ হয়ে গেছে। যাই!

উভয়ের প্রস্থান।

সুকুমারী ও শশধরের প্রবেশ

সুকুমারী। দেখ, তোমাকে জানিয়ে রাখচি, আমার হরেনকে মারবার জন্যেই ওরা মায়ে পোয়ে উঠে পড়ে' লেগেছে।

শশধর। আঃ, কি বল! তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি?

সুকুমারী। আমি পাগল, না, তুমি চোখে দেখতে পাও না!

শশধর। কোনটাই আশ্চর্য্য নয়, দুটোই সম্ভব। কিন্তু—

সুকুমারী। আমাদের হরেনের জন্ম হতেই দেখনি ওদের মুখ কেমন হয়ে গেছে। সতীশের ভাবখানা দেখে বুঝতে পার না!

শশধর। আমার অত ভাব বুঝবার ক্ষমতা নেই, সে-ত তুমি জানই।

সুকুমারী। সতীশ যখনই আড়ালে পায়, তোমার ছেলেকে মারে, আবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে খোকাকে জুজুর ভয় দেখায়।

শশধর। ঐ দেখ, তোমরা ছোট কথাকে বড় করে' তোল। যদিই বা সতীশ খোকাকে কখনো—

সুকুমারী। সে তুমি সহ্য করতে পার, আমি পারব না—ছেলেকে ত তোমার গর্ভে ধর্‌তে হয়নি!

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার করতে পারব না। এখন তোমার অভিপ্রায় কি শুনি।

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি ত বড় বড় কথা বল, একবার তুমি ভেবে দেখ না, আমরা হরেনকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, তার মাসি তাকে অন্যরূপ শেখায়—সতীশের দৃষ্টান্তটিই বা তার পক্ষে কি রকম, সেটাও ত ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যখন অত বেশি করে' ভাবচ, তখন তার উপরে আমার আর ভাববার দরকার কি আছে! এখন কর্ত্তব্য কি বল?

সুকুমারী। আমি বলি, সতীশকে তুমি বল, পুরুষ মানুষ পরের পয়সায় বাবুগিরি করে, সে কি ভাল দেখতে হয়! আর যার সামর্থ্য কম, তার অত লম্বা চালেই বা দরকার কি?

শশধর। মন্মথ সেই কথাই বল্‌ত। আমরাই ত সতীশকে অন্যরূপ বুঝিয়েছিলেম। এখন ওকে দোষ দিই কি করে'?

সুকুমারী। না—দোষ কি ওর হ'তে পারে! সব দোষ আমারি। তুমি ত আর কারো কোনো দোষ দেখতে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই—

শশধর। ওগো, রাগ কর কেন—আমিও ত দোষী।

সুকুমারী। তা হ'তে পারে। তোমার কথা তুমি জান। কিন্তু আমি কখনো ওকে এমন কথা বলিনি যে, তুমি তোমার মেসোর ঘরে পায়ের উপর পা দিয়ে গোঁফে তা দাও আর লম্বা কেদারায় বসে' বসে' আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাক!

শশধর। না, ঠিক ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাথার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাওনি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারিনে। এখন কি করতে হবে বল।

সুকুমারী। সে তুমি যা ভাল বোঝো, তাই কর। কিন্তু আমি বলচি, সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে, খোকাকে কোন মতে বাইরে যেতে দিতে পারব না। ও ত আমারই আপন বোনের ছেলে। কিন্তু আমি ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করিনে—এ আমি তোমাকে স্পষ্টই বল্‌লেম।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। কাকে বিশ্বাস কর না মাসিমা! আমাকে? আমি তোমার খোকাকে সুযোগ পেলে গলা টিপে মারব, এই তোমার ভয়? যদি মারি, তবে তুমি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ট করেচ, তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ট করা হবে? কে আমাকে ছেলে-বেলা হ'তে নবাবের মত সৌখীন করে' তুলেচে এবং আজ ভিক্ষুকের মত পথে বের কল্লে? কে আমাকে পিতার শাসন থেকে বিশ্বের লাঞ্ছনার মধ্যে টেনে আনলে? কে আমাকে—

সুকুমারী। ওগো শুনচ? তোমার সামনে আমাকে এমনি করে' অপমান করে? নিজের মুখে বল্লে কি না, খোকাকে গলা টিপে মারবে? ও মা, কি হবে গো! আমি কাল-সাপকে নিজের হাতে দুধকলা দিয়ে পুষেচি।

সতীশ। দুধকলা আমারও ঘরে ছিল—সে দুধকলায় আমার রক্ত বিষ হয়ে উঠত না—তা থেকে চিরকালের মত বঞ্চিত করে' তুমি যে দুধকলা আমাকে খাইয়েচ, তাতে আমার বিষ জমে উঠেচে। সত্য কথাই বলচ, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন করতে পারি।

বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। কি সতীশ, কি হয়েচে, তোকে দেখে যে ভয় হয়! অমন করে' তাকিয়ে আছিস কেন? আমাকে চিনতে পারচিস নে? আমি তোর মা সতীশ!

সতীশ। মা, তোমাকে মা বলব কোন্ মুখে? মা হয়ে কেন তুমি আমাকে জেল থেকে ফিরিয়ে আনলে? সে কি মাসির ঘরের চেয়ে ভয়ানক?

শশধর। আঃ সতীশ! চল চল—কি বকচ, থাম।

সুকুমারী। নাও তোমরা বোঝাপড়া কর—আমার কাজ আছে।

প্রস্থান।

শশধর। সতীশ, একটু ঠাণ্ডা হও! তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হয়েচে, সে কি আমি

জানিনে? তোমার মাসি রাগের মুখে কি বলচেন, সে কি অমন করে' মনে নিতে আছে? দেখ, গোড়ায় যা ভুল হয়েচে, তা এখন যতটা সম্ভব প্রতিকার করা যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সতীশ। মেসোমশায়, প্রতিকারের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মাসিমার সঙ্গে আমার এখন যেরূপ সম্পর্ক দাঁড়িয়েচে, তাতে তোমার ঘরের অন্ন আমার গলা দিয়ে আর গলবে না। এত দিন তোমাদের যা খরচ করিয়েচি, তা যদি শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত শোধ করে' না দিতে পারি, তবে আমার মরেও শান্তি নাই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে ত সে আমার হাতে, তুমি কি প্রতিকার করবে?

শশধর। না, শোন সতীশ—একটু স্থির হও। তোমার যা কর্ত্তব্য, সে তুমি পরে ভেবো; তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অন্যায় করেচি, তার প্রায়শ্চিত্ত ত আমাকেই করতে হবে। দেখ, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেব, সেটাকে তুমি দান মনে করো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক করে' রেখেচি—পর্শু শুক্রবারে রেজেষ্ট্রী ক'রে দেব।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধূলা লইয়া) মেসোমশায়, কি আর বলব—তোমার এই স্নেহে—

শশধর। আচ্ছা, থাক্ থাক্! ওসব স্নেহ ফেহ আমি কিছু বুঝি নে, রসকস আমার কিছুই নেই। যা কর্ত্তব্য, তা কোনো রকমে পালন কর্ত্তেই হবে, এই বুঝি। সাড়ে আটটা বাজল, তুমি আজ কোরিন্থিয়ানে যাবে বলেছিলে, যাও। সতীশ, একটা কথা তোমাকে বলে' রাখি। দানপত্রখানা আমি মিষ্টার লাহিড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েচি। ভাবে বোধ হ'ল, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন—তোমার প্রতি যে টান নেই, এমন ত দেখা গেল না। এমন কি, আমি চলে' আসবার সময় তিনি আমাকে বল্লেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে না কেন? আরো একটা সুখবর আছে সতীশ, তোমাকে যে আপিসে কাজ করিয়ে দিয়েছি, সেখানকার বড় সাহেব তোমার খুব সুখ্যাতি করছিলেন।

সতীশ। সে আমার গুণে নয়। তোমাকে ভক্তি করেন বলেই আমাকে এত বিশ্বাস করেন।

প্রস্থান।

শশধর। ওরে রামচরণ, তোর মা ঠাকুরাণীকে একবার ডেকে দে ত।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকুমারী। কি স্থির করলে?

শশধর। একটা চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেচি!

সুকুমারী। তোমার প্ল্যান যত চমৎকার হবে, সে আমি জানি। যা হো'ক, সতীশকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করেচ ত?

শশধর। তাই যদি না করব, তবে আর প্ল্যান কিসের? আমি ঠিক করেচি, সতীশকে আমাদের তরফ মাণিকপুর লিখে পড়ে' দেব—তা'হলেই সে স্বচ্ছন্দে নিজের খরচ চালিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারবে। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না।

সুকুমারী। আহা, কি সুন্দর প্ল্যানই ঠাউরেচ! সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে মুগ্ধ! না, না, তুমি অমন পাগলামি করতে পারবে না; আমি বলে' দিলেম।

শশধর। দেখ, এক সময়ে ত ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিল।

সুকুমারী। তখন ত আমার হরেন জন্মায় নি। তা ছাড়া তুমি কি ভাব, তোমার আর ছেলেপুলে হবে না?

শশধর। সুকু, ভেবে দেখ, আমাদের অন্যায় হচ্ছে। মনেই কর না কেন, তোমার দুই ছেলে।

সুকুমারী। সে আমি অতশত বুঝিনে—তুমি যদি এমন কাজ কর, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব—এই আমি বলে' গেলেম।

সুকুমারীর প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

শশধর। কি সতীশ, থিয়েটারে গেলে না?

সতীশ। না মেসোমশায়, আর থিয়েটার না। এই দেখ, দীর্ঘকাল পরে মিষ্টার লাহিড়ির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েচি! তোমার দানপত্রের ফল দেখ। সংসারের উপর আমার ধিক্কার জন্মে গেছে মেসোমশায়! আমি তোমার সে তালুক নেব না।

শশধর। কেন সতীশ?

সতীশ। নিজের কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকুই ভোগ করব। তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্মতি নিয়েচ ত?

শশধর। না, সে তিনি—অর্থাৎ বুঝেছ সে একরকম করে' হবে।' হঠাৎ তিনি রাজি না হ'তে পারেন, কিন্তু—যদিই বা,—

সতীশ। তুমি তাঁকে বলেছ?

শশধর। হাঁ, বলেছি বই কি? বিলক্ষণ। তাঁকে না বলেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন?

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো করে' বুঝিয়ে—ধৈর্য্য ধরে' থাকলেই—

সতীশ। বৃথা চেষ্টা মেসোমশায়। তাঁর নারাজিতে তোমার সম্পত্তি আমি নিতে চাই নে। তুমি তাঁকে বোলো, আজ পর্য্যন্ত তিনি যে অন্ন খাইয়েচেন, তা উদ্গার না করে' আমি বাঁচব না। তাঁর সমস্ত ঋণ সুদ সুদ্ধ শোধ করে' তবে আমি হাঁফ ছাড়ব!

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ। তোমাকে বরঞ্চ কিছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশায়, আর ঋণ বাড়াব না। মাসিমাকে বোলো, আজই এখনি তাঁর কাছে হিসাব চুকিয়ে তবে জল গ্রহণ করব।

প্রস্থান।

সুকুমারীর প্রবেশ

সুকু। দেখ দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম করে' কাজকর্ম্ম করচে। দেখ, অতবড় সাহেব বাবু আজকাল পুরোনো কালো আলপাকার চাপকানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আফিসে যায়।

শশধর। বড় সাহেব সতীশের খুব প্রশংসা করেন।

সুকুমারী। ভালই ত, যা মাইনে পাবে, তাতেই বেশ চলে' যাবে। তার উপরে যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে বস, তবে একদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দেবে। আমার পরামর্শ নিয়ে যদি চলতে, তবে সতীশ এত দিনে মানুষের মত হ'ত।

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নি, কিন্তু স্ত্রী দিয়েচেন; আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েচেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করেছেন,—আমাদেরই জিত।

সুকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা. ঢের হয়েচে, ঠাট্টা করতে হবে না। কিন্তু সতীশের পিছনে এত দিন যে টাকাটা ঢেলেছ, সে যদি আজ থাকত, তবে—

শশধর। সতীশ ত বলেচে, কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ করে' দেবে।

সুকুমারী। রইল। সে ত বরাবরই ঐ রকম লম্বা-চৌড়া কথা বলে' থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরসায় পথ চেয়ে বসে' আছ।

শশধর। এত দিন ত ভরসা ছিল, তুমি যদি পরামর্শ দাও ত সেটা বিসর্জ্জন দিই।

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশী লোকসান হবে না, এই পর্য্যন্ত বলতে পারি। ঐ যে তোমার সতীশ বাবু আসছেন! আমি যাই।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। মাসিমা, পালাতে হবে না, এই দেখ, আমার হাতে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নেই—কেবল খান কয়েক নোট আছে!

শশধর। ইস্, এ যে এক তাড়া নোট। যদি আপিসের টাকা হয় ত এমন করে, সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হচ্চে না, সতীশ!

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াব না। মাসিমার পায়ে বিসর্জ্জন দিলাম। প্রণাম হই মাসিমা! বিস্তর অনুগ্রহ করেছিলে, তখন তার হিসাব রাখতে হবে মনেও করিনি, সুতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভুলচুক হ'তে পারে! এই পনরো হাজার টাকা গুণে নাও। তোমার হরেনের পোলাও-পরমান্নে একটি তণ্ডুলকণাও কম না পড়ুক।

শশধর। এ কি কাণ্ড সতীশ! এত টাকা কোথায় পেলে?

সতীশ। আমি গুণচট আজ ছয়মাস আগাম খরিদ করে' রেখেচি—ইতি মধ্যে দর চড়েচে; তাই মুনফা পেয়েচি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়োখেলা!

সতীশ। খেলা এইখানেই শেষ, আর দরকার হবে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না।

সতীশ। তোমাকে ত দিই নি মেসোমশায়! এ মাসিমার ঋণ শোধ, তোমার ঋণ কোনকালে শোধ করতে পারব না।

শশধর। কি সুকু, এ টাকাগুলো—

সুকুমারী। গুণে খাতাঞ্জির হাতে দাও না, ঐখানেই কি ছড়ানো পড়ে' থাকবে? (নোটগুলি তুলিয়া গুণিয়া দেখা)

শশধর। সতীশ, খেয়ে এসেছ ত ?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাব।

শশধর। অ্যাঁ, সে কি কথা! বেলা যে বিস্তর হয়েচে। আজ এইখানেই খেয়ে যাও।

সতীশ। আর খাওয়া নয় মেসোমশায়। এক দফা শোধ করলেম, অন্নঋণ আর নূতন করে' ফাঁদতে পারব না।

প্রস্থান।

সুকুমারী। বাপের হাত থেকে রক্ষা করে' এত দিন ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলেম, আজ হাতে দু'পয়সা আসতেই ভাবখানা দেখেচ। কৃতজ্ঞতা এমনই বটে! ঘোর কলি কি না!

উভয়ের প্রস্থান।

সতীশের প্রবেশ

সতীশ। এই পিস্তলে দুটি গুলি পুরেচি—এই যথেষ্ট! আমার অন্তিমের প্রেয়সী। ও কে ও? হরেন! কী করছিস্? এই সন্ধ্যার সময় বাগানে অন্ধকার যে, চারদিকে কেউ নেই—পালা, পালা, পালা। (কপালে আঘাত করিয়া) সতীশ, কি ভাবচিস তুই—ওরে সর্ব্বনেশে, চুপ চুপ—না, না, না, এ কী বকচি? আমি কি পাগল হয়ে গেলুম?—কে আছিস ওখানে? বেহারা, বেহারা! কেউ না, কেউ কোথাও নেই। মাসিমা! শুনতে পাচ্চ? ইঃ, একেবারে লুটোপুটি করতে থাকবে। আঃ। হাতকে আর সামলাতে পাচ্চিনে। হাতটাকে নিয়ে কী করি! হাতটাকে নিয়ে কী করা যায়! (ছড়ি লইয়া সতীশ সবেগে চারা গাছগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার উত্তেজনা ক্রমশঃ আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নিজের হাতকে সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু কোনো বেদনা বোধ করিল না, শেষে পকেটের ভিতর হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে হরেনের দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।)

হরেন। (চমকিয়া উঠিয়া) এ কী! দাদা না কী! তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কাঁচাপেয়ারা পাড়ছিলুম, বাবাকে বলে' দিয়ো না!

সতীশ। (চীৎকার করিয়া) মেসোমশায়—মেসোমশায়, এই বেলা রক্ষা কর, আর দেরি কোরো না—তোমার ছেলেকে এখনো রক্ষা কর।

শশধর। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েচে সতীশ? কী হয়েচে?

সুকুমারী। (ছুটিয়া আসিয়া) কী হয়েচে সতীশ। কী হয়েচে?

হরেন। কিছুই হয় নি মা—কিছুই না—দাদা তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করচেন!

সুকুমারী। এ কী রকম বিশ্রী ঠাট্টা। ছি, ছি, সকলি অনাসৃষ্টি! দেখ দেখি। আমার বুক এখনো ধড়াস ধড়াস করচে। সতীশ মদ ধরেচে বুঝি?

সতীশ। পালাও—তোমার ছেলেকে নিয়ে পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।

(হরেনকে লইয়া ত্রস্তপদে সুকুমারীর পলায়ন)

শশধর। সতীশ, অমন উতলা হয়ো না! ব্যাপারটা কী বল! হরেনকে কার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্ত ডেকেছিলে?

সতীশ। আমার হাত থেকে (পিস্তল দেখাইয়া) এই দেখ এই দেখ—মেসোমশায়।

দ্রুতপদে বিধুমুখীর প্রবেশ

বিধু। সতীশ, তুই কোথায় 'কী সর্ব্বনাশ করে' এসেছিস বল দেখি। আপিসের সাহেব পুলিস সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খানাতল্লাসি করতে এসেচে। যদি পালাতে হয়, এই বেলা পালা! হায় ভগবান্! আমি ত কোনো পাপ করিনি, আমারি অদৃষ্টে এত দুঃখ ঘটে কেন?

সতীশ। ভয় নেই—পালাবার উপায় আমার হাতেই আছে।

শশধর। তবে কী তুমি—

সতীশ। তাই বটে মেসোমশায়, যা সন্দেহ করেচ, তাই। আমি চুরি করে' মাসির ঋণ শোধ করেচি। আমি চোর! মা, তুমি শুনে খুসী হবে, আমি চোর, আমি খুনী! তোমার কীর্ত্তি পুরো হ'ল। এখন আর কাঁদতে হবে না—যাও তুমি, যাও যাও, আমার সম্মুখ থেকে যাও। আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।

শশধর। সতীশ, তুমি আমার কাছেও ত কিছু ঋণী আছ, তাই শোধ করে' যাও।

সতীশ। বল, কেমন করে' শোধ করব। কী আমি দিতে পারি। কী চাও তুমি!

শশধর। ঐ পিস্তলটা।

সতীশ। এই দিলাম। আমি জেলেই যাব। না গেলে আমার পাপের ঋণ শোধ হবে না।

শশধর। পাপের ঋণ শাস্তির দ্বারা শোধ হয় না, সতীশ, কর্ম্মের দ্বারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি অনুরোধ কল্লে তোমার বড় সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন থেকে জীবনকে সার্থক করে' বেঁচে থাক!

সতীশ। মেসোমহাশয়, আমার পক্ষে বাঁচা যে কত কঠিন, তা তুমি জান না—

শশধর। তবু বাঁচতে হবে, আমার ঋণের এই শোধ। আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সতীশ। তবে তাই হবে।

শশধর আমার একটা অনুরোধ শোন। তোমার মাকে আর মাসিকে ক্ষমা কর।

বিধু। বাবা, আমার কপালে ক্ষমা না থাকে, নাই থাক্, ভগবান্ তোকে যেন ক্ষমা করেন। দিদির কাছে যাই। তাঁর পায়ে ধরিগে।

প্রস্থান।

শশধর। তবে এস, সতীশ, আমার ঘরে আজ আহার করে' যেতে হবে।

দ্রুতপদে নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। সতীশ।

সতীশ। কী নলিনী?

নলিনী। এর মানে কি? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেচ?

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে, সেইটেই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতারণা করে' চিঠি লিখি

নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলি উল্টো হয়। তুমি মনে করতে পার, তোমার দয়া উদ্রেক করবার জন্যই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন, আমি অভিনয় করছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার এখনো সময় আছে!

নলিনী। কী তুমি পাগলের মত বকচ? আমি তোমার কী অপরাধ করেছি যে, তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে—

সতীশ। যে জন্য আমি এই সঙ্কল্প করেছি, সে তুমি জান, নলিনী—আমি ত একবর্ণও গোপন করিনি, তবু কী আমার উপর শ্রদ্ধা আছে?

নলিনী। শ্রদ্ধা! সতীশ, তোমার উপর ঐ জন্যই আমার রাগ ধরে। শ্রদ্ধা—ছি, ছি, শ্রদ্ধা ত পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে। তুমি যে কাজ করেছ, আমিও তাই করেছি—তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখিনি। এই দেখ, আমার গহনাগুলি সব এনেচি—এগুলো এখনো আমার সম্পত্তি নয়—এগুলি আমার বাপ-মায়ের। আমি তাঁদের না বলে' চুরি করেই এনেচি, এর কত দাম হতে পারে, আমি কিছুই জানিনে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার উদ্ধার হবে না?

শশধর। উদ্ধার হবে; এই গহনাগুলির সঙ্গে আরো অমূল্য যে ধনটি দিয়েচ, তা দিয়েই সতীশের উদ্ধার হবে।

নলিনী। এই যে শশধর বাবু, মাপ করবেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি—

শশধর। মা, সেজন্য লজ্জা কি! দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মত বুড়োদেরই হয় না—তোমাদের বয়সে আমাদের মত প্রবীণ লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না! সতীশ, তোমার আফিসের সাহেব এসেচেন দেখচি। আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আসি! ততক্ষণ তুমি আমার হয়ে' অতিথিসৎকার কর। মা, এই পিস্তলটা এখন তোমার জিম্মাতেই থাকতে পারে।

যবনিকা

ছোট-মা

১
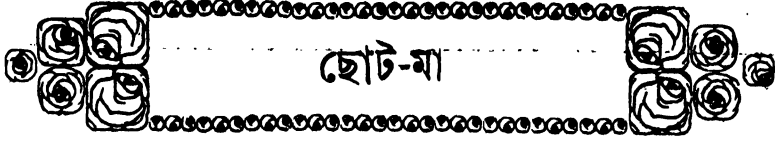
"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"—এই সনাতন প্রবাদের সত্যতা ঘরে ঘরে পরিদৃষ্ট হইলেও, রামের মত গুণের ভাই তারানাথ সরকার ছোট ভাই রমানাথকে যখন পৃথক্ করিয়া দিল, তখন সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল, কলিতে নিতান্ত অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। অনেকে এ জন্য রমানাথকেই দোষী করিয়া বলিল, "রমা ছোঁড়াটা নেহাৎ হতভাগা, এমন গুণের বড় ভায়ের মন জুগিয়ে থাক্‌তে পারলে না।" অনেকে আবার বলিল, "বড় ভায়ের মন জোগান খুব সহজ, কিন্তু বড় বৌয়ের মন জুগিয়ে চলাই শক্ত। বড় বৌয়ের মন জোগাতে পারলে না বলেই রমাকে আলাদা হ'তে হয়েছে।" কেহ বা মন্তব্য প্রকাশ করিল, "এক হাতে তালি বাজে না, দোষ রমারও আছে। এক জন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা এনে সংসার চালাবে, আর এক জন টপ্পা গেয়ে, ইয়ারকি দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, এমন অন্যায় কত দিন সহ্য হয়?" অপরে বলিল, "তা' হ'লেও নিজে যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে ছোট ভাইটাকে এমন পথের ভিখারী ক'রে দেওয়া উচিত হয়নি। হলোই বা স্বোপার্জ্জিত বিষয়। একান্নবর্ত্তীর মামলা করলে রমানাথ সকল সম্পত্তির চুল-চেরা ভাগ পেয়ে যায়।"

পাঁচ জনে যখন রমানাথের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এইরূপ মন্তব্যসমূহ প্রকাশ করিতেছিল, রমানাথ তখন পৃথক্ হইয়া কিরূপে সংসার চালাইবে, তাহারই উপায় চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বাপ গোবর্দ্ধন সরকার দুইটি নাবালক ছেলে আর হাজারখানেক টাকা দেনা রাখিয়া মারা গেলে মহাজনরা যখন দেনার দায়ে জমী-জায়গা, ঘর-ভিটা সব বেচিয়া লইল, তখন মাতৃপিতৃহীন বালক দুইটি শুধু নিরুপায় নহে, সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। জ্যেষ্ঠ তারানাথের বয়স তখন বারো তেরো; সে কোন উপায় না দেখিয়া, ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া, বাপের মামাতো ভগিনী পিসীর বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইল, এবং পিসীর ছেলে বহিয়া, পিসীর গরু বাঁধিয়া, তামাক সাজিয়া, চাষে খাটিয়া কোনরূপে নিজের ও ছোট ভায়ের উদর পূর্ণ করিতে লাগিল।

ক্রমে রমানাথ একটু বড় হইয়া উঠিল। সে জ্যেষ্ঠের পরিশ্রম দেখিয়া এক দিন প্রস্তাব করিল, "এক কায কর, দাদা, তুমি পিসে মশায়ের ক্ষেতের কায নিয়ে থাক। আমি ত বড় হয়েছি, আমি গরুর কায করব।"

তারানাথ সস্নেহে কনিষ্ঠের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল; "না রে বোকা, আমি যেমন খাট্‌ছি, তেমনই খাটি; তুই বরং পাঠশালে যা। আমার ত কিছু হলো না, তুই যদি তবু দু' আখর লিখতে পারিস্।"

গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল। তারানাথ গুরু-মহাশয়ের হাতে-পায়ে ধরিয়া বিনা বেতনে ছোট ভাইকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিল এবং গাছের তালপাতা কাটিয়া, কঞ্চির কলম করিয়া দিয়া তাহাকে পাঠশালায় দিয়া আসিল। কিন্তু ভর্ত্তি করিয়া দিলে কি হইবে, পিসীর হুকুম তামিল করিয়া রমানাথ মাসের অর্দ্ধেক দিনও পাঠশালায় যাইবার অবকাশ পাইত না। তারা-নাথ এ জন্য তাহাকে তাড়না করিতে গেলে, পিসী নিতান্ত উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিতেন, "আরে রেখে দে তোর পাঠশালা! চাষার ছেলে লাঙ্গল ধ'রে খাবে, পাঠশালে গিয়ে হ'বে কি?"

কাযেই ক খ শেষ করিয়া প্রথম ভাগ আরম্ভ করিতে রমানাথের দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। তারানাথ কনিষ্ঠের শিক্ষাবিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু এ জন্য পিসীকে কিছু বলিতে পারিল না, শুধু নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু এ ভাবে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া তারানাথ বেশী দিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। এক বার রমা-নাথের খুব জ্বর হইল, জ্বরে তিন দিন বেহুঁস হইয়া রহিল। তারানাথ ভয় পাইয়া ডাক্তার ডাকিতে ইচ্ছুক হইল। পিসে কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না; বলিলেন, "এ'রকম একটু আধটু জ্বরে ডাক্তার ডাকা গরীব গেরস্তঘরে চলে না। এ জ্বর আপনিই সেরে যাবে।"

জ্বর কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিল, জ্বরের যন্ত্রণায় রমানাথ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাহার কাতরতা দেখিয়া তারানাথ অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু উপায় কিছু করিতে পারিল না। ডাক্তার ডাকিতে, ঔষধ খাওয়াইতে পয়সার দরকার। তারানাথ পয়সা কোথায় পাইবে? সে নিতান্ত নিরুপায়ভাবে রোগযন্ত্রণা-কাতর কনিষ্ঠের পাশে বসিয়া কান্দিতে কান্দিতে আকুল-প্রাণে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। জনৈক প্রতিবেশী তাহার কাতরতা দেখিয়া, নিজ হইতে খরচ দিয়া, ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিল। সে তারানাথকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "বাপু! পিসের ভাতে দু'বেলা পেটটা ভরে বটে, কিন্তু তা'তে পরিণামের কোন উপায় হয় না।"

এই তিরস্কার তারানাথ উপদেশ বলিয়াই মনে করিল, এবং রমানাথ আরোগ্য হইয়া উঠিলে অর্থোপার্জ্জনের আশায় কলিকাতায় চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া প্রথমতঃ সে এক বড় দোকানে মুটের কায করিতে লাগিল; তাহার পর চাঁপাদারীর কায শিখিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইল। বছর তিন কায করিবার পর কিছু টাকা হাতে জমিলে সে পৈতৃক ভিটায় ঘর বাঁধিয়া নিজে বিবাহ করিল এবং রমানাথকে ঘরে রাখিয়া কলিকাতায় পয়সা রোজগার করিতে থাকিল। তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় অদৃষ্টের পড়তা ফিরিয়া গেল, তারানাথ চাঁপাদারীর কায হইতে ক্রমে কয়ালীর কায শিখিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ দুই দশ বিঘা জমী কিনিয়া, রমানাথের বিবাহ দিয়া সে পাঁচ জনের এক জন হইয়া বসিল। বহু দুঃখভোগের পর তারানাথ সুখের মুখ দেখিয়া সংসারে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার এ সুখ সম্পূর্ণ হইল না, সম্পূর্ণতার পথে দুই জন প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম প্রতি-বন্ধক রমানাথ; রমানাথ 'মানুষ' হইল না, দাদার পয়সায় বাবুয়ানী করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে গাল-গল্প-আমোদ-প্রমোদ লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তারানাথ তাহাকে অনেক বুঝাইল, চাষার ছেলে, ঘরে বসিয়া অন্ততঃ চাষ-বাসের দেখা-শোনা করিলেও সংসারের কতকটা উন্নতি হইতে পারে; সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিল। রমা-নাথ কিন্তু জ্যেষ্ঠের উপদেশে কর্ণপাত করিল না, সে সংসারের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া, গাল-গল্প লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারানাথ কনিষ্ঠের সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিল।

তারানাথ হাল ছাড়িয়া দিলেও বড়বৌ মঙ্গলা দাসী কিন্তু হাল ছাড়িল না। সে সময়ে সময়ে নৌকার গতিটাকে ফিরাইবার জন্য এমন জোরে হাল চাপিয়া ধরিত যে, তাহাতে নৌকার গতি ফিরিবার কোনই সম্ভাবনা থাকিত না, পরন্তু সে চাপে হালের দড়ী পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া গিয়া নৌকাখানাকে বিপর্য্যস্ত করিবার উপক্রম করিত। সে ধাক্কা সামলাইয়া লইতে তারানাথকে এক এক সময়ে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত।

সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মঙ্গলা দাসীর কতটুকু বোধ ছিল, বলা যায় না; কিন্তু তাহার একটা গুণ ছিল, কাহারও অন্যায়—তা' সে অন্যায় তালপ্রমাণই হউক বা তিল পরিমিতই হউক—সে আদৌ সহ্য করিতে পারিত না। সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ না সে ন্যায়-পরায়ণতার জয়ঘোষণা করিতে পারিত, ততক্ষণ কিছুতেই স্বস্তিলাভ করিত না।

এক জন বারো মাস বিদেশে পড়িয়া থাকিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পয়সা রোজগার করিবে, আর এক জন গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়াইয়া, বসিয়া বসিয়া সেই পয়সা খাইবে, এই অন্যায়টা মঙ্গলার কাছে সব চেয়ে বড় অন্যায় বলিয়া ঠেকিত এবং এই ভয়ানক অন্যায়ের প্রতিরোধ-কল্পে সে এক এক সময়ে এমনই অবহিত হইয়া উঠিত যে, তাহাতে রমানাথের সহিত তাহার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত। সে বিরোধে রমানাথকে কতকগুলা কড়া কথা শুনান ছাড়া আর কোন ফল না হইলেও, মঙ্গলা কিন্তু বিরোধে কোন দিনই পশ্চাৎপদ হইত না, এবং বিরোধ-শেষে নিজের কড়া কথার প্রত্যুত্তরে রমানাথের নিকট হইতে কতকগুলা কড়া কথা শুনিয়া রাগে-দুঃখে কান্দিতে বসিত; তাহাতেও গাত্রদাহের নিবৃত্তি না হইলে পরি-শেষে ছোটবৌ মোহিনীর উপর পড়িয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া লইত।

মোহিনী মেয়েটি নিতান্ত নিরীহ-প্রকৃতির মেয়ে ছিল। সে সংসারে গাধার মত খাটিতে জানিত, সেবা-যত্নে সকলের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিত, বড়

বৌয়ের দুই বছরের খোকা মন্মথ ওরফে মোনাকে আদর-যত্ন দিয়া কিরূপে মানুষ করিতে হইবে, তাহা বেশ বুঝিত. কিন্তু বেশী কথার ধার সে ধারিত না, ঝগড়া-বিবাদের দিক্ হইতে সে ভয়ে ভয়ে স ি। দাঁড়াইত, তাহাকে ধরিয়া দুই ঘা মারিয়া দিলেও নীরবেই তাহা সহিয়া যাইত। সুতরাং মঙ্গলা স্বচ্ছন্দে তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিয়া স্বীয় গাত্রদাহের নিবৃত্তি করিবার সুবিধা লাভ করিত।

স্ত্রীর সেই অতিরিক্ত ন্যায়নিষ্ঠা তারানাথের সাংসারিক সুখ-শান্তির পথে যেন একটা বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মঙ্গলা স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তিনী হইয়াই ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও উহা যখন তারানাথের হৃদয়ে গৃহ-বিচ্ছেদের আশঙ্কা জাগাইয়া দিত, তখন তারানাথ কিছুতেই সংসারটাকে সুখময় বলিয়া ভাবিতে পারিত না। পত্নী ও ভ্রাতা উভয়ের মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিয়া নিজের সুখের পথ পরিষ্কার করিয়া লইবে, তারানাথ ব্যাকুল চিত্তে অনেক সময় তাহাই ভাবিতে থাকিত।

তারানাথের এই আশঙ্কা এক দিন সত্যে পরিণত হইল। সে বারে কলিকাতা হইতে তারানাথের অসুখের সংবাদ আসিল। অসুখ তেমন বেশী না হইলেও মঙ্গলা রমানাথকে কলিকাতায় যাইবার জন্য তাড়া দিতে লাগিল। রমানাথেরও যাইতে আপত্তি ছিল না, তবে দুইটা দিন বাদ দিয়া সে যাইতে চাহিল। কেন না, সে দুই দিন গ্রামে বারোয়ারীর উৎসব ছিল, কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আসিয়াছিল, পান্না দাসীর কীর্ত্তন হইতেছিল, যাত্রা ও কীর্ত্তনের অবকাশে পুতুলনাচ চলিতেছিল। সংবৎসরের পর বারোয়ারীর উৎসবে গ্রামখানা যেন মাতিয়া উঠিয়াছিল। রমানাথ বারোয়ারীর এক জন প্রধান পাণ্ডা। যাত্রার দলের সিধা মাপিয়া দেওয়া, কীর্ত্তনওয়ালীর আদর অভ্যর্থনা করা, গানের সময় গোলমাল থামান, কীর্ত্তনের দলের জন্য ভাল মাছতরকারীর যোগাড় করা, রমানাথের উপরেই এই সকল কাযের ভার ছিল। সে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রমানাথ সহসা কলিকাতায় যাইতে পারিল না। বিশেষতঃ তারানাথের অসুখ যখন তেমন শক্ত বলিয়া সংবাদ আইসে নাই, তখন এত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি? আর দুই দিন পরেই বারোয়ারী শেষ হইয়া যাইবে, তখন রমানাথ কলিকাতায় গিয়া দাদাকে দেখিয়া আসিবে। দুইটা দিনমাত্র বিলম্ব।

এই দুইটা দিনই কিন্তু দুইটা যুগ বলিয়া মঙ্গলা দাসীর প্রতীতি হইল। সুতরাং যে দিন সে পত্র পাইল, সেই দিনই যাইবার জন্য রমানাথকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু রমানাথ যখন তাহার অনুরোধে কর্ণপাত করিল না, তখন মঙ্গলা রাগে দুঃখে রমানাথের উপর এমন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহা শুনিয়া রমানাথ আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। সে রাগে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া, হাতের ছড়ি তুলিয়া এই মুখরা রমণীকে শাসন করিতে উদ্যত হইল। মোহিনী হাতে পায়ে ধরিয়া বহু কষ্টে স্বামীকে এই ভয়ানক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিল। মঙ্গলা কান্দিয়া মাথা কুটিয়া পাড়ার লোক জড় করিল। লোক রমানাথকে ছি ছি করিতে লাগিল।

ইহার অল্পদিন পরেই তারানাথ বাড়ীতে আসিল। মঙ্গলা তাহার পায়ে পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে রমানাথের ঔদ্ধত্য বিবৃত করিয়া, ইহার প্রতীকার না করিলে আত্ম-হত্যা করিবে বলিয়া মত প্রকাশ করিল। পাড়ার পাঁচ জনও রমানাথের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহার এই অস্বাভাবিক স্পর্দ্ধার প্রতীকারকল্পে তারানাথকে উত্তেজিত করিল। তারানাথ তখন রমানাথকে ডাকিয়া তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলে রমানাথ আপনার অপরাধ স্বীকার করিল; কিন্তু সে জন্য সে একটুও দুঃখ প্রকাশ করিল না। তারানাথ রাগে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি আমার খেয়ে আমারই বুকে ব'সে দাড়ী ওপড়াবে, তোমার এ অত্যাচার আমি সইতে পারবো না!"

রমানাথও রাগভরে উত্তর করিল, "সইতে না পারলে কি করবে তুমি, দাদা?"

তারানাথ বলিল, "তুমি আর ছেলেমানুষ নও যে, মারধর করবো। তোমার বয়স হয়েছে, হাত-পা হয়েছে, কা'ল থেকে তুমি নিজে দেখে-শুনে খাও।"

রমানাথ ইহাতে কিছুমাত্র ভীতি প্রকাশ না করিয়া

র্প উত্তর করিল, "কা'ল থেকে কেন, আজ থেকেই । আমার সব ভাগ ক'রে দাও।"

তীব্র উপহাসের স্বরে মঙ্গলা বলিল, "দাদা এদ্দিন ;-খুটে যা করেছে, তা'র ভাগ পাবার সাহস আছে ই আজ থেকে আলাদা হ'তে চাইচো। খুব সাহস মার কিন্তু, ঠাকুরপো। গলায় দড়ী দাও গে।"

লজ্জায় রমানাথের চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে জ কণ্ঠে বলিল, "বেশ, আমি দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, র রোজগারের এক পয়সার ভাগও আমি নেব না। । যদি, নিজের ক্ষমতায় সব ক'রে নেব।"

মঙ্গলা বলিল, "হাঁ, বেটাছেলের মত কথা বটে।"

তারানাথের কিন্তু এতটা ইচ্ছা ছিল না। সে জমী- না ও নগদ টাকাকড়ি তুল্যাংশে ভাগ করিয়া দিতে ক হইল। রমানাথ কিন্তু তাহা লইল না; বলিল, । আশীর্ব্বাদ কর, দাদা, তোমার আশীর্ব্বাদ ছাড়া কিচ্ছু আমি নিতে চাই না।"

অগত্যা তারানাথকে নিরস্ত হইতে হইল। রমানাথ দিনই হাঁড়ী আলাদা করিয়া লইল। পাঁচ জন ার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া ছি ছি করিতে থাকিল।

২

হ'বে, ছোটবৌ?"

ছোটবৌ মোহিনী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া । করিল, "যা' হবার, তাই হবে। এখন আপাততঃ । বেচে যে যা পায়, ফেলে দাও।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমানাথ বলিল, "এই নথটুকুই ত ার শেষ পুঁজি।"

মোহিনী বলিল, "শেষ পুঁজিই হোক, আর যা-ই , যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ত কোন রকমে চালাতে ।"

একটু ভাবিয়া রমানাথ বলিল, "কিন্তু বাজারে দেনা ারো টাকা। নথটুকু বেচে কত টাকা হ'বে?"

মোহি। কেন, শুনেছি, বড় ঠাকুর এটা বারো ায় কিনেছিলেন।

রমা। কিন্‌বার সময় বারো টাকায় কিনেছিলেন, । এখন বেচবার সময় ছ'টা টাকা পাব কি না সন্দেহ।

মোহি। যা' পাওয়া যায়, তাই নিয়ে পাওনাদারদের কিছু কিছু ফেলে দাও। কতক দিলে তা'রা এখন দিন-কতক চুপ ক'রে থাক্‌বে।

রমা। তা'রা চুপ ক'রে থাক্‌বে, কিন্তু পেট ত চুপ ক'রে থাকবে না।

মোহিনী এ কথার কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া না পাইয়া বিষাদগম্ভীর মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে রমানাথ বলিল, "রাগের মাথায় আলাদা হয়ে আমি কি ভয়ানক বোকামীই করেছি, ছোটবৌ! তখন যদি জান্‌তাম, আমি এত অক্ষম—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া মোহিনী বলিল, "তুমি আর কি কর্‌বে বল? চেষ্টা কচ্চো, কিন্তু কাযকর্ম্ম না জুট্‌লে তুমি কর্‌বে কি?"

একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া রমানাথ বলিল, "আর কিছু কর্‌তে না পারি, তোমার যা' কিছু আছে, সব বেচে কিনে ব'সে ব'সে খা'ব।"

অনুতপ্ত স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া মোহিনী বলিল, "খা'বে না ত কি উপোস দিয়ে থাক্‌বে? তোমার থাকলে আমার, আমার থাকলে তোমার। যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ খেতে হ'বে।"

"যখন আর না থাক্‌বে?"

"তখন—তখন ভগবান্ যা' কপালে লিখেছেন, তাই হ'বে। সে কথা এখন ভেবে কোন ফল নাই। নাও, ওঠো, বেলা হচ্চে।"

মোহিনী নাক হইতে নথটা খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল। রমানাথ সেটাকে দুই একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, কম্পিত হস্তে কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মোহিনী বলিল, "পার যদি, আট আনার চা'ল নিয়ে এস।"

রমানাথ বলিল, "পার যদি কেন, আন্‌তেই হ'বে বোধ হয়।"

মোহিনী কোন উত্তর করিল না। রমানাথও তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

রমানাথ আলাদা হাঁড়ী করিল বটে, কিন্তু হাঁড়ীতে কি দিবে, তাহার কোনই সংস্থান ছিল না। রমানাথ

কিন্তু এ জন্য চিন্তিত হইল না, দোকান হইতে চা'ল, ডাল, নুণ, তেল প্রভৃতি ধারে লইয়া আসিল। তারানাথ সরকারের ছোট ভাইকে দুই পাঁচ টাকার জিনিষ ধার দিতে কেহই অস্বীকৃত হইল না। কিন্তু দিনে দিনে ধারের মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন দোকানদারকে বাধ্য হইয়া সাবেক হিসাব মিটাইবার কথা বলিতে হইল। রমানাথ ক্রুদ্ধ হইয়া মোহিনীর একখানা গহনা বন্ধক দিয়া দোকানের হিসাব মিটাইয়া দিল। দোকানী আবার নিশ্চিন্ত মনে ধার দিতে আরম্ভ করিল।

এমনই করিয়া চারি পাঁচ মাসের মধ্যে মোহিনীর অর্দ্ধাধিক গহনা বাঁধা পড়িয়া গেল। পরিশেষে মোহিনী যখন হাতের বালা জোড়া খুলিয়া দিয়া করকমলে কাচের চুড়ি পরিল এবং তদ্দর্শনে বড়বৌ রমানাথের অক্ষমতার উল্লেখ করিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিল, তখন যেন রমানাথের চৈতন্য হইল। সে বালা জোড়া বাঁধা দিয়া যাহা পাইল, তদ্দ্বারা দোকানের হিসাব মিটাইয়া দিয়া, পাঁচ টাকা হাতে লইয়া কাযের চেষ্টায় কলিকাতায় যাত্রা করিল।

কলিকাতা অর্থোপার্জ্জনের কেন্দ্রস্থল হইলেও অর্থ সেখানে পথে ছড়াইয়া নাই, চেষ্টা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। আবার সে চেষ্টার জন্য রীতিমত সহায়-সম্পদ্ থাকা প্রয়োজন। রমানাথের সেরূপ সহায় ছিল না। তারানাথ এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত, রমানাথ কিন্তু তাহার কাছে গেল না, যাইতে যেন লজ্জা বোধ করিল। কাযেই মাসখানেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে ঘরে ফিরিতে হইল।

ঘরে দেনা ছাড়া সংসার চালাইবার উপায় ছিল না। দেনা যখন বেশী হইয়া পড়িত, তখন মোহিনীর গহনা বন্ধক দিয়া বা বেচিয়া সে দেনা শোধ করিতে হইত। মোহিনীর গহনাও তেমন বেশী ছিল না, মোটামুটি যাহা ছিল, সংসার চালাইবার দেনা শোধ করিতে করিতে তাহা অল্পদিনেই নিঃশেষ হইয়া আসিল। এ দিকে যাহারা দুই এক মাস পরে চাকরীর আশ্বাস দিয়াছিল, কাযকর্ম্ম মন্দা বলিয়া তাহারা আরও দুই এক মাস সময় লইল। ইহার মধ্যে বাজারে আবার বিস্তর দেনা হইয়া পড়িল এবং সে দেনা শোধ না করিলে দোকানদারেরা আর ধারে জিনিষ দিতে সম্মত হইল না; রমানাথ ইহাতে শুধু নিরুপায় নহে, সম্পূর্ণ মুহ্যমান হইয়া পড়িল এবং রাগের বশে জ্যেষ্ঠের সহিত পৃথক্ হওয়ার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল।

তা' রমানাথ তখনও যদি দাদার কাছে যাইয়া গড়াইয়া পড়িত, তাহা হইলে তারানাথ কখনই তাহাকে ঠেলিয়া রাখিতে পারিত না। কিন্তু রমানাথ তাহা করিতে পারিল না। না পারিবার কারণ ছিল। সে পৃথক্ হইয়া কিরূপ কষ্টে পড়িয়াছে, তারানাথের তাহা অবিদিত ছিল না। জানিলেও কিন্তু সে কনিষ্ঠকে কিছুমাত্র সাহায্য করে না; নিতান্ত পরের মতই নিঃশব্দে তাহার কষ্টভোগ প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ইহাতে দাদার উপর রমানাথের দুর্জ্জয় অভিমান উপস্থিত হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, না খাইয়া মরিতে হইলেও দাদার সাহায্যপ্রত্যাশী হইব না।

প্রতিজ্ঞা করিলেও এক এক সময়ে কষ্টভোগটা যখন অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন প্রতিজ্ঞাটাও যেন একটু শিথিল হইয়া আসিত। দূর হউক, দাদা ত বটে! পাঁচ জনের কথা শোনা অপেক্ষা দাদার কাছে একটু হীনতা স্বীকারে অপমান কি আছে? কিন্তু বড়বৌয়ের কঠোর বাক্যবাণ তাহার এই শিথিল প্রতিজ্ঞাকে পুনরায় যেন দৃঢ় করিয়া তুলিত। সে যখন রমানাথের দুর্গতিতে কিছু-মাত্র কষ্টবোধ না করিয়া তীব্র শ্লেষবাক্যে রমানাথের ও মোহিনীর অন্তস্তল বিদ্ধ করিতে থাকিত, তখন রমা-নাথ দাদার নিকট সাহায্যগ্রহণের কল্পনাকে দূরে পরি-হার করিতে বাধ্য হইত; স্থির করিত, দাদার নিকট সাহায্য লইয়া বড়বৌয়ের বাক্যবাণ সহ্য করা অপেক্ষা অপরের নিকট অপমানিত হওয়াও শ্রেয়ঃ।

এ দিকে চাউলের অভাবে মোহিনীকে এক বেলা উপবাস দিতে হইল। তাহার কাপড় এমন ছিঁড়িয়া গিয়াছিল যে, বাড়ীর বাহির হইবার উপায় ছিল না, তাহাকে খিড়কী-পুকুরের পচা জলেই ডুব দিতে হইতে-ছিল। রমানাথ কি উপায় করিবে, ভাবিয়া তাহার কূলকিনারা পাইল না।

পরিশেষে মোহিনী একটু উপায় দেখাইয়া দিল। তাহার শেষ অলঙ্কার নাকের নথটি তখনও অবশিষ্ট

ছিল। সেটি নাক হইতে খুলিয়া দিয়া সে স্বামীকে আপাততঃ গভীর দুশ্চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করিল। কিন্তু এই সামান্য টাকায় কয়দিনই বা চলিবে? ইহাতে পাওনাদারদের অর্দ্ধেক পাওনাও যে মিটিবে না! তাহাদের পাওনা কতক মিটাইয়া যাহা থাকিবে, তাহাতে দুই চারি দিন মাত্র চলিতে পারে। কিন্তু তাহার পর? আর ত তাহার কিছুই সম্বল নাই। হা ভগবান্, ইহার পর কি হইবে?

স্বামীকে নথ বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া মোহিনী একা বসিয়া ব্যাকুলচিত্তে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় মঙ্গলা স্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে কলসী কক্ষে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং জলের কলসীটা রান্নাঘরে দাওয়ার উপর রাখিতে রাখিতে মোহিনীকে সম্বোধন করিয়া তীব্র কণ্ঠে ডাকিল, "হ্যাঁ লা ছোটবৌ!"

মোহিনী চমকিতভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল। মঙ্গলা কলসী রাখিয়া ভিজা কাপড়ের আঁচল নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে বলিল, "তোরা কি মনে করেছিস্ বল্ দেখি? তোদের জ্বালায় কেউ কি গাঁয়ে বাস করবে না?"

শঙ্কিতস্বরে মোহিনী উত্তর করিল, "কেন, দিদি, আমরা করেছি কি?"

গর্জ্জন করিয়া মঙ্গলা বলিল, "করবি আবার কা'র কি? চার দিকের লোকের ধার ক'রে খেয়েছিস্। গাঁয়ে হেন লোক নেই, যা'র কাছে না ধার হয়েছে। তা' ধার কর গে, মর্ গে যা, কিন্তু পোড়া লোক আমাকে পাঁচ কথা শোনায় কেন বল্ ত?"

সলজ্জ কণ্ঠে মোহিনী বলিল, "তা' আমরা কি কর্‌বো, দিদি; আমরা ত আর কাউকে কথা শোনাতে ব'লে দিই নাই।"

তর্জ্জন সহকারে মঙ্গলা বলিল, "তোরা ত খুব সাধু, কাউকে ব'লে দিস্ নাই; কিন্তু যা'রা পাবে, তা'রা শুন্‌বে কেন? তা'দের পাওনা ফেলে দিলে ত তা'রা কা'রও কাছে কিছু বল্‌তে আস্‌বে না। মা গো মা, বাড়ীর বা'র হবার জো নেই, এ বলে এত পা'ব, ও বলে অত পা'ব, কেউ বলে জোচ্চোর, কেউ বলে ডাকাত। বাপের জন্মে কখন কারও এক পয়সা ধার ক'রে খাই নি, কিন্তু পোড়াপুড়ীদের জ্বালায় কথা শুন্‌তে শুন্‌তে প্রাণ গেল। খাঁদা মাইতির মা, বেচারী দুখ্যু-মেহনত ক'রে খায়, তাঁর কাছ থেকে তিন টাকার চা'ল এনে খেয়েছিস্। আগুন লাগুক এমন খাওয়ায়, আগুন লাগুক!"

মোহিনী লজ্জারক্ত মুখখানা নীচু করিয়া নিরুত্তরে রহিল। মঙ্গলা ক্রোধসমুচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তখন যে বড্ড তেজ দেখিয়ে আলাদা হয়েছিলি, এখন সে তেজ গেল কোথায়? এখন জোচ্চোরি ক'রে, মেয়েমানুষের গয়না বেচে খেতে লজ্জা করে না? মুখে আগুন এমন অক্ষম পুরুষের!"

মঙ্গলার এই কটূক্তিতে মোহিনীর চোখে জল আসিল; অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "গাল দাও কেন, দিদি, অসময়ে ধার করেছি, সময় হ'লেই শোধ কর্‌বো।"

বেগে হাত দুইটা নাড়িয়া রোষবিকৃত কণ্ঠে মঙ্গলা বলিল, "সময় আবার ফির্‌বে না কি? আমার ওপর হিংসে ক'রে আলাদা হয়েছ, ভগবান্ যদি থাকেন, তবে সময় আর ফির্‌বে না, ফির্‌বে না, ফির্‌বে না; চিরকাল হাভাতে হয়ে থাক্‌তে হ'বে।"

উচ্চকণ্ঠে অভিসম্পাত করিতে করিতে মঙ্গলা কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল। মোহিনী ভীতিকণ্টকিত দেহে নিস্পন্দভাবে বসিয়া মনে মনে বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিল, "রক্ষা কর, ঠাকুর, রক্ষা কর; গুরুজনের এই অকারণ অভিসম্পাত হ'তে রক্ষা কর।"

মোহিনীর উভয় চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুরাশি ঝরিতে লাগিল।

"ছোতো মা!"

মোনা আকস্মিকভাবে আসিয়া পিছন দিক্ হইতে মোহিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সোহাগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "ছোতো মা!"

মোহিনী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া মোনার দিকে চাহিল। মোনা তাহার ঘাড়ের উপর দিয়া মুখখানা বাড়াইয়া ছোট-মা'র মুখের কাছে আনিল এবং তাহার চোখে জল দেখিয়া যেন ব্যথিত স্বরে বলিল, "তুমি

কাঁদ্‌চো কেন, ছোতো মা? মা মেলেতে? আথা, কেঁদো না, মা'কে আমি খুব মাল্‌বো।"

গলা ছাড়িয়া দিয়া মোনা ঘুরিয়া সম্মুখে আসিল এবং নিজের ক্ষুদ্র কোমল হাত দুইখানি দিয়া মোহিনীর মুখখানা মুছাইয়া দিতে লাগিল। মোহিনী মুহূর্ত্তে সকল দুঃখ, সকল ব্যথা বিস্মৃত হইয়া মোনাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রচুম্বনে তাহার মুখখানাকে আরক্ত করিয়া তুলিল।

৩

রমানাথ নথ বেচিয়া যে কয় টাকা পাইল, তাহাতে দোকানদারের পাওনা কতক মিটাইয়া আট আনার চাউল লইয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন মধ্যাহ্নের রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে আসিয়া রমানাথ মোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শীগ্‌গির এক মুঠো ভাত চাপিয়ে দাও, ছোটবৌ, খেয়ে আমাকে কলকাতায় যেতে হ'বে।"

বিস্ময়ের সহিত মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কলকাতায় গিয়ে কি করবে?"

রমানাথ বলিল, "যা' হয়;—অবশেষে মুটেগিরি।"

মোহিনী চুপ করিয়া রহিল। রমানাথ বলিল, "ঘরে ত আর রাং-রত্তি নাই, এবার ভাত খাবার থালা বেচতে হ'বে।"

মোহিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "আজই যা'বে?"

রমানাথ বলিল, "হাঁ, আজ বিকেলের গাড়ীতেই যা'ব। একটা টাকা আমার কাছে আছে। আট আনা হ'লেই আমি কল্‌কাতা পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারবো। বাকী আট আনা তুমি রেখে দাও।"

মোহিনী বলিল, "আমি রেখে কি করবো? যে চা'ল এনে দিয়েছ, তা'তে আমার দশ বারো দিন খুব চ'লে যাবে। বিদেশে যাচ্ছো তুমি, দু'চার আনা বেশী নিয়ে যাও।"

রমানাথ বলিল, "তোমারও ত নুণটা-তেলটা আছে। নিদেন গণ্ডা চার পয়সা রেখে দাও। তা'র পর ভগবান্ যদি মুখ তুলে চান—"

বক্তব্য শেষ না করিয়াই রমানাথ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। মোহিনী বলিল, "তুমি ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে বেরিয়ে যাও, আমি বল্‌ছি, ভগবান্ নিশ্চয় মুখ তুলে চাইবেন। কিন্তু দোহাই তোমার, পয়সার তরে যেন কোন দুঃসাহসী কাযে হাত দিও না।"

মোহিনীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া গামছার বাঁধন খুলিয়া চাউলগুলি ঘরে তুলিতে উদ্যত হইল।

রান্নাঘরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের চা'ল এলো না কি, ছোটবৌ?"

মোহিনী উত্তর দিল, "হাঁ দিদি।"

মঙ্গলা বলিল, "তা হ'লে ভালই হয়েছে। আমারও চা'ল বাড়ন্ত হয়ে এসেছে, ভাবছিলাম, কি করবো। তা' আমার যে তিন পালি চা'ল ধার নিয়েছিলি, আজ সে চা'ল দে ত।"

মঙ্গলা ব্যস্তভাবে রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিল। মোহিনী বলিল, "তিন পালি নয় ত, দিদি, এক পালি যে।"

তাহার কথায় যেন খুব বিস্ময় অনুভব করিয়া মঙ্গলা বলিল, "এক পালি কি লো ছোটবৌ, তিন পালি নিয়ে এলি, আর আজ দেবার সময় বল্‌ছিস্ এক পালি! কোথায় যা'ব মা! আমি কি মিছে ক'রে তোর কাছে বাড়িয়ে নিতে এসেছি? তা' যদি হয়, তবে যে হাতে চা'ল নেব, সে হাত যেন আমার খ'সে যায়। নইলে যে তিন পালি নিয়ে আজ এক পালি বল্‌ছে, তা'কে যেন জন্মে জন্মে হা অন্ন জো অন্ন ক'রে বেড়াতে হয়, ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে না জোটে।"

ভ্রূকুটী করিয়া রমানাথ বলিল, "না, বৌঠান্, ওর ভুল হয়েছে। তুমি তিন পালি চা'ল মেপে নিয়ে যাও।"

মঙ্গলা বলিল, "নেবই ত। ধার দিয়েছি, শোধ নেব, তা'তে আবার চক্ষুলজ্জা কি? এই তরেই ত আমি ধার দিতে চাই না। নেবার সময় ত্রস্ত, দেবার সময় আর। এখন কি আর কারো ধর্ম্মজ্ঞান আছে।"

নিজের ঘর হইতে পালি আনিয়া মঙ্গলা তিন পালি চাউল মাপিয়া লইল। অবশিষ্ট স্বল্পপরিমিত চাউলের

তথাগত

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু।

দিকে চাহিয়া চাহিয়া মোহিনী সবিনয়ে বলিল, "আজ কিন্তু চালগুলো থাক্‌লে ভাল হ'তো না, দিদি।"

তীব্র গর্জ্জনে মঙ্গলা বলিয়া উঠিল, "না নিলে আরও ভাল হ'তো, না? তা' আমি ত দানছত্র কত্তে বসি নাই যে, ধার দিয়ে ছেড়ে দেব। আমার এক দিন এক মুঠো না থাক্‌লে কে দেয় বল্ ত?"

মোহিনী ঈষৎ উষ্ণস্বরে বলিল, "আমি ত তোমাকে দানছত্র কত্তে বলি নাই, দিদি?"

রোষবিকৃত মুখে মঙ্গলা বলিল, "বলিস্ নাই, অথচ দিতেও ইচ্ছা নাই। আজ থাক, কা'ল থাক্, কবে দিবি তবে? তোদের চিরকালই নাই—নাই। কবে তোদের স্বচ্ছল হ'বে, তখন ধার শোধ দিবি। কিন্তু স্বচ্ছল কি হ'বে কখনও? পরের হিংসায় যা'রা ফেটে মরে, তাদের ভাল কোনকালেই হ'বে না। ভগবান্ ব'লে এক জন আছে যে!"

মোহিনী নিতান্ত অসহিষ্ণুভাবে ইহার উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামীর কঠোর ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া নিরস্ত হইল। মঙ্গলা চাউল লইয়া চলিয়া গেল।

অবশিষ্ট চাউলগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "এই পালি দুই চা'লে তোমার ক'দিন চল্‌বে, ছোটবৌ?"

মোহিনী নিরুত্তরে চাউলগুলি তুলিতে লাগিল। রমানাথ বলিল, "ধর্ম্মের দিকে চেয়ে তখন জমী-যায়গার ভাগ সব ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি, সেইটাই আমার মস্ত বোকামী হয়ে গিয়েছে। এক কড়াও ছাড়বো না আমি, এক সংসারে থেকে যা কিছু হয়েছে, সব চুল চিরে ভাগ ক'রে নেব। চল্লুম দেশের ভদ্রলোকদের কাছে।"

দাঁতে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে রমানাথ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। মোহিনী তাহাকে শান্ত করিবার অবসরই পাইল না।

ভদ্রলোকরা পরামর্শ দিল, ভায়ের ভাই, একান্নবর্ত্তীতে থাকিয়া যে সকল সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে; রমানাথ তাহার তুল্যরূপে অর্দ্ধাংশ পাইবার অধিকারী। তারানাথ সহজে তাহা ছাড়িয়া না দেয়, আদালতে গিয়া দাঁড়াইলেই চুল চিরিয়া ভাগ পাওয়া যাইবে।

ঘরে ফিরিয়া রমানাথ আহারাদি করিয়া মোহিনীকে পরামর্শের কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মোহিনী বলিল, "গোড়ায় ধর্ম্মের মুখ চেয়ে বড় ভাইকে যা' ছেড়ে দিয়েছ, এখন তা'র জন্যে ভায়ের নামে আইন-আদালত কত্তে পার্‌বে ত?"

রমানাথের মাথাটা তখন অনেক ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং সে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবেই উত্তর দিল, "পারবো কি না, তা' ঠিক জানি না, ছোটবৌ, কিন্তু বৌঠানের কথাগুলো অসহ্য।"

সান্ত্বনার কোমল স্বরে মোহিনী বলিল, "অসহ্য হয় ব'লে বড় ভায়ের নামে মামলা-মোকর্দ্দমা কত্তে যা'বে, লোক বল্‌বে কি?"

রমানাথ নিঃশব্দে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মোহিনী বলিল, "দেখ, ও সব যুক্তি ছেড়ে দাও। তা'র চাইতে কলকাতা যাবে বল্‌ছো, তাই সেখানে গিয়ে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখ। মেয়েমানুষের কথায় রাগ ক'রে বড় ভাইকে উচ্ছন্নে দেওয়া—সেটা কি পুরুষমানুষের কায?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমানাথ বলিল, "দূর হোক্, কা'ল সকালে তবে কলকাতাই চ'লে যাব। দেখি, মা কালীগঙ্গা কি করেন।"

৪

কালীগঙ্গা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, রমানাথ এক পাটের আড়তে চাঁপাদারীর কায পাইল এবং বছরখানেক চাঁপাদারী করিবার পর কয়ালীর কায পাইয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার পড়্‌তা ফিরিয়া গেল।

রমানাথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তারানাথের অবনতি হইল। বহু দিন ভুষিমালের গুদামে কায করার ফলে তাহার হাঁপানির ব্যারাম আসিয়া জুটিল। চিকিৎসকের পরামর্শে তারানাথ কায ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া বসিল। যে জমীজমা করিয়াছিল, তাহাতে সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। সে ঝোঁকে পড়িয়া একটা বিবাদী জমী কিনিয়াছিল। সেই জমী লইয়া এক্ষণে বিবাদ বাধিল এবং মামলা আরম্ভ হইব। মামলা প্রথমতঃ নিম্ন আদালতে চলিল, তাহার পর জিলাকোর্টে আপীল হইল।

সেখানে বছর দুই মোকর্দ্দমা চলিবার পর প্রতিপক্ষ জয়লাভ করিল। তারানাথ মোকর্দ্দমার খরচের দায়ী হইল। মোকর্দ্দমার খরচ যোগাইতে তারানাথকে অধিকাংশ জমীজমা বন্ধক দিতে হইত। যাহা অবশিষ্ট রহিল, প্রতিপক্ষ খরচার দাবীতে নীলাম করিয়া লইল। তারানাথ স্বল্পকালের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িল।

ভাবনায় চিন্তায় তারানাথের রোগাক্রান্ত দেহ জীর্ণ হইয়া পড়িল এবং সে অবস্থায় ক্রূর ব্যাধি জীর্ণদেহে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। রমানাথ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে যতটুকু পারিল, জ্যেষ্ঠের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। কিন্তু চিকিৎসায় ফল হইল না, তিন চারি মাস নিদারুণ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে তারানাথ সকল কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

রমানাথ সস্ত্রীক কলিকাতায় বাস করিতেছিল; ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে তাড়াতাড়ি দেশে আসিল। মঙ্গলা আছাড় খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার কি হ'বে গো ঠাকুরপো, আমাকে যে পথে বসিয়ে গেল!"

মায়ের সঙ্গে মোনাও কান্দিয়া উঠিল। রমানাথ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মঙ্গলাকে অভয় দিয়া বলিল, "ভয় কি, বৌঠান্, দাদা গিয়েছেন, আমি ত আছি।"

মোহিনী তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে তুলিতে সান্ত্বনার কোমল কণ্ঠে বলিল, "কান্না কিসের, দিদি, আমরা থাক্‌তে পথে বস্‌তে যা'বে কেন? মোনা কি শুধু তোমারই ছেলে?"

মঙ্গলা আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, 'মোনা আমার ছেলে নয়, ছোটবৌ, আজ থেকে তোর ছেলে। আমি তোর হাতে মোনাকে সঁপে দিলুম।"

রমানাথ সাধ্যানুসারে জ্যেষ্ঠের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিল। মহাজনের কাছে যে সকল জমীজমা বন্ধক ছিল, তাহা ছাড়াইয়া লইল। তাহার পর মোনার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, মোহিনীকে দেশে রাখিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। তারানাথ এক বাড়ীতে দুইটা হাঁড়ী করিয়াছিল, রমানাথ তাহা এক করিয়া লইল। মঙ্গলা লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "ভাগ্যে ঠাকুরপো ছিল, নইলে আজ দাঁড়াতাম কোথায়?"

মঙ্গলার স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া মোহিনীর আনন্দের সীমা রহিল না; সে অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি দিয়া দিদিকে সুখী করিবার জন্য চেষ্টিত হইল। গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম মোহিনী একাই প্রায় সম্পন্ন করিতে লাগিল, দিদিকে বেশী খাটিতে দিল না; পাছে দিদি মনে করে, পরের ভাত খাইতে হইতেছে বলিয়া তাহাকে খাটিয়া খাইতে হইবে।

কিন্তু "স্বভাব যায় না ম'লে"। শোকে-দুঃখে পড়িয়া মঙ্গলার স্বভাবের কতকটা পরিবর্ত্তন হইলেও সে পরিবর্ত্তন কিন্তু স্থায়ী হইল না, ক্রমশঃ স্বভাব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দিন কয়েকের শান্তির পর অশান্তির বাতাস যেন একটু একটু করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল।

অশান্তির কারণ হইল মোনা। একটিমাত্র ছেলে বলিয়া মোনা যে আবদারে ছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মায়ের কাছে তাহার এ অবদার বড় বেশী খাটিত না; বেশী আবদার দেখাইতে গেলেই মাতার রোষরক্ত চক্ষু তাহাকে ভীত করিয়া তুলিত। তবে ছোট-মা'র চোখে সে রক্তিমাটুকু ছিল না দেখিয়া তাহার আবদারও খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, সে আবদারে মোহিনীকে অনেক সময় নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত। হইলেও কিন্তু সে ইহাতে বিরক্তি বোধ করিত না, বরং একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদনই অনুভব করিতে থাকিত। মানুষমাত্রেরই—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের অপত্যস্নেহসম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে। মোহিনীর নিজের পেটের ছেলে ছিল না, সুতরাং সে মোনাকে দিয়াই সে আকাঙ্ক্ষাটুকু পূর্ণ করিয়া লইত

মঙ্গলা কিন্তু এতটা বুঝিত না। মোহিনী তাহাকে পর না ভাবিলেও সে কিন্তু আপনাকে পরাধীন বলিয়াই জ্ঞান করিত এবং সেই জন্যই সে মোনার অন্যায় আবদারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। যে পরের অন্নে প্রতিপালিত, তাহার ছেলের পরের উপর এত আবদার কেন? তাহাদের যদি সেই কপালই হইবে, তবে আজ তাহাদিগকে নিজের রাজত্ব হারাইয়া পরের দ্বারস্থ হইয়া থাকিতে হইবে কি জন্য? ইহাতে মঙ্গলাকে যে কতখানি

কুসুম ও কণ্টক

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

লজ্জিত—কতটা অপদস্থ হইতে হয়, হতভাগা ছেলে ত সে কথা বুঝে না? বুঝে না বলিয়াই মঙ্গলা সময়ে সময়ে তর্জ্জন-গর্জ্জন বা প্রহারের দ্বারা ছেলেকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিত।

মোহিনী ইহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিত না; বলিত, "আচ্ছা, দিদি, মোনা আবদার কচ্চে আমার কাছে, তুমি তা'কে মাত্তে এলে কেন?"

রাগে মুখ ভারী করিয়া মঙ্গলা উত্তর করিত. "মারবো না? কি এমন বড়মানুষের ছেলে যে, যা' নয় তাই বায়না ধ'রে বস্‌বে? ওর কি একটুও জ্ঞান-চৈতন্য নাই?"

মোহিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিত, "আট বছরের ছেলে, তা'র আর জ্ঞান-চৈতন্য কতটুকু হ'বে, দিদি! জ্ঞান থাক্‌লে কি ও এ রকম বায়না করে?"

হাত-মুখ নাড়িয়া মঙ্গলা বলিত, "কিন্তু ও রকম অন্যায় বায়না সহ্য হ'বে না।"

মোহিনী বলিত, "তোমার সহ্য না হয়, তুমি স'রে যাও। বাড়ীর মধ্যে একটা ছেলে,—তা'র বায়না ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, আমি খুব সইতে পারবো।"

মোহিনীর কথায় যেন তাহার কর্ত্তৃত্বের স্বর দেখিয়া মঙ্গলা সরোষে উত্তর করিত. "সইতে তুমি আজ পারবে, কা'ল পারবে, তা' জানি, কিন্তু তার পর ভুগতে হ'বে ত আমাকে। দেখ ছোটবৌ, এক মুঠো ভাত দিয়ে মানুষ কচ্চো ব'লে ছেলেটার মাথা খেও না।"

মঙ্গলার কথায় মোহিনী প্রাণে আঘাত পাইত, তাহাতে তাহাকে নিরুত্তর হইতে হইত। সত্যই ত, মোনা যে তাহার পেটের ছেলে নহে, পরের ছেলে। পরের ছেলের উপরে তাহার অধিকার কতটুকু? অন্য অধিকারের কথা দূরে থাক্,একটু বেশী স্নেহ বা ভালবাসা দেখাইবার অধিকারও নাই। মোহিনীর অন্তস্তল ভেদ করিয়া দুঃখের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইত। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত, না, মোনার উপর এতটা বেশী দরদ দেখাইতে যাইব না।

কিন্তু মোনা আসিয়া যখন ছোট-মা বলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইত, তখন মোহিনী আর প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে পারিত না। মর্ম্মযাতনা ভুলিয়া, দিদির কঠোর উক্তি বিস্মৃত হইয়া মোনাকে পেটের ছেলে বলিয়াই সে ভাবিয়া লইতে বাধ্য হইত।

মোনাও যে দিন হইতে ছোট মা'কে পাইয়াছিল, সেই দিন হইতে সে মা'র কাছে বড় একটা ঘেঁষিত না। নাওয়া, খাওয়া, শোয়া সব ছোট-মার কাছে। ছোট-মা ভাত বাড়িয়া না দিলে খাইয়া তাহার পেট ভরিত না; ছোট-মা'র গলা জড়াইয়া না শুইলে চোখে ঘুম আসিত না। দৈবাৎ কোন দিন মোহিনী অন্য কাযে ব্যস্ত থাকিলে মঙ্গলা যদি ভাত বাড়িয়া দিতে যাইত, তাহা হইলে মোনা আসিয়া মোহিনীকে অনুরোধ করিয়া বলিত, "তুমি ভাত দেবে চল, ছোট-মা।"

মোহিনী বলিত. "কেন, তোর মা যে ভাত দিচ্চে রে।"

ঘাড় ঘুরাইয়া ভারী মুখে মোনা বলিত, "মা ভাল ভাত দিতে পারে না। ডাল, ভাত, তরকারী সব একেবারে দেয়। খেয়ে আমার পেট ভরে না।"

স্নেহপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে মোনার মুখের দিকে চাহিয়া মোহিনী সহাস্যে বলিত, "পাগল ছেলে! মা ভাত দিলে পেট ভরে না, আর আমি দিলেই পেট ভরে!"

জোরে মাথা নাড়িয়া মোনা বলিত, "হাঁ, ভরে। তুমি এখন ভাত দেবে কি না, তাই বল।"

মোহিনী তাহাকে বুঝাইয়া বলিত, "আমি হাতের কায ফেলে যাই কি ক'রে? লক্ষ্মী বাপ আমার, দিদি ভাত দিচ্চে, গিয়ে খেয়ে নে।"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার স্বরে মোনা বলিল, "তা' ত আমি কখনও খা'ব না।"

মোনার জিদ কতখানি, তাহা মোহিনী জানিত; সুতরাং হাতের কায ফেলিয়া তাহাকে ভাত দিতে যাইতে হইত। ইহাতে মঙ্গলা নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া বলিত, "কেন গো. আমার দেওয়া ভাত বাবুর বুঝি পছন্দ হ'লো না?"

হাসিতে হাসিতে মোহিনী উত্তর করিত, "ছেলের মন, দিদি, ওদের কি আবার পছন্দ অপছন্দ আছে? গোঁ ধরেছে, আমাকে ভাত দিতে হ'বে। তা' চল, আমিই ভাত এক মুটো দিয়ে যাই।"

"তা' দাও, মোদ্দা আমাকে কিন্তু আর কোন দিন ওকে ভাত দিতে ব'লো না।"

রোষগম্ভীর মুখে মোনা'র দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক মঙ্গলা সশব্দ পদক্ষেপে রন্ধনশালার বাহিরে চলিয়া আসিত।

মঙ্গলা এক দিন ডাকিল, 'আজ আমার কাছে শুবি আয়, মোনা।"

অসম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলন সহকারে মোনা বলিল, "উহুঁ, তোমার বিছানায় যে ছারপোকা! সারা রাত আমার ঘুম হয় না।"

মঙ্গ। আর ছোটবৌয়ের বিছানাতেই বুঝি ছারপোকা নেই?

মোনা। থাকলেও আমাকে কৈ কামড়ায় না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মঙ্গলা এক দিন নাপিত-বৌয়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরপোর কল্যাণে ভাত-কাপড়ের দুঃখ্ নাই, কিন্তু এর চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও আমার ভাল ছিল। পোড়া পেটের তরে পেটের ছেলেটা পর হ'তো না তা' হ'লে।"

নাপিত-বৌ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "পেটের ছেলে কখন পর হয় কি, মা? ও সব দু'চার দিন; তা'র পর 'যা'র তা'র হবে, পারীর মা পর হ'বে।' ও হচ্চে দু'চারদিনের ভালবাসা।"

মঙ্গলা বলিল, "ভালবাসা নয়, বাছা, গুণ। ওষুদের গুণে ছেলেটাকে পর ক'রে দিয়েছে।"

শুনিয়া নাপিত-বৌ আশ্চর্য্যান্বিতভাবে গালে হাত দিল।

কথাটা পাঁচ কান হইয়া মোহিনীর কানে গেলে মোহিনী হাসিয়া বলিল, 'তা' করলাম বা গুণ। লোক একটা ছেলে পাবার তরে কত যাগযজ্ঞি করে, আমি না হয় একটু গুণতুক্ করেছি।"

৮

মোনা মাইনর পাশ করিলে মোহিনী স্বামীকে ধরিয়া বসিল, "ছেলের বিয়ে দাও।"

রমানাথ বলিল, "এরি মধ্যে বিয়ে? আরও কিছু দিন পড়ুক না।"

মোহিনী বলিল, "হাঁ, প'ড়ে ত সব হ'বে। তা'র চাইতে বিয়ে দিয়ে কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে কাযকর্ম্ম শিখিয়ে দাও।"

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, এখন কি কাযকর্ম্ম শিখ্‌তে পারবে?"

ঘাড় নাড়িয়া মোহিনী বলিল, "খুব পারবে। ছেলে-মানুষ হ'লেও ওর বুদ্ধি কি রকম, তা' জান কি?"

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

মোহিনী বলিল, "শোন তবে। সে দিন আমি জিগ্যেস্ করলুম, 'হাঁরে মোনা, তুই পয়সা রোজগার করলে কা'কে দিবি?' মোনা বল্‌লে, 'অর্দ্ধেক তোমাকে দেব ছোট-মা, আর অর্দ্ধেক দেব মা'কে। নইলে মা তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে।' আমি হেসে জিগ্যেস্ করলুম, 'আর তোর কাকাবাবুকে কিছু দিবি না?' মোনা চট্ ক'রে উত্তর দিলে, 'তোমাকে দিলেই ত কাকাবাবুকে দেওয়া হ'লো'।"

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "ঠিকই ত বলেছে।"

মোহিনী বলিল, "তা' বলেছে, কিন্তু কি রকম বুদ্ধির কথা দেখ। তুমি আমি যে এক, তা' ও বুঝে নিয়েছে।"

রমানাথ বলিল, "এই রকম বুদ্ধি ব'লেই ত বল্‌ছি, আরও কিছু দিন পড়াশোনা করুক।"

মোহি। তা' করুক্ না পড়াশোনা। বিয়ে হ'লে কি পড়াশোনা কত্তে নাই?

রমা। কিন্তু বিয়ের জন্যে তোমার এত তাড়াতাড়ি কেন বল ত?

মোহি। তাড়াতাড়ি আর কোথায়? ছেলের যেমন হোক্ বয়স হয়েছে ত, ষেটের কোলে পনরোয় পা দিয়েছে। তা' ছাড়া বেশ একটি ফুটফুটে মেয়ে পাওয়া যাচ্চে। মেয়েটি কে জান? ও বাড়ার খুড়-শ্বশুরের মেয়ে কালিন্দীর ভাসুরঝি। দিব্যি মেয়ে— যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণটি। মেয়ে দশ বছরে পড়েছে, তা'রা আস্‌চে বোশেখের ভেতরেই তা'র বিয়ে দেবে বল্‌ছে।

রমা। কিন্তু ওরা কিছু দিতে থুতে পারবে না ত?

ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে মোহিনী বলিল, "দেবে থোবে আবার কি? অমন টুকটুকে মেয়ে দিচ্চে। 'এই ঢের,

তুমি নিজের ভায়ের রোজগারের পয়সা ছেড়ে দিয়ে এখন আবার দেখছি, পরের পয়সার পিত্যেশ কচ্চো।”

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, “পরের পয়সার পিত্যেশ আমার না থাক্‌লেও বৌঠানের আছে ত। তা’ যাক্, তোমার যখন পছন্দ হয়েছে, তখন দেওয়া থোওয়ার তরে আটকাবে না।”

বিবাহের কথা শুনিয়া মঙ্গলা বলিল, “মোনার বিয়ে যদি দিতেই হয়, ঠাকুরপো, তা’ হ’লে সজনেগাছীতে যে মেয়েটি আছে, সেইটি দেখ। তারা মেয়েকে দু’তিন-শো টাকার গয়না দেবে।”

রমানাথ বলিল, “কিন্তু সে মেয়ে ত শুনেছি, সাক্ষাৎ মা রক্ষাকালী।”

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মঙ্গলা বলিল, “আর এই মেয়েই বা কোন্ সাক্ষাৎ দুগ্‌গো পিত্তিমে? তাই যদি হয়, আমাদের গরীব চাষাভুষোর ঘরে তেমন রূপসী মেয়ে নিয়েই বা হ’বে কি?”

মোহিনী বলিল, “তোমার দিদি এক কথা! বৌ দেখে পাঁচ জন মুখ সেঁট্‌কাবে, সেইটাই বুঝি ভাল? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা ছেলে, তা’র বিয়ে দিয়ে যদি ঘর আলো-করা বৌ আন্‌তে না পারি, তবে ছেলের বিয়ে দিয়েই দরকার কি?”

বিরক্তভাবে মঙ্গলা বলিল, “তবে যা’ ভাল বোঝো, তাই কর তোমরা।”

মোহিনী বা রমানাথের উপর বুঝিয়া কায করিবার ভার দিলেও সে কাযটা যে মঙ্গলার অনুমোদিত নহে. ইহা তাহার কথার ভাবে স্পষ্টই বুঝা গেল। বুঝিলেও কিন্তু মোহিনী তাহার অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করিল না, রমানাথকে তাড়া দিয়া শীঘ্রই মোনার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিল।

বৌ দেখিয়া অপর সকলে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেও মঙ্গলা কিন্তু পুত্রবধূর সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনেকগুলি খুঁত দেখিতে পাইল। বৌয়ের চোখ দুইটা টানা হইলেও বড় বেশী টানা; এত টানা চোখ ভাল দেখায় না; ঠোঁটটা অত্যন্ত পাতলা; দাঁতগুলো আর একটুক বড় হইলে তবে মানানসই হইত; নাসিকা অনেকটা বাঁশীর মত হইলেও বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে মাঝখানটা একটু বসা বলিয়া বোধ হয়; চুলের রাশিতে মুখখানাকে যদি ঢাকিয়াই রাখিল, তবে সে চুলের বাহার কি? হাতের গড়ন গোলগোল হইলেও আঙ্গুলগুলা যেন একটু লম্বা; পা দুইটা যেন খড়ুমে; না বাবু, গায়ের চামড়া কটা হইলেই তাহাকে সুন্দরী বলা যায় না। অনেক কালো মেয়ের এমন সৌষ্ঠব গড়ন যে, তাহার দিকে দুই দণ্ড চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু এ বৌয়ের গড়ন—কি জানি বাবু, কি দেখিয়া ছোটবৌয়ের মন এত ভুলিয়া গেল।

মঙ্গলা শুধু বধূর সৌন্দর্য্যের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াই নিরস্ত হইল না, তাহার পিতার ভদ্রতার অভাব দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ছি ছি, বৌয়ের বাপের কি একটুও মনুষ্যত্ব নাই? ছেলেকে যে আংটী দিয়াছে, উহা সোনা না তামা? কাপড় যাহা দিয়াছে, আজকাল হাড়ী-বাগ্দীর ঘরেও তেমন কাপড় দিতে পারে কি না সন্দেহ। এমন চাঁদের মত ছেলে, তাহাকে এমন পাঁচ টাকা দামের পাটের জোড় দিল কোন্ লজ্জায়? মেয়েকে মল চারিগাছা একটু ভারী গোছের দিতেও কি তাহার পয়সায় আগুন লাগিয়া গেল? দানসামগ্রীর বাসন-কোসন ত ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়। এমন দানসামগ্রী কি না দিলেই নয়? কেহ কি কখন মেয়ের বিয়ে দেয় না, না কাহারও মেয়ে সুন্দরী হয় না? আরে মোর সুন্দরী রে! মঙ্গলার যদি নিজের কর্ত্তৃত্ব থাকিত, তাহা হইলে সে সুন্দরী বৌয়ের সঙ্গে তাহার বাপের মুখ খড়ের নুড়ো জ্বালিয়া পোড়াইয়া দিত।

বেয়াই-বাড়ীর লোকের সাক্ষাতে মঙ্গলার এই তীব্র সমালোচনায় মোহিনী যেমন লজ্জিত, তেমনই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; বলিল, “দেখ দিদি, পাঁচ জনের সাম্‌নে কুটুমের এই রকম নিন্দে করলে লোকে তা’কে ছোটলোক ছাড়া আর কিছু বলে না।”

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। মঙ্গলা গর্জ্জন করিয়া বলিল, “হাঁ লো ছোটবৌ, আমি ছোটলোক, আর তোরা ত খুব ভদ্দর! ভদ্দর হ’বি না কেন, তোদের কি বল্, পরের সর্ব্বনাশ ক’রে কুটুম্বের কাছে খুব ভাল-মানুষি দেখাবি, কিন্তু চিরদিন ভুগ্‌তে হ’বে যে আমাকে!

তোদের হচ্চে দু'দিনের সখের আমোদ-আহ্লাদ ; কিন্তু এই ছোটলোক কুটুম নিয়ে—ছোটলোকের ঘরের মেয়ে নিয়ে আমাকে যে এর পর জ্ব'লে পুড়ে মত্তে হ'বে।"

এ কথায় মোহিনীকে নিরুত্তর হইতে হইল, চোখে জল আসিলেও কষ্টে তাহা রোধ করিতে হইল। সে স্বামীর কাছে গিয়া লজ্জিতভাবে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেখ, তোমার কথা না শুনে তাড়াতাড়ি মোনার বিয়ে দিয়ে ঝকমারি করেছি আমি। কিন্তু দিদি যে আমাদের এতটা পর ভেবে রেখেছে, তা ত আমি জান্‌তাম না।"

সহাস্যে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া রমানাথ বলিল, "বৌ-ঠানের কথা ছেড়ে দাও। ওঁর স্বভাবটা চিরকালই একরকম রইলো।"

মোহিনী বলিল, "তা, থাক্. কিন্তু মোনা আমাদের পর, এ কথা বল্‌লে আমার বুকে বড্ডই ঘা লাগে।"

মোহিনীর কণ্ঠ বেদনায় যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। রমানাথ বলিল, "পাগল তুমি ছোটবৌ, পরকে যতই আপন ভাব, সে পরই থাকে। মোনাকে তুমি বুক চিরে বুকের ভিতরে রাখলেও তা'কে পরের ছেলে ছাড়া তোমার পেটের ছেলে কেউ বলবে না।"

"কিন্তু মোনাকে যে আমি পেটের ছেলে ব'লেই মনে করি গো।"

মোহিনীর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। রমানাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "তুমি মোনাকে পেটের ছেলে মনে কর, ছোটবৌ, তা'তে তোমার তৃপ্তি—তোমার সুখ, পরের তা'তে কি? তা'রা পর বলবে না কেন? তবে মোনা যদি কোন দিন তোমাকে পর ভাবে, তখন দুঃখু কত্তে পার বটে।"

চোখের জল মুছিয়া সগর্ব্বে মোহিনী বলিল, "মোনা কখনও তা' ভাবতে পারবে না।"

হাসিতে হাসিতে রমানাথ বলিল, "তা' হ'লে তোমার দুঃখুই কিসের? তুমি ত চিরকাল 'না বিইয়ে' কানায়ের মা' হয়ে রইলে।"

স্বামীর কৌতুকবাক্যে মোহিনীর বেদনামলিন মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

৬

"হাঁ রে মোনা!"

"কেন ছোট-মা?"

"বৌকে তুই নিয়ে আস্‌তে চাস্ না কেন?"

"এনে কি হ'বে?"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে মোহিনী বলিল, "কি হ'বে কি রে? বিয়ে দিলুম, বৌ নিয়ে তুই ঘর-সংসার করবি, দেখে আমাদের চক্ষু সার্থক হ'বে। তা' নয়, বৌ নিয়ে আসবো না! তা' হ'লে তোর বিয়ে দিলুম কেন?"

গম্ভীরভাবে মোনা বলিল, "কেন বিয়ে দিলে, তা' তোমরাই জান, কিন্তু বিয়ে দিয়ে ভাল কায করনি, ছোট-মা।"

মোহিনীর মুখখানা অভিমানে গম্ভীর হইয়া আসিল। সে দুঃখিত স্বরে বলিল, "এ কথা তোর মা-ও বলে, দেখছি,তুইও এবার বল্‌তে সুরু করেছিস্। তা' হ'লে তোর বিয়ে দিয়ে আমি এতই কি মন্দ কায করেছি, মোনা?"

ছোট-মা'কে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখিয়া মোনা ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, "রাগ করো না, ছোট-মা, তুমি মন্দ কায করনি বটে, কিন্তু মন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

রোষকুঞ্চিত মুখে মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দ হয়ে দাঁড়াল কিসে শুনি?"

মোনা বলিল, "মা'র যখন এ বিয়েতে সন্তোষ নেই, তখন ভালই বা হ'ল কিসে?"

মোহিনী হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "ওঃ, তোর মায়ের কথা বল্‌ছিস্? সর্ব্বরক্ষে! আমি ভেবেছিলুম, এর ভিতর আর কিছু আছে বুঝি। তা' তোর মায়ের কথা ছেড়ে দে।"

মোনা। আমি যেন ছেড়ে দিলুম, ছোট-মা, কিন্তু মা ত ছাড়বে না?"

মোহি। কি কর্‌বে? বৌকে খোঁটা দেবে?

মোনা। বৌকে খোঁটা দেবে কি না, জানিনে, কিন্তু তোমাকে দশ কথা শোনাবে।

মোহি। তা' শোনাক্। আমাকে কি আজকাল শোনাচ্ছে রে মোনা, যখন তোর জন্ম হয়নি, তখন থেকে শুনিয়ে আস্‌ছে। তা' আমাকে কথা শোনাবে ব'লে বৌ নিয়ে ঘরকন্না কর্‌তে হ'বে না? বেটের কোলে

বৌমা ত পনরোয় পা দিয়েছে, আর কি না নিয়ে আসা ভাল দেখায়?

মোনা চুপ করিয়া রহিল। মোহিনী বলিল, "না বাছা, আর আমি কা'র-ও কথা শুনবো না। এদ্দিন নিয়ে আসি নাই শুধু তোর কাকাবাবুর খাতিরে। উনি বলেন, মোনা এখনও ছেলেমানুষ, কায-কর্ম্ম শিখুক, দু'পয়সা রোজগার করুক, তখন বৌ নিয়ে আসবে। তা' ছাড়া বিয়ের সময় তোর মা যে সেই পাঁচ কথা বলেছিল, তা'তে বৌয়ের বাপের মনটাও গরম ছিল। তা তা'র মা এবার নরম হয়ে এসেছে, তুইও দু'পয়সা আনতে শিখেছিস্, আর কারও কোন কথা শুনবো না আমি। আস্‌ছে সতরোই দিন ভাল আছে, ঐ দিনে আমি নিজ্যস্ নিয়ে আসবো। আজই তোর কাকাবাবুকে চিঠি একখানা লিখে দে।"

মোনা বলিল, "চিঠি আর লিখতে হ'বে কেন, আমি ত পরশু নিজেই যাচ্ছি।"

মাথা দোলাইয়া মোহিনী বলিল, "হাঁ, পরশু যাবি বৈ কি। এ মাসে তোর যাওয়া হ'বে না। চিঠিতে এ কথাও লিখে দিবি। তুই লিখতে না পারিস্, ও বাড়ীর কাশীকে দিয়ে আমি লিখিয়ে নেব।"

চিন্তিতভাবে মোনা বলিল, "কিন্তু, এখন আমদানীর সময়; এ সময় ব'সে থাক্‌লে কাযের ক্ষতি হ'বে যে, ছোট-মা?"

অবজ্ঞায় ঠোঁট ফুলাইয়া মোহিনী বলিল, "ওঃ, ক্ষতি হ'বে! এক রত্তি ছেলে তুই, এখনও তোকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হয়, তুই এসেছিস্ আমাকে কাযের ক্ষতি দেখাতে! ভারী যে কাযের লোক হয়ে উঠেছিস্, রে মোনা!"

বিমর্ষ মুখে মোনা বলিল, "কিন্তু কাকাবাবু রাগ করবেন।"

জোর গলায় মোহিনী বলিল, "তা'র রাগের জন্তে তোকে ভাবতে হ'বে না, সে ভার আমার রইল। মোদ্দা, তোর এ মাসে যাওয়া হ'বেই না। আমার কথা ঠেলে যেতে পার্‌বি?"

ঘাড় নাড়িয়া মোনা বলিল, "তা' আমি পার্‌বো না, ছোট-মা।"

হাসিতে হাসিতে মোহিনী বলিল, "তবে লক্ষী ছেলেটির মত আমি যা' বলি, তাই শোন্। চিঠিখানা লিখতে পার্‌বি?"

"না।"

"আচ্ছা, তোর লিখেও কায নেই। সে আমি যা'কে দিয়ে হোক লিখিয়ে নেব।"

মোনা আর কিছু বলিতে পারিল না।

পরদিন মোনা যখন খাইতে বসিয়াছিল, তখন মঙ্গলা আসিয়া মোহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁ ছোট-বৌ, মোনা পিটে খেতে চেয়েছিল, তা' আজ পিটে ক'রে দিলে হ'তো না?"

মোহিনী বলিল, "আজ ঝঞ্ঝাট আছে, হ'বে তখন এক দিন।"

মঙ্গ। আর কবে হ'বে? কা'ল ত মোনা কল্‌কাতায় যাচ্ছে?

মোহি। কে বল্‌লে কা'ল যেতে চাচ্ছে?

মঙ্গলা। কা'ল না পরশু ও নিজেই বল্‌ছিল না?

মোহি। ও অমন বলে। এ মাসে ওর যাওয়া হ'বে না।

মঙ্গ। এ মাস? আজ ত সবে মাসের বারো দিন। তদ্দিন কায কামাই ক'রে ব'সে থাক্‌বে?

যেন ঈষৎ রুষ্টভাবে মোহিনী উত্তর করিল, "থাক্‌লেই বা ব'সে?"

মঙ্গলা একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "তা' থাকে থাক্ না। তবে কাযে নতুন ভর্ত্তি হয়েছিল, তাই বলছি। ব'সে থাক্‌লে কাযের ত ক্ষতি হ'বে না?"

মোহিনী বলিল, "যদিও ক্ষতি হয়, তাই ব'লে ঘরে এসে দশ দিন থাক্‌বে না? তিন মাস সেখানে থেকে কি চেহারাটা হয়েছে, দেখ দেখি। এখন একটি মাস ঘরে ব'সে খেলে তবে যদি ওর চেহারা কতকটা শোধরায়!"

কুঞ্চিত মুখে মঙ্গলা বলিল, "তা' ভাই, বিদেশে থেকে পয়সা রোজগার কত্তে হ'লে ঘরের মত চেহারা থাকে কি? সেখানে ত মা মাসী নেই যে, আদর-যত্ন ক'রে খেতে দেবে।"

মোহিনী একটু তীব্র কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু যেখানে মা

মাসী আছে, সেখানে এসেও যদি দশ দিন জুড়ুতে না পায়, তা' হ'লে বাঁচবে কি ক'রে? শুধু পয়সা রোজগারটাই কি বড়?"

মঙ্গলা বলিল, "পয়সাও চাই, নিজের দেহটাও চাই। তবে বেটাছেলের পয়সাটাই আগে।"

মোহিনী বলিল, "সে বেটাছেলের কাছে। কিন্তু আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের কাছে ওদের দেহটাই বড়। পয়সা রোজগার কত্তে গিয়ে যে দেহটা নষ্ট করবে, তেমন পয়সার মুখে আমি ঝাঁটা মারি।"

মঙ্গলা একটু চিবানো স্বরে বলিল, "তা' পয়সা যা'র আছে, সে পয়সার মুখে ঝাঁটা মাত্তে পারে, কিন্তু যা'র নাই, তা'র তত সাহস হয় না।"

মোহিনী ক্রুদ্ধভাবে ইহার উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু মোনাকে হাত গুটাইয়া উঠিয়া পড়িতে দেখিয়া ব্যস্ততা সহকারে বলিল, "উঠে পড়লি যে রে, থাম্, দুধ এনে দিই। পাতের ভাত যে অর্দ্ধেক প'ড়ে রইলো।"

"ক্ষিদে ভাল নেই" বলিয়া মোনা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মোহিনীর মুখের উপর একটা সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার এই হাসিটুকুর মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কার নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে মোহিনীর বিলম্ব হইল না। বুঝিয়া সে অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

মঙ্গলা তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "দেখ, ছোট-বৌ, রাগ করিস্ না, যদি কাযের ক্ষতি হয়, তা' হ'লে এদ্দিন বসিয়ে রেখে ফল কি?"

ক্ষুব্ধ স্বরে মোহিনী বলিল, "বসিয়ে আমি রাখতাম না, দিদি, তবে বৌমাকে নিয়ে আস্‌ছি।"

বিস্ময়ের সহিত মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ আস্‌ছে না কি? কবে?"

মোহি। এই সতরোই।

মঙ্গ। পাঠাবে তা'রা?

মোহি। তা'রা পাঠাবে না কেন? আমাদেরই ত আনবার গা-গোছ নেই।

মঙ্গ। আমাদের গা-গোছ নেই কিসে? এই ত ঠাকুরপো সেই কি মাসে নিয়ে আস্‌বার কথা বলেছিল। তা'তে তারা ওজর দিলে—জোড়া বছর।

মোহি। সেটা ত মিথ্যে ওজর নয়, সত্যিই ত চৌদ্দ বছর যাচ্ছিল। গেল কার্ত্তিকে পনরোয় পড়েছে। আমি আন্‌বার কথা ব'লে পাঠিয়েছিলাম, তা'তে তা'রা বলেছে, এই মাসে ভাল দিন দেখে যেন নিয়ে যায়।

মুখখানা একটু মচকাইয়া মঙ্গলা বলিল, "তা' হ'লে নিয়ে এস। কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিয়ে এদ্দিন মেয়ে ঘরে রাখতে কাউকে দেখা যায় না। আরও দু'চার বছর রাখলে না কেন?"

ইহার উত্তর দিতে গেলেই কথা বাড়িয়া যাইবে বুঝিয়া মোহিনী আর কিছু বলিল না। সে নিজেদের ভাত বাড়িবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। অগত্যা মঙ্গলাকেও এ প্রসঙ্গ হইতে নিরস্ত হইতে হইল।

৭

মানুষ সুখের আশাতেই কায করে। কিন্তু সুখের পরিবর্ত্তে অতর্কিতে দুঃখ আসিয়া যখন তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করিয়া দেয়, তখন কৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপ ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। সুখের আশায় মোনার বিবাহ দিয়া মোহিনীকেও এ জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে হইল। বৌকে ঘরে আনিবার পর হইতেই সংসারে এমন অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল যে, মোহিনীর মনে হইল, হায়, কেন তাড়াতাড়ি মোনার বিবাহ দিয়াছিলাম!

আগুন জ্বালাইয়া তুলিল মঙ্গলা। একে ত তাহার অনভিমতে মোনার বিবাহ দিয়া মোহিনী তাহার হৃদয়ে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহার উপর বধূ যখন নবোদ্গত যৌবনের সহিত অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য লইয়া ঘর আলো করিয়া বসিল এবং মোহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশিনীদিগের পর্য্যন্ত মুখে মুখে তাহার রূপ-গুণের খ্যাতি কীর্ত্তিত হইতে থাকিল, তখন মঙ্গলার অন্তরের প্রধূমিত বিদ্বেষ-বহ্নি যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুনে সে সংসারটাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

অপর সকলে বধূ নলিনীর রূপ-গুণের প্রশংসা করিলেও মঙ্গলা কিন্তু তাহার মধ্যে প্রশংসার কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। সে নলিনীর প্রতি কার্য্যে—প্রতি পদক্ষেপে

অজস্র ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া, বৌটা যে সম্পূর্ণ নিগুর্ণ এবং ভদ্র গৃহস্থের সংসারে বধূরূপে পরিচিত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিল। নলিনীর চলা-ফেরা, হাসি, কথা, নাওয়া-খাওয়া, শোওয়া প্রতি কার্য্যেই দোষ ধরিয়া মঙ্গলা তাহাকে তিরস্কার করিতে এবং তাহার প্রত্যেক কার্য্যের জন্য তাহার মাতা-পিতাকে দায়ী করিয়া তাহাদের উপর কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল। তাহার এই অবিরাম তিরস্কারে শুধু নলিনী কেন, মোহিনী পর্য্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিল। সে গোপনে মঙ্গলাকে বুঝাইয়া বলিল, "দেখ, দিদি, একরত্তি মেয়ে, তা'র পেছনে রাতদিন এমন খিট্ খিট্ করলে সে টিঁকতে পারবে কেন?"

অসহিষ্ণুভাবে মঙ্গলা উত্তর করিল, "না টিঁকতে পারে, তা'তে হ'বে কি? তাই ব'লে সে যা খুসী তাই করবে, মুখ বুজে তাই সহ্য করতে হ'বে না কি?"

মিনতির স্বরে মোহিনী বলিল, "বেটার বৌ, সইতে হ'বে বৈ কি? তুমি আমি না সইলে পরে কি সইতে আসবে?"

রাগে হাত-মুখ নাড়িয়া মঙ্গলা বলিল, "আরে মোর বেটার বৌ রে! বেটার বৌ হয়েছে ব'লে মাথায় উঠে নাচবে বুঝি?"

মোহিনী বলিল, "মাথায় উঠে নাচবে কেন? বৌ ত তেমন মেয়ে নয়, শান্ত, শিষ্ট, ধীর।"

রোষবিকৃত কণ্ঠে মঙ্গলা বলিল, "তোমার কাছে শান্ত, শিষ্ট, ধীর, কিন্তু আমার কাছে নয়। আমাকে ত গ্রাহ্যই করে না, আমি যেন কেউ নই, বাড়ীর দাসীবাঁদী একটা। আমি একটা ফরমাস্ করলে কানে যেন শুনতেই পায় না, যেন কানের মাথা খেয়ে ব'সে আছে। সে দিন আমি অন্ধকার দাওয়ার একটি পাশে শুয়ে আছি, গিয়ে আমার পায়ের উপর পা তুলে দিলে। এত তেজ —এত অহঙ্কার এই আঁটকুড়ীর বেটীর?"

সবিনয়ে মোহিনী তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "এতে আবার তেজ অহঙ্কার কি হলো, দিদি! অন্ধকারে দেখতে পায়নি।"

মুখ ভ্যাংচাইয়া রোষসমুচ্চ কণ্ঠে মঙ্গলা বলিল, "না, দেখতে পায়নি! কেন, চোখের মাথাও খেয়েছে না কি? দেখতে পায় না যদি, তবে সে দিকে কেন গিয়েছিল? ওর বাবার ছরাদ্দ করতে গিয়েছিল কি?"

মোহিনী তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ছিঃ, দিদি, পরের মেয়েকে গাল দিতে আছে?"

সগর্জ্জনে চীৎকার করিয়া মঙ্গলা বলিল, "গাল দিতে নাই? দু'শো বার—হাজার বার গাল দেব, দোষ দেখলে ঝাঁটা মারতে মারতে বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দেব। দেখি, আমার কে কি করতে পারে! আমার বেটার বৌ, আর কারো নয় ত।"

মোহিনী বলিল, "তোমার বেটার বৌ বলেই তোমাকে গালমন্দ দিতে বারণ কচ্চি, দিদি।"

মঙ্গলা তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া শ্লেষ-তীব্র কণ্ঠে বলিল, "আহা, হা, এত দরদ তোর লা, ছোটবৌ? তা'র চেয়ে সোজা কথায় বল্ না কেন, আমাদের খাওয়া-পরা যোগাচ্চিস্, ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ এনেছিস্, তাই আমাকে টুঁ শব্দও করতে দিবি না। কিন্তু মঙ্গলা সে মেয়ে নয়, দোষ দেখলে গুরু ক্যানে হোক্ না, তা'রও তোয়াক্কা রাখি না। খোসামুদি আমার দ্বারায় হ'বে না, তা জানিস্।"

অগত্যা মোহিনীকে নিরুপায়ভাবে চুপ করিতে হইল। কিন্তু সে চুপ করিয়াও বেশী দিন থাকিতে পারিল না। বিনা দোষে তিরস্কৃত হইয়া নলিনী যখন নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিত, তখন মোহিনীর প্রাণটা যেন ফাটিয়া যাইত। "ওঃ, দিদির বুকটা কি পাষাণ দিয়া গড়া?" নলিনীর সঙ্গে সে নিজেও চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিত না। হায়, কি কুক্ষণেই সে সোনার বিবাহ দিয়াছিল। মোহিনী যত দূর পারিত, মিষ্ট কথায় নলিনীকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইত। নলিনী শান্ত হইত বটে; কিন্তু এক এক সময় নিতান্ত অধীরভাবে কান্দিতে কান্দিতে বলিত, "উনি আমাকে গাল দিন, মারুন, কাটুন, সব আমি সহ্য করবো, কিন্তু কথায় কথায় আমার মা-বাপকে গাল, আমার সোনারচাঁদ ভাইগুলির মাথা খাওয়া, এ সব আর আমি সইতে পারি না, ছোট-মা! এর চেয়ে তুমি আমাকে বিষ এনে দাও, খেয়ে আমি মরি।"

নলিনীর আক্ষেপ শুনিয়া, কান্না দেখিয়া, মোহিনীর

ইচ্ছা হইত, নলিনীর আগে তাহারই বিষ খাইয়া মরা উচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নলিনীর উপর নির্য্যাতন ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। মোহিনী অবশেষে এক দিন মঙ্গলাকে শাসাইয়া বলিল, "তুমি যদি এই রকমই কর, দিদি, তা' হ'লে আমি তোমার দেওরকে চিঠি লিখে বৌমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।"

মোহিনী ভাবিয়াছিল, দিদি ইহাতে নিশ্চয়ই একটু ভয় পাইবে। কিন্তু ভয় পাওয়া দূরের কথা, মঙ্গলা অধিকতর উত্তেজিতভাবে বলিল, "ঠাকুরপোকে চিঠি লিখে বৌকে বাপের বাড়ীতে পাঠাবি, না আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিবি? তা' যদিই তাড়াস্, আমার কি আর এক মুটো পেটের ভাত জুটবে না? না জুটে, উপোস দিয়ে প'ড়ে থাকবো, তবু তোর নাক-নাড়া আমি সইতে পারবো না, ছোটবৌ!"

মধ্যে রমানাথ বাড়ী আসিল। সমস্ত শুনিয়া সে ভাবিল, তাই ত, এর উপায় কি?

অনেক চিন্তার পর অবশেষে রমানাথ স্থির করিল, যদি বনিবনাও না হয়, বৌঠান আলাদা হইয়াই থাকুক।

মঙ্গলা এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিল না; বলিল, "এমন নাকনাড়ার ভাত খাওয়ার চাইতে আমার আলাদা খাওয়াই ভাল। কেন, আমার বেটা কি রোজগার কর্‌তে পারে না?"

সম্মতি দিয়া মঙ্গলা নিজে স্বতন্ত্র থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা করিল বটে, কিন্তু দিনরাত অভিশাপ দিয়া বলিতে লাগিল, "হে ভগবান্, হে বাবা চন্দ্র-সুয্যি, যে ভালখাকী আমার পেটের ছেলেকে পর ক'রে দিলে, বৌ-বেটা নিয়ে ঘর কর্‌তে দিলে না, তা'র যেন বাড়া ভাতে ছাই পড়ে, সীঁথির সিঁদুর ঘুচে যায়, আমার হাতের মত হাত হয়" ইত্যাদি।

মোহিনী শুনিয়া রমানাথের পায়ে আছাড় খাইয়া বলিল, "ওগো, আর আমার ছেলের সাধে কায নাই। মোনাকে তুমি আলাদা ক'রে দাও। সে তা'র মায়ের কাছে থাকুক।"

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মোনাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পার্‌বে, ছোটবৌ?"

কান্দিতে কান্দিতে মোহিনী উত্তর করিল, "খুব পারবো গো, খুব পারবো। মোনা পরের ছেলে, তা'কে আমি বুক থেকে টেনে ফেলে দেব, কিন্তু তোমার এমন অকল্যাণের কথা আমি আর শুন্‌তে পারবো না।"

মোনা কিন্তু ইহাতে সম্মত হইল না; বলিল, "আমি মা'র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর্‌তে পারবো, ছোট-মা, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে—কাকাবাবুর সঙ্গে আলাদা হ'তে কক্ষনো পারবো না।"

মোহিনী তাহাকে অনেক বুঝাইয়াও যখন পারিয়া উঠিল না, তখন ভয় দেখাইয়া বলিল, "তা' যদি না করিস্, মোনা, তা' হ'লে আমি হয় গলায় দড়ী দেব, না হয় যে দিকে দু'চোক্ষু যায়, চ'লে যাব।"

কাঁদ কাঁদ মুখে মোনা জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঝগড়া-ঝাটি করেন, তিনি না হয় আলাদা রইলেন, কিন্তু আমি কি দোষ কর্‌লাম, ছোট-মা?"

স্থির অকম্পিত কণ্ঠে মোহিনী বলিল, "দোষঘাট আবার কি? যত দিন তুই অক্ষম ছিলি, আমরা প্রতি-পালন করেছি। এখন সমর্থ হয়েছিস্, নিজে দেখে-শুনে খাবি। পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আমরা কত দিন বেড়াব? আমাদের এখন তীর্থ-ধর্ম্ম, বার-ব্রত কর্‌লে পরকালের কায হ'বে।"

মোনা জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবুরও কি এই কথা?"

মোহিনী বলিল, "তোর কাকাবাবু না বল্‌লে আমি নিজ থেকে কি এমন কথা বল্‌তে পারি?"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া মোনা বলিল, "বেশ, আজ থেকে তবে আমি আলাদাই খাব।"

৮

মর্ম্মান্তিক আঘাতের বেদনা হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য মোহিনী জোর করিয়া মোনাকে আলাদা করিয়া দিল বটে, কিন্তু আলাদা করিয়া দিয়াও সে কিছুমাত্র স্বস্তি পাইল না, মর্ম্মবেদনা বরং দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তাহার বুকটা যেন একেবারেই খালি হইয়া পড়িয়াছে, যে একটা স্নেহের বাঁধনে বুকের পাঁজরা-গুলা এত দিন দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ছিল, সে বন্ধন খসিয়া যাওয়ায় পাঁজরাগুলা একে একে স্থানচ্যুত হইয়া

ড়িতেছে। স্নেহসম্বন্ধহীন সংসারটা যেন শূন্য হইয়া ঠিয়াছে। সংসারে তাহার আর কিছুই নাই, কোন খই নাই। পরিচিত পুরাতন জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত য়া একটা অপরিচিত কঠোর নূতন জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

এ সময়ে রমানাথ কাছে থাকিলেও মোহিনী নেকটা ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিত। কিন্তু মোনাকে লাদা হইবার জন্য আদেশ দিয়াই সে কলিকাতায় লয়া গিয়াছিল, মোনার আলাদা হইয়া খাওয়াটা খিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং ই কঠোর দৃশ্যটা মোহিনীকে একাই দেখিতে হইল, ং তজ্জনিত আঘাতের বেদনাটুকু তাহাকে কাই ভোগ করিতে হইল। এই ঘটনায় তাহার নর মধ্যে দুঃখের যে তুমুল তরঙ্গ উঠিতে পড়িতে গিল, তাহা দেখিবার বা দেখাইবার কেহই রহিল না।

দেখিবার এক জন ছিল, সে মোনা। মোনা কিন্তু খিয়াও দেখিল না। সে প্রথম যে দিন স্বতন্ত্রভাবে র কাছে খাইল, মোহিনী সে দিন সকাল হইতেই রের ভিতর শুইয়া রহিল। সারাদিন সে উঠিল না, সারের কাযকর্ম্ম কিছুই করিল না, রাঁধিল না, খাইল । মোনা যে ইহা লক্ষ্য করিল না, তাহা নহে ; লক্ষ্য রিলেও সে কিছু বলিল না, বলিবার প্রয়োজনও কিছুই খিতে পাইল না।

বৈকালে জ্ঞাতিসম্পর্কে ঠাকুরঝি হরিদাসী বেড়াইতে সিয়া মোহিনীকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা রিল, "শুয়ে আছ যে, ছোটবৌ? রান্না-খাওয়া য়েছে?"

মুখ মচকাইয়া মোহিনী উত্তর দিল, "সকাল থেকে সুখ বোধ হচ্চে।"

"জ্বর হয়েছে না কি?"

"জ্বর নয়, তবে মাথাটা ভার, গা-গতর যেন খ'সে ড়ছে।"

"বাতিক হয়েছে তা হ'লে। তা এক দিন উপোস দিলেই সেরে যাবে। মোনা আজ থেকে আলাদা াচ্চে না?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মোহিনী বলিল, "খেলেই বা।"

হরিদাসী বিজ্ঞের ন্যায় মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "তা' থাক্, কিন্তু এইটাই কি ওর ধর্ম্ম হ'লো? তুমি মানুষ-মুনুষ কর্‌লে, বিয়ে দিলে, ছোটদা লিখাপড়া শেখালে, হাতে ধ'রে কাযকর্ম্ম শিখিয়ে দিলে। আর দু'পয়সা রোজগার কত্তে শিখেছে ব'লে তোমাদের সঙ্গে আলাদা হয়ে গেল। কাযটা কিন্তু মোনা ভাল করলে না!"

মোহিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল ; বলিল, "তুই একটু বোস্, ঠাকুরঝি, আমি ঘাট থেকে মুখে হাতে জল দিয়ে আসি। সকাল থেকে এখনও মুখটা পর্য্যন্ত ধোয়া হয়নি।"

হরিদাসী বলিল, "মুখ-হাত ধুয়ে এসে যা হয় কিছু খাও। একেবারে উপোস দিয়ে প'ড়ে থাক্‌লে দুর্ব্বল হয়ে যা'বে।"

মুখ মচকাইয়া মোহিনী বলিল, "খেতে কিছু ইচ্ছা নাই, তবে তেষ্টা পেয়েছে, জল এক ঘটি খেতে হ'বে।"

হরিদাসী বলিল, "তাই খাও, আসি তবে। সেরোর মা'র মুখে কথাটা শুনে মনে বড়ই কষ্ট হলো, তাই বলি একবার দেখে আসি।"

হরিদাসী চলিয়া গেলে মোহিনী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সন্ধ্যার পর মঙ্গলা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে মোনা, ছোট গিন্নী আজ ঘর থেকে বেরোবে না না কি?"

উপেক্ষার স্বরে মোনা উত্তর দিল, "কি জানি।"

মঙ্গলা বলিল, "আজ ত সকাল থেকেই দেখছি, ঘরে শুয়ে আছে, উঠে রান্না-খাওয়াও কর্‌লে না?"

বিরক্তভাবে মোনা বলিল, "না করে, তা'তে তোমার আমার কি?"

মঙ্গলা বলিল, "আমাদের তা'তে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু এ রকম ঢলাঢলি কেন? নিজেই আলাদা ক'রে দিয়ে এখন আবার দেখাচ্ছেন, এতে যেন ওঁর কতই না কষ্ট হয়েছে। এত কষ্ট যে, সারাদিন না-খেয়ে-না-দেয়ে ঘরের ভিতর উপুড় হয়ে প'ড়ে রয়েছেন। একেই বলে, 'মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে'।"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে মোনা উত্তর করিল, "ঐ রকম দেখাতে হয়।"

সারাদিন ঘরের ভিতর থাকিয়া মোহিনী যেন হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল, সন্ধ্যার পর অন্ধকার দাওয়ার উপর ঠাণ্ডা বাতাসে বসিয়া যেন একটু আরাম বোধ করিতেছিল। মাতা-পুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। হরি হরি, মোনা বলে কি? সে লোক-দেখানো দুঃখ দেখাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ দুঃখের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে! তাহার এই বাহ্য দুঃখে মোনার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই! হা ভগবান্, এই মোনাকে সে নিজ গর্ভজাত সন্তান-জ্ঞানে প্রতিপালন করিয়াছিল? ইহার জন্য সে মঙ্গলার কঠোর অভিশাপ কুড়াইয়া লইয়াছিল? ইহাকে আলাদা করিয়া দিতে হইয়াছে বলিয়া সে মনের কষ্টে আজ সারাটা দিন অনাহারে পড়িয়া রহিয়াছে! ছি ছি, কি ভ্রম তাহার! এ ভ্রমের সংশোধন তাহাকে এই মুহূর্ত্তেই করিতে হইবে। মোনাকে দেখাইতে হইবে যে, তাহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়ার জন্য মোহিনী কিছুমাত্র দুঃখিত—কিছুমাত্র কাতর নহে।

মোহিনী দাঁতে দাঁত চাপিয়া উঠিয়া আলো জ্বালিল এবং রান্নাঘরে গিয়া উনান জ্বালিয়া রান্না চাপাইয়া দিল।

রাগে রাগেই মোহিনী রান্না শেষ করিল বটে, কিন্তু খাওয়া যেন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার এই প্রস্তুত অন্নের ভাগ আজ হইতে কাহাকেও দিতে হইবে না, একার জন্য রাঁধিয়া একাই খাইতে হইবে। ওঃ, পোড়া পেটের কি জ্বালা! মোহিনীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। দুই চারি গ্রাস ভাত কষ্টে গলাধঃ করিয়া সে যেন অতিমাত্র অভিমানে ভাতের থালাটাকে দূরে ঠেলিয়া দিল, এবং হাত-মুখ ধুইয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার চোখের জলে বালিস-বিছানা যেন ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

আজ যে কষ্টটা একেবারেই অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, কা'ল তাহার কঠোরতা যেন অনেকটা মৃদু হইয়া আইসে। মানুষ কালে পুত্রশোকও বিস্মৃত হইয়া থাকে। মোহিনীর দুঃখের বেগও ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল; মোনার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াও সে রাঁধিয়া, খাইয়া, হাসিয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। মোহিনী এই বলিয়া মনকে বুঝাইল, মোনা তাহাকে পর ভাবিলই বা, সে ত কোন দিন মোনাকে পর ভাবে নাই, এবং ভাবিবেও না, সে যেখানেই থাক্, সুখে থাকুক; তাহার সুখেই মোহিনীর সুখ। এই যে কত পেটের ছেলে মা'কে ভাত দেয় না, মা'র দিকে ফিরিয়া চায় না। মোনা ত পরের ছেলে। এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া মোহিনী যেন অনেকটা শান্তি লাভ করিল।

কিন্তু তাহার এই চেষ্টাকৃত শান্তিতে আর একটা ব্যাঘাত উপস্থিত হইল নলিনীকে লইয়া। নলিনীর উপর এখন মঙ্গলার সর্ব্বময় প্রভুত্ব। তাহার সে প্রভুত্বে বাধা দিতে কেহই ছিল না। সুতরাং মঙ্গলা এ বার স্বীয় প্রভুত্ব অবাধে যথেচ্ছভাবে পরিচালনা করিতে লাগিল। মোহিনীর জন্য আগে তাহাকে এই ক্ষমতা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এক্ষণে সে মোহিনীকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহা সুদে আসলে আদায় করিয়া লইতে উদ্যত হইল। এখন সে কথায় কথায় নলিনীকে গালাগালি—এমন কি, সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত দিতে আরম্ভ করিল। নলিনীর কষ্টের অবধি রহিল না। তাহার কাঁদিয়া দিন যাইতে লাগিল।

মোহিনী ইহা দেখিত, দেখিয়া অন্তরে অন্তরে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিত। কিন্তু সে ব্যথা তাহাকে অন্তরেই চাপিয়া রাখিতে হইত। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, তখন মঙ্গলার কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া সে থাকিতে পারিত না। কিন্তু প্রতিবাদে বিপরীত ফল ফলিত, নলিনীর নির্য্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইত। মোহিনীকে ইহা নীরবেই দেখিতে হইত। এ নির্য্যাতন রোধ করিবার কোন ক্ষমতাই তাহার হাতে ছিল না। ক্ষমতা ছিল মোনার হাতে। কিন্তু সে একেবারেই নীরব।

নিতান্ত অসহ্য হইলে এক দিন মোহিনী মোনাকে ডাকিয়া বলিল, "হাঁ রে মোনা, মেয়েটাকে কি তোরা মেরে ফেল্‌বি?"

রূঢ়ভাবেই মোনা উত্তর করিল, "আমাদের বৌ, আমরা যদিই মেরে ফেলি?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মোহিনী বলিল, "তা' মাত্তে পারিস্, কিন্তু তোদের কি একটু মায়া-মমতাও নাই?"

কুঞ্চিতমুখে মোনা বলিল, মায়া-মমতা থাক্‌লে কি এমন করি?"

হতাশভাবে মোহিনী বলিল, "ধন্যি যা' হোক্! কিন্তু এত নির্দ্দয় নির্ম্মম কবে থেকে হ'লি তুই?"

মোহিনীর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কঠোর স্বরে মোনা উত্তর দিল, "যে দিন থেকে তুমি শিখিয়ে দিয়েছ, ছোট-মা, জগতে মায়া-মমতার স্থান নেই।"

মোনার স্বরটা কঠোর হইলেও তাহার মধ্যে যে কতটা দুর্জ্জয় অভিমান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে মোহিনীর বিলম্ব হইল না। বুঝিয়া সে মাথাটা একটু নীচু করিল; ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "তা' হ'লে তোরা বৌটাকে মেরে আমাকে শাস্তি দিচ্চিস্ বল্।"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মোনা বলিল, "মিথ্যা বলবো না, ছোটমা, আমার উদ্দেশ্যই তাই। কিন্তু তোমার নির্ম্মমতার উপযুক্ত শাস্তি কি, তা'আমি এখনও ঠিক কত্তে পারিনি।"

মোহিনী নীরবে একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

নিরুপায় হইয়া মোহিনী অবশেষে রমানাথকে পত্র লিখিল, "আমার আর এখানে থাক্‌তে ভাল লাগছে না। একা এখানে থেকেই বা কি করবো? হয় আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, নয় তুমি এসে আমার কাছে থাক।"

পত্র পাইয়া রমানাথ বাড়ীতে আসিল এবং ঘরে চাবী দিয়া, মোহিনীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। মোহিনী চলিয়া গেলে মঙ্গলা আরামের গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আপদ বিদেয় হলো না বাঁচলুম। বৌ-বেটা নিয়ে সুখে ঘর কত্তে পারবো।"

৯

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, মোনার যে কলকাতায় আস্‌বার কথা ছিল, তা' কৈ এলো না?"

রমানাথ বলিল, "এসেছে যে।"

বিস্ময়সহকারে মোহিনী বলিল, "এসেছে? তা' কৈ, আমাদের এখানে এলো না? কোথায় রইলো?"

রমা। আলাদা বাসা ক'রে রয়েছে।

মোহি। আমরা এখানে থাক্‌তে আলাদা বাসা কত্তে গেল?

রমা। বৌঠান্ বোধ হয় আমাদের এখানে থাকতে বারণ ক'রে দিয়েছে।

মোহি। তা' দিতে পারে। কিন্তু মোনা সেই বারণ শুন্‌লে?

রমা। মায়ের বারণ ছেলে শুন্‌বে না?

গভীর দীর্ঘশ্বাসে বেদনার গুরুত্ব ব্যক্ত করিয়া মোহিনী বলিল, "আগে কিন্তু মোনা তা' শুন্‌তো না।"

রমানাথ বলিল, "আগে সে ছেলেমানুষ ছিল, জ্ঞান ছিল না তা'র।"

ক্ষোভরুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে মোহিনী বলিল, "এখন বড় হয়ে জ্ঞান জন্মেছে, তাই এমন নিমকহারামী শিখেছে বুঝি?"

ধীর গম্ভীর স্বরে রমানাথ বলিল, "নিমকহারামী সে আর কিসে করলে, ছোটবৌ? তা'কে আমরা আলাদা ক'রে দিয়েছি যখন, তখন সে আর আমাদের সঙ্গে এক যায়গায় থাক্‌তে আসবে কোন্ মুখে?"

তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া রোষকম্পিত কণ্ঠে মোহিনী বলিল, "কিন্তু একবার দেখা কত্তে এলেও কি দোষ হ'তো?"

রমানাথ বলিল, "দেখা কত্তে আস্‌বে বৈ কি। এই ত সবে পরশু এসেছে।"

ধরা গলায় মোহিনী বলিল, "পরশু এসেছে, কা'ল, আজ—এই দু'দিনের ভিতরেও সে একবার দেখা কত্তে আস্‌তে পার্‌লে না? আগে কিন্তু এই মোনা স্কুল থেকে এসে এক মুহূর্ত্ত আমাকে দেখতে না পেলে কেঁদে বাড়ী মাথায় কত্তো।"

মোহিনীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। রমানাথ বলিল, "বলেছি ত, ছোটবৌ, আগে সে ছেলেমানুষ ছিল। সে সব কথার তুলনা এখন দিলে চলে না।"

মোহিনী বলিল, "তা' চলে না বটে, কিন্তু আমি যে অনেক আশায় মোনাকে মানুষ করেছিলাম গো।"

বলিতে বলিতে মোহিনী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রমানাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "মানুষ করলেই যে কারও উপর চিরকাল সম্পূর্ণ দাবী থাকবে, এমন কোন কথা নাই, ছোটবৌ। তা' হ'লে এক মায়ের পেটের ভাই—দাদা আমাকে

অনেক কষ্টে মানুষ করেছিল, আমি কখনও তা'র সঙ্গে আলাদা হ'তে পারতাম না, জমী-যায়গা নিয়ে তা'র সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কর্‌বার ইচ্ছাও আমার মনে আস্‌তো না। মানুষ করার কথা তুমি ছেড়ে দাও। তোমার পেটের ছেলে নাই, পরের ছেলেকে যত্ন-আত্তি ক'রে—ভালবেসে সুখ পেয়েছ, তাই তুমি মোনাকে মানুষ করেছ। মানুষ করেছ ব'লেই সে যে চিরকাল তোমার পদানত হয়ে থাকবে, এমন আশা করা তোমার খুব অন্যায়।"

আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে মোহিনী বলিল, "আমি তা'কে পদানত হয়ে থাক্‌তে বলি না, কিন্তু তিন দিনের ভেতর একবার দেখা কত্তে এলো না সে, এই আমার দুখ্যু।"

রমানাথ বলিল, "নতুন বাসা গুছিয়ে লওয়ার ঝঞ্ঝাট কত, তা' ত তুমি নিজেই বুঝেছ। সেই ঝঞ্ঝাটেই মোনা আস্‌তে পারেনি। কা'ল সন্ধ্যা নাগাদ আস্‌তে পারে বোধ হয়।"

মোহিনী নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। রমানাথ বলিল, "আর একটা শুভসংবাদ তোমাকে দিতে ভুলে গিয়েছি।"

আগ্রহান্বিতভাবে মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের শুভসংবাদ?"

রমানাথ বলিল, "বৌমার সম্বন্ধে। শুন্‌লাম, তুমি চ'লে আস্‌বার পর থেকে বৌমার উপর অত্যাচারের না কি নিবৃত্তি হয়েছে। বৌঠান্ এখন বৌমা বল্‌তে অজ্ঞান।"

হর্ষপ্রফুল্ল কণ্ঠে মোহিনী বলিয়া উঠিল, "সত্যি? কে বল্‌লে তোমাকে?"

রমানাথ বলিল, "গণেশ খুড়ো দোকানের মাল গস্ত কত্তে দিন পাঁচেক আগে কলকাতায় এসেছিল। তা'র মুখেই শুনেছি।"

ঘাড় নাড়িয়া মোহিনী বলিল, "তা' হ'তে পারে। আমাকে শাস্তি দেবার জন্যেই ত ওরা বৌমার উপর এতটা কত্তো।"

রমানাথ একটু বিস্ময়ের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি না কি?"

মোহিনী বলিল, "হাঁ, মোনাও আমার কাছে এ কথা স্বীকার করেছে।"

সহাস্যে রমানাথ বলিল, "এটা মন্দ যুক্তি নয়, 'ষাঁড়ে ধান খায়, তাঁতি বাঁধা যায়।' কিন্তু তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে—তোমার অপরাধ?"

মোহিনী বলিল, "আমার অপরাধ—আমি বৌমাকে ভালবাসতাম।"

রমানাথ বলিল, "তা' হ'লে তুমি চ'লে এসে বৌমার খুব উপকার করেছ বল।"

মোহিনী বলিল, "আমিও ত তাই ভেবেই চ'লে এলুম। নইলে বাড়ী ঘর ছেড়ে—যাক্, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

রমা। অনুরোধ উপরোধ কখনও আমাকে করেছ ব'লে মনে ত হয় না। আমার বোধ হয়, তুমি অনুরোধ কচ্চো এই নতুন।

মোহি। নতুনই হোক্, আর পুরানই হোক্, রাখবে কি না, তাই বল।

রমা। যদি আকাশের চাঁদ ধ'রে দিতে না বল, তা' হ'লে বোধ হয় রাখতে পারি।

মোহি। রাখতে পারি নয়, রাখতেই হ'বে। বল, রাখবে?

রমা। যদি অসাধ্য না হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই রাখবো। তোমার অনুরোধটা কি শুনি।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মোহিনী বলিল, "দেখ, ইহ-কালে ত কিছুই হ'লো না, এখন পরকালের কায যদি কিছু হয়—"

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "বার-ব্রত, পুণ্যি-ধর্ম্ম কত্তে চাও?"

মোহিনী বলিল, "ঘরে ব'সে পুণ্যি-ধর্ম্ম নয়; একবার পশ্চিমে ঘুরে আসি চল।"

একটু ভাবিয়া রমানাথ বলিল, "মন্দ কথা নয়। আমিও অনেক দিন থেকে মনে কচ্চি—"

মোহিনী তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই নিতান্ত ব্যস্ততার সহিত বলিল, "মনে কচ্চি নয়, চল তা' হ'লে।"

হাসিয়া রমানাথ বলিল, "আজই না কি?"

মোহি। আজ না হয়, কা'ল।

রমা। পাগল না কি! পশ্চিমে যাওয়া কি মুখের কথা? এক দিনে কি তা'র যোগাড় হ'তে পারে?

মোহি। যোগাড়ের মধ্যে ত টাকা? টাকার ভার আমার।

বিস্মিতভাবে রমানাথ বলিল, "শুধু টাকার যোগাড় নয়, কায-কর্ম্মের বন্দোবস্ত কত্তে হ'বে ত?"

মোহিনী বলিল, "সে বন্দোবস্ত আজই ক'রে ফেল। কা'ল বিকেলের মধ্যে বেরিয়ে যেতে হবে।"

একটু আশ্চর্য্যান্বিতভাবে রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন বল দেখি?"

দৃঢ়তাসূচক মস্তক-সঞ্চালনসহকারে মোহিনী উত্তর করিল, "তাড়াতাড়ি আবার কি! যখন মন হয়েছে, তখন দেরী করবো না। কিন্তু কা'ল বিকেলের মধ্যে যদি যাওয়া না হয়, তা' হ'লে আমি যা'ব না,তা ব'লে রাখছি। আমি এ দিককার কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র যা' কিছু সঙ্গে লওয়া দরকার, সব গুছিয়ে নিচ্ছি, তুমিও তোমার কায গুছিয়ে নাও।"

১০

মোহিনীর একান্ত আগ্রহ দেখিয়া রমানাথকে অগত্যা সম্মতি দিতে হইল এবং কাযের ভার অন্য লোকের উপর দিয়া, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া পরদিন বৈকালের গাড়ীতেই উভয়ে গয়া অভিমুখে যাত্রা করিল।

গাড়ীতে যাইতে যাইতে মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মোনা দেখা কত্তে আস্‌বে ব'লে বোধ হয় কি?"

রমানাথ বলিল, "নিশ্চয় আস্‌বে।"

মোহি। তা' হ'লে এতক্ষণ এসেছে বোধ হয়।

রমা। কিন্তু আসা বৃথা! দেখা ত পাবে না।

মোহি। দেখা না পাওয়াই ভাল।

বলিয়াই মোহিনী মুখ ঘুরাইয়া লইয়া গাড়ীর বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এতক্ষণে রমানাথ বেশ বুঝিতে পারিল যে, মোনার উপর দুর্জ্জয় অভিমান লইয়াই মোহিনী তীর্থযাত্রা করিয়াছে এবং ওখানে থাকিলে পাছে তাহার সঙ্গে দেখা হয়, এই আশঙ্কাতেই এত শীঘ্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায় বুদ্ধিহীনা রমণী, যে মোনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না বলিয়া তুমি দূরে পলাইয়া যাইতেছ, সেই মোনা যে তোমার হৃদয়ের মধ্যে! অভিমানের প্রাবল্যে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছ কি?

হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল,"আচ্ছা, দেখা কত্তে এসে আমাদের দেখা না পেলে মোনা কি মনে করবে?"

রমানাথ বলিল, "মনে করবে, আমরা তা'কে এতটা পর ব'লে ভেবে নিয়েছি যে, তীর্থ কত্তে চল্‌লুম, কিন্তু তা'কে একটা কথাও ব'লে এলুম না।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া তীব্র কণ্ঠে মোহিনী বলিল, "তা'কে ব'লে আসবার আমাদের কি দরকার?"

উপেক্ষার স্বরে রমানাথ বলিল, "দরকার এমন কিছুই নাই।"

বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে মোহিনী বলিল, "এতে কিন্তু সে মনে একটু কষ্ট পা'বে নিশ্চয়। আর এটাও বেশ বুঝতে পারবে যে, সে যেমন আমাদের পর ভেবে নিয়েছে, আমরাও তেমনি তা'র সঙ্গে পরের মতই ব্যবহার করেছি।"

রমানাথ বলিল, "এই পরের মত ব্যবহারটাই ত তা'র কষ্টের মূল কারণ হয়ে দাঁড়াবে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মোহিনী বলিল, "কষ্ট হয়, তা'র কি করবো আমরা? নিজেই ত পথ দেখিয়েছে।"

রমানাথ ইহার উত্তরে কিছু বলিল না। সে একটা বিড়ি ধরাইয়া তাহাতে মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিল। মোহিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমাদের ফিরতে কত দিন লাগবে?"

রমানাথ বলিল, "তা'র কি ঠিক আছে? দশ দিনেও ফেরা যায়, আবার দশ মাসও হ'তে পারে।"

যেন ঈষৎ শঙ্কিতভাবে মোহিনী বলিল, "দশ মাস! না না, এত দিন হ'বে কেন? বড় জোর মাসখানেক।"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "ইচ্ছা করলে কালই গয়ার কায সেরে পরশু ফিরে আসতে পারি।"

মোহিনী বলিল, "না না, যখন বেরিয়েছি, তখন

দু'পাঁচ যায়গা না ঘুরে ফিরবো না। এক বার ফিরলে আর কি বেরুতে পারবো ?"

রমানাথ ঈষৎ হাসিয়া বিড়ি টানিতে লাগিল।

গয়ার কায শেষ করিয়া কাশী-যাত্রাকালে মোহিনী বলিল, "হাঁ গা, মোনাকে চিঠি একখানা দিলে হয় না ?"

উপেক্ষাসূচক ললাটকুঞ্চনসহকারে রমানাথ উত্তর করিল, "চিঠি দিয়ে কি হ'বে ?"

মোহিনী বলিল, "ব'লে না আসায় তা'র মনে অবশ্যই কষ্ট হয়েছে। কিন্তু চিঠি একখানা পেলে তবু অনেকটা ঠাণ্ডা হ'বে।"

রমানাথ বলিল, "দেখি, কাশীতে পৌছে চিঠি একখানা লিখবো না হয়।"

মোহিনী বলিল, "সেই সঙ্গে আমাদের ঠিকানাটাও লিখে দিও। কাশীতে ত আমাদের দু'চার দিন দেরী হ'বে। সেই সময়ের মধ্যে তা'র জবাব আস্‌তে পারবে।"

রমানাথ বলিল, "তাই দেব।"

কাশীতে পৌছিয়া রমানাথ মোনাকে পত্র লিখিল এবং তাহার জবাব পাইবার জন্য পাঁচ দিন সেখানে অপেক্ষা করিল। কিন্তু পাঁচ দিনেও যখন জবাব আসিল না, তখন রমানাথ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মোনার চিঠি ত এলো না, তা' হ'লে কি করবে এখন ? জবাবের আশায় এইখানেই ব'সে থাকবে, না এগিয়ে যাবে ?"

উষ্ণস্বরে মোহিনী বলিল, "এখানে ব'সে থাক্‌তে যা'ব কি জন্যে ? তা'র চিঠি না এলো ত তা'তে হ'লো কি ? কালকার দিনটা দেখে এখান থেকে বেরিয়ে যা'ব। মোনা কল্‌কাতায় এসে যখন আমার কাছে আসেনি, তখনই বুঝেছি, মোনা আর সে মোনা নেই। কিন্তু তুমি ত তা' বুঝবে না। তুমি মনে কর, মোনা এখনও আমাদেরই মোনা রয়েছে।"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "তাই বটে, ছোটবৌ, মনই হচ্ছে যত পাপ।"

গম্ভীর মুখে মোহিনী :বলিল, "কিন্তু তীর্থস্থানে এসে আমাদের মোনা মোনা করলে চল্‌বে না, মনটাকে খাঁটি কত্তে হ'বে, মোনার কথা মন থেকে মুছে ফেল্‌তে হ'বে। মোনা কে? সে কি আমাদের স্বর্গের দুয়ার খুলে দেবে ?"

দৃঢ়তাসহকারে কথাগুলা বলিলেও সেই দৃঢ়তার মধ্যে যে খানিকটা অভিমানের অশ্রু নিহিত রহিয়াছে, মোহিনীর ধরা গলায় রমানাথ ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া সে মনে মনে একটু হাসিল।

কাশী, প্রয়াগ, মথুরা ঘুরিয়া রমানাথ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল এবং মোহিনীকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানসমূহ দেখাইতে দেখাইতে বলিল, "তোমার মত মা যশোদাও এইখানে একটি পরের ছেলেকে প্রতিপালন করেছিলেন, ছোটবৌ। তাহার পর ছেলে বড় হয়ে নিজের ঘরে চ'লে গেলে মা যশোদা চোখের জলে এই বৃন্দাবনের পথ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, কেঁদে কেঁদে তিনি অন্ধ হয়েছিলেন।"

শুনিয়া মোহিনীর হৃদয়ে দুঃখের সমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিল। আহা, যশোদাও তাহারই মত অভাগিনী ছিলেন। মোহিনীর উভয় চক্ষু দিয়া অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হইল এবং সে প্রবাহে বৃন্দাবনের ধূলিকণাসমূহ সিক্ত হইয়া যুগযুগান্তরের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি যেন নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিল। জনৈক বাঙ্গালী বৈষ্ণব যমুনার কূলে বসিয়া গাহিতেছিল,—

"ও মা নন্দরাণী তোর নীলমণিরে
হারিয়ে এলাম মথুরায়।
কত ডাকলাম কেঁদে শুন্‌লে না মা
ভাসিয়ে দিলে যমুনায়॥"

গান শুনিতে শুনিতে মোহিনী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কান্দিয়া উঠিল।

দুই মাস কাল ঘুরিয়া উভয়ে কলিকাতা অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে মোহিনী বলিল, "দেখ, আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করেছ, কিন্তু আর একটি অনুরোধ আছে।"

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি অনুরোধ, ছোটবৌ ?"

মোহিনী বলিল, "দেশে যেতে আমার আর ইচ্ছা নাই। যে ক'টা দিন বাঁচি, গঙ্গাতীরেই বাস করবো।"

লিপি

বসুমতী প্রেস। শিল্পী—মণীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

রমানাথ বলিল, "স্বচ্ছন্দে। কিন্তু দেশে না গিয়ে থাক্‌তে পারবে?"

জোর গলায় মোহিনী উত্তর করিল, "কেন পারবো না? দেশে আমাদের কি আছে? কে আছে?"

"মোনা।"

"তা'কে আমি মন থেকে মুছে ফেলেছি।"

"তোমার মনের খুব জোর, ছোটবৌ, আমি কিন্তু এখনও ভুল্‌তে পারি নাই।"

ঠোঁট ফুলাইয়া তর্জ্জনসহকারে মোহিনী বলিল, "ধন্যি যা' হোক মন তোমার! খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রে চিঠি লিখলে যে জবাব দেয় না, মলো কি বাঁচলো, তা'র খোঁজ-খবর পর্য্যন্ত নেয় না, তা'র সঙ্গে আবার সুবাদ কি বল ত?"

মোহিনীর এই তিরস্কার রমানাথ নীরবেই মাথা পাতিয়া লইল।

১১

মঙ্গলা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে মোনা, ঠাকুরপো পশ্চিম থেকে ঘুরে এসে অসুখে পড়েছে না কি?"

মোনা বলিল, "হাঁ, কা'ল কাকাবাবুর চিঠি পেয়েছি। পেটের অসুখে তিনি এক রকম শয্যাগত।"

মঙ্গলা বলিল, "এমন অসুখ, তা' বাড়ীতে এলো না কেন?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া একটু তীব্র কণ্ঠেই মোনা উত্তর করিল, "বাড়ীতে এসে কি করবে? এখানে কে আছে তা'দের?"

মঙ্গলা বলিল, "তা' বটে, আমাদের ত ওরা পরই ভাবে।"

মোনা গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিল। মঙ্গলা বলিল, "তা' তুই একবার গেলি না কেন?"

ভ্রূকুটি সহকারে মোনা বলিল, "আমি গিয়ে কি করবো?"

যেন একটু বিস্ময়ের সহিত মঙ্গলা বলিল, "কি করবি কি রে! তবু যতটা পারিস্, দেখা-শোনা কত্তে পারবি ত। ও বাড়ীর গণেশ ঠাকুরপো বলছিল, মোনার এক-বার যাওয়া উচিত।"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে মোনা বলিল, "আমার যাওয়ায় দরকার?"

ইতস্ততঃ সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মঙ্গলা বলিল, "হক্ কথা বল্‌তে গেলে দরকার আছে বৈ কি, বাছা! ওরা অসময়ে তোকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে ত? তোকে লিখাপড়া শিখিয়েছে, তোর বিয়ে দিয়েছে, কায-কর্ম্ম শিখিয়ে রোজগারের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। ঝগড়ার মুখে যা-ই বলি, কিন্তু ওরা আমাদের করে নাই কি?"

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া রোষপ্রদীপ্ত কণ্ঠে মোনা বলিল, "করেছে সব, কিন্তু খুব অন্যায় কাযই করেছে। সে সময়ে কাকাবাবু যদি আমাদের দিকে ফিরে না চাইতো, ছোটমা যদি ছেলের মত আদরে যত্নে আমাকে মানুষ না কত্তো, তা' হ'লেই ঠিক কায হ'তো না কি?"

মঙ্গলা নীরবে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পুত্রের রোষ-কঠিন মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। মোনা রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তা' হ'লে আজ আমাদের জন্য কাকাবাবুকে দেশত্যাগী হ'তে হ'তো না, তা' হ'লে মানুষের নিমক-হারামীতে কালসাপের দংশনের জ্বালা ভোগ কত্তে কত্তে ছোট-মা এখান থেকে পালিয়ে যেতো না। তা' হ'লে বাড়ী-ঘর সব থাক্‌তে এমন অসুখে কাকাবাবু আজ অনাথের মত বিদেশে অসহায় অবস্থায় প'ড়ে থাক্‌-তেন না।"

মঙ্গলা ধীরে ধীরে মাথা নীচু করিল। মোনা একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত বেদনাকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমাকে যেতে বলছো, মা, কিন্তু আমি যা'ব কোন্ মুখে? আমার জন্যে তাঁ'রা কি কষ্টই না সহ্য করেছেন। কিন্তু আমি তাঁদের করেছি কি? শুধু কষ্টের উপর কষ্টের ভার বাড়িয়ে দিয়েছি। যে কাকাবাবু, যে ছোট-মা মোনা বল্‌তে অজ্ঞান, তাঁ'রা জোর ক'রে আমাকে আলাদা ক'রে দিয়েছিলেন, সেটা কত কষ্টে বল দেখি? আমাকে আলাদা ক'রে দিতে তাঁ'দের বুকে কতখানি আঘাত লেগেছে? প্রথমটা আমি ভুল বুঝেছিলাম, ছোট-মা'র উপর খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু তা'র পর ছোটমা যখন এখান থেকে চ'লে গেলেন, তখন আমার ভুল ভাঙলো, তখন আমি বুঝতে পারলাম, তাঁ'র বেদনা কি

মর্ম্মান্তিক। আর সেই মর্ম্মান্তিক বেদনার মূল অপর কেউ নয়—আমি। এই লজ্জায় কল্‌কাতায় গিয়ে আমি আর তাঁদের কাছে যেতে পারি নাই, আলাদা বাসা কত্তে হয়েছে আমাকে। কাশী থেকে কাকাবাবু চিঠি লিখ্‌লেন, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারলাম না, লিখ্‌তে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগলো। তার পর যে মুহূর্ত্তে শুনলাম, তাঁ'রা পশ্চিম থেকে ফিরে এসেছেন, সেই মুহূর্ত্তেই আমি দেশে পালিয়ে এলাম।"

বলিতে বলিতে মোনার মুখখানা যাতনায় কালি হইয়া আসিল, চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

মঙ্গলা খানিক ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু যে ক'রেই হোক, তা'দের এখানে নিয়ে আস্‌তে হবে, মোনা। পারবি তুই?"

"না।"

"আচ্ছা, আমি পারি কি না দেখ। আমাদের জন্যে যে তা'রা দেশত্যাগী হয়ে যা'বে, তা' হ'তেই পারে না। আমাকে কল্‌কাতায় নিয়ে চল্‌।"

"কিন্তু নিয়ে আস্‌তে পারবে কি, মা?"

"খুব পারবো। না পারি, আমি তোর মা-ই নয়।"

মাতার কথায় মোনার মুখখানা হর্ষসমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

১২

"কাকাবাবু!"

"কে, মন্মথ?"

"আমি মন্মথ নই কাকাবাবু, মোনা।"

মোনা গিয়া রমানাথের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল; জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার অসুখ করেছে, কাকাবাবু?"

সহাস্যে রমানাথ বলিল, "হ্যাঁ, সামান্য পেটের অসুখ। কিন্তু ছোটবৌ ত ভেবেই আকুল; বলে, মোনাকে আস্‌তে লিখে দাও। তা' কই গো, এই নাও, তোমার মোনা এসেছে।"

মোহিনী ছুটিয়া দরজার কাছে আসিয়া মোনাকে দেখিয়াই যেন মুহ্যমানভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। মোনা তাহার দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি একা আসি নাই, ছোট-মা, মা-ও সঙ্গে এসেছেন।"

ব্যগ্রকণ্ঠে মোহিনী বলিয়া উঠিল, "দিদি এসেছেন? কোথায় তিনি?"

"নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।"

মোহিনী হুড়মুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

মঙ্গলা উপরে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোদের আক্কেলটা কি, ছোটবৌ, আমার রুক্ষু মেজাজ, না হয় ঝগড়াঝাঁটিই করেছি, কিন্তু সে জন্যে তোরা দেশত্যাগ করবি, আর পাঁচ জন আমার মুখটা পুড়িয়ে দেবে, বৌ-বেটার কাছে পর্য্যন্ত আমি দোষী হ'ব, এ কেমন কথা বল্‌ ত?"

মোহিনী লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিল। মঙ্গলা তখন রমানাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আর তোমারই বা কি আক্কেল, ঠাকুরপো, ও না হয় মেয়েমানুষ, কিন্তু তুমি কোন্‌ হিসাবে এমন কায করতে গেলে? আমি কি তোমার সঙ্গে কোন দিন ঝগড়া করেছি?"

সহাস্যে রমানাথ বলিল, "তুমি যেমন আমার সঙ্গে ঝগড়া করনি, বৌঠান, তেমনই দেশত্যাগ আমিও করি নাই। যে করেছে, তা'কে দশ কথা শুনিয়ে দাও।"

হাত-মুখ নাড়িয়া মঙ্গলা বলিল, "শুধু কথা শোনাব কি, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যা'ব। যখন আমি নিজে এসেছি, তখন ছেড়ে যা'ব কি? কি লো ছোট-বৌ, ভালোয় ভালোয় যা'বি?"

হাসিতে হাসিতে মোহিনী বলিল, "না নিয়ে গিয়ে যখন ছাড়বে না, দিদি, তখন কাযেই যেতে হ'বে আমাকে। কিন্তু এ কথাও ব'লে রাখি, দিদি, মোনা নিতে এলে কক্ষনো আমি যেতাম না।"

মাথা নাড়িয়া মোনা বলিল, "আমিও বল্‌ছি, ছোট-মা, তোমার মত কঠিন-প্রাণ মেয়েমানুষকে নিয়ে যেতে কক্ষনো আমি আসতাম না।"

কৃত্রিম রোষে মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া চাপা হাসির সঙ্গে মোহিনী বলিল, "তা বলবি বৈ কি রে নিমক্‌হারাম! আমার প্রাণ খুব কঠিন বৈ কি!"

মোনা বলিল, "তোমার প্রাণ যেমন তেমন কঠিন নয়, ছোট-মা, বোধ হয়, লোহা দিয়ে গড়া। তা' নইলে

চিরকালের স্নেহ-সম্পর্ক মুছে ফেলে, আমাকে পর ক'রে দিয়ে তুমি চ'লে আস্‌তে পার কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "ঐখানেই তুই একটু ভুল বুঝেছিস্, মোনা, স্নেহের সম্পর্কে—ভালবাসার দাগ কেউ কখন মুছতে পারে না। তা' যদি পারতো, তা' হ'লে বৃন্দাবনচন্দ্রকে দেখতে গিয়ে মোনাকে দেখে তোর ছোট-মা কখন কেঁদে আকুল হ'ত না।"

মোহিনী লজ্জারক্ত মুখে স্বামীর দিকে তিরস্কারপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। মঙ্গলা বলিল, "ও সব কথা যেতে দাও, আমিও কিন্তু এক কথা ব'লে রাখি, ছোট-বৌ, তোদের নিয়ে যেতে এসেছি ব'লে মনে করিস্ না, ঝগড়াঝাটি আর আমি করবো না। আমি ঝগড়াও করবো, তোকে কাছেও রেখে দেব। তুই না থাক্‌লে আমি কা'র সঙ্গে ঝগড়া করবো বল্ দেখি? এই ক'মাস ঝগড়া কর্‌তে না পেয়ে আমার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে।"

মঙ্গলার কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। সেই আনন্দ-হাস্য-কোলাহলে সকলেরই মনের দুঃখ ও অভিমানের অন্ধকার মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইয়া গেল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সন্ধ্যা

অস্ত যাও দিবাকর—কার্য্য অবসান,
শ্রান্ত জীবকুল যাচে শান্তি তব স্থান।
এস সন্ধ্যা শ্যামাঙ্গিনী, স্বয়ম্ভু-নন্দিনী,
সুখদা-শর্ব্বরী-দূতী, শান্তি-প্রদায়িনী।
শঙ্খের নিস্বন, ঘন ঘণ্টার ঘোষণে,
আগমন-বার্ত্তা তব প্রচার ভুবনে।
ধূপগন্ধ-আমোদিনী, ছায়া-সুশীতলা,
গোধূলি ধূসরা, ঘোরা গলিত-কুন্তলা,
টিপি টিপি চুপি চুপি চরণ-সঞ্চারে—
তারকার দীপ ধরি এস ধরাগারে।
শীতল শিশির-বিন্দু করিয়ে সিঞ্চন,
অলস-সলিলে ক্ষিতি কর নিমগন;
মন্দবায় কিশলয় সঞ্চালি সুধীর—
ঝিল্লীরবে তন্দ্রাগীত গাও সুগভীর।
চল, যথা পথহারা স্রোতস্বতী-সতী,
মৃদুনাদে মরমরি ধীরে করে গতি ;
অশান্ত হৃদয়-বেগ শান্ত করি তা'র,
ভাসি নীরে দাও ধীরে তরঙ্গে সাঁতার।

সরসীর কূলে বসি—বিমল মুকুরে
নিরখ বদন ঘন ছাদন চিকুরে ;
কুমুদের কানে গেয়ে সঙ্গীত আশার—
কাতর কমল নেত্রে ঢাল তন্দ্রাভার।
প্রমোদে প্রমদা হাসি ভাসিতেছে নীরে,
রম্য উপকথা-কথা কহ কিশোরীরে ;
ম্লান মুখে মনোদুখে দিন গেছে বয়ে—
দেখাও মোহিনী ছবি কুমুদ-হৃদয়ে।
প্রেমিক-প্রেমিকা-প্রিয় ফুলে মনোহর,
উপবনে বসি রচ' প্রেমের বাসর ;
পরিমল মাখাইয়ে পাতায় পাতায়—,
বল বুল্‌বুলে গান গাইতে তথায়।
যবনিকা আবরিয়া জীবরঙ্গভূমে,
বিজন শিখরে ব'স কুয়াশার ধূমে ;
প্রশান্ত শান্তির কোলে রাখিয়া ধরায়
কবির ধ্যানের ছবি লেখ নীলিমায়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

'কিশোর প্রেম'

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা?
সে যে অনেক দিনের কথা॥

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখীর মত কম্পিত চুম্বন,
সেদিন নির্জন অঙ্গন॥

তখন ভাষা ছিল না ত ভালোবাসার ভাষা;
শিহর লেগেছিল গায়ে;
বনে প্রথম দখিন বায়ে
চাঁপার কুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা॥

তার পরে সেই তীরে এসে কত কাঁদন কাঁদা।
ওপার পানে যাবার লাগি'
তরীর পাশে ছিলাম জাগি',
কে জানিত উচ্ছ্বসিত তরী ছিল বাঁধা,
মিছে কত কাঁদন কাঁদা॥

সেই সেদিনের আসা-যাওয়া, আধেক জানাজানি;
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
চোখে চোখের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি॥

এই জীবনে সেইত আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি'
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস॥

ওরে ভরা সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার শেষের মানে,
আজ কোথায় উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা,—
সেই শেষ-না-করা কথা॥

ফিরে-যাওয়ার উধাও পাখী সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি'
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর সুরের মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ নবেম্বর
বুয়েনোস্ এয়ারিস্।

হরিণী শিকারী হ'ল নিষাদ শিকার।
প্রেমের অরণ্যে ধন্য প্রকৃতি-বিকার॥
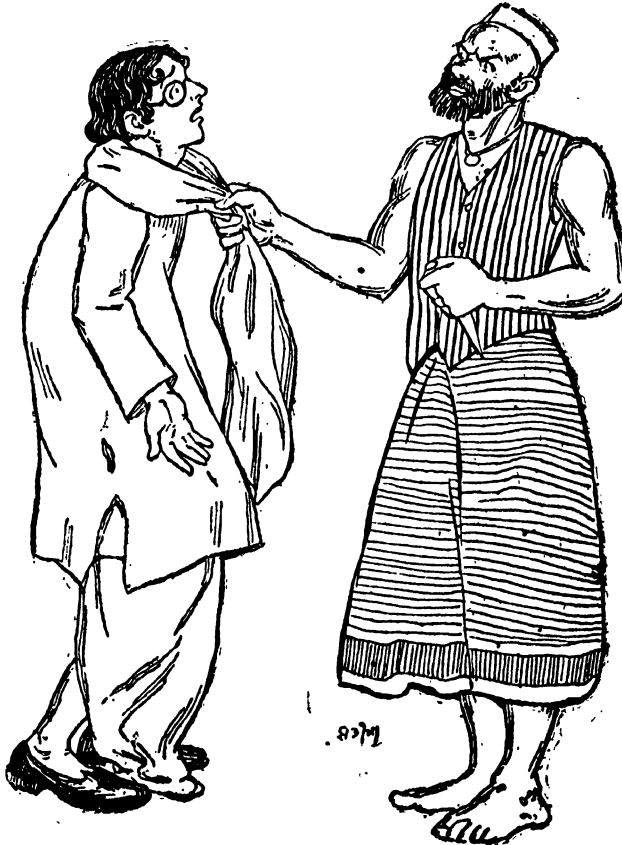
বীররসে ভাসমান কবিতা আমার।
পকেট বাহার মাত্র দেহের আমার॥
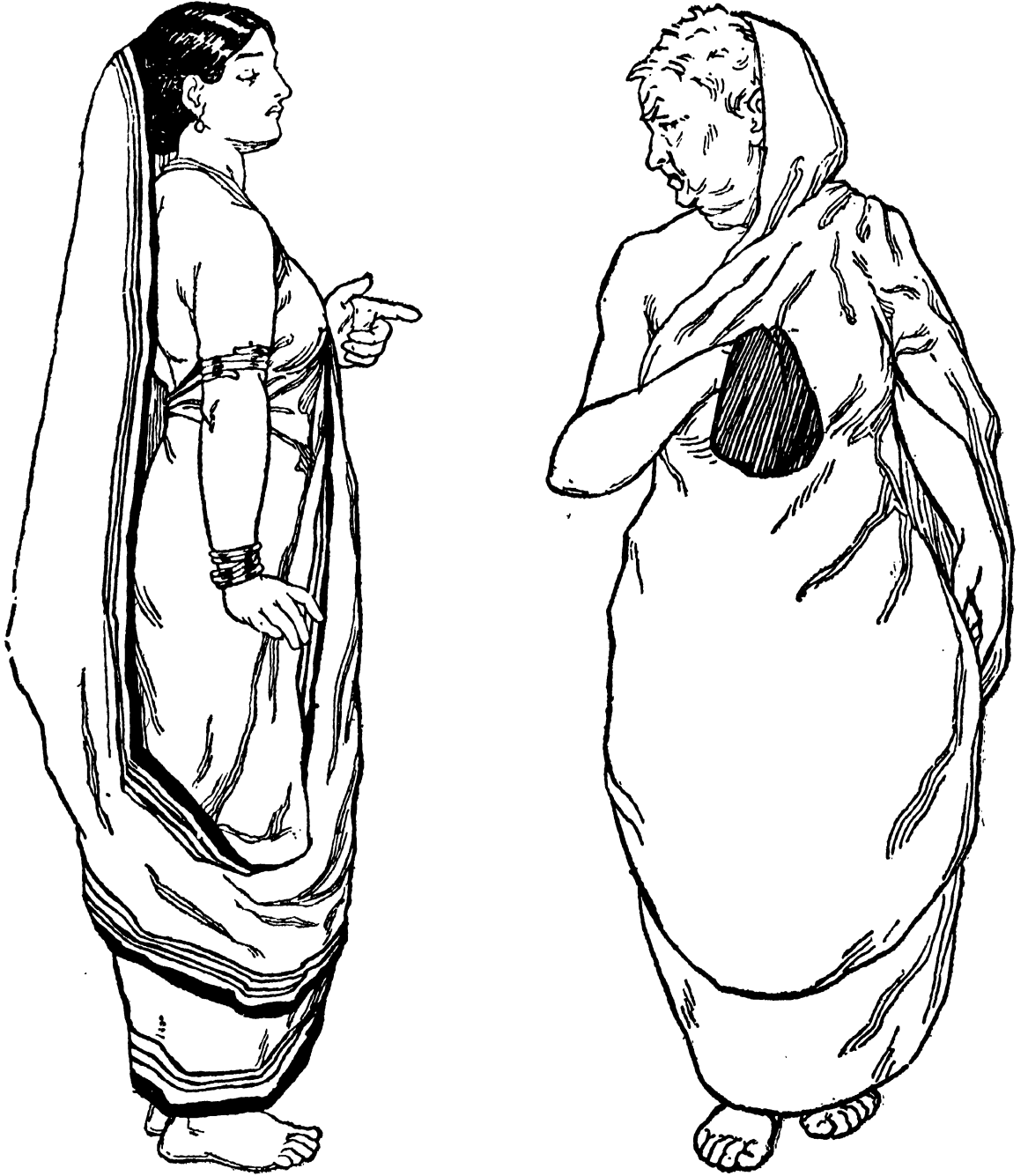
তাড়াইতে চাহে বউ চিতাইয়ে বুক।
জপ লোপ শাশুড়ীর হাঁড়ীপানা মুখ ॥

রঁধা করি করি মোক ফুলি গলা ফুঁড়ি।
দশ টকা কঁড় নিব দিতে হব কুড়ি॥

হার চুড়ী খুলে দাও, ভয় নেই আর।
রেশে বাজী জিতে পা'ব ডবল এবার॥
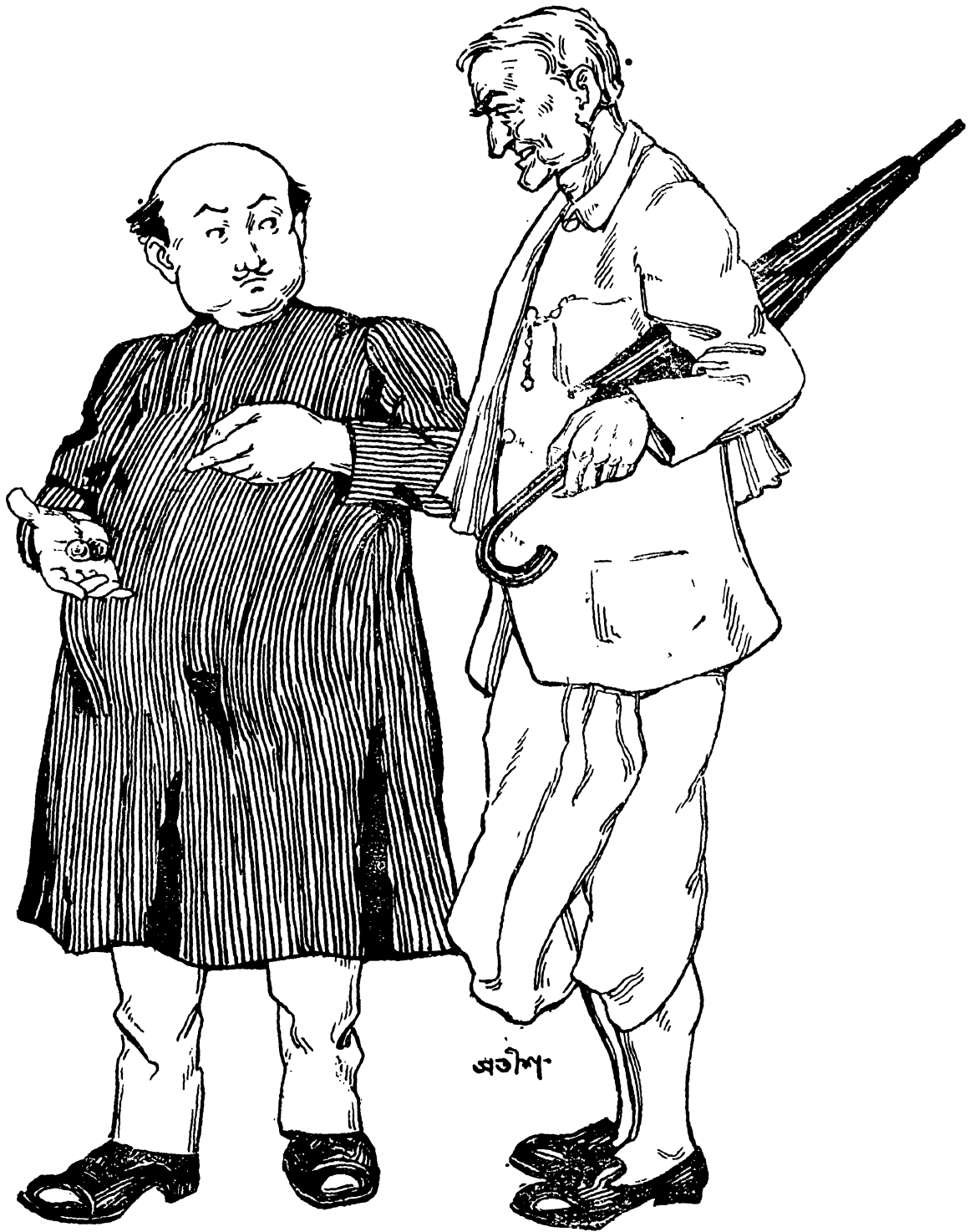
দু'টি টাকা দক্ষিণায় প্ল্যান হ'বে পাশ
হাঁটাহাঁটি ক'রে মর পুরা আট মাস ॥

ভেয়ের বউএর ছিরি নয় তেমন রূপবন্ত।
পদ্মাবতী পিস্‌শাশুড়ী ছিরকুটেছেন দন্ত

ইন্‌সিওর—বুঝেছেন—লাইফ—লাইফ—লাইফ।
উদরীর দেখছি লক্ষণ—বাড়ীতে আছে ওয়াইফ—ওয়াইফ।

কেরাণী পেয়ারী বাবু তেউড়ে গেছে বেঁকে।
বড় বাবুর জামাজোড়া ভুঁড়ি নাড়া দেখে॥
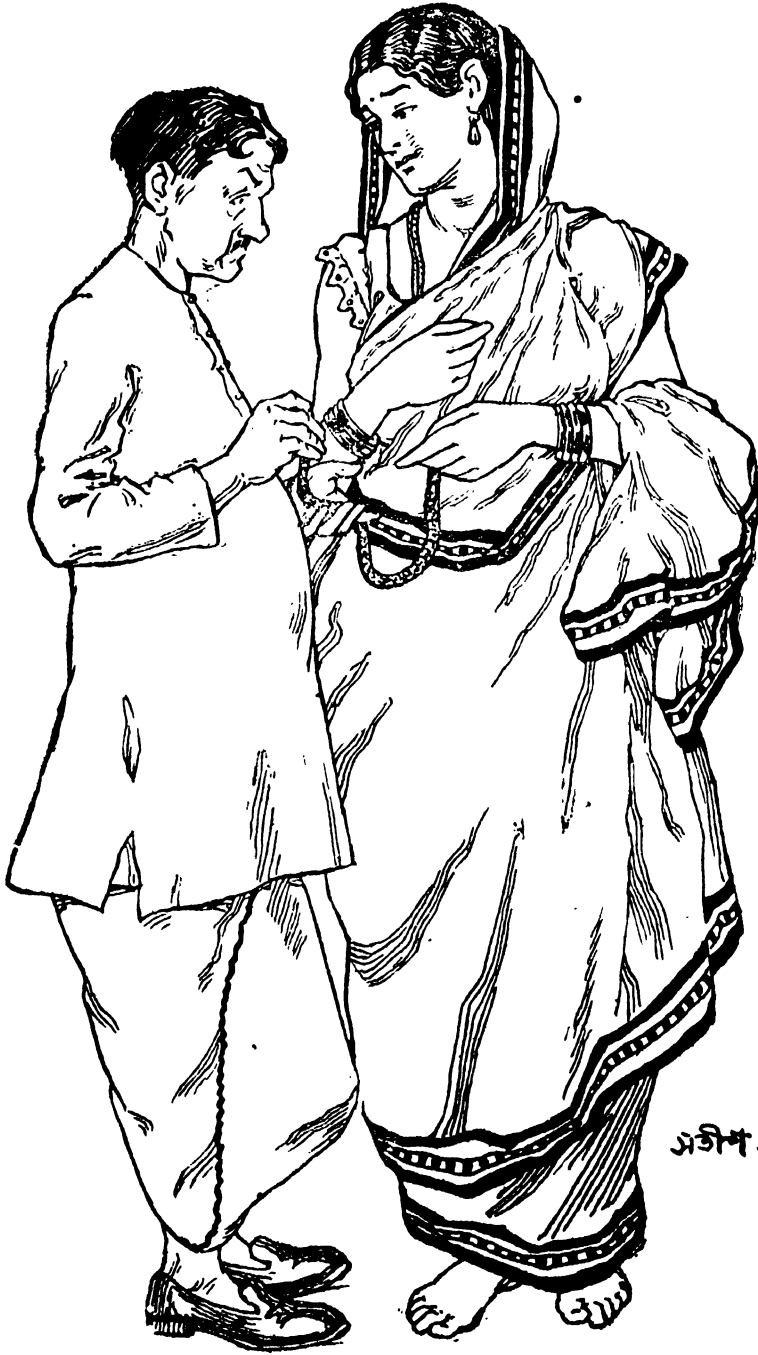
ফর্দ্দে ফর্দ্দে বাড়ছে যত গয়নার তোমার গর্ব্ব।
আপনা-আপনি হচ্ছি যেন আমি প্রিয়ে খর্ব্ব।

কাছা খুলে দাও বেটা! ছটাকখানে ছিটে।
মাষ্টারীতে রিজাইন আজকে তোমায় বেদম পিটে॥

দৈববল ইন্‌জেক্‌সনে ফুলে ওঠে গাল।
এবারে ডাক্তার চালে সার্জ্জারীর চাল॥

আরে বাবু চার আনা! লাও—বার আনা
নেহি ত থাম্‌কা যানে পড়েগা থানা॥

বাই বাই অইচি .মোরা হিঁদু মোছনমান ।
মোর গরি যাতি কেন ডব্বুচ বাবাজান ॥

স্মৃতি

১

সারাদিন টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল।

অসময়ে প্রকৃতির উৎপাতে সকলেই বিরক্ত হয়েছিল; বর্ষার আধিক্য কোন কালেই তেমন সুসহ নহে, তাহার উপর আবার এই অকালে! অল্প অল্প শীতের হাওয়া বইতে সুরু করেছে,আর তা'র সঙ্গে প্রকৃতির এই বিষণ্ণতা সবারই দেহে মনে এমন জড়তা এনে দিয়েছিল যে, কা'রও আর এক পা নড়ে বসবার ইচ্ছা ছিল না। তাই সবাই মিলে ঘরের মধ্যে মহোল্লাসে তাসের আসর জমিয়ে তুলেছিল।

অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরে যত দূর দৃষ্টি চলে, কেবলই কালো আর কালো, সেই কাজল-রাতের নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়েমি দূর করতে একটু বিজলীর রেখাও ছিল না।

ঘরের ভিতরে আসর থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে প্রভাত একা দাঁড়িয়েছিল বাহিরের বারান্দায়। এই মসীমাখা অকাল-সন্ধ্যায় তা'র মন যেন কোথায় চ'লে গেছে। তাই তা'র ঘরে ভাল লাগছিল না।

হঠাৎ পিছনে পদশব্দ শুনে চমকে উঠে পিছনে চাইবামাত্র প্রতিভা ব'লে উঠলো,—"প্রভাতবাবু, আপনি এখানে যে?"

মৃদু হেসে প্রভাত জিজ্ঞাসা করলে,—"তুমিই বা এখানে কেন?"

প্রতিভা জবাব দিলে, "আপনাকে ঘরের মধ্যে না দেখে ভাবলুম, কোথায় গেছেন আপনি, সন্ধান করা যাক। উঃ, কি অন্ধকার! আপনার এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে?"—ব'লে প্রতিভা যেন তা'র উৎসুক দৃষ্টি প্রভাতের দিকে মেলে দিলে।

প্রভাত বল্লে,—"হাঁ, আমার এই নীরবতা আর এই অন্ধকার খুব ভাল লাগছে।"

রেলিঙে ভর দিয়ে প্রতিভা জিজ্ঞাসা করলে—"কেন বলুন তো? শুধু আজকে নয়, আমি আরও অনেক দিন দেখেছি, আপনি মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। সে দিন ত কিছু বলেন নি, আজ কিন্তু ছাড়ছিনে।"

কথাটা ঠিক। প্রভাত মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়ত, তখন কারও সঙ্গ তা'র ভালো লাগত না। আপন মনে বাইরের গেটের কাছে তেঁতুলগাছের তলায় গিয়ে ব'সে থাকত। অনেক দিন সকালবেলা, দুপুরবেলা সে প্রভাতকে এমনই ভাবে ব'সে থাকতে দেখেছে, এক দিন সে প্রভাতকে জিজ্ঞাসাও করেছিল এ সম্বন্ধে; কিন্তু তা'র উত্তরে প্রভাত বলেছিল, কি জানি! সময়ে সময়ে আমার মনে হয়, কিছু ভাল লাগছে না।

সে দিন প্রতিভাকে এইখানেই ক্ষান্ত হ'তে হয়েছিল বটে, কিন্তু কৌতূহল বরাবরই মনে তা'র জেগে ছিল। তাই আজকের এই সান্ধ্য আসরে প্রভাতকে না দেখতে পেয়ে এই রকমই একটা কিছু সন্দেহ ক'রে সে বারান্দায় এসেছিল।

প্রভাত কিন্তু কোন জবাবই দিল না। বাস্তবিক এ সম্বন্ধে তা'র নিজের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না; থাকলে হয় ত বলতে পারতো। কিন্তু এমন অনেক জিনিষ আছে, যা'দের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়,অথচ ঠিক স্বরূপটি ধরা যায় না, তাই তা'রা যেমন কৌতূহল জাগায়, বেদনাও দেয় তেমনই। আবার এক রকম বেদনা আছে, যা'কে ঠিক সখেরই মত উপভোগ করা যায়, তাই সে বেদনার হেতু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার আগ্রহও থাকে না। কাযেই শেষ পর্য্যন্ত কৌতূহলকে হার মান্‌তে হয়; কেন না, সে কৌতূহল মিটলেই এই পরম উপভোগ্য বেদনার উৎস বন্ধ হয়ে যা'বে!

এই বেদনার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইত না ব'লে প্রভাত এ বিষয়ে বিশেষ কোন চিন্তাই করত না। কেবল সময়ে সময়ে যখনই তা'র মনে হ'ত, তা'র কাছে কেউ কোথাও নেই, চারিদিকে কেবল শূন্যতা,—তখনই সে সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিত, কিন্তু এর "কেন"র কথা সে কোন দিনই জিজ্ঞাসা করেনি আপনাকে।

প্রভাতের বাঁ হাত ধরে একটা নাড়া দিয়ে প্রতিভা বল্লে,—"কি, চুপ ক'রে রইলেন যে? বল্‌তেই হ'বে, নইলে আপনার সঙ্গে আড়ি ক'রে দেব, তা' ব'লে রাখছি।"

তা'র সকল কথার মধ্যে এমন একটা সরলতা ছিল যে, তা' প্রভাতের ভারী ভাল লাগত। সাধারণতঃ তা'র বয়সে বাঙ্গালী মেয়েরা যে রকম "গৃহিণী" হয়ে ওঠে, প্রতিভা সে রকম মোটেই ছিল না। এ জন্য অবশ্য তা'কে মাঝে মাঝে তিরস্কার সইতে হ'ত; কিন্তু তা'র অন্তরের অফুরন্ত আনন্দের স্রোতে সে ভর্ৎসনা তার ম'নে কোন দাগ রেখে যেতে পারত না। তা'র মুখের সহজ হাসিটুকু কখনও তা'কে ছেড়ে যেত না।

এ সবই প্রভাতের ভাল লাগলেও প্রতিভাকে কিছুই জানানো সে সমীচীন মনে করলে না। তা' ছাড়া সে জানাবেই বা কি? নিজেই কি সে ঠিক জানে এর কারণ? আর প্রতিভা হয় ত বুঝেবেও না—

প্রতিভা ফের বললে, "শুধু শুধু কেন আপনার মন এমন খারাপ হয়? আমার ত হয় না।"

কখনও কখনও প্রভাতের মনে হ'ত, যদি সে তা'র এই অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য বেদনার কথা কাউকে ব'লে ফেলে, তা' হ'লে হয় ত এর ভার অর্দ্ধেক ক'মে যায়, নইলে সময়ে সময়ে এটা তা'কে অত্যন্ত পীড়া দেয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাউকেই তা'র বলা হয়নি। এখন তা'র একবার মনে হ'ল, ব'লে ফেলে, কিন্তু কি মনে ক'রে একটু হেসে বল্‌লে,—"আমার এক বন্ধুর জন্যে মন কেমন করছে!"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করলে—"তা'কে চিঠি দেন না কেন?"

"চিঠি দিয়ে কি হ'বে?"

"বাঃ! আপনি ত আচ্ছা লোক",—ব'লে একটু হেসে প্রতিভা আবার প্রশ্ন করলে—"কে আপনার বন্ধু?"

"একটি মেয়ে।"

প্রতিভার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে যেন কারণটা আগেই অনুমান করেছিলো, এমনই ভাবে বল্‌লে—"তা'তে আর দুঃখ কি? তা'কে বিয়ে ক'রে কাছে এনে রাখুন না কেন? আর তা' হ'লে আপনার কখনও খারাপ লাগবে না!"

প্রভাত একটু হাসলে মাত্র। কথাটা আগাগোড়া মিথ্যা। বাস্তবিক তা'র কোন মেয়ে-বন্ধুই ছিল না। কেবল প্রতিভাকে শান্ত করবার জন্যে একটা কাহিনী বানিয়ে বলেছিল মাত্র। প্রতিভা সেটা সত্যি ব'লে ধ'রে নিয়েছে দেখে তা'র ভারী আমোদ পেয়ে গেল। সে বল্‌লে—"সে হয় না।"

কেন হয় না? আমাকে বলুন, আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি! দেখুন প্রভাতবাবু, বিয়ে আপনাকে করতেই হ'বে শীগ্‌গীর!"

বিস্মিত হয়ে প্রভাত প্রশ্ন করলে, "কেন বল ত?"

ডান হাতের তর্জ্জনী প্রসারিত ক'রে মাথা নেড়ে প্রতিভা বল্‌লে,—"আমি বল্‌ছি ব'লে!" সে অকস্মাৎ যেন উষ্মা প্রকাশ ক'রে চ'লে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে প্রভাত দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিভার শেষের কথাগুলোর সঙ্গে তা'র এ পর্য্যন্তকার ব্যবহারের এতটা অসাদৃশ্য যে, কোন দিক থেকেই এর কোন অর্থ প্রভাত খুঁজে পেলে না। তা' ছাড়া প্রতিভার কণ্ঠস্বরেও এমন একটা অস্বাভাবিকতা ছিল, যা' তা'কে আঘাত করেছিল। প্রভাতের মন হ'ল, এই কথাগুলোর সঙ্গে প্রতিভার অন্তরের যোগ নেই, তাই সে যতটা তা'কে না হোক, আপনার কথা আপনি বিশ্বাস করতে এত জোর ক'রে কথা ব'লে গেল, যা'র ফলে এই অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি!

কিন্তু কেন এই প্রয়াস? কোন সদুত্তর তা'র মনে এল না, বরং সে দুঃখিত হ'ল এই মনে ক'রে যে, প্রতিভার সঙ্গে রহস্য করতে গিয়ে তা'র মনে সে বেদনা দিলে।

বাইরে তখনও তেমনই অন্ধকার। তাসখেলা সবেমাত্র শেষ হয়েছে; প্রতিভার দাদা অমিয় আগাগোড়া র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বাইরে এসে বল্‌লে—"ওঃ, প্রভাত, বুঝি এখানে? তাই আমি বলি, সে গেল কোথায়! খুব বাহাদুরী হয়েছে, আর হিমে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে না। চল, খাবার যায়গা হয়েছে।"

হাসিমুখে প্রভাত বল্‌লে, "চল।"

২

পরদিন সকালেই আকাশকে বর্ষণক্লান্ত হ'তে দেখে সবাই বল্‌লে—"আঃ, বাঁচা গেল, একে শীতে বাঁচিনে, তা'র ওপর আবার বিষ্টি!"

চা-পান চলছিল, অমিয় বল্‌লে, "ও বেলা নাগাদ আকাশ পরিষ্কার হয়ে যা'বে আশা কর্‌ছি।"

প্রভাত বল্‌লে, "তোমায় তা' হ'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব। বর্ষার দিন হ'লেই আমার ভারী মন খারাপ হয়ে যায়।"

পরিহাসের সুরে অমিয় বল্‌লে, "তোমার যেমন মন। দেখ দিকি, আমরা কা'ল সন্ধ্যার সময়ে কেমন তাসের আড্ডাটি জমিয়ে তুলেছিলুম; আর তুমি গেলে কি না ঠাণ্ডায় বারান্দায় কাব্যি কর্‌তে"—ব'লে সে চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলে।

প্রতিভা ভিতর থেকে এল। সবেমাত্র স্নান ক'রে চুল তা'র এলিয়ে দেওয়া এবং একখানি শাল তা'র গায়ে জড়ান।

"ও সব তোমরা বুঝবে না হে", ব'লে—হাসি হেসে প্রভাত প্রতিভার মুখের দিকে চাইলে।

প্রতিভা বল্‌লে, "প্রভাতবাবুর কথাই ঐ রকম, কেউ কিছু বুঝবে না, আর উনি সব বুঝে ব'সে আছেন। কা'ল রাত্তিরে যখন জিজ্ঞাসা করলুম, বাইরে কেন, বল্‌লেন, বুঝবে না!"

তা'র মৃদু হাসিতে দুষ্টামি মাখানো!

প্রভাত তখন মনে মনে প্রমাদ গণ্‌ছিল। যদি প্রতিভা কালকের কথা ব'লে দেয়, এঁরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর্‌বেন। তখনকার লজ্জা থেকে সে মুক্তি পাবে কিসে? আর কেমন করেই বা সে প্রমাণ কর্‌বে যে, এটা নিছক মিথ্যা কথা! কিন্তু প্রতিভা আর কোনও কথা বল্‌লে না দেখে সে আশ্বস্ত হ'ল।

এবার তা'র মনে হ'ল, না হয়, সে একটু লজ্জাই পাবে, সেটুকু কাটিয়েও দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এতে প্রতিভার উষ্মার কারণটা হয় ত ধরা প'ড়ে যেতে পারে। এই মনে ক'রে সে প্রতিভার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, গত সন্ধ্যার অনুভূতির কোনও চিহ্ন তা'র মুখে আছে কি না, কিন্তু কিছুই দেখতে না পেয়ে সে নিজে থেকে খুঁচিয়ে কোনও কথা তোলা প্রয়োজন মনে কর্‌লে না।

প্রতিভা বল্‌লে—"কিন্তু প্রভাতবাবু, আজ বিকালে আকাশ পরিষ্কার হলেই আমাকে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে যেতে হ'বে, আমি কোন আপত্তি শুনবো না।"

প্রভাত বল্‌লে—"বেশ, আমার কোন আপত্তি নাই; দিন দুই ধরে ব'সে থেকে ত হাঁপিয়ে উঠেছি।"

মনে মনে সে স্থির করলে, যদি বিকালে বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হয়, তা' হ'লে সেই সুযোগে প্রতিভার কাছ থেকে কালকের রহস্যময় আচরণের কারণ জেনে নেবে; কেন না, সে বেশ জানে যে, প্রতিভার যে স্বভাব, তা'তে তা'র কাছ থেকে কথা আদায় ক'রে নেওয়া বিশেষ কঠিন হ'বে না। তবে একটা মুস্কিল হচ্ছে এই যে,প্রতিভা হয় ত তা'র হাল্‌কা মনের হাসির হাওয়ায় তা'র প্রশ্নকে একেবারে উড়িয়ে দেবে; অথবা যদি সে কালকের ব্যবহারের জন্যে লজ্জিত হয়ে থাকে, তা' হ'লে কথাটাকে সে একেবারে চাপা দিয়ে ফেল্‌তে চাইবে। তবে আপাততঃ তা'র আচরণ থেকে সে যে কোন লজ্জা অনুভব করছে, প্রভাতের এমন মনে হ'ল না!

সে নিজের প্রতি একটু বিরক্তও হ'ল এই মনে ক'রে যে, প্রতিভা হয় ত কালকের কথাগুলো একেবারে ভুলেই গেছে, আর সে কেবল মনে মনে সেই কথা আলোচনা ক'রে আপনার অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলছে। কি আর এমন অস্বাভাবিক সে কথাগুলো!

তা' নয় বটে, তবু প্রতিভার কাছ থেকে তাই যে অপ্রত্যাশিত—

প্রতিভার দিদির ছেলে তিনু সেইখানে একখানা চেয়ারে ব'সে পরমানন্দে বিস্কুট ভোজন করছিল; সে এই সময়ে ব'লে উঠলো,—"মাসী, আমিও যা'ব তোমার সঙ্গে বেড়াতে!"

ততক্ষণে প্রভাতের চা-পান শেষ হয়ে গেছে। সে পেয়ালা নামিয়ে রেখে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে প্রতিভার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তা'র উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখ থেকে আপনার আঁখি সরিয়ে নিয়ে প্রতিভা শালের আঁচলটা নিয়ে নাড়াচাড়া সুরু করলে।

তিনু ফের বল্‌লে—"অ—মাসী!"

তা'র কথায় বাধা দিয়ে সহজ কণ্ঠে মুখ না তুলেই প্রতিভা উত্তর দিলে,—"বেশ, প্রভাতবাবু যদি নিয়ে যান, তবে যাস।"

তিনুর আর কোন কথা বলবার আগেই প্রভাত ব'লে

উঠলো, "বেশ ত, তা'র আর কি ! যেয়ো তুমি আমাদের সঙ্গে !"

কা'ল সন্ধ্যার কথাগুলো প্রতিভার মনে ছিল এবং সে জন্যে সে মনে মনে আপনার ব্যবহারে প্রভাতবাবুর মনে কষ্ট দিয়েছে মনে ক'রে লজ্জিত হয়েছিল। প্রথমে সে যখন প্রভাতের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করে, তখন তা'র এ কথা মনে হয়নি, হয় ত প্রভাত তা'কে সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করতে পারে; কিন্তু কথা স্থির হয়ে যাওয়ার পর যখন তা মনে পড়লো, তখন সে একটু বিব্রত হয়ে উঠল। তাই একলা প্রভাতবাবুর সঙ্গে যাওয়া সম্বন্ধে তা'র মনে যেমন একটুখানি দ্বিধা জাগছিল, এমন সময়ে তিনুর যাওয়া ঠিক হয়ে যাওয়াতে তা'র সমস্ত অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে গেল। তা' ছাড়া তা'র মনে এ সব বিষয় বেশীক্ষণ ঠাঁই-ও পেত না।

তবু এ প্রকার দ্বিধা যে আগে কখনও জাগেনি, তা' ঠিক———

তিনু বিস্কুট শেষ ক'রে হাত ধোবার জন্যে লাফাতে লাফাতে ভিতরে চ'লে গেল। সে দিকে চেয়ে প্রভাত বল্‌লে—"ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আমার বড় ভালো লাগে।"

তিনুর পরিত্যক্ত চেয়ারখানা দখল ক'রে প্রতিভা জিজ্ঞাসা করলে—"কেন ?"

কৌতুক করার উদ্দেশ্যে প্রভাত বললে—"সে তুমি বুঝবে না।"

মহা চ'টে প্রতিভা বললে,—"ফের ? আপনার সঙ্গে কিন্তু তা' হ'লে আড়ি !" অমিয়কে এই সময়ে দৃষ্টিক্ষেপ করতে দেখে তা'কে উদ্দেশ ক'রে প্রভাত বললে, "আচ্ছা অমিয়, তোমার কি মনে হয় ?"

অমিয় উত্তর দিলে, "তুমি ত কিছুই বলো নি, আমি কি ক'রে বলব কি মনে হয় ?"

"এই আমি বলছিলুম, ছোট ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে। আমার ত মনে হয়, ওরা আগাগোড়া রহস্যভরা; ঐটুকু ছোট ছোট মনে ওরা যে কখন্ কি ভেবে হাসে, কাঁদে, এটা আমার ভারী আশ্চর্য্য ব'লে মনে হয়।"

অমিয় কিছু বলবার আগেই প্রতিভা ব'লে উঠলো—"প্রভাতবাবুর যত আজগুবি ভাবনা, উনি নিজে কেবল ভাবেন কি না, তাই মনে করেন, সবাই বুঝি কেবল ব'সে ব'সে ভাবে। লোকের ত আর কায নেই।"

ভৎর্সনার স্বরে অমিয় বললে, "না বুঝে কথা কইতে হ'বে না, চুপ কর তুই।" তা'র পর প্রভাতের দিকে ফিরে বললে, "হ্যাঁ, আমারও ছোটদের ভাল লাগে, খুব আদর করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তোমার মত এ সম্বন্ধে আমি কিছু ভাবি নি এ পর্য্যন্ত !"

দাদার বকুনীতে কিছুমাত্র না দ'মে, তেমনই হাসি-মুখে প্রতিভা বল্‌লে—"আচ্ছা, আমি কিছু বুঝি কি না দেখবে ? প্রভাতবাবু, ব'লে দিই ?"

যেন মস্ত বড় একটা রহস্য তা'র কাছে গোপন আছে এবং সে ইচ্ছা করলে এখনই সব ফাঁস ক'রে দিয়ে প্রভাতবাবুকে অপ্রস্তুতে ফেলতে পারে, এমনই একটা ভাব দেখিয়ে প্রতিভা গম্ভীরভাবে পা নাচাতে সুরু ক'রে দিলে।

অমিয় জিজ্ঞাসা করলে,—"ব্যাপার কি হে ?"

হেসে প্রভাত বললে,—"কিছু না, ওর পাগলামী ? আমাকে জ্বালাতন করার মতলব আর কি !"

অমিয় সহাস্যে প্রতিভার দিকে চাইলে। প্রভাতের কথায় প্রতিভার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল বটে, তবে সে মুখে আর কিছু বললে না।

একটু পরে সে উঠে চ'লে যাবার সময় তা'র প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রভাত বললে, 'তোমার বোনটি একটি আস্ত পাগল !"

অমিয় জিজ্ঞাসা করলে,—"কেন ?"

"কেন, ওর ব্যবহারেই কি তা'র পরিচয় পাওয়া যায় না ?"

মৃদু হাস্যে অমিয় বললে,—"হ্যাঁ, বোধ হয়, ওর মাথার কোনো স্ক্রু আল্‌গা আছে।

প্রভাত বললে, "কিন্তু যা-ই বল, ঐ জন্যেই ওকে আমার এত ভাল লাগে। ওর মধ্যে এমন একটা সহজ ভাব আছে,—অবশ্য এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম,—তবে এ বয়সে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মেয়ের এ রকম সহজ ভাব থাকে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

অমিয় একটু হাসলে।

আর সকলে এর অনেক আগেই চায়ের টেবল থেকে উঠে গিয়েছিল।

৩

সকালের কথামত প্রতিভা এবং তিনুকে সঙ্গে নিয়ে প্রভাত বেড়াতে বা'র হয়ে পড়লো। অমিয়কেও সে সঙ্গে যাবার জন্য ডাক্‌ছিল; কিন্তু সে বল্‌লে, ঠাণ্ডা লেগে তা'র শরীরটা এ বেলা ভাল নেই, বের হ'বে না।

বেড়াতে বেড়াতে অনেক কথাই হ'ল তাদের, কিন্তু সকালবেলা প্রভাত যে কথাটি বল্‌বে ব'লে মনে করেছিল, তা' আর বলা হলো না; তা'র কেমন প্রবৃত্তি হলো না। হয় ত সেই কথাগুলো তুলে প্রতিভাকে লজ্জা দেওয়া হ'বে মনে ক'রে।

কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে একটি সামান্য কথাও এমন বিশেষত্ব নিয়ে মনে আসন পেতে বসে যে, তা'কে মন থেকে কিছুতেই দূর করা যায় না। অথচ অন্য কোন সময়ে বললে হয় ত সেই কথারই তেমন কোন সার্থকতা থাকত না। প্রভাতের সেই অবস্থা হয়েছিল; প্রতিভা কা'ল সন্ধ্যাবেলা যে কটি কথা ব'লে চ'লে গিয়েছিল, সেগুলি প্রভাতের তখনকার মনের এমনই একটি অবস্থার দরুণ এমন ক'রে বারে বারে মনের ওপর তলায় ভেসে উঠছিল; অথচ ভেবে দেখলে সে আর এমন বিশেষ কথাই বা কি!

প্রতিভা নিজেও সে দিকে তেমন গেল না। একবার-মাত্র ঠাট্টার ছলে কথাটা তুলে প্রভাতের কোন সায় না পেয়ে চুপ ক'রে গেল। দু'জনের মধ্যে কিছুক্ষণ আর কোনো কথা হ'ল না।

তিনু ততক্ষণ তা'র অর্থহীন হাজার প্রশ্নে প্রতিভাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলছিল। তা'কে বিরক্ত হ'তে দেখে তিনুকে ডেকে প্রভাত বল্‌লে,—"এস, তিনু, আমার কাছে এস। তোমার মাসী ভারী দুষ্টু।"

প্রতিভা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, "ইস, নিজে ভারী লক্ষ্মী কি না!" তা'র পর আবার তা'দের মধ্যে আরম্ভ হ'ল কত কি কথা। প্রতিভার আচরণে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। প্রভাতও আপাততঃ আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ ক'রে নিঃশেষে নিজেকে খুসীর স্রোতে ছেড়ে দিলে।

সে দিন রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে প্রভাতের হঠাৎ ভারী হাসি পেয়ে গেল—প্রতিভাকে কেমন ক'রে তা'র মেয়ে-বন্ধু সম্বন্ধে একটা মিথ্যা গল্প রচনা ক'রে বলেছে মনে ক'রে। ঘুম আসার আগে অনেকক্ষণ আকাশ-পাতাল চিন্তার মাঝে হঠাৎ এই কথাটা মনে প'ড়ে যাওয়ায় সে ভারী আমোদ বোধ করলে।

প্রতিভা কি ছেলেমানুষ! যেমন সে একটা গল্প বানিয়ে বললে, অমনই সে তা বিশ্বাস ক'রে বস্‌লো! কিন্তু এই জন্যেই যে তা'র প্রতিভাকে ভালো লাগে। সে যদি অন্য রকমের হ'ত, তা' হ'লে হয় ত তা'র এত ভাল লাগত না; কিংবা হয় ত অন্য রকম ভাবে ভালো লাগত।—কিছুই বলা যায় না! তবে বর্ত্তমানে তা'কে এই রকমেই খুব ভাল লাগে। এ কথা প্রভাত আপনার কাছে বারে বারে স্বীকার করলে।

যা' থেকে তা'র মিথ্যা কাহিনীর উদ্ভব, সেই কথা মনে করতে গিয়ে প্রভাতের মনে হ'ল, বাস্তবিক এর কারণ কি? সে তা'র এক বন্ধুকে এক বার এই কথাটা জানিয়েছিল, তা'তে সে উত্তর দেয়,—একটা বিয়ে ক'রে ফেল হে! তা' হলেই ও সব বায়ুরোগ সেরে যাবে।

এই অনির্দ্দেশ্য বেদনার আনন্দ ছিল তা'র গোপন সম্পদ। তাই এত দিন জোর ক'রে নিজেকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে এই আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত করতে চায় নি; কিন্তু আজ সকল রকম ভাব-প্রবণতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তলিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে গিয়েও প্রভাত কিছুই কিনারা ক'রে উঠতে পারলে না। তা'র মনে হ'ল, যদি সত্যিই তা'র কোন বন্ধুর জন্যে মন খারাপ হয়ে থাকৃত, তা' হ'লে ভাল হ'ত; সে অনিশ্চয়তার চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যেত। তা'র পরে তা'র মনে প'ড়ে গেল, তা'র বন্ধুর পরিহাসের ছলে বলা বিয়ের কথা; সত্যিই কি তা'র জীবনে এক জন সঙ্গিনীর এত প্রয়োজন হয়েছে যে, তা'র নিজের অজ্ঞাতসারে অন্তরে বিরাট ক্ষুধা জেগে উঠে এমন ক'রে তাকে পীড়া দিচ্চে?

এ কথাটা সে এত দিন মোটেই ভেবে দেখেনি, তাই তা'র প্রশ্নের এমন একটা রমণীয় দিক খোলা পেয়ে তা'র তরুণ মন খুসী হয়ে উঠলো। সে বারে বারে এ কথাটি মনে তোলাপাড়া করতে লাগলো। মানুষের স্বভাবই

এই যে, মনে কোন প্রশ্ন জাগলে তা'র এক রকম উত্তর না স্থির ক'রে কেউ থাক্‌তে পারে না। এই উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর ঠিক করতে গিয়ে প্রভাতের মনে তা'র কল্পিত মেয়ে-বন্ধুর কথা আর বিয়ের কথা এই দুইয়ে যেন মিশে গেল। তা'র মনে হ'ল, সত্যি যদি তা'র কোন বন্ধু থাকতো—যাকে সে ভালবাসে, তা' হ'লে তা'কে তা'র জীবনের সঙ্গিনী ক'রে আনলে এই বর্ত্তমান মনের অবস্থা থেকে সে মুক্তিলাভ পেত হয় ত।

মনকে ক্রমাগত একটা জিনিষ বোঝাতে থাক্‌লে শেষে আর কষ্ট ক'রে তা' বোঝাবার দরকার হয় না, মন আপনি তা'কে জেনে নেয়। তাই যখন এই ব্যাপারকেই প্রভাত তা'র বর্ত্তমান শূন্যতার অনুভূতির কারণ ব'লে স্থির ক'রে নিলে, তখন মন খানিকটা ছাড়া পেয়ে হাল্‌কা হয়ে গেল। কিন্তু ফিরতি পথে চিন্তাধারা আবার তা'কে প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত আপনার মধ্যে এমন একটা তথ্যের আবিষ্কার ক'রে ফেললে, যাতে আপনি স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রতিভাই যদি সেই বন্ধু হয়, আর সে যদি তা'কে ভালোবাসে——

যদি ভালবাসে, তা' হলে কি?

কি যে, তা'র স্বরূপ ঠিক ধরতে তা'র সাহস হ'ল না, কেবল হঠাৎ পাওয়া এই খবরটি তা'র মনকে যেন কানায়-কানায় পূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল।

আর প্রতিভা? তা'র খুসীর আলোভরা জীবনে কি তা'র কোন ছায়া পড়েছে? কে জানে! নারী-রহস্যের সে কোন দিনই খোঁজ রাখে না, কাযেই সে বুঝবে কি ক'রে! তা'র এ পর্য্যন্তকার সমস্ত ব্যবহার যতদূর মনে পড়ল, সব প্রভাত মনে মনে আলোচনা ক'রে দেখলে; কিন্তু কোন হদিস্ পেলে না। এই কা'লই ত সে তা'কে তা'র কল্পিত মেয়ে-বন্ধুর কাহিনী বিশ্বাস ক'রে কত পরিহাস ক'রে গেল। কেবল প্রতিভার সেই কথাগুলো সম্বন্ধে তা'র যে খটকা লেগেছিল, সেটা থেকেই গেল; সেখানটা সে বেশ গুছিয়ে উঠতে পার্‌লে না। এক বার তা'র মনে হ'ল, হয় ত সে তা'র মেয়ে-বন্ধুর জন্যে মন খারাপ থাকার কথা বলায় প্রতিভা ঈর্ষ্যাবশে অত ঝাঁঝের কথাগুলো ব'লে ফেলেছিল। তা' যদি হয়, তা' হ'লে প্রতিভা ত ভালবাসে!

এই সিদ্ধান্তটি অতি মনোরম হলেও সে মান্‌তে রাজি হলো না; প্রতিভা সম্বন্ধে তা'র ধারণা তা' হ'লে অনেকটা খারাপ হয়ে যায়, প্রতিভা যে সামান্য কথায় বিচলিত হয়ে পড়ে, এ কথা তা'কে বিশ্বাস কর্‌তে হয়। তাই তলে তলে এই সিদ্ধান্তটি তা'র অন্তরের খুসীর পরিমাণ বাড়িয়ে তুল্‌লেও ওপর থেকে সে এটাকে চাপা দিয়ে রাখলে; এবং সে যে নিজে প্রতিভাকে ভালবাসে, এই সত্যটি উপলব্ধি ক'রে পরম খুসীতে পাশ ফিরে শুলে।

তা'র ব্যথার আনন্দ সে হারিয়ে ফেল্‌লে বটে, কিন্তু তা'র বদলে এতখানি আনন্দ সে আজ পেলে যে, আগেকার আনন্দ এর কাছে তুচ্ছ ব'লে তা'র মনে হ'ল।

৪

পাঁচ বছর পরে।

বছর চারেক হ'ল, প্রতিভার বিয়ে হয়ে গেছে। তা'র স্বামী রাজ-সরকারে বেশ পদস্থ কর্ম্মচারী, দিল্লী, সিমলা তাঁ'র আফিস, তাই প্রতিভা এখানকার সমস্ত সম্বন্ধ থেকে প্রায় বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। প্রভাতবাবুরও আর কোন খোঁজ সে পেত না; কেবল এক বার সে শুনেছিল, তিনি কল্‌কাতাতেই কি যেন কায করেন এখন।

শৈশবের সজীবতা-ভরা দিনগুলি থেকে স'রে সুদূর প্রবাসে ব'সে প্রথম প্রথম প্রতিভার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হ'ত। কত কি যেন পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এবং হাজার ইচ্ছা কর্‌লেও আর সেই পরিবর্ত্তনের স্রোত ফেরান যায় না;—এমনই একটা চিন্তা তা'কে কেবল পীড়িত ক'রে তুলত। তা'র ওপর প্রভাতের স্মৃতিও অতি অকারণেই যেন তা'র বেদনাকে বাড়িয়ে দিত।

তা'র পর ক্রমে সব গা-সহা হয়ে এলো। বিশেষতঃ যে দিন খুকী তা'র কোলে এলো, সে দিন থেকে সে যেন খুকীর মধ্যে তা'র সমস্ত শৈশবকালটাকে ফিরে পেয়ে বিহ্বল হয়ে গেল এবং ক্রমে সেই বিহ্বলতার মাদকতা ধীরে ধীরে গভীর আনন্দে পরিণত হয়ে তা'র সমস্ত ক্ষতির বেদনা দূর ক'রে দিল।

অতীতকালটা তখন তা'র কাছে উপভোগের বস্তু হয়ে দাঁড়ালো।

* * * * * *

অনেক দিন পরে সে বাপের বাড়ী এসেছে। সে দিন সে বিকেলবেলা শোবার ঘরে বিছানা পেতে

রাখছে, এমন সময় তিন্নু ছুটতে ছুটতে এসে তা'কে খবর দিলে,—"মাসী, প্রভাতবাবু এসেছেন।"

মুহূর্ত্তকাল প্রতিভার মুখ থেকে কোন কথা বা'র হলো না; তা'র পর সে সহজ কণ্ঠে বল্‌লে;—"দাদা নীচে নেই?"

"না; মামা কোথায় বেরিয়েছে; আমি তাঁ'কে ডেকে আনি?"—তা'র যেন আর দেরী সইছিল না।

বিছানার চাদরের একটা দিক গুটিয়ে ছিল, সে দিকটা সমান ক'রে দিতে দিতে প্রতিভা বললে,— "আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।"

প্রভাত ঘরে ঢুকে নমস্কার ক'রে বললে,—"ভাল আছ ত' প্রতিভা? অনেক দিন তোমার সহিত দেখা হয় নি, তাই সে দিন অমিয়র কাছে তুমি এসেছ শুনে এক বার দেখা করতে এলুম।"

মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে প্রতিভা জিজ্ঞাসা করলে,—"কিন্তু আপনাকে অমন শুকনো দেখাচ্চে কেন? অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?"

হেসে প্রভাত বল্লে, "বালাই, অসুখ করবে কেন? তবে কি জান, পরের চাকুরী ক'রে জীবন কাটাতে হ'লে শরীরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়ে উঠে না। তা' ছাড়া নিজের যত্ন আমি কোন দিনই করতে পারি নে।"

কি একটা কথা প্রতিভার মুখের গোড়ায় এসে অনুচ্চারিত রয়ে গেল। সে পরিহাসতরল কণ্ঠে বল্‌লে,— "বিয়ে করেন নি?"

প্রভাত বললে,—"এইবার ঠিক বলেছ! নিজেই খেতে পাই নে, তা'র ওপর আবার—"

এই সময়ে দাসী খুকীকে কোলে নিয়ে এসে বললে, "মা, খুকী বড় কাঁদচে, আপনি একে নাও।"

উৎসুক হয়ে প্রভাত প্রশ্ন করলে,—"এটি তোমার মেয়ে নাকি? দেখি, দেখি!"

সে হাত বাড়িয়ে দিলে। মৃদু হেসে প্রতিভা "হ্যাঁ" ব'লে খুকীকে ঝির কোল থেকে নিয়ে প্রভাতের কোলে দিতে গেল, কিন্তু সে মা'কে জড়িয়ে ধ'রে রইলো।

প্রভাত বললে,—"বোকা মেয়ে, মামাকে চেনো না।" একটু পরে সে কৌতুকভরে বললে,—"এক দিন তুমি বড় জোর ক'রে বলেছিলে যে, আমি বিয়ে করবই; সেই জন্যেই বোধ করি ওটা হয়ে ওঠে নি!"

প্রতিভা কোন উত্তর দিল না।

এর কিছুক্ষণ পরেই অমিয় এসে বললে,—"এই যে প্রভাত, কতক্ষণ এলে?"

"এই খানিকক্ষণ।"

এদের দু'জনকে কথা কইবার অবসর দিয়ে প্রতিভা খুকীকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই একথালা জলখাবার এনে হাজির করলে; বললে, "প্রভাতবাবু, অনেক দিন বাদে দেখা হ'ল, একটু মিষ্টিমুখ করুন; নইলে আবার ঝগড়া হ'বে।

হেসে প্রভাত অমিয়র দিকে চেয়ে বললে,— "প্রতিভার কাণ্ডটা দেখেচো একবার! এত কখন এক জন লোক খেতে পারে?"

খাবারের থালাটা প্রভাতের সামনে রেখে দিয়ে ডান হাতের তর্জ্জনী প্রসারিত ক'রে প্রতিভা বললে, "খুব খেতে পারে। এ ত খেতেই হ'বে, তা' ছাড়া পরশু সকালে আপনার নেমন্তন্ন রইলো এখানে,"—ব'লে সে যেন সম্মতির অপেক্ষায় দাদার দিকে চাইলে।

অমিয় বললে,—"সে ত ভালই।"

গম্ভীর মুখে প্রভাত বললে, "আপাততঃ এগুলো না হয় উদরস্থ করার চেষ্টা করা যাচ্ছে, কিন্তু পরশু সকালে আস্‌তে পারবো কি না, ঠিক বলতে পারছি নি।"

ঝঙ্কার দিয়া প্রতিভা ব'লে উঠল,—"কেন, কি এত কায আপনার! ও সব শুনচিনে, আসতেই হ'বে।"

প্রভাতের কানে যেন বহুদিনের বিস্মৃত কোন সুর আবার আজ বেজে উঠলো। সে চুপ ক'রে রইলো।

প্রতিভা ফের বললে,—"শুনচেন! ও সব শোনা হ'বে না। দাদা, তুমিও বল না একবার।"

অমিয় কোন কথা বলবার আগেই প্রভাত হেসে বললে,—"আচ্ছা, আচ্ছা, হার মান্‌ছি! আসবো।"

প্রভাত চ'লে যাওয়ার পর খুকীকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে সে যে আজও বিয়ে করেনি, এই কথাটা প্রতিভার মনে প'ড়ে মনকে এক অকারণ, অনির্ব্বচনীয় খুসীতে ভরে দিলে। সে আনন্দের রসে ঘুমন্ত খুকীর মুখে চুমা দিয়ে গভীর স্নেহে তা'কে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

শ্রীজলধর সেন।

আদর

বসুমতী প্রেস — শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

ঝড়ের রাতে

১
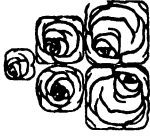
উজ্জ্বল প্রশস্ত দিবালোক। কারাগৃহের চারিধার হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহলের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রকাণ্ড ভারী দরজাগুলা সজোরে মুক্ত ও রুদ্ধ করিবার শব্দে, চাবীর ঝনঝন্ আওয়াজে, রূঢ় কণ্ঠের চীৎকারে চারিধার মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল; নীরস কঠোর পাষাণ-গৃহে এই সকল কোলাহলেরই সহিত সম্মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে আরও একটা ধ্বনি ভাসিয়া উঠিতেছিল, সেটা কঠিন কারা-জীবনে অভ্যস্ত বন্দীদিগের কাহারও কাহারও উল্লাস-সঙ্গীত ও আনন্দ-কোলাহল।

কারাগারের মাঝখানে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ; তাহার চারিপাশে পায়রার খোপের মত ছোট ছোট জানালা দেওয়া অসংখ্য কুঠরী; প্রত্যেক কুঠরীর সামনের অপ্রশস্ত ছোট্ট একটুখানি দালানের মাঝে মাঝে দেওয়াল দিয়া পরস্পর হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। আর এই সমস্তটাই দুর্গ-প্রাচীরের মত সুদৃঢ় ও উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

উত্তর সারির একটা বন্দিগৃহের মধ্যে নিজের বহু দিনের অধিকৃত অপ্রশস্ত বিছানার এক প্রান্তে ১২৭ নম্বরের কয়েদী সদানন্দ দাস উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া ছিল। চারিদিকের ঐ পরিচিত রাগিণীর ঝঙ্কারগুলি তাহার কর্ণকুহরে যেন প্রবিষ্টও হইতেছিল না, আর প্রবেশ করিলেও সে সকলের অর্থ যেন আজ তাহার চিত্ত উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না। ঐ সকল প্রাত্যহিক মিশ্র কলরবকে চাপিয়া ফেলিয়া এক অখণ্ড বিচিত্র সঙ্গীতের সুর তাহার সমুদায় হৃদয় ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল;—আজ সে মুক্তি পাইবে! ওই যে লৌহদ্বার দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে, উহা উদ্‌ঘাটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আজ সে এখান হইতে মুক্তি পাইবে। মুক্তির মূল্য দেওয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে যেন এই কথাটাকে এখনও ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে, সত্য সত্যই এই সুদীর্ঘ দিনের অধিবাসিত কারাগৃহে তাহার এই শেষ ঘণ্টা কাটিতেছে। এমনই অসম্ভব এ কথা।

হ্যাঁ, এতই ইহা অসম্ভব। এমন সময় ছিল, যখনকার সমস্ত দিনের, রাত্রির, মাসের ও বৎসরের মধ্যে এক বারেরও জন্য সে নিজের মনকে আজিকার এই দিনের জন্য প্রস্তুত করিতে ভরসা দিতে পারে নাই। ঐ দিন যে এ জীবনে আবার কখন দেখা দিবে, সে ভরসার ছায়াও তাহার হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইত না। আনন্দাতিশয্যে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, জীর্ণ শয্যার উপর সে হতাশ হইয়া যে ভাবে কত দিন ঢলিয়া পড়িয়াছে, তেমন করিয়াই শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকা দিল।

মুক্তি! মুক্তি! সত্যই কি সে মুক্তি পাইবে? আর একটি ঘণ্টা পরেই সে বাহিরের উন্মুক্ত উদার বিশাল আকাশের তলায়, স্নেহ-মায়া-প্রেম-প্রীতিভরা অপরূপ সুন্দর পৃথিবীর মধ্যে গিয়া তাহারই আর এক জন হইয়া দাঁড়াইবে? আলো ও সূর্য্যের তাপ সুপ্রচুরভাবে উপভোগ করিতে পারিবে? পাখীর গান, শিশুর হাসিকান্না, যুবক-যুবতীর মান-অভিমান, বৃদ্ধের আশীর্ব্বচন যে পৃথিবীর বুকের উপর স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঝরণার মতই নিরবধি ঝরিত ক্ষরিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে তাহারও অতটুকু একটুখানি স্থান মিলিবে? আঃ, সত্য এ কথা!

সহসা এই সুখ-চিন্তার মাঝখানে সদানন্দ ঈষৎ ম্লান হইয়া পড়িল। সহসা মনে হইল, এই যে দীর্ঘকাল সে সেই আনন্দময়, আলোকময়, জনকোলাহলময়, সজীব জগৎ হইতে এই নিরালোক, নিরানন্দ, হতাশাপূর্ণ, প্রাণহীন জীবলোকে স্থান লইয়াছে, ইহার বাহির হইয়া আর কি সে সেই তাহার পুরাতন স্থানে ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে? আর কি,—

কিন্তু কেনই বা পারিবে না? তাহার বয়স এখন এই পঁয়ত্রিশ, আর সে ত এই সবে দশ বৎসর তিন মাস মাত্র এখানে আসিয়াছে। দশ বৎসর তিন মাস মাত্র! সদানন্দের শুষ্ক অধরপ্রান্তে এক ফোঁটা তীব্র বেদনার হাস্য অত্যন্ত ক্ষীণভাবে প্রকটিত হইল। মাত্র দশ বৎসর তিন মাস। এই দশ বৎসর তিন মাস যে তাহার জীবনের দশটি হাজার তিন শত বৎসর! প্রথম যখন সে এইখানে আসিয়াছিল, তখনকার কথা মনে পড়িল।

প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি তখন তাহার কাছে কি অসহনীয়ই বোধ হইয়াছিল! প্রতি নিমিষেই মনে হইয়াছে, আর কিছুক্ষণ এখানে থাকিলে সে উন্মাদ হইয়া যাইবে। একটি প্রহরকে একটি যুগ বলিয়াই সে দিনে বোধ হইত এবং প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টার ঘড়ীর বাজনা শুনিতে পাইলেই সে মনে মনে এই ভাবে হিসাব করিতে বসিত।

এই ত আধ ঘণ্টা গেল, ইহার পর আবার এতখানি সময় লইয়া আর আধ ঘণ্টা গেলে এক ঘণ্টা হ'বে, তাহার পর আবার আধ ঘণ্টা, আবার আধ ঘণ্টায় এক ঘণ্টা। এমনই ক'রে আটচল্লিশ বার হ'লে একটা দিনরাত্রি কাটবে। তেমনই ক'রে একটির পর একটি ক'রে দিন-রাত কেটে কেটে এক একটি হপ্তার শেষ হ'বে। চারটি ক'রে ক'রে হপ্তা কেটে একটি মাস। তা'রপর আবার—আবার—আবার সেই রকম চল্‌তে থাক্‌লো, দুই মাসে এক এক ঋতু; এই ভাবে,—বর্ষার পর শরৎ, তা'র পর শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, এমনই ক'রে একটি বৎসর পূর্ণ হ'বে। এই এত দিন ধ'রে যে বৎসর হ'বে, সেই বৎসরের দশ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই—তাহার পর আরও তি—ন—মা—স। ওঃ ভগবান্! এ কি কখন সহ্য হয়? না, না, এ জন্মে আর কখন এই মুক্তির মুখ দেখা কপালে নাই! অসম্ভব এ মুক্তি পাওয়া!

কিন্তু ইহাও সহিয়া গেল। সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতি দেবী তাঁহার স্বভাবজ বৈচিত্র্য দিয়া যেমন জগতের সকল বস্তুজাতকে, তেমনই মানব-প্রকৃতিকেও গঠিত করিয়াছেন, তাই বুঝি মানুষেরও প্রাণে সকল সহে এবং শুধুই যে সহ্য হয়, তাহাই নহে; সে স্বভাবতঃই আবার সকল অভ্যাসেরই একান্ত দাস হইয়া পড়ে। সদানন্দও তাহার জীবন হইতে এই বিচিত্রতার অধিকারকে ছাড়াইতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, সে-ও সবিস্ময়ে দেখিল যে, এই ঘৃণা ও বিভীষিকাপূর্ণ কারাজীবনে সে-ও যেন ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, উহারই ভিতরে আবার ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ অনুভবও করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তাহার এই কারাদণ্ড সপরিশ্রম। তাই তাহাকে সারাদিন ধরিয়াই প্রায় কায করিতে হইত। প্রথম কিছুদিন তাহাকে ঘানি টানিতে হয়। সর্ব্বপ্রথম দিন গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে ঘানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তাহার ফলে কয়েক দিন হাঁসপাতালে বাস করিয়াছিল। উঃ, সে কি ভীষণ স্থান! অপরিচ্ছন্ন শয্যা, চারিদিক হইতে একটা রোগযন্ত্রণার ক্লিষ্ট আর্ত্ত-নাদ, রোগের ও ঔষধের উৎকট একটা দুর্গন্ধ। কিন্তু তাহার পর যখন আরোগ্য লাভ করিল, তখন সেই ভীষণ স্থান হইতে ফিরিতেই কি আতঙ্ক! আবার সেই নিদারুণ গুমোটের ভিতর শ্বাসরোধকর ভীষণ পরিশ্রম! উপায় কি? তখন অল্পবয়সে, সুস্থ শরীরে রোগ ত আর চাপিয়া বসিতে পারে না, কাযেই সে দুই দিনে ছাড়িয়া গেল! কাযেই হাঁসপাতাল ছাড়িতে হইল, আবার সেই বন্দিশালার রুদ্ধ কক্ষ! সেই নিজেরই দুর্ভাগ্যের স্মৃতি-তাপতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে উত্তপ্ত বায়ু সে কক্ষকে ভরাইয়া রাখিবে, নিরাশার—হতাশার তীব্র বৃশ্চিকদাহে বক্ষ ক্ষণে ক্ষণে ছিঁড়িয়া কাটিয়া পড়িতে থাকিবে, এমনই করিয়া দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। শুধু তাই নহে, পল, দণ্ড, প্রহর গণনা করিয়া করিয়া দিন কাটান। আর সেই সঙ্গে—উঃ, কি সে ভয়ানক পরিশ্রম! আর কি সে অমানুষিক লাঞ্ছনা! ভাবিতে গেলে মাথার ভিতর দিয়া আগুন ছুটিতে থাকে; উত্তেজনায় সর্ব্বশরীরের শিরাসমুদয় দপ দপ করিয়া উঠে। অথচ সেই উত্তেজনার এতটুকুর বহিঃপ্রকাশের উপায় নাই! তাহা হইলেই তখনই লাঞ্ছনার একটা প্রবল ঝড় উঠিয়া পড়িবে। উপায় নাই, কোনই উপায় নাই; শরীরে না বহিলেও ঠিক ঐ একই ভাবে খাটিতে হইবে, মনে না বহিলেও ঠিক সেই একই অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া সকলই তাহাকে সহিতে হইবে। কারণ, সে যে অপরাধী, সে যে বন্দী।

তাহার পর ক্রমশঃ ইহাও যেন কতকটা সহিয়া আসিল। এই সময় ঘানিটানা বন্ধ করিয়া দিয়া জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে অন্য কাযে নিয়োজিত করিলেন। কিছু দিন করাত দিয়া বড় বড় কাঠের গুঁড়ি তাহাকে চিরিতে হইল, দুই হাত তাহাতে তাহার ফোস্কা-ছেঁড়া ঘায়ে ভরিয়া গেল; আবার একবার হাঁসপাতালটাকে তাহার এই সময় ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এ বার দুই চারি দিনেই সেখান হইতে তাহাকে উহারা ফিরাইয়া

আনিতেও পারে নাই, পুরাপুরি একটি মাস সেখানে বাস করিবার পর ফিরিয়া আবার তাহাকে পুরা দমে কায করিতে লাগিতে হইল। এই সময়ে আবার কায বদল হইয়াছিল। হাতুড়ি দিয়া পাতর ভাঙ্গিয়া বর্ষার জলে ক্ষয়-প্রাপ্ত পুলের ধারে ঢালা, এই তা'র এখনকার কায হইল; সব কাযের চাইতে এই কাযটাকেই সে কিন্তু পছন্দ করিল। ঐ যে দিনের মধ্যে এক বার দুই বার প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া সে নদীতীরে যাইতে পারিত, সেইটুকুতেই যে তাহার সকল শ্রম সার্থক হইয়া যাইত। আঃ, সেই মুক্ত উদার আকাশের তলায়, জননী ধরিত্রীর মাটীর বক্ষে দাঁড়াইয়া, সর্ব্বশরীরে নদীর জলস্পৃষ্ট সুস্নিগ্ধ বায়ুর স্পর্শ অনুভব করিয়া তাহার সকল শ্রান্তি, সকল তাপ নিমেষে ঝরিয়া পড়িয়া যাইত। আবার এইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া এক বার তৃষিত চক্ষুতে ইহার এ পারে ও পারে, ইহার বুকের উপরকার চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গ, তদুপরি তরণীর মেলা, সেই তরীর উপরকার মৎস্যজীবীদের কার্য্যপ্রণালী, খেয়ার নৌকায় যাত্রীদলের ঠাসাঠাসি, মহাজনী সুবৃহৎ বোঝাই তরণীর উপর বোঝাই করা মালের মধ্যে মাঝির ঘরকরণা করা, তীরে স্নানের ঘাটে মেয়ে-পুরুষের ভিড়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অবাধ জলক্রীড়া, অভি-ভাবকদের ভর্ৎসনা, যুবতীবৃন্দের ঘোমটা ফাঁক করিয়া এ দিক ও দিক চাওয়া, যুবকদলের আধখানা নদী তোলপাড় করিয়া সাঁতার দেওয়া, আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদলের আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া বা তীরে বসিয়া পূজাজপ করা—সে মুগ্ধ লুব্ধ তৃষিত নেত্রে এই সব দৃশ্য দু'চোখ ভরিয়া পান করিয়া লইত। এই সকলের মধ্যে যে এত রস, এত আনন্দ লুকান ছিল, জন্মাবধি দেখিয়া দেখিয়া কোন দিনই সে যে তাহা বুঝিতেও পারে নাই! কিন্তু আজ? ও! আজ এইটুকু দেখিবার জন্য সে অনায়াসে নিজের সমস্ত প্রাণটাকেই নিঃশেষে ফুরাইতে দিতে পারে, এইটুকু সুখের স্বাদ পাইবার জন্য সে সারা রাত্রিদিন ধরিয়াই অসুরের মত খাটিতে রাজী আছে। কিন্তু শুধু এইটুকু যেন তা'র কাছ হইতে কেহ কাড়িয়া না লয়!

২

এমনই করিয়া কয়টা বৎসর কাটিয়া গেল। কারাজীবন অনেকখানিই এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি যখন পাতর বহিয়া লইয়া যাইতে যাইতে পথের উপর কোন ছোট ছেলেকে সে দেখিতে পায়, অমনই তাহার বুকের মধ্যে একটা প্রবল স্নেহের তৃষ্ণা আকুল তৃষিত হইয়া উঠে। নদীর ধারে যখন স্নানরত ছেলেমেয়েগুলি আনন্দের কলহাস্যে সারা নদীতীর ঝঙ্কৃত মুখরিত করিয়া তুলিত, তখন বিচিত্র সঙ্গীতের সুরের মত সেই স্বরলহরী তালে তালে সদানন্দের বুকের মাঝখানে একটা প্রবল হর্ষ-বেদনার আলোড়নে তাহাকে যেন অভিভূতপ্রায় করিয়া ফেলিত। বহু যত্নে চাপিয়া রাখা সমস্ত স্মৃতিসরোবরের তলদেশ যেন একটা সহসাগত ঢেউএর ধাক্কায় একেবারে উলটিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইতে চাহিত। উঃ, কেমন করিয়া আর সে সহ্য করিবে? মানুষের প্রাণ আরও কি সহিতে পারে?

সদানন্দরও যে ঐ রকমেরই একটি ছোট ছেলে আছে। আহা, বেচারী দুলাল আমার! আজ কোথায় তুই? আর কি তুই তোর এই হতভাগ্য বাপের কাছে আসিবি না? তা'র নামও কখন তুই সহ্য করিতে পারিবি? কিন্তু সে এক দিন ছিল—যে দিন পিতার সে কি ভালবাসায়ই না তোকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল! তা'র চুম্বনে, তা'র আদরে, তা'র প্রাণঢালা স্নেহে তুমি মায়ের কোল ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতে, কতই না তৃপ্তি বোধ করিতে; মায়ের উপর অভিমান হইলে—ওরে অভিমানী! তুই যে তোর আধ আধ ভাঙ্গা বুলি লইয়া ছোট ছোট বাঁকা পায়ে টলমল করিতে করিতে বাপের কাছেই নালিশ করিতে ছুটিয়া আসিতিস্! চোখে যেন জল ধরিত না, কচি নরম ঠোঁট দু'টি ফুলিয়া উঠিত। তখন তোর এই অভাগা বাপই যে তোকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে চুম্বনে তোর সকল ব্যথা মুছিয়া লইয়া তোর সেই রাঙ্গা ঠোঁটে হাসি ফুটাইয়া তুলিত! ওরে মাণিক আমার! ওরে আমার বুকের নিধি! আমার প্রাণের দুলাল! আজ সেই বাপের স্মৃতিই কি না তোর কাছে সব চেয়ে বেশী দুর্দ্দৈবের হইয়া দাঁড়াইল! আজ তোর অনেকটাই জ্ঞান হইয়াছে, বয়স বাড়িয়াছে, ভদ্রসন্তানরা তোর সঙ্গী সহচর, তাদের কাহারও বাপ ত আর তোর বাপের মত তা'র নিজের ছেলেকে লজ্জা-ঘৃণার কলঙ্কে ডুবাইয়া রাখে নাই! আমার নামে তাহার প্রাণ কি শিহরিয়া উঠিবে না? আমার

নামে জীবনের যত লজ্জা—যত অপমান তা'র অন্তরে কি জাগিয়া উঠিবে না? লোক কি তা'র বাপের কথা মনে রাখিয়া তা'র দিকে একটুখানি অবজ্ঞা, একটুখানি ঘৃণা, একটুখানি অনুকম্পায় মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিবে না? আর তা'দের সেই দৃষ্টি! উঃ, কেমন করিয়া সে সব সে সহিবে? যে পিতা তাহাকে এই জীবন-ভরা অভিশাপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, তা'র স্মৃতি তা'র মনের কাছে কি বীভৎস ঘৃণার জলন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে, সে কি কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে?—ওরে নির্ম্মল, পবিত্র প্রসূন আমার! ওরে আমার পঙ্কিল জলজাত অম্লান সুপবিত্র শতদল! তাই করিস্, তাই করিস্ বাপ! ঘৃণাই তুই করিস্ আমাকে! তাই আমার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত! আর আমি তোকে প্রাণ ভরিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন তোর ছেলে তোকে শ্রদ্ধা করিতে পারে। ছেলের কাছে যে বাপ ভক্তি-ভালবাসার দাবী করিতে পারিল না, জীবন্তেই তাহার প্রাণে নরকের অসহ্য দাহজ্বালা জ্বলিতে লাগিল। দয়াময়! আমার দুলালের যেন কিছুতেই এত বড় দুর্গতি না ঘটিতে পায়।

এমনই করিয়াই সেই আত্মহারা পিতা বিশ্বের সকল ছোট ছেলেদেরই মধ্যে তাহার দূরাবস্থিত সন্তানের স্মৃতিকে জাগ্রত করিয়া কত কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে থাকিত। কখনও তাহাদের উদ্দেশে প্রাণপণে চোখ বুজিয়া ভগবান্কে ডাকিয়া বলিত—দেখ ঠাকুর! এতগুলো সরল প্রাণ তোমারই হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে, এদের যেন ব'সে ব'সে গরল মাখিও না! আহা, তোদের ভাল হোক, আমার দুলালও যে, তোরাও সে, তাহার মত তোরাও পাপকে ঘৃণা করতে শিখিস্। কিন্তু ওরে, পাপীকেও একেবারে ঠেলে ফেলিসনে সব! তা' হ'লে তা'দের দুর্গতিটা হ'বে কি? না না দুলাল! তোর বাপের জন্য ঘৃণা ক'রে হোক, অভিমান ক'রে হোক, এক ফোঁটা চোখের জল একটি দিনের জন্যও ফেলিস্ বাপ! একেবারে মরুভূমির মত হয়েও শুকিয়ে যাসনে।

সকালে সন্ধ্যায় নাম ডাকা হইয়া গেলে, নির্জ্জন নিরানন্দ ঘরের কোণে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া সদানন্দ তাহার নিজের সমুদায় অতীতটাকে সামনে টানিয়া আনিত এবং যেমন করিয়া এক একটি ফুলকে সূচের মুখে পরাইয়া লোক মালা গাঁথে, সে-ও তেমনই করিয়া তাহার অতীত কথাগুলিকে দিয়া একটি প্রকাণ্ড মাল্য রচনা করিত। অথচ কতই বা সে কথা, আর কি-ই বা এমন বিচিত্রঘটনাময় তাহার সে অতীত! তা' যতই যা' হোক, তা'র জন্য কিন্তু কিছুই আটকাইয়া থাকিত না। যে কথাটাকে সহজ দিনের স্বাভাবিকতায় নেহাৎ তুচ্ছ বলিয়া মনে করা যায়, তাহারও একটি সময় আছে, যে দিন সে তা'র সেই সহজ রূপকে বদল করিয়া এমন একটি অপরূপ ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়া বসে যে, তাহা দেখিয়া হয় ত চমৎকৃত হইয়া যাইতে হয়! তুচ্ছ চিরদিনই কখন তুচ্ছ থাকে না।—তাহার পর সেই গাঁথা মালার প্রত্যেকটি ফুলের মধ্যে নিহিত পুষ্পবাসের মতই তাহারই সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকিত—তাহার ছোট শিশুটির অজস্র স্মৃতি। সেই-টুকুই যেন ছিল সেই মালাগাছির প্রাণ, তাহার সমস্ত মূল্য। এতটুকু অসহায় কচি শিশু, মায়ের বুকের জন্যই শুধু যা'র একমাত্র বিলাপ আবেদন, তখনই সে কি অফুরন্ত স্নেহ-নির্ঝরের ধারা তাহারই উদ্দেশ্যে এই বুভুক্ষিত পিতৃস্নেহস্বাদবঞ্চিত সদ্য-পিতৃ-গৌরবে গৌরবান্বিত পিতৃহৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া আসিয়াছিল! তাহার পর সেই শিশু চন্দ্রকলার মত দিনে দিনে বাড়িয়া একটি হাস্য-রহস্যময় আনন্দের প্রতিকৃতিস্বরূপ বালকে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল। তাহার পর?—তাহার পরের কথা ভাবিতে গেলে বুকের ভিতর এখনও ফুটিয়া থাকা কাঁটার খিচ করকর করিয়া উঠে! পাঁচ বছরের ছেলেকে সেই যে তাহার মা জোর করিয়া তাহার বাপের বুক হইতে টানিয়া লইল, সেই হইতেই ত তাহার এই দুর্ভাগ্য-জীবনের সূচনা!

পাতর-ভাঙ্গা কায দুই মাস পরেই বদল হইয়া গেল। জেলখানার ভিতর বসিয়া সদানন্দকে এখন সতরঞ্চি বোনা শিখিবার আদেশ হইল। কারণ, অত বড় শ্রম-সাধ্য কার্য্য অনেক দিন ধরিয়া করাইলে কয়েদীদের শরীর খারাপ হইয়া যাইবে। কিন্তু সদানন্দের মনে হইল, তাহার উপর এত বড় নিষ্ঠুরতা বোধ করি আর

কেহ কোন দিন করে নাই, এমন কি, তাহার স্ত্রী পর্য্যন্ত নহে!

স্ত্রী,—স্ত্রীর কথা মনে পড়িতেই বুকখানা তাহার স্ফীত হইয়া উঠে। সমুদ্রের বিশাল উত্তাল তরঙ্গেরই মত একটা প্রচণ্ড বেদনা ও সংশয়ের তরঙ্গ তাহার বুকের উপর যেন ভীম বলে আছড়াইয়া পড়ে। স্ত্রী,—হ্যাঁ, তাহার স্ত্রী! ধরিতে গেলে সেই স্ত্রীর জন্যই তাহার আজ এই এত বড় মন্দ দশা!

আজ এই মুক্তির পরশ প্রাণে লইয়াও সদানন্দ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—মুক্তি পাইবে বটে, কিন্তু এ পাওয়ার কি কিছু দরকার ছিল? মুক্তিকে এই জেল-খানা হইতে পাইলেও দশের কাছে—সমাজের কাছে—নিজের বিবেকের কাছে, আর—আর তাদের—তাদের কাছে—তার স্ত্রীপুত্রদের কাছে কি এমনই করিয়া আর কখনও মুক্তি পাইতে পারিবে? না না, তাহা সম্ভব নয়, কখনই তা সম্ভব নয়, এই হীনসংসর্গী, হেয়চরিত্র, নীচকর্ম্মী, অপরাধীকে ক্ষমা? সম্ভবে না।

কেমন করিয়া সে তাহার একমাত্র সন্তানকে, তাহার চির-স্নেহের দুলালকে এই দীর্ঘ দিনের অদর্শনের পর—এত বড় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর একবার না দেখিয়া থাকিবে? অথচ তাহার কাছে মুখই বা সে দেখাইবে কেমন করিয়া? ইহা অপেক্ষা চির-সমাহিত হইয়া এই-খানেই সে যদি রহিয়া যাইতে পারিত! যদি তাহার মৃত্যু ঘটিত!

৩

সদানন্দ বড়লোকের ছেলে না হইলেও পল্লীগ্রামের মধ্যে তাহার জমীজমা, গোলা-মরাই লইয়া অবস্থাটা নিতান্ত মন্দও ছিল না। চব্বিশ বিঘা ধানজমী, দুখানা লাঙ্গল, এক জোড়া বেশ বলিষ্ঠ বলদ, দুইটা দুগ্ধবতী গাভী, পুকুরে মাছ, গাছে নারিকেল, তাল, কাঁঠাল, আম, জাম, পেয়ারা, আতা, বাতাবী ও কাগজী লেবু, ক্ষেতে শাক-সব্জী, চালে লাউ-কুমড়া—পাড়াগাঁয় এই থাকিলেই এক সময়ে লোক নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিত। অবশ্য সে দিন এখন চলিয়া গিয়াছে, নানা কারণে লোকের এখন অভাব ও অভিযোগ অনেক-খানিই বর্দ্ধিত হইয়াছে; তথাপি যত দিন সদানন্দের বিবাহ হয় নাই, তা'রা মা ও ছেলেতে তা'দের এই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিল। সদানন্দর মা ইহার কাছা-কাছি পল্লীগ্রামেরই সামান্য ঘরের মেয়ে। শারীর শ্রম তাঁহার আজন্মেরই অভ্যস্ত, নিজের ঘরেও তিনি এই বয়সেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। লোক রাখিয়া ধান রোপণ, ধান কাটানো, দোউনি করা, তৈরি ফসল ঘরে তোলা, ধান সিদ্ধ করা, শুকানো, ভানা, ঝাড়া-কাঁড়া এ সকলই তিনি যথাসাধ্য স্বহস্তে করিতেন। যাহাতে দুই পয়সা বাঁচে, কম খরচে সংসারটি চলে, চুরি না যায়, অপচয় না হয়, এই সকল ভাবনা-চিন্তাতেই তাঁহার রাত্রিদিনগুলি অতিবাহিত হইত, ছেলেটিকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালায়, সেখান হইতে ক্রমে গ্রামান্তরের স্কুলে পড়িতে পাঠানো, ছেলে পড়িতে গেলে সহস্র কায-কর্ম্মের মধ্য দিয়া তাহারই পথের দিকে উন্মনা হইয়া চাহিয়া থাকা, ছেলে বাড়ী ফিরিলে তাহাকে আঁচলে মুখ মুছাইয়া পাখার হাওয়া দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহার পর চারিটি গুড়-মুড়ি বা মুড়ি-মটরভাজা, নারিকেল, দু'খানা বা ফুলুরি-বেগুনী খাইতে দেওয়া—এই ছিল তাঁ'র নিত্যকর্ম্ম ও সব চেয়ে আনন্দের ও গৌরবের কার্য্য। হায়, সেই মা-ই বা আজ তাহার কোথায়?

পৃথিবীতে তখন আর কেহ, আর কিছুই ছিল না, এই দুইটি মাতা-পুত্র তখন নিজেদের সুখ-দুঃখ লইয়া পরস্পরের মধ্যে এক হইয়া থাকিত। মায়ের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—ছেলে মানুষ করা, আর ছেলের জীবনেরও সেই ভিন্ন আর অন্য কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। লিখা-পড়া করিলে মা খুসী হইবেন, মা'র মনে গৌরব হইবে, এই জন্যই সে যেন লিখাপড়ায় অতখানি মন দিতে পারিয়াছিল; নতুবা চাকরী করিব, কি বড়লোক হইব, সে রকম কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাহার মনের মধ্যে স্থান পাইত না। সে জানিত, এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা গ্রামখানিই তাহার সকল দেশের সেরা। ইহার বাহিরে গিয়া যদি সে লক্ষপতিও হয়, তবু কি এমন সুখ সে পাইবে?

হায়, কোথায় সেই সবুজ ভেলভেটের গদী-আঁটা

সোফার মত নবীন তৃণাস্তীর্ণ গো-চারণের মাঠ! কোথায় সেই সুন্দরীর সীমন্তরেখার ন্যায় শুভ্র সরল অনতিপ্রশস্ত পল্লীপথ! প্রতিদিনের প্রাতে সেই পথের উপরে ভারে ভারে দুগ্ধ-দধির পসরা মাথায় লইয়া পসারিণীরা আমড়া-তলীর হাটের মুখে ত্রস্ত চলিয়াছে; পসারীর দল কাঠের বোঝা ও মাছের ঝাঁকা মাথাতে ও কাঁধে করিয়া, বাঁকে দুগ্ধ লইয়া কেহ হাটের দিকে, কেহ বা ষ্টেশনের অভিমুখে চলিতেছে। মাঠের উপর নিশ্চিন্ত আরামে সুপুষ্ট গাভীগুলি ইচ্ছাসুখে বিচরণ করিতে থাকে, প্রতি চলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গল-ঘণ্টার মৃদু-মধুর রব শুনা যায়; রাখাল-ছেলেরা গাছের ডালে দড়ী টাঙ্গাইয়া ঝুল খেলে, কখনও বা বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিয়া, কখনও বা শুধু গলায় গাহিয়া উঠে,—

"আর কি সময় নাহি রসময় বাজাতে মোহন বাঁশী।"

আবার সন্ধ্যার সময়েও আর এক নূতন দৃশ্য! শূন্য পসরা মাথায় লইয়া দলে দলে পসারিণীরা শ্লথ-মন্দগতিতে ঘরের পানে ফিরিয়া চলিয়াছে; তাহাদের রূপার তাবিজের, কাঁসার পৈঁছের জলুষের উপর অস্তগামী সূর্য্য-কিরণ ঝিলিক দিয়া উঠিতেছে; তাহাদের সুখ-দুঃখের আলোচনার গুঞ্জনে পথ মুখরিত। মাঠের উপর দিয়া সারি বাঁধিয়া গোরুগুলি গোষ্ঠের অভিমুখে চলা আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাণ্ড শিংওয়ালা সব চেয়ে বড় গোরুটার পিঠের উপর শুইয়া পড়িয়া, তাহার গলা জড়াইয়া গোয়ালার সব চেয়ে ছোট ৪ বছরের ছেলেটা আপন মনে আধ আধ স্বরে রাগিণী ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিয়াছে, ভয় বা ভ্রূক্ষেপ নাই,—

'তোলা দা' গো তবে আমাল দাওয়া হলো না—"

আর সেই নদীর উপকূল! স্তব্ধ শান্ত নির্ম্মলসলিলা নদী জননীর বক্ষের মত সুশীতল নীরধারা বিলাইবার জন্য প্রত্যেককে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন! কে তাপিত আছ, এসো, এসো,—কে তৃষিত আছ, ওগো এস,—কে কোথায় ব্যথিত আছ, আহা, সে-ও এসো,—ওগো, সকলেই তোমরা আমার এই শান্তিময় শীতল বক্ষের সংস্পর্শ লাভ করিয়া যদি এমনই শান্ত, এমনই শীতল হইতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এসো,—এসো—এসো। এস গো!

মনে পড়ে, ঐ নদীর বক্ষে কত ছুটীর দিনের আনন্দ-সন্তরণ। উহারই তীরে পড়িয়া কত কাদা মাখামাখি, সঙ্গিদলের প্রত্যেককে ধরিয়া ধরিয়া তেমনই করিয়া কাদা মাখানো, তীর বা বালুকার মধ্য হইতে শামুক কুড়ানো, ঝিনুকভাঙ্গা সংগ্রহ, নদীর ধারের দত্তদের বাগান হইতে কাঁচা আম চুরি করিয়া লবণাভাবে তাহা অমনই কচমচিয়া খাওয়া! তাহার পর উন্মুক্ত সুবিস্তৃত মাঠের উপরে সে কি ছুটাছুটি,—খেলা, সে কি লুটাপুটি খাওয়া। হায় রে সুখের অতীত সাধের শৈশব! তোকে ফিরাইয়া আনিবার—তোর কাছে ফিরিবার কোন পথই যে বিধাতা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেন নাই, তাই কি তোর স্মৃতি অত মধুর হইয়া মানুষের সমুদায় হৃদয়-মনকে ব্যাপ্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া থাকে? ওরে আমার শৈশব, কৈশোর-জীবন, ওরে আমার সোনার অতীত! আর একটি বারের জন্যও যদি তোকে একবার ফিরাইয়া আনা যাইত! আর একবার তোকে ফিরিয়া পাইলে, এই জটিল, জটপাকানো, বিশৃঙ্খল জীবনটার উপর হইতে তাহার সকল বিশৃঙ্খলা— সমস্ত জটিলতার পাশ ছিঁড়িয়া খুলিয়া সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া তাহাকে আর একবার সোজাভাবে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া যাইত। আর তাহা হইলে, এই জীবনের এই উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে, এই আশা-দীপ্ত যৌবনের মধ্যসীমায় এমন করিয়া হতাশার অনুতাপের আত্মগ্লানির আগুনে তাহাকে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে হইত না।

হা ভগবান্! কেন তোমার সকল নিয়মকে এমন করিয়া অখণ্ডনীয় করিয়া তুমি তৈয়ারী করিয়াছিলে? কেন অজস্র হাহাকারে, অফুরন্ত অশ্রুনির্ঝরের ধারা ঢালিয়া দিয়া, বুকফাটা অনুতাপের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদেও মানুষের কৃত কর্ম্মকে ফিরাইয়া আনা যায় না? কেন?—এ কি জগতের কঠোর নিয়ম! এ অবিচার, না সুবিচার? না—না—এই ত তোমার ন্যায়বিচার!

৬

বসন্তের এক পুষ্পামোদিত জ্যোৎস্নাভূষিত আনন্দোৎসব-সমারোহিত মধ্যরাত্রিতে সদানন্দ দাসের সহিত বড়-গাঁয়ের বাবুদের বাড়ীর মেজ বাবুর মেজ মেয়ে লাবণ্যলতার

বিবাহ হইয়া গেল। সে কি আশ্চর্য্য—অভাবনীয় বিবাহ।

জমীদার বাবুদের এখন পড়তির মুখ, জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে মিলিয়া তাঁহাদের এখন প্রায় এগার ঘর সরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বংশ ত বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জমী ত সেই মাপা-জোকা, তাহার ত আর এতটুকুও "বাড়" নাই। বরং দিনে দিনে উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়াই যায় ও বন্যা, অনাবৃষ্টি, কীটাধিক্য ইত্যাদিতে ফসল জন্মাইবার পক্ষে সহস্র বাধা উপস্থিত করে; কাযেই চিরদিন পুরুষানুক্রমে বসিয়া খাওয়া চলে না। মেজ তরফের সেজ বাবুকেই সেই বিরাট গোষ্ঠীর মধ্যে লোকে "দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ" আ্যাখ্যা দিয়াছিল; কারণ, তিনি জমীদার-গোষ্ঠীয় হইলেও লিখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এবং ঘরে বসিয়া জ্ঞাতিদের সহিত বিবাদ কি ভাবে আইন বাঁচাইয়া করা যায়, তাহারই অভিনব পন্থায় মাথা না ঘামাইয়া বাহিরে গিয়া দুই পয়সা বাড়াইবার চেষ্টায় নিরত থাকিতেন। সেই শৈলেশ্বরবাবুর চতুর্থী কন্যা লাবণ্যদেবীর সে দিন বিবাহ।

চৈত্রমাস, বসন্তের হিল্লোলে নবীন বৃক্ষপত্র মর্ম্মর করিতেছে, প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কোকিল পাপিয়া দিগ্-দিগন্ত ছাপাইয়া ঝঙ্কার তুলিয়াছে। সেই কোকিল-কূজিত, মলয়ানিল-বিকম্পিত, বসন্তপুষ্প-পরিমলাকুল প্রকৃতির মধ্যে দুইটি হৃদয়ের পরস্পর বিনিময়! কি সুখের পুলকে তরুণ চিত্ত দু'টি স্পন্দিত হইতে থাকে! কি গভীর গূঢ় হৃদয়ভারে চিত্ত দু'টি অবনত হইয়া পরস্পরাশ্রয়ী হইতে চাহে!

কিন্তু এ বিবাহ ত সে বিবাহ নয়। লাবণ্যদেবীর বয়স পূর্ণ চতুর্দ্দশ, তিনি পিতার কর্ম্মস্থলে থাকা কালে সেখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ে লিখাপড়া শিখিতেন। বিদ্যা তাহাতে যত বেশী দূর অগ্রসর হোক বা না-ই হোক, আধুনিক কেতাদুরস্ত ভাবটা ঠিকই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সেমিজ, পেটিকোট, বডি, জ্যাকেট সর্ব্বদাই তাঁহার পরিয়া থাকা অভ্যাস, পায়ে চটি-জুতা তাঁহাকে রাখিতেই হয়, না হইলে সর্দ্দি হয় ও পায়ে হাজা ধরে। সাড়ীখানি হাল ফ্যাসানে পরিয়া ঠিক কেমন ভাবে ব্রোচটি আঁটিলে মানায়, ডানদিকে বা বাঁদিকে সীথি কাটিয়া কি ভাবে চুলগুলিকে সাজাইলে সামনে ভাল দেখায় খোঁপাটি কতখানি উঁচু করিয়া বাঁধিলে চুলগুলি বেশী বলিয়া বোধ হয়, সে সকল বিষয়েই এই মেয়েটির যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান জন্মিয়াছিল। অগত্যাই তাহাকে শিক্ষিতা মহিলা বলিতে পারা যায়। সেই মেয়ের উপযুক্ত বর অনেক খুঁজিয়া মিলিয়াছিল। ছেলেটি মেডিকেল কলেজের পাশ করা ডাক্তার, ছেলের বাপও বেশ অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ী তাঁহাদের রাজসাহী জিলায়। বিবাহ দিতে এত দূর যে আসিয়াছিলেন, সে কেবল ধনী কুটুম্বের টাকায় পথখরচ করিতে পারিবেন বলিয়া। বিবাহের লগ্ন একটু বেশী রাত্রিতে, কিন্তু লগ্ন আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল।

পণের টাকা দেখিয়া বরের বাপ চটিয়া উঠিলেন, "না মশাই, অত কমে হ'বে না, তা' ব'লে দিচ্ছি। দূর কি কম? পথের কষ্টটা কি সোজা দিলেন! তা'র পর মেয়েও যতটা সুন্দর ব'লে শুনেছিলুম, দেখছি তাও নয়। আপনারা সহুরে লোক, রং মাখিয়ে মেয়ে দেখান, সে ত এক এক রকম জোচ্চুরি! ও হাজার টাকা নগদের কর্ম্ম নয়, আরও হাজার টাকা আমার চাই।"

কন্যাকর্ত্তা এই কথায় রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "জোচ্চোর কে, তা' এই আপনার কাযেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। যে কথা হয়ে গেছে, তা'র উপর আমি একটা পয়সাও বা'র করবো না, তা'তে না হয় না হ'বে আমার মেয়ের বিয়ে।"

মধ্যস্থগণ দর কষাকষি করিয়া বরের বাপকে ৫শত টাকায় রাজী করিল, কিন্তু ক'নের বাপকে কিছুতেই তাহারা তুলিতে পারিল না, অগত্যা সবাই হাল ছাড়িয়া দিল। তখন বর নিজে উঠিয়া আসিয়া ভাবী শ্বশুরের কাছে দাঁড়াইল, বিনীত বাক্যে কহিল, "বাবার কথায় কিছু মনে করবেন না; টাকা এখন দিয়েই দিন, আমি না হয় পরে ওটা আপনাকে ফেরত দেব।"

মেয়ের বাপ উত্তর দিলেন, "যদি দিই ত আমি তা' আর ফেরত নেব না, কিন্তু আমি দেব না!"

বর বলিল, "তা' হ'লে আর কোন উপায় নেই; আমার বাপকে ত আর আমি চটাতে পারি নে।"

বরকর্ত্তা সদলবলে বাহির হইয়া গেলেন। গ্রামান্তরে এক ধনী কন্যার পিতা পথে তাঁহাকে বিস্তর টাকার লোভ দেখাইয়াছিল, সেই জন্যই তাঁহার মনটা হঠাৎ উঁহাদের উপর বাঁকিয়া উঠে।

যাহা হৌক, তাহার পর সেই রাত্রিতেই ত আবার এক জন বর চাই। মেয়ের বাপের গা-গোছ নাই দেখিয়া প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা আসিয়া অশেষবিশেষে ভয় দেখাইতে লাগিল। সমাজরীতি রক্ষার জন্য ইহা না হইলে ক'নের বাপকে একঘরে করা হইবে ইত্যাদি বলিয়া নিজেরাই চারিদিকে বর খুঁজিতে লোক পাঠাইল। এই এমনই করিয়াই দরিদ্র বিধবার প্রবেশিকা-পাশকরা ছেলে শৈলেশ্বরবাবুর জামাই হইল। এমন ঘোরফের না করিলে ত আর এ ব্যাপারটি ঘটে না, তাই বিধাতাকে ঐ রকম করিয়া এই খেলাটুকু খেলিতে হইয়াছিল।

সদানন্দকে দেখিতে ভাল, স্বভাবটিও তাহার পাঁচ জনের কাছে সার্টিফিকেট পাওয়ার মত, বিদ্যা ও ধন এই দুইটিই সে পরিমাণে বড় কম। তা' বলিয়া আর করা যায় কি? বিদ্যার জন্য এখনও যথেষ্ট অবসর পড়িয়া আছে, এই ত সবে তাহার সতের আঠারো বৎসর বয়সমাত্র! আর বিদ্যা হইলেই ধনও হইবে। যাহা হৌক, বিবাহ হইয়া গেল।

প্রথম এই অসম্ভাবিত বিবাহের ফলে মাতাপুত্র উভয়েই আপনাদিগকে অতিরিক্ত সৌভাগ্যবান্ বোধ করিয়া আনন্দে ও গর্ব্বে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এইখানেই তাহার জীবনের দুঃখ-অমানিশার আরম্ভ হইল। বড়লোকের মেয়ে পুত্রবধূ শাশুড়ীর সঙ্গে একেবারেই বনাইতে পারিল না। মা গো! কি কুৎসিত চেহারা! প্রণাম করতে ঘেন্না করে যেন! যেমন জঘন্য রান্না-বান্না, আর তেমনই হাজা-ধরা হাতের পরিবেশন, খেতে যেন বমি উঠে আসে। মাটীর ঘরে চলতে পা পিছলাইয়া যায়, দাওয়ার বাতা মাথায় ঠেকে, পুকুরে নামিলে পায়ে জোঁক ধরিবার ভয়, রাত্রিতে সারারাত্রি কানের পাশে শিয়ালের ডাক, আর খাওয়া-দাওয়ারও তেমনই কষ্ট! সব চেয়ে কষ্ট—জামা, সেমিজ, পেটিকোট-পরা বিবি-বউ দেখিবার জন্য দেশের লোকের হুড়াহুড়ি। গ্রামবৃদ্ধারা অনেকেই তাহার শাশুড়ীর হাতের জল খাওয়া ছাড়িয়া দিল; কারণ, বধূ তাহার নিশ্চয় খৃষ্টানী, না হইলে ঘাগ্‌রা পরিয়া বেড়ায় কেন? যুবতী বালিকারা দলে দলে আসিয়া তাহার পোষাকের রহস্য ভেদ করিয়া লইতে চায়, তাহার বাঁকা সীঁথায় সিন্দূর দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে থাকে; বধূ গির্জ্জায় যায় কি না, তাহারা এ কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। লাবণ্য মায়ের কাছে গিয়া কাঁদিয়া ফেলে, "আমায় অমন ক'রে হাত-পা বেঁধে জলেই যদি ফেলে দেবে, তা' হ'লে আমায় অমন ভাবে মানুষ করেছিলে কেন? অত দুর্দ্দশা—অত অপমান আমার সহ্য হয় না, আমি সেখানে আর যাবো না।"

দুই বৎসর সদানন্দ কলিকাতার মেসে থাকিয়া আই, এ, পড়িল; দুই বৎসর বধূ পল্লীগ্রামের মুখ দেখিল না; কিন্তু ছুটীর সময় তাহার বার কয়েক স্বামিসন্দর্শন ঘটিল। স্বামীর সুরূপ মূর্ত্তি, বাধ্য বিনীত ভাব লাবণ্যের নেহাৎই অসহ্য বোধ হইত না; কিন্তু যখনই সে তাহার মায়ের কথা পাড়িত, পরীক্ষাশেষে তাহাকে লইয়া বাড়ী যাইবার কথা তুলিত, তখনই লাবণ্যের পতিভক্তি একেবারে উড়িয়া যাইত। তাহার মনে হইত, জেলখানাও বুঝি তাহার স্বামিগৃহের তুলনায় শ্রেষ্ঠ!

তবু দুই চারি দিনের জন্যও দুই একবার করিয়া যাইতে হইল। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই অন্নপ্রাশন উপলক্ষে একবার যাওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। আর একবার যাইতে হইল—শাশুড়ীর ব্রত উদ্‌যাপনে। সেই বার ফিরিয়া আসিয়া সে এমনই কোট ধরিল যে, আর কেহ কোন দিন তাহাকে পিত্রালয় হইতে নড়াইতে পারিল না। শাশুড়ী সে বার গোটাকত কঠিন কথার বাণ ছুড়িয়াছিলেন, তাই কাঁদিয়া রাগিয়া সে শপথ করিয়া বসিল যে, অমন শাশুড়ীর মুখ সে আর কখন দেখিবে না।

সদানন্দ বার বার তিন বার আই, এ, পরীক্ষায় ফেল করিয়া এ পর্য্যন্ত বেকার বসিয়া আছে। কখন নিজের ঘরে, কখন শ্বশুরবাড়ীতেই খাইয়া শুইয়া কোনমতে সে আলস্যে দিনগুলাকে কাটাইয়া দেয়। আর বেশীর ভাগটাই যে শ্বশুরের দ্বারে সে অমন করিয়া নির্লজ্জভাবে পড়িয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ ঐ তা'র ছেলে। ঐ ছেলেটিই

যেন তাহার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা, একটিমাত্র সুখ, তাহার জীবনের ধ্রুবতারা! ঐ ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া, তাহার কচিমুখে চুমা খাইয়া সে নিজের স্ত্রীর সকল অবহেলাই অনায়াসে সহিয়া যাইত। এমন কি, মা র কথাও সব সময় তা'র এখন আর মনে পড়িত না। পড়িলেও নিঃসঙ্গ মা'র দুঃখ বিস্মৃত হইয়াও সে নিজের সুখে তন্ময় হইয়া থাকিত। দুলালকে ছাড়িয়া সে কেমন করিয়া দূরে থাকিবে? অথচ সেই দুলালকে—তাহারই বুকের রক্ত, দেহের অংশ আপনার সন্তানকে সে তা'র নিজের ঘরে লইয়া যাইতে পারে, এমন সামর্থ্য তাহার নাই। তাহার সে সাধ্য কোথায়? যেহেতু, সে গরীব আর দুলাল ধনীর দৌহিত্র!

লাবণ্য কোন দিনই তাহার গরীব স্বামীকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। বিশেষতঃ নিজের বিবাহের কথা মনে পড়িলেই তাহার বুকের মধ্যে একটা অনিঃশেষিত যন্ত্রণার তরঙ্গ বহিয়া যাইত। তেমন বিড়ম্বনার পাকে জড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে এই অভাগা দরিদ্রের গলায় না পড়িতে হইলে ত আর তাহার এ দুরবস্থা ঘটিত না। সে-ও তাহার দিদিদের মত সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাইয়া দিতে পাইত। হয় ত এত.দিনে তাহার সুখের সংসারে দাসদাসী, সোফার, সরকার গিস্‌গিস্ করিতে থাকিত। বারো মাস বাপের বাড়ী পড়িয়া থাকায় কখন মানুষের ইজ্জত থাকে?

এক দিন সেই কথাই সে স্বামীর কাছে বলিয়া ফেলিল; দুঃখ করিয়া কান্দিয়া বলিল,"আমার মতন পোড়া কপাল ক'রে কেউ যেন জন্মায় না। বিয়ে হয়ে ক'দিন আমি স্বামীর ভাত খেলুম! এখন বয়েস হচ্ছে, সব কথায় কি মাবাপের কাছে হাত পাতা যায়? একটা এমন পয়সা থাকে না যে, আপনা হ'তে খরচ করি।"

শুনিয়া সদানন্দর বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্ত্রীকে সে ভয় করিত বটে, কিন্তু মনে মনে তাহাকে সে কি কম ভালবাসিত! তবে যে অমন চুপটি করিয়া এক ধারে আড়ষ্ট হইয়া থাকিত, সে শুধু সঙ্কোচে। গরীব সে, অক্ষম সে, স্ত্রীকে আদর দেখাইতে যাইবে সে কিসের ভরসায়? এই যে এত দিন বিবাহ হইয়াছে, এক ভরি সোনা কি স্ত্রীর গায়ে দিতে পারিয়াছে? আজ এই অনুযোগে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়া ধীরে ধীরে সে উত্তর করিল, "তোমরা আমড়াতলীতে চলো না, সেখানে থাক্‌লে তবু মোটা ভাতটা আমাদের চ'লে যায়, আর—"

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার আর ধৈর্য্য না রাখিয়াই উত্তেজিত উচ্চ কণ্ঠে লাবণ্য ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—"থামো বাপু, তুমি আর কাটাঘায়ে নুণের ছিটে দিও না, সেই মোটা ভাত খাবার মত প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা ভগবান্ আমাকে দিয়ে পাঠান নি। তোমার যদি তা' অতই মিষ্টি লাগে, তা' হ'লে কিসের লোভে দিনের পর দিন ধ'রে এই শ্বশুরবাড়ীর বালাম চা'ল খাবার জন্যে ভিকিরীর মত প'ড়ে আছ, শুনি? তোমার এতে লজ্জা করে না? তোমার যদি লজ্জাই থাকবে, তা' হ'লে শ্বশুরের পয়সায় পড়ে তিন তিন বার ফেল হও; আর কোন কিছু না ক'রে দিব্যি আরামে শ্বশুরের ঘাড়ে ব'সে থাক? কিন্তু তোমার এই নির্লজ্জতায় আমার গলায় দড়ী দিতে ইচ্ছে করে। কোন দিন না কোন দিন আমায় হয় ত দিতেও হ'বে তাই!"

৬

সেই হইতে সদানন্দ শ্বশুরবাড়ীর বাস ছাড়িল, কিন্তু সে কলিকাতাকে কোনমতেই ছাড়িতে পারিল না। প্রথম কয়দিন সে অনবরত দিন নাই, রাত্রি নাই, ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটি চাকরী যোগাড় করিল। এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সংসারে তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়াইবার চাকরী; বলিয়া কহিয়া খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিল, মাহিনা সে জন্য মোটে পাঁচটি টাকা ধার্য্য হইল। তাহার মনে হইল, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। তবু ত প্রত্যহ একবার করিয়া দুলালকে সে দেখিতে যাইতে পারিবে।

প্রথম দিনেই একটি টাকা চাহিয়া লইয়া সদানন্দ এক শিশি লজঞ্জুস কিনিয়া লইল, হাসিমুখে দুলাল আসিয়া শিশিটি যখন দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বাপের দিকে চাহিয়া মধুর স্বরে বলিল, "আমার বাবা কত লক্ষ্মী, আমায় অতুলের, প্রতুলের বাবার মত লজঞ্জুস এনে দিয়েছে! মা, তুমি আমার বাবাকে আর বকো না যেন। বাবা রাগ ক'রে যদি আবার চ'লে যায়!" সদানন্দর চোখে তখন অশ্রু যেন আর চাপা থাকিতে চাহিতেছিল না। ছেলেকে সে দুই হাতে বুকে

সাপটাইয়া ধরিয়া ঘন ঘন চুম্বনে নিজের সেই অদম্য অশ্রুপ্রবাহকে সে কোন মতে প্রশমিত করিয়া লইল।

একটু পরে ছেলে খেলিতে গেলে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "পয়সা কোথা পেলে, কোন চাকরী-বাকরী জোগাড় করেছ না কি ?"

সদানন্দ স্ত্রীর সহিত একা হইতেই ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, এখন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াই সে যেন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু নিরুত্তরে থাকিতেও তা'র ভরসা হইল না, একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া সে মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল—"হ্যাঁ।"

লাবণ্য ঈষৎ প্রসন্নমুখে কহিল, "তা' ভালই হয়েছে। পুরুষ বেটাছেলের কি খালি ব'সে ব'সে পরের অন্ন ধ্বংস করতে আছে! একটা কিছু চেষ্টা করতেই হয়। তা' কি রকম হলো ? কাযটা কি শুনি ?"

"তিনটি ছোট ছেলেমেয়েকে পড়াতে হ'বে।"

"মাইনে কত ?"

এই বার সদানন্দর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। মাহিনার কথা শুনিয়া যে লাবণ্য খুসী হইবে না, তাহা সে জানিত। ভয়ে ভয়ে একটু ঘুরাইয়া সে বলিল, "তা'দের বাড়ীতেই থাক্‌তে হ'বে, খাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানেই করেছি।"

লাবণ্য মুখটা ঘুরাইয়া সবিদ্রূপ হাস্যে কহিল, "সে ত ভাল কথাই। শ্বশুরের ভাতটা না হয় বেঁচেই যা'বে। তা' মাইনেটা কত পা'বে, না হয় সেটা শুনিই না, কেড়ে ত আর নিতে যাচ্ছিনে।"

সদানন্দ একটুখানি কাসিয়া একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "পাঁচ টাকা দিতে চায়, তা'র বেশীতে উঠলো না।"

গায়ের উপর জলন্ত আগুনের ফিন্‌কী উড়িয়া পড়িলে মানুষ যেমন চম্‌কাইয়া উঠে, তেমনই করিয়া বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়া লাবণ্য দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া স্বামীর পানে চাহিল, তাহার পর দেখিতে দেখিতে গভীর অবজ্ঞায় ও ঘৃণায় তাহার ললাট যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। ক্ষণকাল বাক্যহীন স্তব্ধ থাকিয়া শেষে রোষে, ক্ষোভে, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সে সবেগে বলিয়া উঠিল, "খুব লোকের হাতে পড়েছিলুম! আমার বাপের বাড়ীর একটা চাকরেরও যে এর চেয়ে মাইনে বেশী! ছি ছি, একগাছা দড়ী জোটে না!"

বলিতে বলিতে কান্দিয়া ফেলিয়া রাঙ্গামুখে সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল, আর হতভম্ব সদানন্দ সেইখানে পাতর হইয়া জমিয়া গিয়া বসিয়া রহিল।

৭

একবার সদানন্দ মনে করিল, এই ঘৃণিত চাকরী না হয় ছাড়িয়া দিবে। তাহার পরই তাহার মনে পড়িল যে, আজ প্রথম দিনই সে তাঁহাদের কাছে একটি টাকা চাহিয়া লইয়াছে, এখন যদি সেখানে ফিরিয়া না যায়, তবে তাঁহারা তাহাকে জুয়াচোর বলিয়া মনে করিবেন। যাইতেই হইবে।

ছেলে আসিয়া চাপিয়া ধরিল, "হ্যাঁ, লজঞ্জুস দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কক্ষনো যেতে দোব না, তা হ'বে না। এস।"

লাবণ্যের ঝি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি বল্লে, শীগ্‌গির ক'রে পোষাক প'রে পার্কে বেড়াতে চলো, চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে পোরা থাক্‌লে শরীর খারাপ করবে। দেখুন, জামাইবাবু! ওকে অমন ক'রে ধ'রে রাখবেন না—ছেড়ে দিন দেখি! দিদিমণি রাগ করবে।"

দুলাল বাপকে সবলে জড়াইয়া থাকিয়া ঝিয়ের উদ্দেশে তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ধ্যেৎ, আমি বেড়াতে যাবো না, বাবার কাছে থাকবো, মা রাগ করুক গে।"

"বটে! এই যাচ্ছি আমি মা'র কাছে। মা যখন আস্‌বে, তখন সব ভিরকুটি বা'র করবে।"

"যা' না, এক্ষুণি যা', মা এসে আমার কি করবে ? বাবা আমায় যেতে দেবে না, দেখিস্ তুই—"

"'মা এসে কি করবে', দেখ তা' হ'লে!" ছেলের পিঠে গুম্-গুম্ করিয়া গোটা দুই তিন কিল বসাইয়া দিয়া তাহাকে কঠিন হস্তে টানিয়া লইতে লইতে ক্রুদ্ধ বক্রকণ্ঠে নির্ম্মম বিদ্রূপে লাবণ্য স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ভাল করতে পারি না মন্দ করতে পারি—কি দিবি তাই বল্, সেই যে কথায় বলে, তোমার হয়েছে ঠিক তাই! করবার ত কিছুরই যোগ্যতা নেই, শুধু শুধু ছেলেটাকে বিগড়ে দেবার চেষ্টা করা কেন ? ওর ত আর তোমার মত বেকার হয়ে ব'সে থেকে দিন কাটানো

চলবে না, মানুষ ত হ'তে হ'বে। নিজে ত ঐ হয়েছ, ওটাকেও কি নিজের মতন কর্‌তে চাও? তার চেয়ে ও ওর মামাদের কাছেই মানুষ হোক, তোমার আর ওকে এসে এসে দেখা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলার দরকার নেই!"

বিচারক জজের মত এই দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াই ক্রন্দনপরায়ণ বালককে তাহার একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠিন হস্তে টানিয়া লইয়া ক্রুদ্ধা ক্ষুব্ধা অবমানিতা স্ত্রী তাহার সকল দুর্ভাগ্যের মূল মূঢ় স্বামীকে অধিকতর বিমূঢ় করিয়া দিয়া ঝড়ের মতই চলিয়া গেল। সদানন্দর মনে হইল, যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল এবং সেই ফাঁসির দড়ী তাহার গলায় পরানোও হইয়া গিয়াছে।

৮

তবু সদানন্দর দিন কাটিত! বড় অসহ্য হইলে যখন আর নিতান্তই থাকিতে পারিত না, এই বাড়ীটার আশেপাশে একবার উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া যাইত, কোন দিন পার্কের ধারে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছেলেটিকে দেখিতে চেষ্টা করিত। কোন দিন দুলালের একটু গলার সাড়া তাহার কানে ঢুকিত, কোন দিন তাহার ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি বারেকের জন্য হয় ত চোখে ঠেকিত; সব দিন তাহাও ঘটিত না, তথাপি সেইটুকুই ছিল তাহার জীবনের সান্ত্বনা।

মাসকাবারে চারিটি টাকা দিয়া সদানন্দ দুলালের জন্য ছবির বই কিনিল, খানকতক জলছবি, একটি রবারের বল, এবং আরও কয়েকটি খেলনা ও লজঞ্চুস কিনিয়া লইয়া সে দিন পার্কে গিয়া সেগুলি দুলালের হাতে দিয়া আসিল। দুলাল প্রথমে কোনমতেই বাপের কাছে আসিবে না, তাহার দেওয়া ঐ অতি সখের জিনিষপত্রের দিকে সে একবার তাহার নীচুকরা চোখ'দুটা তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না, ঝি-এর কাপড় শক্ত করিয়া ধরিয়া সে গম্ভীর মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বালকের এই গভীর অভিমানের ব্যথা পিতার আহত হৃদয়কে যেন শতধা করিয়া দিতেছিল, সে তখন আর যেন নিজের উদ্বেলিত অন্তরের উছলাইয়া-পড়া অশ্রু-প্রবাহকে শত চেষ্টা করিয়াও রুদ্ধ রাখিতে পারিতেছিল না। শিশুর মত হা হা করিয়া কান্দিয়া উঠিয়া একেবারে বুকের ভিতরে সে ছেলেকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিল।

"দুলু দুলু! মাণিক আমার! চেয়ে দেখ, কথা ক';—একটা কথা ক'—এম্‌নি হতভাগা বাপ তোর আমি—"

পিতাকে কান্দিতে দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়া দুলাল পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার নিজের চোখ দিয়াও জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর যেই তাহার বাপ "ছিঃ, কেন্দো না"—বলিয়া অশ্রুসিক্ত গণ্ডে চুম্বন দান করিল, অমনই সে ফুলিয়া ফুলিয়া কান্দিয়া বাপের বুকের ভিতর মুখ গুঁজিল এবং তেমনই করিয়াই বহুক্ষণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিল। পিতাও নিজের চোখের জল মুছিবার অশেষবিধ চেষ্টা করিতে করিতে নিঃশব্দে হু হু করিয়া কান্দিতে লাগিল।

তাহার পর কত করিয়াই পিতাপুত্র দুই জনে শান্ত হইল। অবশেষে বাপের আদরে আদরে ছেলে তাহার মনের মধ্যের দুর্জ্জয় অভিমানব্যথা ভুলিয়া আসিল। সেই অপূর্ব্ব উপহার-সম্ভার তখন সাগ্রহে গৃহীত হইল। তাহাদের এই মিলনদৃশ্য দেখিতে যে সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহাদের চারিদিকে জড় হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া দুলাল সহর্ষে তাহার ধন-সম্পত্তিগুলি দেখাইতে লাগিয়া গেল। মুরলা, বেলা, চুনী, দোপাটি সবাই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিল, তাহাদের বাবার চাইতে দুলুর বাবাই লক্ষ্মীছেলে, সে দুলুকে অনেক জিনিষ দিয়াছে।

সে দিন অনেক কষ্টে ছেলেকে ছাড়িয়া ফিরিবার সময় সদানন্দ মনের মধ্যে একটা নিদারুণ শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। ইহার পর দুই চারি দিন সে যেন কোন কাযেই মন দিতে পারিল না, স্নানাহার পর্য্যন্ত তাহার এক রকম বন্ধ হইয়া গেল, কেবল উন্মনা হইয়া ছেলের কথাই সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এতক্ষণ সে কি করিতেছে? বাড়ী গিয়া কান্নাকাটি করিয়া তাহার মা'কে বিরক্ত করিয়াছিল কি না? ছেলের কান্নার কথা মনে করিতেই তাহার নিজের চোখের জল আর চাপা থাকিল না। দুই দিন পরে সে আবার পার্কে গিয়া ছেলের সঙ্গে দেখা করিল। দুলাল এ দিন হাস্যোজ্জ্বল মুখে বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল।

কিন্তু এ সুখটুকুও সদানন্দর ভাগ্যে বেশী দিন সহিল

না। দেশ হইতে খবর আসিল, জননী মৃত্যুশয্যায়। সদানন্দ বাড়ী গেল, যাইবার পূর্ব্বে একবার স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। লাবণ্য বলিল, "বল কি তুমি! এই বর্ষাকালে সেই মেটে বাড়ীতে দুলালকে নিয়ে গেলে ওকে কি আর ফিরিয়ে আনতে পারব? আর ওকে ফেলে ত আমার যাওয়া হয় না! তুমি ত যাচ্ছোই, তা' হ'লেই হ'বে।"

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সদানন্দ একাই বাড়ী গেল। মা বলিলেন, "হাঁ রে, মরবার সময় একবার আমার দুলালকে আমি দেখতে পাবো না রে?"

কাতর কণ্ঠে সদানন্দ উত্তর দিল, "তোমার দুলাল আর কৈ মা! তোমার হ'লে তুমি দেখতে পেতে, সে যে মা বড়লোকের নাতি।"

দুই মাসাধিককাল রোগ ভুগিয়া সদানন্দর মা তাঁহার একমাত্র সন্তানের অকৃত্রিম সেবা লইয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিলেন। মায়ের রোগে ও শ্রাদ্ধে সদানন্দর জোত-জমী, কুটীর কয়খানি সমস্তই বাঁধা পড়িল।

কলিকাতায় ফিরিয়া দেখা গেল, চাকরীতে অন্য লোক বাহাল হইয়াছে। এ মাষ্টার বেশী যত্ন লইয়া পড়ায়। গৃহস্বামী সদানন্দর পাওনা দুইটি টাকা তাহাকে দিয়া দিলেন, সে আবার শ্বশুরালয়ের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বেশী দিন সেখানেও আর তাহার পোষাইল না, এক দিন লাবণ্যের শ্রুতিদগ্ধকারী অনেকগুলি অত্যন্ত কটুবাক্যে নিতান্তই অপমানিত বোধ করিয়া লজ্জারক্তিম মুখে সদানন্দ বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল, কঠিন শপথ করিয়া সে সে দিন বলিয়া আসিল, যদি কখন পয়সা হয়, তবেই আবার সে মুখ দেখাইবে. নতুবা তাহার এই শেষ! শুনিয়া লাবণ্য উত্তর দিল যে, সে-ও তাই চায়! সদানন্দ তাহার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

এই ঘটনার দেড় বৎসর পরে এক দিন এক সন্ধ্যাকালে সদানন্দ আসিয়া আড়াই হাজার টাকার নোটের একটা তাড়া তাহার স্ত্রীর পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দিল এবং এক জোড়া অতি উজ্জ্বল চুণির ও মতির বালা স্ত্রীর হাতে দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এইতে হ'বে? না আর কিছু চাই?"

সদানন্দর মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু সেই বিবর্ণ মুখে চোখ দুইটা তাহার অস্বাভাবিক তেজে যেন মোটরের আলোর মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সে যে স্বরে কথা কহিল, তাহা যেন মানুষের গলার স্বর বলিয়া মনে হইল না, যেন কাঠের পুতুলের মুখ দিয়া কোন দৈববলে একটা প্রাণহীন শব্দ বাহির হইতেছে। তাহাকে কেহ তখন যদি স্পর্শ করিয়া দেখিত ত দেখিতে পাইত, তাহার সমস্ত শরীরটাও যেন অমনই পাতরের বা কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছিল। দেহে যেন তাহার প্রাণ নাই!

লাবণ্য বিস্ময়ে চমকিত ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। যে ব্যগ্রভাবে টাকাগুলা মাটীর উপর হইতে তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইল, দুই একখান উল্টাইয়া দেখিল, সবই মোটা অঙ্কের আঁক কাটা কাটা নোট। বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়া সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল, অত্যন্ত আশ্চর্য্যের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এত টাকা কোথায় পেলে?"

সদানন্দ মাথা হেঁট করিয়া ভারী মুখে জবাব দিল, "সে কথা তোমার কেন? তুমি টাকা চেয়েছ, এনে দিয়েছি। আরও চাও ত তা'ও পা'বে; এখন বোধ হয়, দুলালকে তাহার বাপ একটুখানি আদর করবার যুগ্যি হয়েছে?"

যেন আকাশ হইতেই বা খসিয়া পড়িয়াছে, এমনই ধারা ভাব করিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যের স্বরেই লাবণ্য কহিয়া উঠিল, "ও মা, কথার শ্রী দেখ! তোমার ছেলে, তুমি তা'কে আদর করবে, তা'র আবার 'যুগ্যি' 'অযুগ্যি' কি? বসো তুমি, আমি আস্‌ছি। ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নাও, জলখাবার. পান-টান নিয়ে আসি গে।"

এই বলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিয়া লাবণ্য তাড়াতাড়ি মা'র কাছে গেল। হাতে তাহার সেই নোটের তাড়া ও জড়োয়া বালাজোড়া।

মেয়ের মুখ অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দের আভায় সমুজ্জ্বল দেখিয়া মা একটু বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "সদানন্দ এসেছে নাকি শুনলুম?"

মেয়ে সে প্রশ্নের উত্তরে এক মুখ আনন্দের হাসি

হাসিয়া বলিল, "এই আড়াই হাজার টাকাটা, মা, তুমি বাবাকে দিয়ে রাখ, কালই যেন খোকার নামে ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দেন।" এই বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া মা'র হাতে নোটের তাড়াটা চালান করিয়া দিল।

লাবণ্যের মেজদিদি পুণ্যলতাও সেখানে ছিল,লাবণ্যের হাতে বালা দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি সেটা টানিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে প্রশংসাসূচক স্বরে কহিয়া উঠিল, "খাসা বালা দিয়েছে ত! দেখলি ত লাবি, অত তাচ্ছীল্য কর্‌তিস্! সবেরই একটা সময় আসে। খোকার জন্যে কি আন্‌লে রে?"

লাবণ্য কহিল, "তা' এখনও দেখিনি, আমায় জিজ্ঞেস কর্‌ছিল, 'তোমার আর কি চাই বল?'—"

"তা তুই কি চাইলি?"

"এখনও বলিনি কিছু, ইচ্ছা আছে, একটা চুণি-মুক্তোর নেকলেশ আর দুটো হীরের ইয়ারিং চাইবো।"

মা কহিলেন, "জামাই বুঝি কোন ব্যবসা করছে? না হ'লে এর ভিতর এত টাকা জমালে কি ক'রে?"

লাবণ্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ক্ষমতা ত আছে, মা, মনই ছিল না। এখন সেইটে হয়েছে বলেই —যাই একটু জল-টল খেতে দিই গে।"

মা কহিলেন, "হ্যাঁ, যাও, তাই দাও গে, ঝিকে বলো, ভাল খাবার আট আনার এনে দিক, তা'র কমে কি পেট ভরে।"

রাত্রি-ভোজনের পরই সদানন্দ স্ত্রীকে বলিল, "আজ তা' হ'লে চল্লুম, আবার কিছু হাতে হ'লেই আসবো'-খন। দুলালকে কা'ল এসে পারি ত একবার দেখে যাব।" এই বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

লাবণ্য এই কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। যে লোক এতটুকু একটু আদরের জন্য লালায়িত ছিল, সে আজ তাহার এত যত্ন-আদর, প্রেমসম্ভাষণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত! এ ব্যাপার কি? সে একটু অভিমানের সহিত কহিল, "এত রাত্তিরে আর না গিয়ে, থাক্‌লেই হতো না আজকের রাতটা?"

সদানন্দ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া জবাব দিল, "না, এখানে আমার যায়গা নেই। আমি যে দিব্যি করেছিলুম।"

"তা' হ'লে আমাদের কবে নিয়ে যা'বে মনে করেছ?"

অন্য দিকে মুখ করিয়া অস্পষ্ট স্বরে সদানন্দ উত্তর করিল, "তোমাদের নিয়ে যেতে আমার ত সুবিধে হ'বে না। তবে তুমি যে গহনার কথা বল্লে, সে আমি যত শীগ্‌গির পারি, তোমায় এসে দিয়ে যাব।" এই বলিয়াই সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। লাবণ্য আড়ষ্ট, অভিভূত, মুহ্যমান হইয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৯

তাহার পর এক দিন এক দল মোটর-ডাকাইত ধরা পড়িয়া গেল, তাহারা বড়বাজারের এক জহুরীর দোকান লুঠ করিয়া ফিরিতেছিল। পিস্তলের গুলীতে দোকানের একটা লোকও জখম হইয়াছিল। হাঁসপাতালে তাহার মৃত্যু ঘটিল। বিচারে ডাকাইতদলের এক জনের যাবজ্জীবন ও তিন জনের যথাক্রমে ১০ বৎসর, সাড়ে ৮ বৎসর ও ৭ বৎসর করিয়া সপরিশ্রম কারাদণ্ড হইল। এই দস্যুদলের ভিতর সদানন্দ দাসের নামটাও সে দিন সহরশুদ্ধ লোকই শুনিল। যখন পুলিসের হাতে ধরা পড়ে, তখন পর্য্যন্ত তাহার পকেটে জহুরীর দোকানের অপহৃত একটা সুন্দর চুণির ও মতির নেকলেশ ও একজোড়া খুব দামী হীরার ইয়ারীং ছিল, তাহা ছাড়া হাজারখানেক টাকাও না কি মিলিয়া গিয়াছিল। আদালতে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কি উদ্দেশ্যে সে এই ডাকাইতের দলে মিশিয়াছিল, তখন সে হাসিয়া উকীল বাবুর দিকে চাহিয়া কহিয়াছিল, "আপনার বুঝি বিয়ে হয়নি?"

* * * * *

এখন এই সদানন্দর মনের সব চেয়ে বড় সমস্যা, সে কেমন করিয়া তাহার দুলালকে মুখ দেখাইবে? সেই ছেলে! দূর হইতে বাপের ছায়া দেখিয়া যে চিনিতে পারিত, বাপকে একবার কাছে পাইলে যে জোঁকের মত ধরিয়া থাকিত, বাপের কোল পাইলে যা'র সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা-ধূলা, খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত মনে থাকিত না, সেই দুলাল! সেই দুলাল এখন বাপকে দেখিলেও হয় ত চিনিতে পারিবে না। আর পারিলে? চিনিতে পারিলেও হয় ত তাহার সেই হাসিমুখখানি লজ্জায়,ঘৃণায় কালীমাখা

হইয়া যাইবে। হয় ত গভীর বিরাগে সে তাহার সেই বিপন্ন-গম্ভীর মুখ সবেগে বিপরীত দিকেই ফিরাইয়া লইবে। হয় ত, হয় ত—

সদানন্দের বুকখানা বক্ষোমিবদ্ধ রুদ্ধ অন্তর্বায়ুর চাপে সঘনে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; হয় ত—হয় ত সে তাহাকে চিনিতেই পারিবে না, পারিলেও তাহাদের মধ্যের যে নিকটতর, ঘনিষ্ঠতর পরিচয়, তাহাকে সে অস্বীকারই বা করিয়া বসিবে!

সদানন্দের বুক দুঃখে, ক্ষোভে অভিভূত হইয়া আসিল, তাহার চোখ দিয়া দর-দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে দুই হাত যুক্ত করিয়া উর্দ্ধমুখে গদ্‌গদস্বরে বলিল, "নারায়ণ! আমার ফুলের মত পবিত্র দুলালের যদি এমনই মনে হয়, তা' হ'লে সে যেন আমায় আর দেখতে না পায়, আমাকে শুধু একটিবারের জন্য তা'কে দেখতে দিও।"

প্রভাতের অম্লান আলোক বাহিরের চারিধারকে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে। নির্ম্মল আকাশ, বাতাস তাহার সমুদায় শোভা-সৌন্দর্য্যকে যেন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আঃ, কি আনন্দ এই মুক্তিতে!

অসম্ভব ও অসঙ্গত জানিলেও সদানন্দের চিত্তে একটা অধীর আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ জাগিয়াই উঠিতেছিল। সেটুকু তাহার নিছক কল্পনামাত্র জানিতে পারিয়াই তাহার সেই আশা-চকিত বুকের উপর একটা চাবুকের ঘা পড়িল। দুঃখে ক্ষোভে মনটা যেন তাহার গুঁড়াইয়া পড়িতে চাহিল। অথচ সে জানে যে, এত বড় ধৃষ্ট ও মিথ্যা আশা করিবার মত কোন কারণই তাহার জন্য বর্ত্তমান ছিল না। না, কেহ কোথাও নাই! প্রভাত-রৌদ্র-করোজ্জ্বল রাজপথে কদাচিৎ কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত নাগরিক নিজ নিজ কর্ম্মব্যপদেশে যাওয়া আসা করিতেছিল, তাহারা তাহার দিকে একবার চোখ তুলিয়াও গেল না। তাহার দুই চোখ তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই একেবারে অনাহূত অশ্রুপ্রবাহে ছাপাইয়া উঠিল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে চলিতে আরম্ভ করিল, পিছনদিকে আর একটিবারের জন্যও তাহার যেন চাহিয়া দেখিতে সাহস হইতেছিল না।

১৩

কই দুলাল? কোথায় দুলাল? আর কত দূরে গেলে তাহার প্রাণের দুলালের মুখখানি সদানন্দ দেখিতে পাইবে? এই ত সেই কলিকাতা। এই কোলাহল-মুখরিত, জনারণ্য হাবড়া ষ্টেশন, হাবড়ার পুল, ইহার নীচেও যেমন ভাগীরথীর কলকল গদগদ নাদ, তাহার অসীম প্রবাহ, ইহার উপরেও তেমনই কলনাদে অসংখ্য যানবাহন ও জনস্রোত অসীমভাবেই দিবারাত্রি সমস্রোতেই চলিয়াছে। তাহার পর বিপণিশ্রেণী-সুসজ্জিত বড়বাজার, হ্যারিসন রোড। এই সেই গোপীচাঁদ দত্তের লেনের সেই চিরপরিচিত নম্বরের বাড়ী! হ্যাঁ, ইহাই ত বটে! সদানন্দের বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত জমা হইয়া এমনই ভয়ানক শব্দে তোলপাড় করিতে লাগিল যে, তাহার সে ভীষণ শব্দে তাহার কানে তালা লাগিয়া যাইবার মত হইল। তাহার সহসা মনে হইল, সে হয় ত এখনই পড়িয়া যাইবে, অতি কষ্টে একটা বাড়ীর দেওয়াল ধরিয়া সে কোনমতে নিজের পতন সংবরণ করিল। কি সাহসে সে এই বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? সে কি ভুলিয়া গিয়াছে, সে এক জন জেলখালাসী অপরাধী? তা সে না হয় ভুলিতে পারে, কিন্তু তাহারা যে পারে নাই, এটা নিশ্চিত।

সারাদিন যে কোথায় কাটে, তাহার কোন নিশ্চিত হিসাব ছিল না, কিন্তু রাত্রিটা তাহার কাটিত এই গোপী দত্তর লেনেরই মধ্যে। কয়েক দিনের পর এক দিন সেই বাড়ীর এক জন ঝিয়ের নিকট হইতে খবর পাওয়া গেল। যে খবর পাওয়া গেল তাহা এই—এই বাড়ীর কর্ত্তার নাম রামহরি চট্টোপাধ্যায়, তাঁহারা কত দিন এ বাড়ীতে আছেন, সে ঠিক বলিতে পারে না, তবে ৪ বছরের কম নয়।

সদানন্দর মনের অবস্থা ভীষণ হইয়া উঠিল। তবে কি আর সে দুলালকে—তাহার একমাত্র আশা-প্রদীপটিকে এ জীবনে কখন দেখিতে পাইবে না? না না, এই হয় ত ঠিক; এই হয় ত সঙ্গত! সে যে পাপী, মহাপাপী, পরস্বাপহারী দস্যু। পুণ্য কি কখন পাপের সংস্রবে আসিতে পারে?

১১

সেই দিন মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে নিবিড় ঘন মেঘে আকাশ ছাইয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। সারা দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত শরীরে কোথাও কোন গৃহস্থ-গৃহের দ্বারের পার্শ্বে কুকুরগুলার এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াই সদানন্দের দিন কাটিতেছিল। আজ অকস্মাৎ এই ঝড়-ঝঞ্ঝা আসিয়া তাহাকে একটা আশ্রয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল, অদূরে মল্লিক বাবুদের উদ্যানের বৃক্ষশ্রেণী বৃষ্টির অস্পষ্টতায় দিগন্তের নয়নতটে শ্যাম-কজ্জল রেখার মত দেখাইতেছিল। মাথার উপর ধূসর আকাশ দামিনীর তীক্ষ্ণ হাস্যে থাকিয়া থাকিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবং আর্দ্র বায়ু অশ্রুসিক্ত দীর্ঘনিশ্বাসের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া হা হা শব্দে ধরণীর শীতল বক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছিল।

শীতার্ত্ততায় কম্পিত, অনাহার অনিদ্রায় দুর্ব্বল, সারাদিন পর্য্যটন-পরিশ্রমে ক্লান্ত সদানন্দ নন্দ বসাক গলির একটা ছোট বাড়ীর সাম্‌নের রকে উঠিয়া তাহার দ্বার চাপিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। আর যেন সে পারে না। এই মহানগরীর লক্ষ লক্ষ পথবাহী মানুষের প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই যে দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিশ্রামে ঘুরিয়া ফেরা, এমন করিয়া সে আর ক'দিন কাটাইবে? পেটে কলের জল ছাড়া আজ দুই দিন তাহার আর কিছুই যে পড়ে নাই; কিন্তু ঐ পোড়া পেট তা'র পাওনা না পাইলে আর ত বিনা খরচায় শরীরকে এতটুকু সামর্থ্য সরবরাহ করিতে রাজী নয়! অথচ এই এত বড় প্রকাণ্ড সহরের মধ্যে একটি তণ্ডুলের কণাই বা তাহাকে কে যোগাইবে? চাকরী করিলে হয়। কোন দোকানে চাকরের, অথবা ষ্টেশনে বা বাজারে মুটের দরকারের অভাব নাই, নিজের ভদ্র পরিচয় না দিয়া ঐ পথে গেলে অন্নাভাবটা অন্ততঃ হইবে না। কিন্তু দুলাল রে! একবার তোর চাঁদমুখটি না দেখিয়া যে স্বর্গ নরক কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না! আর কি তোকে কখনও দেখতে পাবো না?

গুম্ গুম্ শব্দ করিয়া কামান-গর্জ্জনের অভিনয়ে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সদানন্দের হৃদয়-তন্ত্রী কি যেন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। বেদনার তীক্ষ্ণ আঘাতে তাহার শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া আসিল। বদ্ধ দরজার উপর শরীরের ভার রাখিয়া সে জলের ঝাট্ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে গুঁড়িসুড়ি মারিয়া বসিয়া পড়িয়া আবার একটা অগ্নিতপ্ত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল—"বাবা দুলাল রে! একবার দেখা দিলি নে, বাপ?"

সহসা ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া কেহ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ তাহার দ্বার খোলার শব্দে চকিত হইয়া সরিয়া বসিয়াছিল, নিবিড় ঘনান্ধকারে মনুষ্যমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। সে আপনার বিশাল শূন্যতাময় ততোঽধিক অন্ধকার হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া আত্মগতই উচ্চারণ করিল—"দুলাল রে! বাপ আমার!"

অন্ধকারে অদৃশ্যপ্রায় কেহ এই শব্দে যেন ভূতাহতবৎ চমকিয়া উঠিয়া স্তম্ভিত স্খলিত-বাক্যে বলিয়া উঠিল—"কে?" তাহার পর সাড়া না পাইয়া পুনশ্চ সে সমধিক সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কে? কে তুমি? কেন আমার নাম ক'রে ডাকছো?"

প্রশ্নকারীর কণ্ঠ যে কম্পিত হইতেছিল, সদানন্দের নিজের সমস্ত দেহ-মনের ঘন আবর্ত্তনে সেটুকু সে জানিতেও পারিল না। সে তখন সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, শব্দানুসরণে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিল, এবং বিদ্যুতালোকে দৃষ্ট, স্তম্ভিত, শঙ্কিত এক তরুণ মূর্ত্তিকে সবলে নিজের বক্ষে দুই হাতে বেড়িয়া জড়াইয়া ধরিয়া বুকফাটা সুগভীর আর্ত্তনাদের সহিত বলিয়া উঠিল—"দুলাল! দুলাল! অন্ধের নড়ি আমার! সত্যি কি আমি তোকে পেয়েছি রে! দশ বৎসর পরে—দশ বৎসর পরে আবার আমি তোকে আমার এই জ্বলন্ত বুকের মধ্যে চেপে ধরতে পেরেছি। ওরে, তুই কি সত্যি সত্যি আমার দুলাল?"

দৃঢ় আলিঙ্গননিবদ্ধ যুবক ক্ষণকাল বাক্যবিমুখ বিস্ময়াভিহত হইয়া রহিল, তাহার পর সে সেই উন্মাদ পিতৃ-আলিঙ্গনপাশ হইতে নিজ দেহকে প্রাণপণে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত করিয়া লইয়া সুগভীর বিস্ময়েরই সহিত

ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল, "দশ বৎসর পরে ?- তবে কি তুমি জেলখানা থেকে আসছ ?"

সদানন্দের শরীরের সেই আসুরিক বল এক মুহূর্ত্ত-মধ্যে কোথায় যেন চলিয়া গেল! সে মুহ্যমান অবসন্নবৎ পতনোন্মুখ হইয়া আত্মরক্ষা করিল, তাহার কণ্ঠ কোনমতে এইটুকু শুধু উচ্চারণ করিল, "হ্যাঁ।"

তাহার পর কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। অবশেষে সেই বৃষ্টির করতাল-বাদন-শব্দ-মুখর ও বাতাসের হাহাকারে করুণতর সকাতরা প্রকৃতির জীর্ণ বক্ষকে বিদীর্ণতর করিয়া দিয়া পিতার মর্ম্মবিদারী স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উচ্চারিত হইল—"দুলাল!"

একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস প্রবল ঝড়ের শব্দকেও পরাস্ত করিয়া ভাসিয়া উঠিল। পুত্র কহিল—অত্যন্ত সাবধানতাপূর্ণ সঙ্কোচের সহিত সলজ্জে কহিল, "দেখ, এখানে কেউ জানে না যে, আমার বাপ বেঁচে আছে। আর সে সব কথাও এরা কেউ জানে না। আমি এখন আই, এস্-সি, পড়ি, ম্যাট্রিকে স্কলারশিপও পেয়েছিলুম, তোমায় যদি কেউ দেখে বা জানতে পারে, তা' হ'লে আমি একেবারে লজ্জায় ম'রে যাব। তাই বল্‌ছি—" একটু থামিয়া তাহার পর আবার বলিল, "তুমি এখানে আর এসো না।" ক্ষণপরে বাক্যবিমুখ চেষ্টাবিরহিত বাপের উদ্দেশে ঈষৎ করুণার সহিত সে কহিল, "কোথায় আছ! দেশে গেলে হ'ত না ?"

আর্ত্ত বাতাস তখন সমধিক উচ্চ কণ্ঠে হাহাকার করিতেছিল, বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ছুরী যেন আকাশের বিশাল বক্ষকে কুচি কুচি করিয়া কাটিতেছিল। ভিতর হইতে আর এক জন কেহ ডাকিয়া বলিল—"দুলালবাবু! কা'র সঙ্গে গল্প করছেন ?" বিমূঢ় দুলালের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভীত আর্ত্ত আহত কণ্ঠে সদানন্দ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল, "ওগো, কেউ নয়, আমি এক জন ভিকিরী।" সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এক দিন সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে এক দল পুলিস প্রহরী আসিয়া নন্দ বসাক লেনের একটা মেস-বাড়ীর চারিধার ঘেরাও করিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার লোক ও পথের লোক সেখানে একটা হাট বসাইয়া ফেলিল। সকলেই সমকৌতূহলে কারণ জানিবার জন্য পরস্পরকে একই প্রশ্ন করিতেছিল, ব্যাপার কি?—উত্তর কিন্তু কাহারও মুখে শুনা গেল না।

পরিশেষে ব্যাপার যে কি, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ দেখা গেল—পুলিস এক পরিণতমূর্ত্তি সুবেশধারী তরুণ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া বাটীর বাহিরে আসিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেস-বাড়ীর বাসিন্দা যুবকের দল। ছেলেরা সকলেই বিশেষভাবে উত্তেজিত। কেহ কেহ বলিতেছে, "ছি ছি, কি ঘৃণার কথা! এক জন আণ্ডার গ্রাজুয়েটের এই জঘন্য কায!" আবার অধিকাংশই ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ পূর্ব্বক তুমুল তর্ক তুলিতেছে। "খোট্টাটাকে মেসে ঢুকিয়ে আজ ভদ্রলোকের ছেলের এত বড় অপমান ঘটতে দেওয়া হলো! ছি ছি, দুলাল যে মাস মাস পনর টাকা স্কলারশিপ পায়, সে কি না ওর একশ'টাকা টেবলের উপর প'ড়ে আছে দেখে আর লোভ সামলাতে পারলে না! এ-ও বিশ্বাস হয়! আচ্ছা, এর ফল আমরা দোব!"

প্রতিপক্ষ প্রবল কোলাহলে আত্মসমর্থন করিতেছিল—"সেই বৃষ্টির রাত্রিতে, কেউ বাড়ী ছিল না, শুধু দুলাল বাবু ছিলেন আর আমি ছিলেম। তোমরা সে কথা ত আজ অস্বীকার করতে-পার না, বাইরে কোন একটা ভিখিরীর সঙ্গে গল্প ক'রে বাবু যখন ভেতরে এলেন, তখন আমি খেতে বসেছি, টেবলে নোটের তাড়া প'ড়ে ছিল, কিছুক্ষণ পরে মনে পড়তে তাড়াতাড়ি দেখতে গেলুম, বেমালুম উপে গেছে! তা'র পর জিজ্ঞেস করতে প্রথমটা দুলালবাবু একটি কথা কইতে পারেন নি, সেগুলো মশাই কিসের লক্ষণ! আপনারা সব্বাই এককাট্টা হয়ে ওনারই পক্ষ নিলেন, অথচ—"

সেই ভিড়ের মধ্য হইতে এক জন শীর্ণকায় দীর্ঘাকৃতি মধ্যবয়স্ক পুরুষ স্খলিতপদে কষ্টে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া ভিড় ঠেলিয়া পুলিসবাহিনীর সম্মুখে আসিয়া স্থির ও দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "বাবুকে তোমরা ছেড়ে দাও, উনি কিছু জানেন না। সে দিন ঝড়ের রাতে আমিই এখানে আশ্রয় নিয়েছিলুম, আর খোলা দরজা পেয়ে বাবু চ'লে গেলে চুপি চুপি ভিতরে গিয়ে নোটের গোছা দেখতে পেয়ে

তুলে নিই—টাকা অবশ্য আমার কাছে নেই, সে খোয়া গেছে! তবে আমি এক জন দাগী আসামী। হুগলীর জেলখানা থেকে মোটে এই পাঁচ দিন হ'ল বা'র হয়ে এসেছি, সেখানে আমার নম্বর ছিল ১২৭—খবর নিলেই টের পাবে।"

খোট্টা যুবকটি "শালা!" বলিয়া তাহার পিঠে একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের কিল মারিল। তাহার পর পুলিস-হস্তমুক্ত স্তব্ধ স্থির অসাড় অ-নড় দুলালের জ্ঞানশূন্য—প্রাণশূন্যবৎ মুখের দিকে চাহিয়া সকাতরে হাতযোড় করিল এবং বলিল, "ধ'রে দু' ঘা যদি পিটিয়ে দেন, মুখে লাথিও মারেন—আমার কিচ্ছুটিও আপনাকে বলবার নেই।"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

শিল্পের 'ক' ও 'খ'
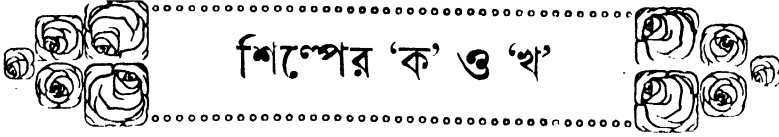
পাথর কেটে, কাঠ কুঁদে, ছবি বার করলে ভাস্কর—কাটার এবং কোঁদার বাহাদুরি খানিকটা জড়িয়ে রইলো ছবিতে, মূর্ত্তির সঙ্গে মূর্ত্তি যে মানুষটা গড়লে, সে-ও রইলো জড়ানো, কাযেই মূর্ত্তিকে বলা গেল না অমানুষি কিছু। ধাতুতে ছবি ঢেলে বার করলে, কেটে সাফ করলে, ঘ'ষে পালিস্ করলে, প্রত্যেক অবস্থাতে ধাতুমূর্ত্তিটা মানুষ আর তা'র কারিগরকে ব্যক্ত করতে থাকলো অনেকখানিই। সূচের আগায় ফুল তুল্লে কারিগর কাপড়ের উপরে, সূচ দিয়ে তামার ফলকের গায়ে আঁচড় দিয়ে দাগলে, ছাপলে (চাপ দিয়ে বসালে) নানা নক্সা দেওয়ালের গায়ে, বইয়ের পাতায় কোনো কায কারিগর এবং তা'র শক্তি সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়ে উঠতে পারলে না শক্ত কায সব এইটেই প্রমাণ হ'ল, এ সব থেকে! মানুষের ছোঁয়াচ মানুষের গন্ধ পাওয়া গেল তা'র হাতে রচা ফলে।

কথায় বলি আমরা, মূর্ত্তি ঢালা হয়েছে, কাটা হয়েছে, কাঁথার ফুল তোলা হয়েছে, নক্সা দাগা হয়েছে, ছবি ছাপা হয়েছে! কারিগরের অস্ত্রের ঘায়ে এ সব মূর্ত্তি নক্সা বার হ'তে বাধ্য হ'ল, এটুকু ভোলা গেল না! পটে আঁকা ছবির বেলায় অন্য কথা—সেখানে বলতে হ'ল, ছবি ফুটলো! রাতের ছবি ফুটলো পটে, দিনের ছবি ফুটলো, ফুলের ছবি ফুটলো! এ যেন আর একটা জগতে চোখ পড়লো আপনা হতেই। চিত্রকর যে ঘাড় ধ'রে আমাদের মুখ ও চোখ সে দিকে ফেরালে, তা' নয়, সে যে নিজের শক্তি দেখিয়ে পটের গায়ে ছবিটা আবিষ্কৃত ক'রে ধরলে চোখে, তাও নয়। ফুল ফুটেছে যখন—তখন ফুলের নিজের রূপ আর পরিমল দিয়েই তা'র উপভোগ, এ কথা নিয়ে নয় যে, কোন্ মালীর হাতে বাড়ানো কোন্ গাছের ফুল! তেমনই চিত্রবিদ্যায় চরম হ'ল, চিত্র সেখানে ফুটলো চমৎকার, কিন্তু চিত্রকর মিলিয়ে গেল বাতাসে একেবারে পরিষ্কার।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝড়ের রাগিণী

সে দিন সকাল থেকেই বেশ বাদলা নেমেছিল; মেঘ-মেদুর আকাশ, আর থেকে থেকে হুহু ক'রে হাওয়া প্রাণের ভিতর কি যেন একটা অজানা রাগিণীর অচিন সুর ধ্বনিয়ে তুল্‌ছিল।

হ্যারিসন রোডের একটা মেসের নীচেকার একটা ঘরে আমরা তিন-চারটিতে ব'সে বৈকালিক চা পান কর্‌তে কর্‌তে থিয়েটারে এখন ভাল অভিনেত্রী কে, নন্‌-কো-অপারেসন—ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ম্যাচ প্রভৃতি বিভিন্ন তর্কে ঘরটিকে গুল্‌জার ক'রে তুলেছিলাম।

সুবোধ চা'র বাটিতে একটা বড় রকমের চুমুক দিয়ে বল্লে, "ওরে শরৎ, তোর হারমোনিয়মটা বা'র কর, বরেন গানটান ধরুক—এ বাদলায় আর কিছু ভাল লাগে না; বাটি বাটি চা ধ্বংস করা যাক আর মসগুল হয়ে ব'সে বরেনের গান শোনা যাক্।"

আমরা সকলে প্রায় একসঙ্গেই ব'লে উঠলুম,—"বেশ বেশ, আমরা সকলেই সুবোধের কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন কর্‌ছি।" এই ব'লে শরৎ তক্তপোষের নীচে থেকে হারমোনিয়মটা বা'র ক'রে বরেনের সামনে বসিয়ে দিলে। বরেন হারমোনিয়মটা কোলের উপর তুলে নিয়ে একটা পর্দ্দা টিপে বল্লে,—কি গান কর্‌বো?"

সুবোধ তক্তপোষের উপর হাত চাপড়ে বল্লে,—"এমন বাদলায় আবার জিজ্ঞেস কর্‌তে হয়, কি গান কর্‌বি? কাজরি জানিস্—কাজরি।"

বরেন মাথা নেড়ে বল্লে,—"না, ও কাজরি-টাজরি আমি জানি নে।"

"তা' হ'লে রবি বাবুর গান ধর।"

এই ব'লে গুন গুন ক'রে সুবোধ নিজেই গান ধর্‌লে—

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।"

বরেন হারমোনিয়মটায় জোর দিয়ে বল্লে, "বাঃ সুবোধদা, গলা ছেড়েই হোক না, লজ্জা কি, এখানে ত আর শালীটালি কেউ নেই", এই ব'লে শরতের দিকে চেয়ে চোখ টিপে অর্থপূর্ণ হাসি হাস্‌লে।

সুবোধচন্দ্র মোটেই গায়ক নয়, তা'র বিয়ের সময় না কি তা'র অনেক আপত্তি ও কাকুতি-মিনতি সত্বেও তা'র শ্যালিকাবৃন্দের অনুরোধে তা'কে গান ধরতে হয়েছিল; দুঃখের বিষয়, তা'র গানের প্রথম চরণ শেষ না হতেই তা'র শ্যালিকাবৃন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চ হাস্যে সুবোধচন্দ্রের গান অর্দ্ধপথেই থামিয়ে দিয়েছিল। সে দিন থেকে সুবোধ আর কোন দিন তা'র গান গুন গুনের চেয়ে চড়া পর্দ্দায় ধরেনি।

"যা যা, আর ইয়ারকি দিতে হ'বে না, এখন যা' বলছি, গা; বাপ-মা এখনও বিয়ে দিলে না, তা বাদলা দিনের সুর বুঝবি কি ক'রে বল? সে সুরের পর্দ্দায় পর্দ্দায় কেবল বিরহ জেগে উঠবে আর মনটা একেবারে উদাস হয়ে যা'বে।"

শরৎ একটু হেসে বল্লে, "সত্যি, সুবোধদা, আমি ও কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারিনে; বলে—কোকিল ডাকল আর বিরহীদের ছটফটানি ধরল, বাদলা নামল ত অমনি সব বিরহে কাবু হয়ে পড়লো।"

সুবোধ আশ্চর্য্যভাবে বল্লে—"সে কি রে, তুই হলি একটু আধটু কবি, আর এগুলো বুঝিস না—নাঃ, নিতান্ত বেরসিক।"

শরৎ হেসে বল্লে, "অনেকেই তাই, নিজে কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, যখন কবিরা ও বিষয় নিয়ে বড় বড় কাব্য লিখে গেছে, তখন সবাইকে কাবু হতেই হ'বে। কেমন? কবে কোন্ কালে বিরহী যক্ষ মেঘ দেখে কালিদাসের মেঘদূতের সৃষ্টি করেছে, কাযেই লোকের কাছে কবিত্ব দেখাতে মেঘভরা আকাশের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকতেই হ'বে।"

"প্রাণটা তোর নিতান্ত শুক্‌নো, তাই প্রকৃতির সরসতা বুঝতে পারিস না।"—এই ব'লে বরেনকে একটা ছোট রকমের ধাক্কা দিয়ে সে বল্লে, "নে, নে বরেন, তুই গান ধর।"

বরেন হারমোনিয়মের সুরে সুর মিলিয়ে গান ধরলে আর সুবোধ সকলের চেয়ে বেশী বেশী মাথা নেড়ে তারিফ করতে লাগল।

"প্রাণ দিয়ে যে তোমায় খুঁজি বাহির মনে,
চিরদিবস মোর জীবনে।"

বরেন সবে মাত্র গানের দু'চরণ গেয়ে অন্তরাটা ধরেছে, এমন সময় সিক্তবসনা এক রমণী খানিকটা বাদল হাওয়া সঙ্গে নিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বল্লে—'ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, ও গান আর গেয়ো না।"

গান বন্ধ হয়ে গেল—সকলেরই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল সেই অপরিচিতার মুখের উপর। আপনাকে একটু সামলে নিয়ে সুবোধ জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কে গা, বাছা?"

মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে ঘোমটা দিয়ে রমণী বল্লে—'আমায় তোমরা চেন না? আমি যে বৌবাজারের বউ।"

সকলেই মুখ চাওয়াচাহি করতে লাগল। শরৎ বল্লে, "তা বাছা, যেখানে যাচ্ছিলে, যাও।"

উদাস দৃষ্টিতে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রমণী বল্লে—'তোমরা ভাবছ, আমি একটা পাগলী, তা নয়, অত্যাচার সয়ে সয়ে আমার মাথা একটু খারাপ হয়ে গেছে।"

বরেন হারমোনিয়মটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে বল্লে, 'তা' হাঁ বাছা, তুমি এ গানটা গাইতে বারণ করলে কেন?"

সেই ভাবেই চেয়ে থেকে রমণী বল্লে, "ওগো, ছেলেবেলা থেকে ঐ গান আমি বড় ভালবাসি, ঐ গানই আমার এই দশা করেছে। আমার প্রাণে বড় জ্বালা গো বড় জ্বালা। তোমাদের পায়ে পড়ি, একটু শোন—"

রমণী বলতে লাগল—"আমি বৌবাজারের এক গেরস্তোর বৌ; সাজান সংসার—শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেওর। দশ বছর বিয়ে হয়েছিল, এত দিন বেশ সুখেই ছিলুম; বিধবা হয়ে ননদ বাড়ীতে ঢুকল, আমারও সুখের দিন ফুরুল। তখন থেকেই দেখলুম, হঠাৎ স্বামী আমায় সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন; আমি অনেক ভেবেও তা'র কোন কারণ খুঁজে পেলুম না—মুখ বুজে সব সইতেই লাগলুম।

"আমাদের পাশের বাড়ীর আমার ঘরের দিকের একটা ঘর থেকে রোজই আমার পরিচিত এই গানটা কে গাইত, খুব ভাল লাগত; যখনই গাইত, হাতে কায না থাকলে আমি জানালার খড়খড়ি তুলে সেই বন্ধ জানালাটার দিক চেয়ে থাকতুম; চোখ দুটো বন্ধ জানালা ভেদ ক'রে দেখতে চাইত—সেই মিষ্টি সুরের অধিকারীকে।

"এক দিন দুপুরবেলায় সেই রকম গান শুনছি, হঠাৎ শুনলুম, ননদ চেঁচিয়ে বলছে—'ছি! ছি! কি বেহায়া বৌ, মা! ওদের ছোঁড়াটা ওর দিকে চেয়ে হাসছে আর গান করছে আর ও কি না হাঁ ক'রে তা'র মুখের দিকে চেয়ে আছে। কি ঘেন্না, মা।'

"আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কি আশ্চর্য্য, দুটো জানালাই বন্ধ, তবুও আমি তা'র দিকে চেয়ে আছি!"

উন্মাদিনীর দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—একটু চুপ ক'রে থেকে সে আবার উদাস হাসি হেসে বলতে লাগল, "তখন বুঝতে পারলুম, স্বামীর লাঞ্ছনা, শ্বশুর-শাশুড়ীর গঞ্জনা আর ননদের তাড়নার কারণ। সে দিন আমার অত্যাচারের মাত্রা বড় বেশী হ'ল; আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলুম। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলুম, আমার শোবার ঘরের মেঝেয় আমি প'ড়ে। একে একে সব কথাই মনে পড়ল। কেন বুঝতে পারলুম না, খুব জোরে হো হো ক'রে হেসে উঠলুম। সেই হাসি শুনে পাশের বাড়ীর এতদিনকার বন্ধ জানালাটা খুলে একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'হাঁগা, তোমার কি কোন অসুখ করেছে, মাঝে মাঝে খুব কাঁদছ আবার হো হো ক'রে হাসছ!' আমি বল্লুম, 'না, অসুখ করেনি - হ্যাঁগা, তুমিই কি সেই গানটা গাও?' মেয়েটি একটু হেসে ঘাড় নেড়ে বল্লে, 'হ্যাঁ!' হঠাৎ দেখলুম, মেয়েটি জানালা থেকে স'রে গেল। পেছন ফিরে দেখি, আমার স্বামী আর তাঁ'র ভগিনী আর তাঁদের পিছনে শ্বশুরশাশুড়ী। স্বামিদেবতা আমায় মারতে মারতে ঘর থেকে টেনে বাইরে এনে বল্লেন, 'এখনও সেই—আমার মুখে চুণ-কালি দিচ্ছিস, নিকাল বাড়ীসে!' অসহ্য যন্ত্রণার কাঁদতে কাঁদতে বল্লুম, "ওগো, আর মেরো না। তা'র চেয়ে একেবারে মেরে ফেল, আমি আর সইতে পারি না।' ননদ চুলের মুটী ধ'রে নেড়ে দিয়ে বল্লে, 'আর সোহাগ ক'রে কাঁদতে হবে না, দিচ্ছি সব চুলগুলো কেটে।'

এই ব'লে ছুটে একখানা বঁটী এনে চুলগুলো কেটে দিলে। আমি তা'র পায়ে হাত দিয়ে বল্লুম—'ওগো, তোমার পায়ে পড়ি; আমার গলায় বসিয়ে দাও।' সেইখানে আমায় ফেলে রেখে সবাই চ'লে গেল। আমার বুকটা ফেটে দু'খান হয়ে যাবার মত হ'ল—ভাবলুম, মুখ বুজে সহ্য করতেই আমাদের জন্ম। আমার মাথার ভেতর কে যেন জ্বলন্ত আঙ্গরা বসিয়ে দিলে। তা'র পর যেন সব ভুলে গেলুম। কতক্ষণ পরে আমার হাসি এল। মনে হ'ল, কেনই বা এত সইছি, মা গঙ্গা রয়েচেন, তিনি ত আর ঘেন্না ক'রে ফেলবেন না। মনটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেল। ভয়-ভাবনা, ঘেন্না-লজ্জা কিছুই রইল না। সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে পড়লুম; সোজা গঙ্গার পথ ধ'রে আস্‌ছি।" এই ব'লে অর্থশূন্য হাসি হেসে সে সকলের দিকে চাইতে লাগল।

"যেতে যেতে তোমাদের জানালার ধারে এসে আবার সর্ব্বনেশে গান আমার কানে গেল। এততেও সে গান শোনবার লোভ ছাড়তে পারলুম না, জানালার ধারে দাঁড়ালুম। মনটা বিদ্রোহী হয়ে বল্লে, 'না, ও গান আর শুনিসনি, আর ওদেরও বারণ ক'রে দে ও গান গাইতে।' তা'র কথা ঠেলতে পারলুম না, ছুটে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।"

রমণী চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। সকলেই নির্ব্বাক, গৃহ শব্দহীন, শুধু ঝড়ের উদাসকরা রাগিণী থেকে থেকে খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে ঘরের করুণ সুরটাকে আরও বিষাদ-মলিন করে তুল্‌ছিল।

"না গো, বড় জ্বালা, গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে না পড়লে এ জ্বালা জুড়বে না।"

সে যেমন ভাবে এসেছিল, তেমনই ভাবে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শরৎ বল্লে, "সে কি হে, চোখের ওপর সত্যি পাগলীটা ডুবে মরবে না কি?"

আমরা সকলেই নগ্নপদে ফুটপাথে বেরিয়ে এলুম—সেই সীমাহীন জনস্রোতের মাঝে শুধু তাকে ব্যর্থ খোঁজা খুঁজতে।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র।

আশঙ্কা

ব্রজ ত্যজি মথুরায় যদি শ্যাম চলি যায়
নিরানন্দ ব্রজবাসে কে তবে রহিবে আর?
শ্যামহীন ব্রজে তবে কি সুখে রহিব সবে
ব্রজের বিপিনে যদি না বাজে বাঁশরী তা'র?
শ্যাম বিনা অন্ধকার ব্রজে কি শোভিবে আর
উষায় তরুণ ভানু, নিশাকালে শশধর!
আর কি গাহিবে পাখী বিরাবে সোহাগ মাখি'?
আর কি নাচিবে শিখী গোবর্দ্ধন গিরি'পর?
অশোক, মাধবী, বেলা বসন্তে কুসুম-মেলা
আর কি শোভিবে যদি রাস দোল নাহি হয়?
মধুপান-মত্ত ঢলি' আর কি পড়িবে অলি
গোপিকার এলায়িত কেশে ফুলরেণুময়?
বরষার নব ঘনে স্নিগ্ধ ধারা বরষণে
হ'বে কি কদম্বকুঞ্জ কুসুমিত সুষমায়?
আর কি যমুনা-জল উছলিবে কল কল
জলকেলি আর যদি নাহি হয় যমুনায়?
র'বে শুধু দীর্ঘশ্বাস র'বে শুধু হা-হুতাশ
বেদনার আর্ত্তনাদ র'বে শুধু চরাচরে;
ছিন্ন-নাল কমলিনী হ'বে শ্যাম-সোহাগিনী
বৃকভানুসুতা রাধা লুটা'বে ধরণীপ'রে।
অকাল-জলদ-ঘটা আবরিবে রবিছটা
তিতিবে এ ব্রজ শুধু ব্রজবাসি-আঁখিজলে—
শ্যাম বিনা গোপিকার র'বে কি জীবন আর?
কালার বিরহ-জ্বালা জুড়াবে যমুনাতলে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মথুরা

প্রথমে যখন একটা নূতন জিনিষ দেখা যায়, তাহার কথাটা যত মনে থাকে, পরে বহুবার সেই জিনিষটা দেখিলেও সে সময়ের কথাগুলা তত মনে থাকে না। মথুরা যে কতবার দেখিয়াছি, তাহা গণিয়া বলা মুস্কিল। মথুরায় যখন প্রথম যাই, তখন আমি অত্যন্ত শিশু; সুতরাং সে কথা বিশেষ কিছু মনে নাই; কেবল বিশ্রাম ঘাটে বড় বড় কচ্ছপ দেখিয়াছিলাম, এই কথা মনে পড়ে। বড় হইলে প্রথম মথুরায় যাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। তখনও আগ্রা-দিল্লী কর্ড রেলওয়ে খুলে নাই; সুতরাং কলিকাতা হইতে মথুরায় যাইতে হইলে টুণ্ডলা ও আগ্রায় নামিয়া যাইতে হইত। আমি ও আমার এক জন আত্মীয় দিল্লী হইতে মথুরায় আসিতেছিলাম। আমরা পঞ্জাব মেলে রাত্রি ১২টার সময় দিল্লী হইতে উঠিয়া শেষ রাত্রিতে টুণ্ডলা ও বেলা ৭টার সময় আগ্রায় পৌছিলাম। আগ্রা হইতে ৭টার সময় ছোট রেলে চড়িয়া বেলা ৯৷৷০টার সময় মথুরায় পৌছিলাম। তখন রেলের যে ষ্টেশনটি মথুরা জংশন নামে পরিচিত ছিল, এখন তাহা মথুরা ক্যান্টনমেন্ট নামে পরিচিত। এখন মথুরায় বড় রেল হওয়ায় যে স্থানে জি, আই, পি ও বি, বি, সি, আই রেলওয়ে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই ষ্টেশনটির নাম হইয়াছে মথুরা জংশন। এই ষ্টেশনটি মথুরা সহর হইতে অনেক দূরে; মথুরা ক্যান্টনমেন্ট, বা ছাউনীর বাহিরে মাঠের মাঝখানে অবস্থিত। এখান হইতে গাড়ী বা এক্কা চড়িয়া চারি মাইল দূরে অবস্থিত মথুরা সহরে যাইতে হয়।

মদনমোহনের পুরাতন মন্দির—বৃন্দাবন

জ্ঞান হইয়া যখন প্রথম মথুরায় যাই, তখন আমার সঙ্গে যে আত্মীয় ছিলেন, তিনি বড় রহস্যপ্রিয়। এখন তিনি পরলোকে; সুতরাং তাঁহার বিদ্রূপবাণের ভয় নাই, তথাপি নানা কারণে তাঁহার নাম গোপন রাখিতে বাধ্য হইলাম। সাবেক মথুরা জংশনে নামিয়াই আত্মীয়টি এক বন্ধু জুটাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই বন্ধুটি এখনও জীবিত আছেন; সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহার নামটি বদলাইতে হইল। নূতন বন্ধু পাইয়া আত্মীয়টি ষ্টেশনে আলাপ করিতে বসিয়া গেলেন; এমন ভাবে জমিয়া গেলেন যে, সে দিন যে তাঁহার ষ্টেশন হইতে সহরে যাওয়া, বাসা খুঁজিয়া লওয়া অথবা আহারের চেষ্টার প্রবৃত্তি আছে, তাহা বোধ হইল না। তাঁহার গতিক সুবিধা নহে দেখিয়া আমি একখানা গাড়ী ঠিক করিয়া তাহাতে মালপত্র উঠাইয়া দিলাম। গাড়োয়ান আমাকে কলিকাতার নূতন বাবু বুঝিয়া আড়াই টাকা ভাড়া স্থির করিয়া লইল। ষ্টেশনের ভিতরে আত্মীয়টিকে ডাকিতে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি ও তাঁহার বন্ধু পান ও সিগারেটের দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন। ধরিয়া লউন যে, আমার আত্মীয়ের নূতন বন্ধুর নাম পণ্ডিত মোহনলাল। আমি সেই প্রথম মথুরা সহরে আসিয়াছি এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ভাড়াটীয়া গাড়ীর ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়াছি শুনিয়া পণ্ডিতজী বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "বাবুজী, এই মথুরা সহরে দুই শ্রেণীর জুয়াচোর

সোনোট টিলা

করিয়া তামাক সাজিতে আরম্ভ করিলেন। উত্তরাধিকারগত দৌর্ব্বল্যের জন্য তিনি চটীজুতা জোড়াটা রান্নাঘরের বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্পেশাল কলিকার আগুন সংগ্রহ হইবামাত্র তাঁহাকে তাহা একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত নির্ব্বাপিত করিতে হইয়াছিল। কারণ, সেই অবসরে একটি দীর্ঘকায় হৃষ্টপুষ্ট পবননন্দন নূতন কে, এম, দাসের এক পাটি সংগ্রহ করিয়া পাশের বাড়ীর চারিতলার ছাদের উপর গিয়া বসিয়াছিল। আমি যখন বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিলাম, তখন আত্মীয়টি কলিকাতার সুবিখ্যাত কে, এম, দাসের এক পাটি হাতে লইয়া হতাশভাবে ছাদের উপরে বসিয়া আছেন, নূতন চাকর বটুক ছোলা কিনিতে বাজারে গিয়াছে এবং পবননন্দন অতি গম্ভীর দার্শনিক পণ্ডিতের মত চটী জুতাখানা লইয়া পাশের বাড়ীর ছাদে বসিয়া আমার আত্মীয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। যথাসময়ে ছোলাভাজা আসিল, জুতা যথাস্থানে ফিরিল এবং রন্ধন আরম্ভ হইল।

আছে, প্রথম শ্রেণীর জুয়াচোর পাণ্ডা বা চৌবেজী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জুয়াচোর গাড়োয়ান ও এক্কাওয়ালা। তোমরা কোথায় যাইবে?" কোথায় যে যাইব, তখনও তাহা স্থির ছিল না, অগত্যা পণ্ডিতজীকে জানাইলাম যে, আমরা পাণ্ডার বাসায় উঠিব। তখন মোহনলালজী বলিলেন যে, অধিকাংশ যাত্রী রেলের পুলের নিকটে বাঙ্গালীঘাটে থাকে। সেখানকার বাসাওয়ালারা মাছ-মাংস রাঁধিলে আপত্তি করে না, সুতরাং বাঙ্গালী যাত্রীর পক্ষে সেই স্থানই সুবিধা। যমুনার অতি নিকটে বাঙ্গালীঘাটের উপরে আমরা একটা বাসা লইলাম। বাসাটি দোতলা; কিন্তু দুয়ার-জানালা সমস্তই লোহার শিক দিয়া আবদ্ধ। কারণ, বানরের উপদ্রব। বানরের উপদ্রব এখন মথুরা সহরে অনেকটা কমিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তখন তাহা অতি ভীষণ ছিল। কারণ তখনই বুঝিতে পারিলাম। পণ্ডিতজী বাসা ঠিক করিয়া দিয়া এক জন চাকর জোগাইয়া বিদায় লইলেন, আমি বাজার করিতে বাহির হইলাম এবং আত্মীয়টি একটি চারি ইঞ্চি লম্বা পাতরের কলিকা বাহির

বেলা তিনটার সময় আহারান্তে একবার চক্ষু মুদ্রিত

মনসা দেবীর টিলা

করিতে বাধ্য হইলাম, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে চক্ষু খুলিয়াই দেখিলাম যে, পাষাণময়ী কলিকার তীব্র ধূমে ও গন্ধে ছোট বাড়ীটি ভরিয়া উঠিয়াছে এবং একতলার উঠানে ইঁদারার পার্শ্বে বসিয়া আমার আত্মীয় ও পণ্ডিত মোহনলালজী ঘন ঘন কলিকা বিনিময় করিতেছেন। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত স্থানে তীব্র ধূম পান করিতে দেখিয়া আত্মীয়টির উপর তখন বড়ই চটিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন বিবেচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, আমার সেই স্বর্গগত আত্মীয় কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ব্যয় করিয়া চারি ইঞ্চি পরিমিত পাষাণময়ী কলিকা এবং কিঞ্চিৎ পরে শুভ্র সুধাসারের আট আউন্স পরিমিত শিশি বাহির করিয়া মথুরানিবাসী পণ্ডিত মোহনলালজীকে দুর্ভেদ্য প্রেমপাশে আবদ্ধ না করিলে আমার মথুরাযাত্রা বিফল হইত। তরল সুধাসার পাষাণময়ী কলিকার অমৃতের সহিত মিশ্রিত হইলে আমার আত্মীয়ের সহিত পণ্ডিত মোহনলালজীর বন্ধুত্ব ক্রমে ঘন প্রেমে পরিণত হইল।

বিমকদফিসের মূর্ত্তি—সম্মুখের দৃশ্য

বিমকদফিসের মূর্ত্তি—পার্শ্ব দৃশ্য

কলিকাতা হইতে সংগৃহীত গৌড়ী নামক স্বচ্ছ সুধাসার শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া দুই বন্ধু সুধা সংগ্রহে বাহির হইলেন। আমি মনে মনে বিরক্ত হইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

রেলের পুল হইতে বিশ্রামঘাট পর্য্যন্ত যমুনার ধারে ধারে একটা সুন্দর বাঁধান রাস্তা আছে। রাস্তাটি অতি পুরাতন। বিশ্রামঘাটের নিকটে অনেকগুলি খাবারের দোকান আছে। পথে যাইতে যাইতে বহরমপুরের পুরাতন ডাক্তার পিতৃবন্ধু পূর্ণচন্দ্র দাসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট হইতে পথ জানিয়া লইয়া বিশ্রামঘাট পর্য্যন্ত চলিয়া গেলাম এবং ফিরিবার সময় রাত্রির জন্য খাবার কিনিয়া লইলাম। কারণ, বাসা হইতে বাহির হইবার সময়ই আত্মীয়ের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি যে রাত্রিতে আহার করিবেন, সে আশা

কাটরা টিলা

বেড়াইতেছিলাম। এই শিলালেখখানি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মথুরা নগরে খননকালে কোনও স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে ইহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মথুরা নগরে যত পুরাতন স্থান আছে, সেই সকল যায়গায় এই শিলালেখখানি খুঁজিবার জন্য আমি মথুরায় গিয়াছিলাম। পণ্ডিত মোহনলালজীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে, মথুরা জিলায় এমন স্থান নাই যাহা তাঁহার অপরিচিত। আত্মীয়ের নূতন বন্ধুর সাহায্য লইয়া পরদিন হইতে নিজের কাযে লাগিয়া গেলাম।

ছিল না। পূর্ণ বাবুর উপদেশ অনুসারে খুর্টন নামক শুষ্ক সরের মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বাসায় পৌছিয়া আত্মীয়ের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

সেই দারুণ শীতে, কালটা পৌষমাস, পণ্ডিত মোহনলালজী উঠানে হ্যারিকেনের আলোকে হামামদিস্তায় পেঁয়াজ ও গরম মসলা কুটিতে বসিয়া গিয়াছেন এবং নর-দ্রৌপদী আত্মীয় এক হাতে পাতরের কলিকা ধরিয়া আর হাতে রন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত মোহনলালজী কনৌজীয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চৌবে নহেন, তিনি তখনকার মিউনিসিপ্যাল কমিটীর মেম্বর এবং ভরতপুর রাজ্যে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি আছে। গৌড়ীয় শুভ্র সুধাসারের অনুগ্রহে সরলমতি পণ্ডিতজী পলাণ্ডুযুক্ত অজমাংস ও খেচরান্ন প্রচুর পরিমাণে গলাধঃকরণ করিয়া রাত্রিকালে গৃহে ফিরিতে পারিলেন না; আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়া গেল।

আমি তখন কণিষ্ক নামক এক জন শক-রাজার ইতিহাস সংগ্রহ করিবার জন্য একখানি শিলালেখ খুঁজিয়া

মথুরা নগর যে কত দিনের, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আর্য্যরা এই দেশে আসিবার পূর্ব্বে মথুরা নগর ছিল। মথুরা দৈত্য বা অসুর নামক দ্রবিড় জাতির শাখাবিশেষের একটি প্রধান নগর। যাদব জাতির শূরসেন শাখার রাজারা মথুরা অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত অসুরদের অনেক দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল। কংসবধ করিয়া কৃষ্ণ মথুরা জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও অধিক দিন নিরাপদে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই; দৈত্য বা অসুরদের ভয়ে তাঁহাকেও মথুরা ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছিল।

চামুণ্ডা টিলা

মথুরা নগরের ধ্বংসাবশেষ অনেক দূর বিস্তৃত। চারিদিকে বহু দূর দাঁড়াইয়া এই মহানগরের পুরাতন গৌরবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা সহর ও ছাউনীতে অনেক পুরাতন ধ্বংসাবশেষ আছে ও ছিল, এইগুলি এখন "টিলা" বা ঢিবি নামে পরিচিত। কঙ্কালী টিলা, কাটরা টিলা, কংস টিলা, গণেশ টিলা প্রভৃতি বহু টিলা খনিত হওয়ায় খৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টাব্দের ১২শ শতক পর্য্যন্ত দেড়হাজার বৎসরের মূর্ত্তি ও মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মথুরায় এবং চারি পাশে এককালে জৈনধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং হাজার হাজার জৈনদিগের মূর্ত্তি, স্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

কণিষ্কের মূর্ত্তি

মথুরার অনেকগুলি টিলা খনিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও ছোট বড় অনেক টিলা খনন করিতে বাকি আছে। ইহাদের মধ্যে কাটরা টিলা প্রধান। এই স্থানে শককায় সম্রাট একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই কাণ্ড

টিলাটির অনেক অংশ এখনও খনন করা হয় নাই। সোনোট টিলায় প্রতিবৎসর কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের সোনার মোহর পাওয়া যায়। এখন ইহার চারিদিকে বসতি হইয়া খোলা যায়গা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনসাটিলার উপরে মনসাদেবীর একটি আধুনিক মন্দির আছে। চামুণ্ডা টিলায় চামুণ্ডাদেবীর একটি পুরাতন পাতরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ মথুরা নগরে এখনও শত শত টিলা আছে। মথুরায় যে কেবল বৌদ্ধ মূর্ত্তিই পাওয়া যায়, তাহা ঠিক নহে। খৃষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ও পরে জৈনধর্ম্মই মথুরার প্রধান ধর্ম্ম ছিল এবং এই সময়ে জৈনধর্ম্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে।

মথুরায় একটি ছোট মিউজিয়ম্ আছে; ইহা মথুরা ক্যান্টন-মেন্টে তহশীল কাছারীর নিকটে অবস্থিত। মথুরা সহরের মোতি পুরা মহল্লা--নিবাসী রায় বাহাদুর পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ এই ছোট মিউ-জিয়ম-টির

সপ্তমাতৃকা-মূর্ত্তি

সপ্ত সমুদ্রী টিলার নূতন ধরণের শিবলিঙ্গ

অবৈতনিক রক্ষক। তাঁহার যত্নে মথুরার অনেক পুরাতন কীর্ত্তি উদ্ধার হইয়াছে ও হইতেছে। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ যেরূপ সুকৌশলে মথুরা নগরে ও চারিপাশে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগ্রহ করেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমি ও আমার দুইটি ইংরাজ বন্ধু মথুরার সহরতলীতে বেড়াইতে বেড়াইতে শকজাতীয় রাজা বাসুদেবের শিলালিপিযুক্ত একটি মূর্ত্তি আবিষ্কার করি। ইংরাজ দুই জন মূর্ত্তিটাকে উদ্ধার করিবার জন্য পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিতজী দুই তিন দিন চেষ্টা করিয়া মূর্ত্তিটি মালিকের নিকট হইতে খরিদ করিতে পারিলেন না। সেই মূর্ত্তির স্বত্বাধিকারী মথুরার এক জন চৌবে ব্রাহ্মণ। তিনি পূর্ব্বে এই মূর্ত্তির মস্তক দিয়া নিত্য বৈকালে সিদ্ধি বাঁটিতেন এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই শিলাখণ্ডে পেষণ করিলে ভাং যেরূপ সুমিষ্ট হয়, অন্য শিলাখণ্ডে তাহা হয় না। বাঙ্গালাদেশে অনেক যজমান থাকায় চৌবেজীর দেহ অতিশয় পুষ্ট হইয়াছিল এবং নিত্য তাঁহার ভার বহন করায় শিলালিপি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছিল। তিন দিন পরে পণ্ডিতজী আমার সহিত পরামর্শ করিয়া কৌশলে মূর্ত্তিটি আদায় করিলেন। চৌবেজীর এক জন শরিক ও শত্রু ছিল, পণ্ডিতজী তাহাকে হস্তগত করিয়া তাহাকে দিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করাইলেন যে, চৌবেজী নিত্য দেবমূর্ত্তিতে পদাঘাত করিয়া এবং সিদ্ধি বাঁটিয়া হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিতেছেন। তাহার পরদিন বৈকালে আমাকে নিজের চোগা-চাপকানে বিভূষিত করিয়া এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের এক লাল পাগড়ী-পরিহিত চাপরাশী লইয়া পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সরেজমীনে তদন্ত করিতে চলিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, চৌবেজী তখন মূর্ত্তিটির পৃষ্ঠের উপর বসিয়া সিদ্ধি বাঁটিতেছিলেন। তাঁহাকে দুই একটি প্রশ্ন করিতে করিতে পণ্ডিতজী দরখাস্তের কথা বলিলেন। চোগাচাপকানপরিহিত বাঙ্গালী ও লালপাগড়ী পরিহিত চাপরাশী দেখিয়া চৌবেজী ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সর্ব্বদোষাকর মূর্ত্তিটি পণ্ডিতজীকে দান করিলেন। এইরূপে শকাধিকারকালের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপদান সংগৃহীত হইল।

সূর্য্যমূর্ত্তি

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণও মথুরার নানা স্থানে যে সকল আশ্চর্য্য পুরাতত্ত্বের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। প্রসিদ্ধ কবি ভাসের 'প্রতিমা' নাটকের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এই প্রতিমা নাটকে যেমন রাজাদের মূর্ত্তি রাখিবার ঘরের বা Sculpture Galleryর কথা আছে, মথুরার নিকটে মাঠে গ্রামে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সেইরূপ একটি মূর্ত্তির ঘর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিগুলি রাজাদের অর্থাৎ মানুষের মূর্ত্তি—দেবমূর্ত্তি নহে। এই স্থানে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ শকজাতীয় সম্রাট কণিষ্ক, বিমকদফিস ও গুজরাট এবং কাঠিয়াবাড়ের মহাক্ষত্রপ চাষ্টনের মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া মথুরা মিউজিয়মে লইয়া গিয়াছেন।

সপ্তর্ষি টিলার স্ত্রী-মূর্ত্তি

মথুরায় অনেক নূতন প্রকার হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সপ্তসমুদ্রী টিলা নামক ঢিবিতে একটি নূতন রকমের শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনটি লিঙ্গ একত্র বাঁধিয়া এই লিঙ্গটি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক লিঙ্গেই শিবের এক একটি মুখ আছে। এই শিবলিঙ্গটি খৃষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বে তৈয়ারী হইয়াছিল। মথুরা মিউজিয়মে ...টি বিস্ময়কর ...র্য্য মূর্ত্তি ...ছ; তাহাও সময়ের। আশ্চর্য্য ...মের মূর্ত্তি। ...দেব উঁচু ... বসিয়া আছেন এবং তাঁহার সপ্তাশ্ববাহিত রথের পরিবর্ত্তে মূর্ত্তির এক এক পার্শ্বে এক একটিমাত্র ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়। শকজাতীয় সম্রাটদের রাজত্বকালে মথুরার ভাস্কররা কত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সপ্তর্ষি টিলায় আবিষ্কৃত একটি নারী-মূর্ত্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই মূর্ত্তিটি দেবমূর্ত্তি নহে, কণিষ্ক ও চাষ্টনের মূর্ত্তির মত মানুষের মূর্ত্তি। দুই হাজার বৎসর পরেও এই মূর্ত্তিটি এমন সুন্দর আছে যে, ইহাকে দূর হইতে দেখিলে সত্য নারী বলিয়া ভুল হয়।
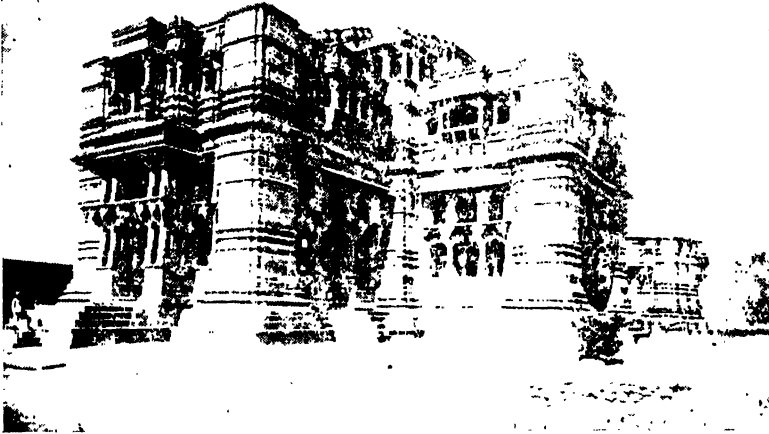
খৃষ্টাব্দের ৪র্থ শতকে মগধের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মথুরা জয় করিয়া শকবংশের রাজাদের রাজ্যলোপ করিয়াছিলেন এবং এই সময় হইতে মথুরার অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। গুপ্তবংশের রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহাদের সময় হইতে মথুরায় বৈষ্ণবপ্রাধান্য লক্ষিত হয়। গুপ্তযুগ হইতেই মথুরায় কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনধারণ বেশী পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতির পরে মথুরায় জৈন ও বৌদ্ধের সংখ্যা কমিয়া হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মহমুদ মথুরা ধ্বংস করিয়া জৈন ও বৌদ্ধ কীর্ত্তি একেবারে লোপ করিয়াছিলেন। ইহার

গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির

গোবর্দ্ধন ধারণ

করিয়াছিলেন, তাহা এখন মথুরা নামে পরিচিত। মুসলমানদিগের প্রধান রাজধানী দিল্লী নগরের নিকটে অবস্থানের জন্য মথুরা নগরের পুরাতন দেবমন্দিরগুলি বার বার বিনষ্ট হইয়াছিল। গোপাল-ঘেরা নামক টিলায় খৃষ্টাব্দের ১১শ বা ১২শ শতকে নির্ম্মিত একটি হিন্দু মন্দির ছিল। এই মন্দিরে সপ্তমাতৃকার যে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মথুরা নগরে এই সময়ে শক্তি উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। মথুরামণ্ডলে নানা স্থানে বহু শক্তির মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই সমস্ত মূর্ত্তি খৃষ্টাব্দের ১১শ ও ১২শ শতকের এবং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গৌড়ীয় গোস্বামিগণের বৃন্দাবন-বাসের পূর্ব্বে মথুরামণ্ডলে শক্তিপূজা প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টাব্দের ১৬শ শতকের প্রথম ভাগে শ্রীরূপ গোস্বামী, জীবগোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবমতের আচার্য্যগণ মথুরা

যুগলকিশোরের মন্দির—বৃন্দাবন

পরে দুই চারিটি জৈন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য মূর্ত্তিতে মথুরামণ্ডল একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে শূরসেন-বংশের রাজারা মথুরামণ্ডলের অধিকারী ছিলেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর রাজা চৌহান-বংশীয় পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহারা রাজধানী মথুরা হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই প্রাচীন শূরসেন বংশের রাজারা এখনও রাজপুতানার পূর্ব্বভাগে কেরৌলী রাজ্যের রাজা। প্রাচীন মথুরা নগর মুসলমানরা অধিকার করিলে কেরৌলীর যাদবরা শ্রীমথুরা নামক এক নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শ্রীমথুরা নগর কেরৌলী রাজ্যে অবস্থিত এবং ইহা এখনও বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থস্থান। মথুরা নামে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এইরূপ অনেক নগর স্থাপিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের কুমারিকা অন্তরীপের নিকটে পাণ্ড্যরা যে মথুরা নগর প্রতিষ্ঠা

অন্তরীপের নিকটে পা৷

গোবিন্দজীর মন্দিরের ভিতরের দৃশ্য

মণ্ডলে আগমন করিয়া বৃন্দাবন আবিষ্কার করেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বৃন্দাবন প্রকৃত বৃন্দাবন কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। বর্ত্তমান বৃন্দাবনে প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই বৃন্দাবন যদি প্রকৃত বৃন্দাবন হইত, তাহা হইলে গুপ্তযুগের বৈষ্ণবরা নিশ্চয়ই এই স্থান ফেলিয়া রাখিতেন না। গোবর্দ্ধন, কাম্যবন, মহাবন প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থেই ভারতবর্ষের মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বের যুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, কেবল গৌড়ীয় গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বৃন্দাবনেই প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই।

গৌড়ীয় গোস্বামিগণ রাজপুতানার শাক্তদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনের আধুনিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। রাজপুত রাজাদিগের ব্যয়ে ও পরে আকবরের রাজত্বকালে মথুরায় ও বৃন্দাবনে অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বৃন্দাবনের কেশবের মন্দির সর্ব্বপ্রধান। এই মন্দিরের বাহিরের দৃশ্য দেখিতে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের মত বটে, কিন্তু ইহার ভিতরে মুসলমানী ধরণের অনেক বড় বড় পাতরের খিলান আছে। এই মন্দির এক কালে সপ্ততল ছিল, কিন্তু ইহার উপরের চারিতলা বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। এখন মথুরা ও বৃন্দাবনে যতগুলি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্ব-পুরাতন। নিজ মথুরা মন্দিরে কাটরা টিলার উপরে কেশব দেবের আর একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। এই মন্দির কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রবাদ আছে ওরছার রাজা নৃসিংহবীর এই মন্দির তৈয়ারী করিয়াছিলেন। নৃসিংহ খৃষ্টাব্দের ১৫শ বা ১৬শ শতকের লোক, সুতরাং এই মন্দিরও বেশী

যুগলকিশোরের মন্দির

পুরাতন নহে। সাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকো এই মন্দিরের একটি বৃতি মেরামত করাইয়া দিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এই রেলিং ভাঙ্গিবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং চারি বৎসর পরে তাঁহারই আদেশে মথুরার ফৌজদার আবদুন্নবী খাঁ কেশব দেবের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। জন-প্রবাদ অনুসারে জানা যায়, কাটরা টিলার উপরে আওরঙ্গজেবের মসজিদ এই মন্দির ভাঙ্গিয়া তৈয়ারী হইয়াছিল। নিজ মথুরা সহরে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের আগে নির্ম্মিত একটি মন্দিরও নাই। বৃন্দাবনে মথুরা সহরের সমস্ত মন্দির অপেক্ষা পুরাণ আর দুইটি মন্দির আছে। এই দুইটি মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পরে তৈয়ারী হইয়াছিল। ইহার মধ্যে মদনমোহনের মন্দিরটি যমুনার নিকটে অবস্থিত এবং দেখিতে বোতলের ন্যায়। এক জন বাঙ্গালী বৈষ্ণব ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের যুগলকিশোরের মন্দিরও দেখিতে বোতলের ন্যায় এবং ইহার সম্মুখের দরজা দেখিতে মসজিদের খিলানের মত।

যমুনার ধারে বৃন্দাবন ও মথুরায় যতগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোনটিই পুরাতন নহে। রেলের পুল হইতে বিশ্রামঘাট পর্য্যন্ত যে বাঁধান রাস্তার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার ধারে একটা লাল পাতরের দোতলা মন্দির আছে। এই মন্দিরের নাম সতীবুর্জ্জ। সম্ভবতঃ ইহা জাঠ রাজাদের আমলে তৈয়ারী হইয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শরতের শ্যাম

নিখিল-বন্ধু আসেন তাঁহার সুন্দর হাসি হেসে!
আঁধার আনন মূর্ত্ত শ্রাবণ অই চলে যায় ভেসে।
শ্যামসুন্দর বন্ধু আমার নন্দন-বেশ ধরি'
হাস্যের আলো আস্যে উছলে, এ কি রূপে আসে মরি!
মাথায় জলিছে মণিমালা আজ, কোথায় শিখীর চূড়া!
কদম-রেণুর অভাবে মাধব মেখেছে রতন-গুঁড়া।
দোয়েলা কোয়েল কাড়িয়া লয়েছে বাঁশের বাঁশীটি তাঁ'র,
পুলকের সুরে চারিদিক পূরে তুলিতেছে ঝঙ্কার!
হাল্‌কা মেঘের কল্‌কা চাদরে নীল তনুখানি ঢাকি'
নীলমণি বঁধু মেলেছেন তাঁ'র ঘন নীল দু'টি আঁখি।
শেফালী-ফুলের পীত রঙ গুলে আউস ধানের ক্ষেতে,
হিরণ-বরণ বসনাঞ্চল রেখেছেন বঁধু পেতে!
কৃষক-বধূর মধুর হাস্যে খল খল ধ্বনি উঠে,
আজি পুলকের কলহাসি নিল শ্যামের নূপুর লুটে!
দুগ্ধ-ধবল কাশের মেলায় যশোদা জননী অই,
গোপালের লাগি আঁচলে ঢাকিয়া আনেন নবনী দই!
কল কল তালে করতালি দিয়ে কালো জল চলে ছুটে,
গলাজল ক্ষেতে, সরসীর বুকে নীল-কহ্লার ফুটে!
গোপাঙ্গনার অঙ্গ-সুরভি কেতকী-বনের বায়ে,
যেন মৃদু মৃদু বহে সীধু সম কদম বেদীর ছায়ে!
আজি যমুনার নীল জল বুঝি উদ্বেল হ'ল অই!
আকাশের কোলে তারি নীল লেগে আলো করে থই থই।
চম্পা, শিরীষে, কম্পিত হেরি আপীত অঙ্গবাস!
সিত-বিধু, ঘন মধুর মিলন, সেই ত ঝুলন, রাস!
নিখিল-বন্ধু নন্দ-দুলাল সুন্দর হাসি হেসে
কিরণে সুনীল গগন প্লাবিয়া আসেন শাওণ শেষে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

ম্যাডাম কুরী ও রেডিয়াম

বিধাতার লীলাখেলা বুঝা আমাদের ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির অতীত। কোথায় কখন্ কাহার দ্বারা তিনি কি অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ক্ষুদ্র পোলাণ্ড কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহার প্রতিবেশী মহাবলশালী ও প্রবলপরাক্রান্ত অত্যাচারী রুস সম্রাটের ক্রীড়া-পুত্তলিরূপে কাল কাটাইতেছিল। অতঃপর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়া এই তিন স্বার্থলোলুপ দেশ পোলাণ্ডের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভূখণ্ড ও এক-পঞ্চমাংশ লোক ছিনাইয়া লইয়া আপনাদিগের অধিকার-ভুক্ত করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আরও কতকাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার পর বর্ত্তমান পোলাণ্ড পূর্ব্ববর্ত্তী পোলাণ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে গিয়া দাঁড়াইল। Kosciuszko প্রমুখ কয়েক জন স্বদেশ-প্রেমিক পোল এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন এবং অনেকখানি দেশ-শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া নূতন শাসননাতি প্রবর্ত্তিত করেন ও Kosciuszko ইহার কর্ণধার হয়েন। কিন্তু শক্তিশালী শত্রু এই দেশাত্মবোধের সংহারার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন, ফলে কত রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইল, কত পোল বীরের মত রণক্ষেত্রে প্রাণ দিল—Kosciuszkoএর পতন হইল—**Freedom shrieked as Kosciuszko fell** ও অবশেষে ফলে এই দাঁড়াইল যে, পোলাণ্ডের প্রায় সবটুকুই রুসিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইল। ইহার পরেও পোলাণ্ড অনেক বার জাতীয় হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু "বারে বারে জ্বালতে গেলেও বাতি আর জ্বল্‌ল" না—অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া উঠিল। অবশেষে রুস-সম্রাট্ নিকোলাসের রাজত্বকালে পোলাণ্ডের দুর্দ্দশা চরমতা প্রাপ্ত হইল। "The administration estabiished by Nicholas I in Russian Poland was harsh and aimed avowedly at destroying the nationality and even the language of Poland. A very hostile policy was adopted against the Roman Catholic Church." পোলাণ্ডের স্বরূপ, জাতীয়তা, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা, আইনকানুন, বিধি-বিধান আচার, ধর্ম্ম, এমন কি, তাহার পূর্ব্বগৌরব-স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত রুসিয়া কোনও প্রকার চেষ্টার ও আবশ্যক অত্যাচারের ত্রুটি করিল না। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ও আদালতে জোর করিয়া রুস ভাষা ও রুস রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত হইল। সকল প্রকার স্বদেশ-প্রেম-উদ্দীপক অনুষ্ঠানগুলিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হইল। যাহাতে পোলযুবকগণ রুসীয় আদর্শে ও সভ্যতায় মানুষ হইয়া স্বদেশ বিস্মৃত হইয়া যায়,

ম্যাডাম কুরী

তজ্জন্য সরকার তাহাদিগকে রুসিয়ার বিদ্যালয়সমূহে প্রেরণ করিতে লাগিলেন. লোককে ধরিয়া রুসিয়ার পল্টনে ভর্ত্তি করা হইল। এই সমস্ত কারণে অনেক পোল স্বদেশ-প্রেমিক দেশ ছাড়িয়া বিদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। Marie Sklodowska তাঁহাদের অন্যতম। ২০।২১ বৎসরের যুবতী Sklodowsk। এইরূপে নির্য্যাতিত, পদদলিত মাতৃভূমির পরাধীন আওতা ছাড়িয়া স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায় বিদ্যাশিক্ষার্থ এক-প্রকার নিঃসম্বল অবস্থায় একাকী প্যারিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেশে তাঁহার পিতা ছিলেন—স্কুলের শিক্ষক; এবং তাঁহার নিকটেই মেরীর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। এখানে আসিয়া প্রথমতঃ তিনি টুইশনি করিয়া যাহা রোজগার করিতেন, তাহাতে সামান্য একটু দুগ্ধ ও রুটী মাত্র খাইয়া তাঁহার দিন কাটিত।

অতঃপর তিনি চুল্লী প্রস্তুত ও বোতল ধৌত করার কায লইয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁহার কার্য্যতৎপরতায় মুগ্ধ হইয়া প্রধান অধ্যাপক লিপম্যান (Gabriel Lippmann) মেরীকে তাঁহার প্রিয় ছাত্র পিয়ারী কুরীর (Pierre Curie) অধীনে কায করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এখানে মেরী পিয়ারীর কার্য্যে সাহায্যও করিতেন এবং নিজেরও পড়াশুনা করিতেন। ক্রমে ক্রমে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

অতঃপর ইঁহারা মিলিতভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামি-স্ত্রীতে মিলিয়া পিচব্লেণ্ড (Pitchblende) নামক একপ্রকার খনিজ পদার্থ হইতে প্রায় ৪ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার পর রেডিয়াম (Radium) নামক এক অলৌকিক ধাতু আবিষ্কার করেন। এই কার্য্য যে কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা বৈজ্ঞানিক-মাত্রই অবগত আছেন। কয়েক টন (১ টন প্রায় ২৮ মণের সমান) পিচব্লেণ্ডে কয়েক গ্রাম মাত্র রেডিয়াম থাকে। বিরাট বস্তু-সমুদ্রের মাঝখান হইতে এই বিন্দু-মাত্র রেডিয়াম নিষ্কাশন করা রাশীকৃত খড়ের স্তূপ হইতে একটি ক্ষুদ্র সূচ খুঁজিয়া বাহির করার চেয়েও বোধ হয় বেশী ধৈর্য্য ও কষ্টসাপেক্ষ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রেডিয়াম অতি অলৌকিক গুণসম্পন্ন। ইহা হইতে নিয়তই তেজ নির্গমন (radio actine) হইতেছে। এই তেজ প্রধানতঃ দুই রকমের, যথা,—উত্তাপ ও অতি সূক্ষ্ম বস্তু-কণা। বস্তু-কণাগুলি আবার দুই প্রকারের, যথা,—আল্‌ফা রশ্মি ও বিটা রশ্মি। পরে রাদারফোর্ড, সোডি, রাম্‌সে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিটা রশ্মিগুলি বিয়োগ উর্ম্মী তাড়িৎ-কণা (negative electric particles called electron) ও আল্‌ফা রশ্মিগুলি যোগ-তাড়িৎশক্তিসমন্বিত (positively charged) হিলিয়াম (Helium) নামক অতি লঘু মৌলিক পদার্থের পরমাণু। সার নরম্যান লকইয়ার সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া উহাতে এই পদার্থটি আবিষ্কার করেন ও সূর্য্যের নামানুসারে উহার নাম হিলিয়াম রাখেন। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, হিলিয়াম সৌর পদার্থ। এই পৃথিবীতে ইহার অস্তিত্ব অসম্ভব।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে ধারণা ছিল, মৌলিক পদার্থের পদার্থান্তরে রূপান্তর অসম্ভব ও কল্পনাতীত (transmutations of elements is impossible and unthinkable), এই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন রাসায়নিকদিগের (Alchemists) সীসক, লৌহ প্রভৃতি হীন ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করার কল্পনা ও চেষ্টার উল্লেখে উপেক্ষার হাসি হাসিতেন। কিন্তু রেডিয়াম নামক মৌলিক ধাতু হইতে হিলিয়াম নামক মৌলিক বায়বীয় পদার্থের উৎপত্তিতে সে ধারণা অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে এইটুকু বলা আবশ্যক, রেডিয়ামের তেজ নির্গমন কার্য্য মানবের আয়ত্তের বাহিরে। পদার্থের এই রূপান্তরকে মানুষ কোনও উপায়ে নিবৃত্ত বা বর্জ্জিত করিতে পারে না। এই নির্গমনের ধর্ম্ম ও উৎপন্ন পদার্থগুলির ব্যবহার সম্বন্ধেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়াছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বহু বৎসর ধরিয়া এত শক্তি বিকিরণের পরেও রেডিয়াম ধাতু ওজনে কমে বলিয়া বৈজ্ঞানিক ধরিতে পারেন না। এক কথায় এই রেডিয়াম ধাতু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ইহা মানবের আবিষ্কৃত সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক বিধি-বিধানের বাহিরের বস্তু।

যাহা হউক, এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের জন্য ১৯০[illegible] খৃষ্টাব্দে পিয়ারী কুরী ও ম্যাডাম কুরীকে যুক্তভাবে

বিলাতের রয়াল সোসাইটীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'ডেভী' পদক ও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান- 'নোবেল' পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু মানবের মহা দুর্ভাগ্য, পিয়ারী কুরী অতি অল্পদিন পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এক রাত্রিতে জনৈক বন্ধু-গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্যারিসের এক রাস্তায় তিনি গাড়ী চাপা পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। প্রথমতঃ ম্যাডাম কুরী এই অতর্কিত অনাকাঙ্ক্ষিত আঘাতে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই মন স্থির করিয়া স্বামীর পরিত্যক্ত কাযে নূতন উৎসাহে তিনি নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। ফলে আরও কতকগুলি অভিনব আবিষ্কার করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বার 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। এত বড় সম্মান পৃথিবীতে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রেডিয়াম অতি অলৌকিক গুণসম্পন্ন। ইহার অনেক ধর্ম্মের মধ্যে একটি এই যে, ইহা হইতে নির্গত তেজের সীমার মধ্যে মানুষের অবস্থান করা অতি বিপজ্জনক। যে পদার্থ ইহা হইতে বিদীর্ণ হয়, তাহা বহু পদার্থকে, এমন কি, লৌহ, সীসক প্রভৃতি ধাতুকে ভেদ করিতে সমর্থ—মানবদেহ ত দূরের কথা। এই জন্য আবিষ্কারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাকালে পিয়ারী কুরীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে ও তাঁহার একখানি হস্ত বিকল হইয়া যায়। এইরূপ মারাত্মক বস্তু এই রেডিয়াম। কিন্তু ভাল গুণও ইহার আছে। অনেক রোগ ইহা নিরাময় করিতে পারে। বিশেষতঃ নালী-ঘা। এই নিমিত্ত বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই ফরাসী গবর্ণমেণ্ট একটি রেডিয়াম পরীক্ষাশালা স্থাপন করিয়া তাহার রোগনিবারণধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিবার নিমিত্ত ম্যাডাম্ কুরীর হস্তে উহার পরিচালনাভার ন্যস্ত করেন। বস্তুত. ম্যাডাম্ কুরীকে আজ পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমি অনেক বার বলিয়াছি, আজও আবার বলিতেছি, যদি ভারতে প্রকৃতই কোন অনুন্নত জাতি থাকে, তবে সেটা নারীজাতি (It is the women of India who are the really depressed class)। নারীর ভিতরে কি অলৌকিক, অপরিসীম বুদ্ধি, প্রতিভা, মনীষা সুপ্ত নিহিত আছে—আর চর্চ্চা, শিক্ষা, প্রেরণা ও সুযোগের দ্বারা তাহা কিরূপ স্ফূর্ত্ত ও বিকশিত হইতে পারে, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত এ কালের ম্যাডাম্ কুরী আর আমাদের ভারতের সেকালের লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নারীগণ।

"কোন্ ললনা ভারতললনা তুলা" এ যুগের 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রীও তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু হায়! ভারতের ললনা কেন, ভারতের নারী কেন—ভারতের পুরুষই বা কোথায়? এই বত্রিশ কোটি মানবের মধ্যে কয় জনেরই বা নাম করা যাইতে পারে—যাঁহাদের নাম জগতের ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

কিছু দিন পূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় গবাদি পশুর স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত শালিকের কি সম্বন্ধ, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। বিপুল মানব-সমাজের সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপারে শালিক বা অন্য কোন পাখী কতটা উপকারে আইসে বা কতটুকু অপকার করিতে সমর্থ হয়, তাহা আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া আলোচিত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে ইহা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। শুধু স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে পাখীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই চাপা পড়িয়া যায়। উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিৎ ও প্রাণিতত্ত্ববিৎ কোনও কোনও দেশে কোনও বিশেষ ঋতুতে কোনও অপরিচিত উদ্ভিদের আকস্মিক আবির্ভাবে অথবা মূষিক বা পঙ্গপালের উচ্ছেদসাধনে সহসা পক্ষিবিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। যে গাছ এ দেশে কোনও ঋতুতেই কস্মিন্‌কালে জন্মাই-বার সম্ভাবনা ছিল না, যে গাছের কোনও পরিচয় সে অঞ্চলের লোক জানিত না, হঠাৎ সেই গাছ কেমন করিয়া সেখানে দেখা দিল? কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে পেচক প্রভৃতি পাখী যে কত বড় বন্ধুর কায করে, তাহা অপরিজ্ঞাত নহে। তাহাই যদি হইল, তবে পাখীকে শুধু পাখী হিসাবে দেখিলে চলিবে না, শুধু মানুষের বিলাসসামগ্রী বা তাহার স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট মনে করিলেই তাহাকে সম্যক্‌রূপে ভাল করিয়া দেখা হইল না; বিপুলা প্রকৃতির সহিত সে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত, নানা দিকে বিচিত্র সূক্ষ্ম সূত্রে তাহার সমস্ত চেতন ও অচেতন আবেষ্টনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। পাখীর সহিত গরু, ভেড়া, মহিষের, তথা পোকামাকড়ের নিগূঢ় সম্বন্ধ বিচার করা আবশ্যক; মৎস্যাদি জলচরও বাদ দেওয়া যাইবে না। বিহঙ্গ কর্তৃক ফলের বা ফুলের বীজ কেমন করিয়া স্থানান্তরিত হইয়া কালক্রমে অঙ্কুরিত হয়, পুষ্পরেণু গর্ভকেশরে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারও বিশদ বৈজ্ঞানিক আলোচনার সময় আসিয়াছে।

আমাদের পরিচিত অনেক পাখীই যাযাবর; কতক-গুলি সম্পূর্ণ যাযাবর; কতকগুলি আংশিকভাবে যাযাবর। এই যাযাবরত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা আমি অন্যত্র করিয়াছি। এই যাযাবর বিহঙ্গদিগের যাতায়াতের পরিধি হয় ত সমগ্র এসিয়াখণ্ডের উত্তরে মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া; দক্ষিণে বা দক্ষিণপূর্ব্ব সিংহল ও আফ্রিকা মহাদেশ; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে য়ুরোপের উত্তর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমধ্যসাগর পার হইয়া মধ্য-আফ্রিকায় বা দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাহার পর্য্যবশেষ। এসিয়া ভূখণ্ডের ভ্রাম্যমাণ পাখী ঋতুবিশেষে হিমাচল অতিক্রম করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে; য়ুরোপ ভূখণ্ডের ভ্রাম্যমাণ বিহঙ্গ ভূমধ্যসাগর ও সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যথারীতি আনাগোনা করে।

পৃথিবীর মানচিত্রের কতখানি স্থান জুড়িয়া ইহারা ব্যাপকভাবে রহিয়াছে! অথচ ঋতুবিশেষে ইহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব। পাখীর এই আনাগোনার নিগূঢ় রহস্যের আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, পৃথিবীর নানা স্থানের বৃক্ষলতা, ফলফুল, কীটপতঙ্গ, মৎস্যাদির সহিত তাহার কি বিস্ময়কর সংযোগ-সূত্র রহিয়াছে! গোলাপী শালিক সম্পূর্ণ যাযাবর; সে শীতকালে হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। তখন তাহাকে ঝাঁকে ঝাঁকে অশ্বত্থ-বটবৃক্ষের ফল ভক্ষণে রত দেখিতে পাওয়া যায়। ভুক্ত ফলের বীজ তাহার পুরীষের সহিত নিঃসৃত হইয়া দেশদেশান্তরে নব নব বট ও

অশ্বত্থচারার আবির্ভাব সম্ভাবিত করে। অতএব যে গাছ একান্ত ভারতবর্ষের বলিয়া পরিচিত, তাহার বীজ হয় ত ভারতবর্ষের বাহিরে, এমন কি, এসিয়া ভূখণ্ডের বাহিরেও অঙ্কুরিত হইতে দেখিলে বিস্ময়ের বিশেষ কারণ থাকে না; বিহঙ্গের দায়িত্ব সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। পক্ষীর অন্ত্র-নিঃসৃত ফল ও বীজের পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অন্ততঃ শতকরা পঁচাত্তরটা বীজে গাছ উৎপন্ন হয়। আবার ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পক্ষী কর্ত্তৃক গলাধঃকৃত হওয়ার দরুণ বীজবিশেষের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে সকল চারাগাছের বীজ সার দেওয়া জমীতে সাধারণতঃ রোপণ করা হয়, সেগুলি যদি পাখীর অন্ত্রের ভিতর দিয়া একবার চালিত হইয়া আইসে, তাহা হইলে সেগুলি হইতে যে অঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহা কালে বিচিত্রবর্ণ-সমন্বিত ফলে নিজের শক্তির পরিচয় প্রদান করে।

অতএব প্রকৃতির যবনিকার অন্তরালে বিহঙ্গের দৌত্য না থাকিলে হয় ত এমন বর্ণবিশিষ্ট ফলটি পাওয়া যাইত না; কোনও পুষ্পরেণু হয় ত গর্ভকেশরে নীত হইত না, কোনও কোনও গাছ হয় ত একেবারেই লুপ্ত হইয়া যাইত। বিলাতের থ্রাস (Thrush) পাখী না কি Missletoe গাছটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; এই জন্য সে সাধারণতঃ Missle Thrush নামে পরিচিত। ফলভুক্ পারাবতের দৌত্য Nutmeg গাছের প্রাণরক্ষা করিয়া আসিতেছে। ফলটি পীতবর্ণ, আবার অনেকটা পীচের মত দৃঢ়; পরিপক্ক হইলে ইহা ফাটিয়া ফাঁক হইয়া যায়; তখন ইহার অভ্যন্তরস্থ চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ বীজ ঐ ফলভুক্ পারাবতের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদরসাৎ হইলে উহা পুরীষের সহিত বহিঃক্ষিপ্ত হয় এবং এইরূপে দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে।

শালিক, বুলবুল, ময়না, ধনেশ, তোতা সকলেই এইরূপে প্রকৃতির নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেছে।

পাখীর পায়ে যে মাটীকাদা লাগিয়া থাকে, তৎসংলগ্ন বীজও দেশদেশান্তরে নীত হয়; আবার কোনও কোনও স্থলে বোধ হয়, বিহঙ্গপতত্রে সংলগ্ন হইয়া ফুলফলের বীজ স্থানান্তরিত হয়। শস্যভুক্ পাখীদের সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে। বিহঙ্গপদলিপ্ত মৃত্তিকার কথা ডার্‌উইন্ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। একটা রক্তাঙ্ঘ্রি তিতিরের পায়ে খানিকটা মাটী লাগিয়া ছিল; অধ্যাপক নিউটন পাখীর সেই পা পরীক্ষা করিলেন; মৃত্তিকাটুকু ওজনে ৬ আউন্স হইল। সেই মৃত্তিকাটুকু ভাঙ্গিয়া জলসিক্ত করিয়া একটি কাচপাত্র ঢাকা দিয়া রাখা হইলে দেখা গেল যে, ৮২টি চারা গাছ বাহির হইয়াছে। উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিৎ কার্ণার বোহিমিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে পুষ্করিণীতে এক অভিনব উদ্ভিজ্জ লক্ষ্য করিলেন— যাহা ভারতবর্ষের বাহিরে কুত্রাপি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; বোহিমিয়াতেও ইহার এই প্রথম আবির্ভাব। তাঁহার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, যাযাবর পাখী কর্ত্তৃক ইহা য়ুরোপের দক্ষিণ অংশে সম্ভাবিত হইয়াছে।

রহস্যময়ী প্রকৃতি কত প্রকারে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কতকগুলি মাছ উদ্ভিজ্জ খাইয়া জীবন ধারণ করে; মীনভুক্ বিহঙ্গ কুরর, পেচক, মাছরাঙা প্রভৃতি সেই সকল মৎস্য উদরসাৎ করে; তখন তাহাদের পেটের ভিতরে উদ্ভিজ্জবীজ রহিয়াছে; চঞ্চু ও নখর দ্বারা মৎস্যদেহ ছিন্নভিন্ন করিবার সময় হয় ত কোন জলাশয়সান্নিধ্যে সেই বীজ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, অথবা সবীজ মীনদেহ কবলিত হইবার পর ঐ মাংসাশী বিহঙ্গের অন্ত্রমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই বীজ ভূমিতে পতিত হয়; এমন স্থানে পড়ে, যেখানে সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অঙ্কুরোদ্গমের পক্ষে অনুকূল। অতএব দেখা যাইতেছে, সমগ্র চেতন ও অচেতন পরিবেষ্টনের মধ্যে নৈসর্গিক ঘাতপ্রতিঘাতে বিহঙ্গ, লতাগুল্ম, মীন, ফল ও ফুল, মূষিক, কীটপতঙ্গ পরস্পর নিগূঢ়ভাবে এক বিচিত্র আদান-প্রদান ব্যাপারে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অহরহঃ ব্যাপৃত রহিয়াছে। মিস্‌ল্‌টো (Missletoe) জাতীয় গাছ পাখী না থাকিলে বাঁচিতেই পারিত না; বাগানের বেড়ার গায়ে কতকগুলা উজ্জ্বলবর্ণ ফল দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলারও অস্তিত্ব সম্ভাবিত হইয়াছে পাখীর অন্ত্রমধ্যে তাহাদের বীজ ছিল বলিয়া। পক্ষান্তরে, পাখীরও কিছু লাভ হইয়াছে; কারণ, ফলভুক্ পাখীর জীবন দুর্ব্বহ হইত—যদি এই সকল ফল না থাকিত। দেখিলে মনে হয় যেন, তাহারা ভবিষ্যতে এই সকল ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিবে বলিয়া ইহাদের

বীজ এইরূপে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া বেড়ায়। আবার নিসর্গ-ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ যদি অবাধে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে মিশরের পঙ্গপালপ্রলয়ের মত এমন একটা বিপ্লব বাধিয়া যাইত যে, মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিত। বহুসংখ্যক পাখী কেবলমাত্র কীট পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ করে বলিয়া মানুষ নগরে ও গ্রামে হাঁপ ছাড়িতে পারিতেছে। কৃষিজীবী মানুষের কাছে এই সকল পাখী বিশেষ বন্ধুরূপে পরিগণিত। পাখী না থাকিলে মূষিকের উপদ্রবে সকলকে সন্ত্রস্ত হইতে হইত। মূষিক যে শুধু গৃহস্থের ফলশস্যভাণ্ডার লুণ্ঠন করে, তাহা নহে, কৃষকের ক্ষেতেরও প্রচুর অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই জন্য মনে হয়, যাঁহারা বিলাসব্যসনে রত হইয়া পক্ষী হনন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণ মানবসমাজের মিত্র নহেন। বহুসংখ্যক পাখী বিনষ্ট হইলে ঐ সকল মূষিক-কীট-পতঙ্গের উপদ্রবে মানবসমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিবে। স্থানবিশেষে বাস্তবিক এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানে আইনের সাহায্যে বিহঙ্গহনন নিবারণ করিতে হইয়াছে।

প্রবন্ধান্তর্গত ১নং চিত্র গোলাপী শালিকের। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা সম্পূর্ণ যাযাবর অর্থাৎ কোনও স্থান-বিশেষেই ইহারা ষড়ঋতু যাপন করে না। ইহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্য মনোমুগ্ধকর। গ্রীষ্মকালে ইহাদের সমগ্র শিরোদেশ, কণ্ঠ, গ্রীবা, বক্ষের উপরিভাগ, প্রধান পতত্রগুচ্ছ এবং পুচ্ছদেশ সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ; দেহের প্রায় সমুদায় বাকী অংশ গোলাপী বর্ণের। শীতকালে ইহাদের এত চাকচিক্য থাকে না।

২ নং চিত্র গাং শালিকের। ইহা বাঙ্গালা দেশে এত সুপরিচিত যে, ইহার বর্ণনা অনাবশ্যক। এই পাখীটি আদৌ যাযাবর নহে। উত্তর-ভারতবর্ষে যে যে অঞ্চলে গাং শালিককে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা সেই সেই স্থানেরই স্থায়ী অধিবাসী।

এই উভয় জাতীয় শালিক ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপে ফলের ও ফুলের বীজ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে; আবার ইহারা কীটভুক্‌ বলিয়া মানবসমাজের কিছু উপকারও সাধিত করে। আমরা সাধারণতঃ ইহাদের সম্বন্ধে এই সকল তথ্য অবগত নহি বলিয়া শালিক আমাদের কাছে কতকটা অনাদৃত।

শ্রীসত্যচরণ লাহা

বসুমতী প্রেস]

দেবদূতরূপে নলরাজ

শিল্পী—শ্রীবামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্ট

১

বিশ্বের বিচিত্র লীলার মধ্যে আর্টের উৎকর্ষ একটা মনোরম্য ব্যাপার। তাই মনে হ'ল মিষ্টার বসুর ড্রয়িংরুমে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে জঙ্গল-পাহাড়ে যান, কিংবা দেশবিদেশ ভ্রমণ ক'রে মানব-মানবীর মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করুন, তা'তে সময় ও পয়সা উভয়ই নষ্ট হয়। ড্রয়িংরুমে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, মনস্তত্ত্ব সবই একাধারে পাবেন। চয়ন করা জিনিষ নয়ন ভ'রে দেখতে গেলে, প্রথমতঃ এক পেয়ালা চা', তা'র পর গোটা কতক সিগারেট টেনে প্রকৃতিস্থ হয়ে গম্ভীর হয়ে ব'সে থাক।

আমরা পূর্ব্বে ('সেকালে'ও বল্‌তে পারেন) যাহা মাঝে মাঝে দেখেছি, সেগুলো খাপছাড়া। হয় ত কোন দেশে একটা বিখ্যাত মন্দির, কোথায়ও এক জন বিখ্যাত ওস্তাদের গান, হয় ত একটা জলপ্রপাত কিংবা তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ। অবশ্য সেগুলো ড্রয়িংরুমে আনা যায় না। কিন্তু তা'দের ছবি, কিংবা গ্রামোফোনে রেকর্ড ঘরে ব'সে পেতে পারেন। ভগবান্ এই জন্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার উৎকর্ষ যাহাতে হয়, তার বিশেষ চেষ্টা কচ্ছেন এবং করেছেন। আমরা তা'কে বলি ক্রমবিকাশ। যা-ই শুনি না কেন, দেখি না কেন, মনের মধ্যে একটা ছাপ পড়ে মাত্র। ঐ ছাপটা যদি তৈয়ারী পাওয়া যায়,তবে দেশে দৌড়াদৌড়ি ক'রে লাভ কি? ক্রমে এই কলিকাতা সহরে বিশ্বের সব জিনিষই দেখতে শুন্‌তে পাবেন। এই রকম বিলাতে ও অন্যান্য সভ্য দেশে বহুল পরিমাণে হয়ে গিয়েছে।

'ডিসেন্ট্রেলিজেশন' এডুকেশনের চরম ফল। ড্রয়িংরুম তা'র নমুনা। যদি আরও বিস্তৃত করতে চান, তবে পশুশালা, মিউসিয়ম, একজিবিশন্ প্রভৃতি ত আছেই। ড্রয়িংরুম বাস্তবিকপক্ষে একটা ছোট-খাটো মানব-শালা। মৌমাছির চাকের মত অন্ধকারে মধু সংগ্রহ করুন ও পূর্ণিমা-সম্মিলনের সময় সঞ্চিত মধু যা'র যত খুসি পান ক'রে প্রস্থান করতে পারেন। মিঃ বসুর ড্রয়িংরুম তারই মধ্যে খুব সভ্য। সভ্যতার তীর্থস্থান। সকলেই অতি বিনীত, পরস্পরের প্রতি প্রণত। কোন অশ্লীলতা নাই, বাচালতা নাই, শব্দের বাহুল্য নাই। পরস্পরের মনের ভাব সকলেই শীঘ্র বুঝতে পারেন। তাহার জন্য যোগসাধনের দরকার নাই। কষ্ট, প্রীতি, সুখ, দুঃখ নিমেষের মধ্যে বুঝা যায়। কৌচ ও চেয়ারগুলি এত সুন্দরভাবে সাজানো যে, যখন যেমন মনের ভাব, সেই রকমটি বেছে নিতে পারেন। উদাস হ'লে মনের মত ছবির দিকে তাকাতে পারেন।

ভালবাসা? অনেকে ভালবাসা হৃদয়ে পুষিয়া রাখেন। সেখানে তা'র দরকার নেই। সকলেই বুঝে নেবেন এবং যথেষ্ট খাতির করবেন।

অনুতাপ? প্রকাশ করবার সরকার নেই। আপনাকে দেখলেই সকলের সহানুভূতি হ'বে।

যদি ফিট্ হয়ে পড়ে, বাক্সভরা অষুধ আছে।

গান? গেয়ে যান পিয়ানোর সঙ্গে। সকলেই প্রশংসা জানিয়ে হাততালি দেবেন। যদি কেহ মুগ্ধ কিংবা মুগ্ধা হয়ে থাকেন, তবে যা'বার সময় হয় ত আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে ছাড়বেন না।

মধ্যে মধ্যে কোন শক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয় এবং সকলে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে তা'র মীমাংসা করেন। সে দিনকার আলোচনা—দ্বাপরে ভগবান্ গান না ক'রে বাঁশী বাজিয়েছিলেন কেন?

কাহারও সন্তোষজনক উত্তর না হওয়াতে সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন, বিশেষতঃ মিস্ বসু। হেমলতা বসু হিষ্ট্রীতে এম, এ, এমন কি, এক সময় অতিশয় অধ্যয়ন ক'রে তাঁর হিষ্টিরিয়া হয়ে পড়েছিল।

এমন সময় একটি ভদ্রলোক ড্রয়িংরুমে প্রবেশ ক'রে বিনীতভাবে বল্লেন, "আমার একটু বিলম্ব হয়েছে, মার্জ্জনা করবেন। যদি অনুমতি হয়, এই বাঁশীটা বাজিয়ে apologise করি।"

হাতে তাঁ'র একটা ফ্লাজিওলেট ছিল। নাম নিরুপম মিত্র। বনিয়াদী ঘর। সকলেই জান্‌তেন, তিনি এক জন সুগায়ক, এবং ড্রয়িংরুমে তাঁ'র খাতির ছিল সর্ব্বত্র। প্রায় ছয় মাস তিনি এ দিকে আসেন নাই, এবং পূর্ব্বেও কখনও বাঁশী বাজান নাই। নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে কসরৎ করেছেন, নচেৎ সাহস ক'রে কথাটা বল্‌তে পারতেন না।

গান ছেড়ে বাঁশী ধরলেন কেন?

আর একটা জিনিষ সকলে লক্ষ্য ক'রে দেখল, তাঁ'র এক দিকের দাড়ি ও গোঁপ কামানো। কিন্তু চুল ও ভ্রূ সযত্নে রক্ষিত। বাঁ দিকের ঐ ভাব দেখে কেহ কেহ ভাবলেন যে, তাঁ'র স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। কিন্তু ছ'মাস পূর্ব্বে তিনি অবিবাহিত ছিলেন। হঠাৎ এমন দুর্ঘটনা ঘটবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ তাঁ'র বিবাহ হ'লে অন্ততঃ কেহ জান্‌তে পার্‌ত। সুতরাং, অন্ততঃ বাঁশী ধরবার যে কারণ, দাড়ি-গোঁপের অর্দ্ধেক লুপ্ত করারও সেই কারণ, সেটা অনেকের মনে উদয় হ'ল। কিন্তু সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করা অসভ্যতা।

গায় পাঞ্জাবী। চুল বাবরিকাটা। গলায় অতি ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা।

নিরুপম বাবু নিমন্ত্রিত হ'য়ে বাঁশী বাজিয়ে 'এপলজি' জানালেন। শেষে বল্লেন, "গানে কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, ও কথার সীমা আছে। বাঁশীতে মনের কথা জানানো যায়, কিন্তু সে কথাটা কি? কা'র কথা এবং কিসের কথা; যা'র যা খুসি বুঝে নিতে পারেন। ক্ষমা করবেন।" কথাগুলো ব'লে তিনি একটা বাঁশের চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

হেমলতা বসু চক্ষু মুদ্রিত ক'রে সেই বাঁশী শুন্‌লেন, এবং বিস্মিত হয়ে ব'ল্লেন, "অদ্ভুত"!

২

ড্রইংরুমে যে কাবুলী বিড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটা হেমলতা বসুর অতিশয় প্রিয়পাত্রী। কাহারও কোলে যেতে চায় না; গেলে আঁচড়ে দেয়। সুতরাং সে নির্ব্বিবাদে যেখানে খুসি শুয়ে থাকে, এবং খাবার সময় কেবল হেমলতার মুখের দিকে তাকায়। স্বাধীনতা একটু বেতরভাবে পেয়েও সে অন্যান্য বিড়ালের চেয়ে খুব সভ্যশিষ্ট। বাঁশীর রব শুনে সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার জন্য নিরুপম বাবুর পদতলে গেল, এবং ক্রমে এক লাফে কোলে গিয়ে উঠলো। নিরুপমবাবু লর্ড রবার্ট্‌সের মত বিড়ালকে ভয় করতেন এবং অত্যন্ত স্ত্রীস্বাধীনতা পছন্দ করতেন না। কিন্তু বিড়ালের কর্ত্রীর মানরক্ষার জন্য তিনি প্রথমতঃ মোটেই আপত্তি করেন নাই। বিড়ালের রোমরাশি ঠিক রেশমের মত উপরন্তু গোলাপসিঞ্চিত। সুতরাং আদর ক'রে তিনি বিড়ালের মাথায় আশীর্ব্বাদের মাত্রায় একবার হাত বুলিয়ে দিলেন। বিড়াল তাহা অনুমোদন করিয়া দ্বিতীয় লাফে স্কন্ধে গিয়া উঠল।

পাশেই তাঁহার পরিচিতা শ্রীমতী তরুবালা দেবী লেডী ডাক্তার চা খাচ্ছিলেন। তিনি বল্লেন, "একটু সাবধান হবেন, ওটা ভয়ানক আঁচড়ে দেয়। নখে নানা রকমের জারম থাকা সম্ভব।"

নিরুপম বাবুর বিভীষিকা ক্রমে বেড়ে যাওয়াতে তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে বিড়ালটাকে খানিকটা নীচে নামিয়ে নিলেন, কিন্তু সে পাঞ্জাবী আস্তীনে নখর বিদ্ধ ক'রে স্থির হয়ে ডাকল—"ম্যাও।"

লেডী ডাক্তার। একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে দেখলেন কি ?

নিরুপম। দেখেছি। দাঁত সোনা-বাঁধানো।

লেডী। শুধু তাই না, ইনশিওর করা। আমি কিন্তু তা' বলছি না। দাঁতের উপরে চারটি অক্ষর ক্ষোদা আছে—"ম—নে—রে—খ"

নিরুপমবাবু দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করিয়া বল্লেন, "বাঃ'!"

লেডী। ওটা আর্ট হলেও পলিটিক্‌সের মধ্যে। আমার মনে পড়ে, মেডিকেল কলেজে একটা নরকঙ্কাল ছিল, তা'র দাঁতই উল্লেখযোগ্য। আমাদের এক জন সহপাঠী তার উপর লিখেছিল—R—e—m—e—m—b—e—r m—e আপনি নিজেও ত Geologyতে M. A.; সুতরাং বেশী কথার দরকার নেই। দাঁত দেখলে জীবনের ইতিহাস দূরে থাকুক, যুগের ইতিহাস নির্ণয় করা যেতে পারে। হয় ত কিছু দিন পরে আমরাই

দাঁতে নানাপ্রকার কথা. ক্ষুদ্‌তে আরম্ভ কর্‌ব, কথায় না জানিয়ে হেসে দেখালেই চল্‌বে আপনি আজ সুন্দর বাঁশী বাজিয়েছেন। তা'র জন্য ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ সাঙ্গ হ'বার পূর্ব্বেই নিরুপমবাবু আত্ম-রক্ষার চেষ্টা কর্‌ছিলেন অর্থাৎ বিড়ালের ল্যাজ টানিয়া যত দূর সম্ভব তাকে অধোগত করা। ইহার ফলে তাঁ'র পাঞ্জাবী ছিঁড়ে গেল, এবং খানিকটা রক্তস্রাব বাম হস্তে!

ড্রয়িংরুমে এমন একটা কাণ্ড হওয়া নিতান্ত দুর্ভাগ্য-জনক। হেমলতা বসু এতক্ষণ চা' তৈয়ারীতে ব্যস্ত ছিলেন। অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি নিরুপমবাবুর কক্ষ হ'তে বিড়ালের গলা টিপিয়া বাহির করলেন—"আমি অত্যন্ত লজ্জিতা ও দুঃখিতা হয়েছি, মাফ করবেন।"

নিরুপম। কিছু না, কিছু না—কথাটা কিছু না। যদি আঁচড়ে না দিত তবে কিছুই বাধা ছিল না। চুপ ক'রে বসেছিল অনেকক্ষণ।

হেমলতা। আপনার হাতে জলপটি বেঁধে দিই।

(লেডী ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া) তরু দিদি, এ বিষয়ে তুমি পাকা, এই যে জল, এই যে রুমাল।

লেডি ডাক্তার। তুমিই বেঁধে দেও। যদি দরকার হয় একটু টিংচার আইডিন পরে দিলে হ'বে। তবে কি জান? নখে কত কি জারম থাকে।

টিংচার আইডিন দেওয়ার পর নিরুপমবাবু একটু প্রকৃতিস্থ হ'লেন, এবং এক পেয়ালা চা খেয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে বস্‌লেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষতস্থান জ্বালা করাতে তিনি সমুদ্রের একটা ছবির দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌ছিলেন।

হেমলতা। ও ছবিটা আমিও পছন্দ করি। Adriatic Seaর তটে ভেনিস্। যদি বেঁচে থাকি ত এক দিন দেখব।

নিরুপম। নিশ্চয়।

হেমলতা। আপনি কখনও সমুদ্রযাত্রা করেছেন?

নিরুপম। আমাদের দেশের উপন্যাসে নগেন্দ্র দত্তের নৌকারোহণে যাত্রাই সকলে প্রশস্ত ব'লে মনে করত।

হেমলতা। নৌকায় দাঁড় টানা বোধ হয় পরিশ্রমের কায?

নিরুপম। মোটেই না।

তরুবালা। তবে এক দিন বারাকপুর পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়।

মিষ্টার বসু সেই সময় নিকটে এসে বল্লেন, "তোমরা যদি নৌকায় বেড়াতে যাও, তবে রবিবারে বন্দোবস্ত করি।"

সকলে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

৩

ড্রয়িংরুমের বাহিরের সঙ্গে ভিতরের তুলনা ক'রে অনেকে হয় ত বল্‌তে পারেন যে, বাহিরে মুক্ত আকাশ, পরিষ্কার আলো ও হাওয়া ইত্যাদি। খানিকটা সত্য, তবে কি জানেন, বাহিরে শারীরিক পরিশ্রম বেশী এবং হঠাৎ ভালমন্দ হ'লে হাতের কাছে ডাক্তার পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ নৌকারোহণে জলে ডুবিবার ভয় সঙ্গে সঙ্গে। হৃদয় একবার সঙ্কুচিত ও একবার প্রসারিত হয় সত্য, এবং উপন্যাসের মালমশলা পাওয়া যায়, সেটাও সত্য, তবে সাবধানের বিনাশ নাই, এই জন্য দুখানা ডিঙ্গী ঠিক হ'ল। একখানিতে যাঁ'রা সাঁতার জানেন না, তাঁ'রা থাকবেন, এবং তাঁ'রা খুব কম জলে পাড়ের নিকট দিয়ে দাঁড় বেয়ে চ'লে যাবেন। আর একখানা বেশী জলে চলবে এবং নিতান্ত দরকার হলে সাহায্যের জন্য আস্‌বে।

পূর্ব্বোক্ত ডিঙ্গীতে ছিলেন মিস্ বসু, ডাক্তার তরুবালা, শ্রীমতী পূর্ণাঙ্গিনী দেবী বি, এ, এবং নিস্তারিণী ঝি। দাঁড়ে বসেছিলেন নিরুপমবাবু এক দিকে এবং দাঁড়ি বালক অন্য দিকে। কর্ণধার সেই বালকের বাপ বনমালী জেলে। শেষোক্ত গভীর জলের নৌকাতে মিষ্টার বসু, মিসেস্ বসু, এবং তাঁহাদের সমবয়স্ক বন্ধুগণ।

তরণীর গতির সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে নানা রকম ভাবের উদয় হচ্ছিল। হেমলতার মনে পড়ল, ইতিহাসে পুরাকালের যত নৌকার কাহিনী, ক্লিওপেট্রা থেকে আরম্ভ ক'রে, কিংবা ট্রোজান্ যুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে এলিজেবেথের সময় পর্য্যন্ত। পূর্ণাঙ্গিনী দেবী ভারতবর্ষের নৌকার আমল সম্বন্ধে অলোচনা কর্‌ছিলেন। এক সময় নদীতে নৌকার একটা শোভা ছিল, এবং তা'র মধ্যে জীবন ছিল, দস্যুভয় সত্ত্বেও। এখনকার উপন্যাসের মধ্যে হয় ত সমুদ্রগামী জাহাজ কিংবা নিতান্তপক্ষে গোয়ালন্দের ষ্টীমার। লোকের ভিড়ে ও বাষ্পের শব্দে মনের কথা বলা যায় না। ইত্যাদি।

ডাক্তার তরুবালা। নদীবক্ষে তটের ছায়া পড়েছে বড় সুন্দর। নিরুপমবাবু, অত জোরে দাঁড় টান্‌বেন না।'

নিরুপম। আপনারা যদি শোভা দেখতে চান, তবে সূর্য্যাস্তের সময় দেখবেন। নদীর বক্ষ খুব গভীর, তার মধ্যে মাছগুলো এক একটা ভাবের মত বিচরণ কচ্ছে। এখন আমরা উজিয়ে যাচ্ছি প্রায় ডুব-জলে, আস্‌বার সময় ভেটিয়ে আস্‌ব। সেই সময় কম জলে প্রতিবিম্ব সাদা দেখাবে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু আকাশে যদি এমন সময় মেঘ হয়, তবে একটু কষ্ট পেতে হ'বে।

পূর্ণাঙ্গিনী। আপনার বাঁশী এবার আনেন নি যখন, তখন গান ছাড়া উপায় নাই।

হেমলতা। ওঁরা অনেক এগিয়ে চ'লে গিয়েছেন। (ত্রস্ত ভাবে) আমার বোধ হয়, জোরে যাওয়াই ভাল। আস্‌বার সময় গানটান হ'বে।

শালিক
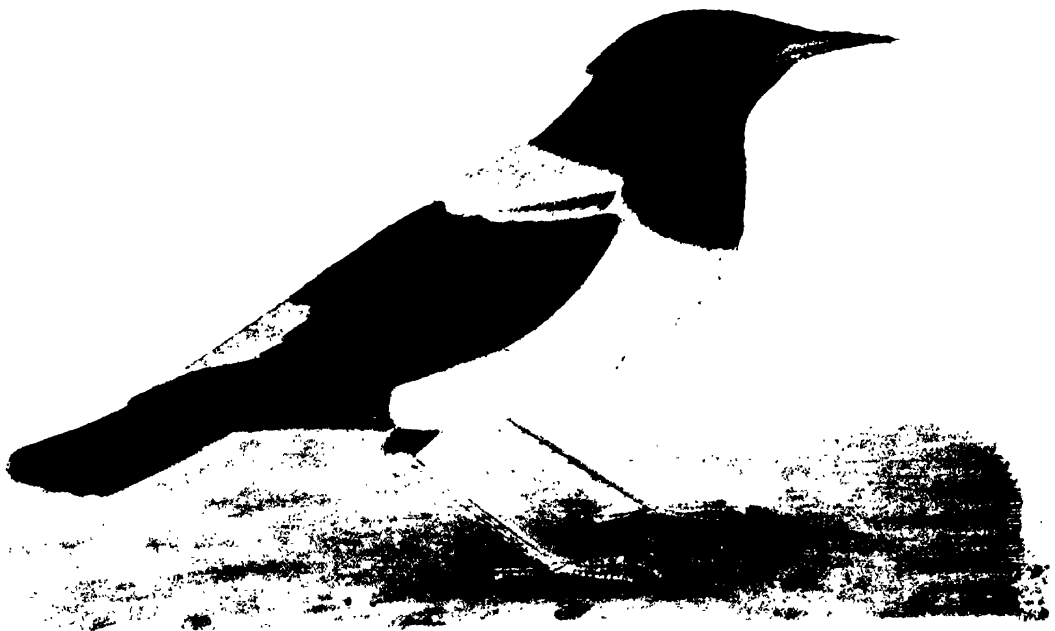
[শিল্পী—নারায়ণচন্দ্র কসারী।

বনমালী মাঝি। যদি তাড়াতাড়ি এগোতে চা'ন, তবে আমি লগি ঠেলি, বাবু গিয়ে হাল্ ধরুন।

নিরুপম। আমি হাল ধরতে শিখিনি, তবে বাঁশ দিলে নৌকাটা ঠেলে চালাতে পারব নিশ্চয়।

মাঝি মানা করা সত্ত্বেও নিরুপমবাবু কথা শুনলেন না, উপরন্তু তাঁ'র শরীরে শক্তি নাই, পাছে কেহ এমন সন্দেহ করে, তাই মনে ক'রে তিনি বিলক্ষণ বল সহকারে লগি চালাচ্ছিলেন, এবং তা'র সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে একটা খাম্বাজ রাগিণীর টপ্পাও সুরু ক'রে দিয়েছিলেন। অবশেষে হঠাৎ কিসে নৌকা বেধে গিয়ে তাঁ'র গান সজোরে গলা ছেড়ে ছুটে চ'লে গেল।

নিরুপমবাবু "ডিঙ্গী ডাঙ্গায় আট্‌কে গিয়েছে" এই কথা ব'লে ছট্‌কে পড়লেন।

মাঝি। ডিঙ্গী ঠেলে দিয়ে, আপনি উঠে পড়ুন, আমার হালও কাদায় আট্‌কে গিয়েছে।

নিরুপম বাবু সত্রাসে বল্লেন, "ড্যাঙ্গা ঠেলে উঠছে!" এ কথা সকলে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে নাই, অথচ ব্যাপার নিতান্ত সোজা নয়; কারণ, নিরুপমবাবু ঠিক ড্যাঙ্গার উপর ছটকে পড়েন নাই। একটা মহিষ পাড়ের নীচে কাদায় ডুবে আরাম করছিল, তা'রই কাঁধের উপর তিনি পড়িয়া যাওয়াতে' স্বাধীনতাভ্রষ্ট হয়ে মহিষ বিরক্তিসহকারে উঠতে চেষ্টা করল। মহিষটা খুব বৃহৎ-কলেবর এবং তা'র চোখের ভীতি-চাহনী দেখে মিস্ বসুর তৎক্ষণাৎ ফিট হয়ে পড়ল। ঝি চেঁচিয়ে ব'ল্লে, "মা, মহিষাসুরের হাত হ'তে রক্ষা কর।" মাঝি নিরুপমবাবুকে খুব সাবধান ক'রে ব'ল্লে—"আপনি শিং ধরবেন না, নির্ব্বিবাদে কাঁধের উপর ব'সে থাকুন, উঁচু হয়ে দাঁড়ালে গোলুইয়ে নেমে পড়বেন।"

ডাক্তার তরুবালা। আপনি হেমলতার জন্য ভয় পাবেন না, আমার কাছে ফিটের অষুধ আছে।

নিরুপম। আমি এমন ভয় পাইনি যে, ফিট হ'বে।

পূর্ণাঙ্গিনী। আপনার ফিটের কথা হচ্ছে না, মিস্ বসুর ফিট হয়েছে।

নিরুপমবাবুকে কাঁধে ক'রে মহিষ তখন উঠে পড়ল, এবং তিনি নিতান্ত কাতর হয়ে বল্লেন, "আমার দরকার হ'বে কি?"

ডাক্তার। না, এক মিনিটেই সুস্থ হ'বে এখন।

নিরুপম কোন প্রকারে হামাগুড়ি দিয়া নৌকায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, পূর্ণাঙ্গিনী দেবী জানালেন, "বোধ হয়, আপনার বিপদ দেখে হেমলতা নিতান্ত ভয় পেয়েছিলেন, আপনি জামাটা ছাড়ুন, কাদা লেগেছে।"

নিরুপম। ওঁর ফিট ভেঙ্গেছে?

ডাক্তার তরুবালা। অনেকক্ষণ।

নিরুপম। তবে নৌকা চালিয়ে দি।

৪

নিস্তারিণী ঝির বিশ্বাস যে, নিরুপমবাবুর গান শুনে হেমলতার ফিট হয়েছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন তর্ক করার ইচ্ছা তা'র ছিল না। যাই হোক্ না কেন, ফিরে আসবার সময় দুটো ডিঙ্গীই পাড়ের ধার দিয়ে এসেছিল, এবং সূর্য্যাস্তের সময় পাড়ের ধারে জলের মধ্যে তীরে বৃক্ষশ্রেণীর উল্টো প্রতিবিম্ব সকলেরই খুব রমণীয় বোধ হয়েছিল।

তবে, আর্ট সম্বন্ধে সকলের মত একরকম নয়। কারও কারও গান শুনলে মনে হয় অরণ্যে রোদন, কেহ কেহ মনে করে ছেলে কেঁদে উঠছে, কেউ মুখভঙ্গীর দিকে চেয়ে দেখে মনে মনে হাসে, কেহ বা রাগিণীর বিচার করে, কিংবা কথা শুনে পরিতৃপ্ত হয়। নিস্তারিণী চুপি

চুপি পূর্ণাঙ্গিনী দেবীকে বলেছিল, "যার এক দিকের দাড়ি গোঁপ নাই, তা'র গান করা অন্যায়, কেন না তা'তে 'বেয়াড়া দৃশ্যি' হয়, মনে হয় যেন একটা মুখোস গান গেয়ে ভয় দেখাচ্ছে।"

পূর্ণাঙ্গিনী। তুই আর্টের কি বুঝবি? আর্টের আসল উদ্দেশ্য মনের মধ্যে বিশ্বপ্রেম জাগানো।

এই কথা ব'লে তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, দময়ন্তীর স্বয়ংবর, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ প্রভৃতি বিখ্যাত আর্টিষ্টিক উদাহরণগুলি একে একে ঝিকে বোঝাতে লাগলেন। হেমলতার কানে সেই কথাগুলি মধ্যে মধ্যে প্রবেশ কচ্ছিল বোধ হয়। তাঁ'র মুখের পাণ্ডুবর্ণ দেখে নিরুপমবাবু এক বার বিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার বিশেষ কষ্ট হয়েছে এই নদীপর্য্যটনে। বাড়ী গিয়ে এক পোয়ালা চা তৈরি ক'রে দেব, তাই মনে ক'র্‌ছি।"

ডাক্তার তরুবালা। চা'র সরঞ্জাম সব নৌকাতেই আছে। পূর্ণ! তুমি ষ্টোভটা জ্বেলে ফেল।

নিরুপম। আপনারা কষ্ট করবেন না, আমিই সব করব এখন। দার্জ্জিলিংএ থেকে থেকে এত অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, দশ মিনিটের বেশী লাগবে না।

কিন্তু দেখা গেল যে, স্পিরিট-ষ্টোভ আনা হয় নাই। নিরুপমবাবু নৌকার একখানা তক্তা খুলে দেখলেন যে, একটা মাটীর উনান ও খানিকটা কয়লা আছে।

"মাঝি, তোমার উনানে আমরা চা তৈরী করছি, কিছু মনে কোরো না।"

মাঝি। একটু সাবধানে। যেন অগ্নিকাণ্ড না হয়। সম্মুখে সপ্তমীপুজো।

নিরুপমবাবু হেসে বল্লেন, "তুমি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ?"

ঝি। প্রথমে নুড়োটা জ্বেলে নিন্ দেশলাই-কাঠী ধরিয়ে।

নিরুপমবাবু (বিরক্তি সহকারে)। তোমাকে বক্‌তে হ'বে না, আমি নিজের কায বুঝি। এই করতে করতে জন্মটা গেল।

ঝি। আপনি বড়লোক তাই বল্‌ছিলুম।

পূর্ণাঙ্গিনী। তুই চুপ ক'রে থাক। জানিস্, উনি মেসপটেমিয়াতে যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

ঝি ভয়ে চুপ ক'রে থাক্‌ল।

নিরুপম। ওকে ব'কে কোন ফল নাই। আমাদের দেশে এক সময় এমন অবস্থা হ'বে যে, ঝি-চাকর পাওয়া যা'বে না। এমন কি, স্ত্রী পর্য্যন্ত পাওয়া যাবে না।

পূর্ণাঙ্গিনী। নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা।

নিরুপম। এক রকম বটে; কেন না, পূর্ব্বকালে লোক মনে করত যে, পুরুষ স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গী, এখন আর সেটা কেউ মনে করে না, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সকলেই চায়। সুতরাং কারও কপালে স্বামী কিংবা স্ত্রী জুটুক কিংবা নাই-জুটুক, চুলো ধরানো, কাপড় কাচা, রান্না ইত্যাদি যত জীবননির্ব্বাহের কায, প্রত্যেকেরই শেখা উচিত, নচেৎ ঘোর দুর্দ্দশা নিশ্চয়।

ডাক্তার তরুবালা। অতিশয় সত্য কথা। আপনি চুলোর দিকে নজর রাখুন, ধোঁয়া উঠছে।

নিরুপম। কেতলি কোথায়?

কেতলিতে জল ভ'রে চুলোর উপর বসাবার পর ধোঁয়া আরও বেড়ে গেল।

বনমালী কর্ণধারের ছেলে দাঁড় টেনে চল্‌ছিল ও মধ্যে মধ্যে নিরুপম বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে পাড়ের দিকে নিজের মুখ ফিরিয়ে হাসি সাম্‌লাচ্ছিল। হেমলতার মুখে পড়ন্ত রৌদ্র লাগছিল ব'লে ঝি একটা লাল ছাতা ধ'রে বস্‌লে।

নিরুপমবাবুর দশ মিনিট পার হয়ে গিয়েছিল, ও নৌকাও তখন হাওড়া পুলের কাছে, কেবল তীরে লাগালে হয়। সময় উত্তীর্ণ হয় দেখে নিরুপমবাবু সজোরে উনাণের মুখে ফু দিতে লাগলেন। কয়লা জ্ব'লে উঠল, কিন্তু আর একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল। অর্থাৎ নিরুপমবাবুর যে দিকটা দাড়ি ও গোঁফ ছিল, সেই দিকটা এবং তা'র সঙ্গে খানিকটা বাবরিচুল নিয়ে আগুন ধরে উঠল।

মাঝির ছেলে চীৎকার ক'রে উঠাতে সকলে দেখলেন যে, দাড়ি-গোঁফ প্রায় নিঃশেষ, কিন্তু নিরুপমবাবু বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর মুখের কোনও স্থানে আগুন লাগে নাই।

কিন্তু মাঝি চীৎকার ক'রে বল্লে—"নৌকায় আগুন লেগেছে।" অবশ্য সকলেই তখন তটস্থ। কেবল

হেমলতা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিলেন। নিরুপমবাবু তাঁ'কে একলাফে কোলে তুলে নিয়ে তীরে লাফিয়ে পড়লেন। আর আর সকলে তারই অব্যবহিত পূর্ব্বে নেমেছিল।

জলন্ত নৌকার পাটায় জল দিয়ে মাঝি অগ্নি নির্ব্বাপিত করল।

৫

তীরে উঠে বসুজা মহাশয় বল্লেন, 'নৌকায় বেড়ান' সব সময় 'সেফ' না।"

মিসেস্ বসু। হেমলতার গায় আগুনের ছিটে পড়ে নাই ত?

পূর্ণাঙ্গিনী দেবী মনে কল্লেন যে, নিরুপমবাবুর পোড়া দাড়ির এত কাছে হেমলতার মাথা ছিল যে, খানিকটা মাথা affected হবার কথা।

তরুবালা ডাক্তার বল্লেন, "Psychologically affected হ'তে পারে, কিন্তু Physiologically কখনো সম্ভবে না, কেন না; তখন অগুন নিভে গিয়েছে।"

নিরুপমবাবুর অসমসাহস দেখে ঝি লজ্জিত হয়েছিল; কারণ, সে জানত যে, তিনি এক জন বড় জমীদারের ছেলে, যুদ্ধবীরের মত লাফ ঝাঁপ কদাচ অভ্যাস নেই।

শেষে কারে আরোহণ ক'রে সকলেই পূর্ব্বোক্ত ড্রয়িং রুমে এসে পৌছুলেন। কাবুলী বিড়ালও ছুটে এসে পড়ল ও প্রথমেই নিরুপমবাবুর কোলে গেল। আঁচড়ালেও না, কামড়ালেও না। বাস্তবিকপক্ষে একপেশে দাড়ি-গোঁফ না থাকাতে, তাঁ'র মুখের লাবণ্য বোধ হয়, অন্ততঃ বিড়ালের নিকট বর্দ্ধিত হয়েছিল।

আবার চা'র সরঞ্জাম এসে পড়ল, কিন্তু আর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না। এ সম্বন্ধে ড্রয়িংরুমমাত্রেরই প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। বাহিরের সংসার বাস্তব অভিনয়ের স্থান, কিন্তু ড্রয়িংরুমে আর্টের শেষ উৎকর্ষ। তাই দেখতে পাওয়া গেল যে, নিমেষের মধ্যে সকলে ভাল পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে একটু ভিনোলিয়া সোপ মেখে, দু' তিন পেয়ালা চা খেয়ে আবার প্রকৃতিস্থ হ'য়ে পড়ল।

সেই সময় একটু সুযোগ পেয়ে পূর্ণাঙ্গিনী দেবী নিরুপমবাবুকে জানিয়ে দিলেন যে, হেমলতা তাঁ'র নিকট কৃতজ্ঞ; কারণ, তিনি না থাক্‌লে সে পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে যেত, এবং হেমলতাকে জানিয়ে দিলেন যে, নিরুপমবাবু তাঁ'র নিকট চিরকৃতজ্ঞ; কারণ, পূর্ব্বের দিন বিড়ালটা তাঁ'র মহামূল্য চোখ নখরে বিদ্ধ ক'রে দিলে অন্ধ হয়ে যেতে হ'ত।

এইরূপ খানিকটা ঘটকালী ক'রে, অবশেষে ডাক্তার তরুবালার সঙ্গে তিনি আলাপ করতে লাগলেন।

ডাক্তার। Caseটা বুঝ্‌লে ত? প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবাসা।

পূর্ণাঙ্গিনী। আমার বোধ হয়, দ্বিতীয় দৃষ্টিতে অর্থাৎ দাড়ি-গোঁফ পুড়ে যাবার পর। কেন না, প্রথম দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিভীষিকা প্রকাশ পেয়েছিল।

তরুবালা। তোমার এখনও বিয়ে হয় নি, সুতরাং এ সম্বন্ধে তর্ক করা বৃথা। ভয় ও রাগের মধ্যেও সময় সময় অনুরাগ এসে জোটে। আমার স্বামীর গালে এক দিন চড় মেরে আমি ভালবেসে ফেলেছিলুম। যা হৌক তিনি স্বর্গে, সে সব কথা বল্‌তে গিয়ে বুক ফেটে যায়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

হরিলক্ষ্মী

১
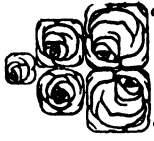
যাহা লইয়া এই গল্পের উৎপত্তি, তাহা ছোট, তথাপি এই ছোট ব্যাপারটুকু অবলম্বন করিয়া হরিলক্ষ্মীর জীবনে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা ক্ষুদ্রও নহে, তুচ্ছও নহে। সংসারে এমনই হয়। বেলপুরের দুই সরিক, শান্ত নদী-কূলে জাহাজের পাশে জেলে ডিঙ্গীর মত একটি অপরটির পার্শ্বে নিরুপদ্রবেই বাঁধা ছিল, অকস্মাৎ কোথাকার একটা উড়ো ঝড়ে তরঙ্গ তুলিয়া জাহাজের দড়ি কাটিল, নোঙ্গর ছিঁড়িল, এক মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র তরণী কি করিয়া যে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তাহার হিসাব পাওয়াই গেল না।

বেলপুর তালুকটুকু বড় ব্যাপার নয়। উঠিতে বসিতে প্রজা ঠেঙ্গাইয়া হাজার বারোর উপরে উঠে না, কিন্তু সাড়ে পোনর আনার অংশীদার শিবচরণের কাছে দু' পাই অংশের বিপিনবিহারীকে যদি জাহাজের সঙ্গে জেলে ডিঙ্গীর তুলনাই করিয়া থাকি ত বোধ করি, অতিশয়োক্তির অপরাধ করি নাই।

দূর হইলেও জ্ঞাতি, এবং ছয় সাত পুরুষ পূর্ব্বে ভদ্রাসন উভয়ের একত্রই ছিল, কিন্তু আজ এক জনের ত্রিতল অট্টালিকা গ্রামের মাথায় চড়িয়াছে এবং অপরের জীর্ণ গৃহ দিনের পর দিন ভূমিশয্যা গ্রহণের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছে।

তবু এমনই ভাবে দিন কাটিতেছিল এবং এমনই করিয়াই হয় ত বাকি দিনগুলা বিপিনের সুখে দুঃখে নির্ব্বিবাদেই কাটিতে পারিত; কিন্তু যে মেঘখণ্ডটুকু উপলক্ষ করিয়া অকালে ঝঞ্ঝা উঠিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল, তাহা এইরূপ।

সাড়ে পোনর আনার অংশীদার শিবচরণের হঠাৎ পত্নী-বিয়োগ ঘটিলে বন্ধুরা কহিলেন, চল্লিশ একচল্লিশ কি আবার একটা বয়স! তুমি আবার বিবাহ কর। শত্রু-পক্ষীয়রা শুনিয়া হাসিল; কহিল, চল্লিশ ত শিবচরণের চল্লিশ বছর আগে পার হয়ে গেছে! অর্থাৎ, কোনটাই সত্য নয়। আসল কথা, বড়বাবুর দিব্য গৌরবর্ণ নাদুস-নুদুস দেহ, সুপুষ্ট মুখের পরে রোমের চিহ্নমাত্র নাই। যথাকালে দাড়ি গোঁফ না গজানোর সুবিধা হয় ত কিছু আছে, কিন্তু অসুবিধাও বিস্তর! বয়স আন্দাজ করা ব্যাপারে যাহারা নীচের দিকে যাইতে চাহে না, উপরের দিকে তাহারা যে অঙ্কের কোন্ কোঠায় গিয়া ভর দিয়া দাঁড়াইবে, তাহা নিজেরাই ঠাহর করিতে পারে না। সে যাই হোক, অর্থশালী পুরুষের যে কোন দেশেই বয়সের অজুহাতে বিবাহ আটকায় না, বাঙ্গালা দেশে ত নয়-ই। মাস দেড়েক শোক-তাপ ও না না করিয়া গেল, তাহার পরে হরিলক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া শিবচরণ বাড়ী আনিলেন। শূন্য গৃহ এক দিনেই ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কারণ, শত্রুপক্ষ যাহাই কেন না বলুক, প্রজাপতি যে সত্যই তাঁহার প্রতি এবার অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, তাহা মানিতেই হইবে। তাহারা গোপনে বলাবলি করিল যে, পাত্রের তুলনায় নববধূ বয়সের দিক দিয়া একেবারেই বে-মানান হয় নাই, তবে, দুই একটি ছেলে-মেয়ে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিলে আর খুঁত ধরিবার কিছু থাকিত না! তবে, সে যে সুন্দরী, এ কথা তাহারা স্বীকার করিল। ফল কথা, সচরাচর বড় বয়সের চেয়েও লক্ষ্মীর বয়সটা কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল, বোধ করি, উনিশের কম হইবে না। তাহার পিতা আধুনিক নব্যতন্ত্রের লোক, যত্ন করিয়া মেয়েকে বেশী বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া ম্যাট্রিক পাশ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য ইচ্ছা ছিল, শুধু ব্যবসা ফেল পড়িয়া আকস্মিক দারিদ্র্যের জন্যই এই সুপাত্রে কন্যা অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মী সহরের মেয়ে, স্বামীকে দুই চারি দিনেই চিনিয়া ফেলিল। তাহার মুস্কিল হইল এই যে, আত্মীয় আশ্রিত বহু পরিজন-পরিবৃত বৃহৎ সংসারের মধ্যে সে মন খুলিয়া কাহারও সহিত মিশিতে পারিল না। ও-দিকে শিবচরণের ভালবাসার ত আর অন্ত রহিল না। শুধু কেবল বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা বলিয়াই নয়, সে যেন একেবারে অমূল্য নিধি লাভ করিল। বাটীর আত্মীয় আত্মীয়ার দল কোথায় কি করিয়া যে তাহার মন যোগাইবে, খুঁজিয়া পাইল না। একটা কথা সে প্রায়ই শুনিতে পাইত,—এইবার মেজ-বৌয়ের মুখে কালি পড়িল। কি

রূপে, কি গুণে, কি বিদ্যা-বুদ্ধিতে এত দিনে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল।

কিন্তু এত করিয়াও সুবিধা হইল না, মাস দুয়েকের মধ্যে লক্ষ্মী অসুখে পড়িল। এই অসুখের মধ্যেই এক দিন মেজ-বৌয়ের সাক্ষাৎ মিলিল। তিনি বিপিনের স্ত্রী, বড় বাড়ীর নতুন বধূর জ্বর শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। বয়সে বোধ হয়, দুই তিন বছরের বড়; তিনি যে সুন্দরী, তাহা মনে মনে লক্ষ্মী স্বীকার করিল। কিন্তু এই বয়সেই দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাতের চিহ্ন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে বছর ছয়েকের একটি ছেলে, সে-ও রোগা। লক্ষ্মী শয্যার একধারে সযত্নে বসিতে স্থান দিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার না^ পরণে ঈষৎ মলিন একখানি রাঙা পাড়ের ধুতি, বোধ হয়, তাহার স্বামীর হইবে, পল্লীগ্রামের প্রথামত ছেলেটি দিগম্বর নয়,তাহারও কোমরে একখানি শিউলীফুলে ছোপানো ছোট্ট কাপড় জড়ানো।

লক্ষ্মী তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "ভাগ্যে জ্বর হয়েছিল, তাই ত আপনার দেখা পেলুম। কিন্তু সম্পর্কে আমি বড় জা হই, মেজবৌ। শুনেছি, মেজ ঠাকুরপো এঁর চেয়ে ঢের ছোট।

মেজবৌ হাসিমুখে কহিল, সম্পর্কে ছোট হ'লে কি তা'কে আপনি বলে?

লক্ষ্মী কহিল, প্রথম দিন এই যা বল্লুম, নইলে 'আপনি' বল্‌বার লোক আমি নই। কিন্তু তাই ব'লে তুমিও যেন আমাকে দিদি ব'লে ডেকো না,—ও আমি সইতে পারব না। আমার নাম লক্ষ্মী।

মেজ-বৌ কহিল, নামটি ব'লে দিতে হয় না, দিদি, আপনাকে দেখলেই জানা যায়· আর আমার নাম—কি জানি, কে যে ঠাট্টা ক'রে কমলা রেখেছিলেন—এই বলিয়া সে সকৌতুকে একটুখানি হাসিল মাত্র।

হরিলক্ষ্মীর ইচ্ছা করিল, সে-ও প্রতিবাদ করিয়া বলে, তোমার পানে তাকালেও তোমার নামটি বুঝা যায়, কিন্তু অনুকৃতির মত শুনাইবার ভয়ে বলিতে পারিল না; কহিল, আমাদের নামের মানে এক। কিন্তু, মেজ-বৌ, আমি তোমাকে 'তুমি' বল্‌তে পারলুম, তুমি পারলে না।

মেজ-বৌ সহাস্যে জবাব দিল, হঠাৎ না-ই পারলুম, দিদি। এক বয়স ছাড়া আপনি সকল বিষয়েই আমার বড়। যাক্ না দু'দিন—দরকার হ'লে বদ্‌লে নিতে কতক্ষণ?

হরিলক্ষ্মীর মুখে সহসা ইহার প্রত্যুত্তর যোগাইল না, কিন্তু সে মনে মনে বুঝিল, এই মেয়েটি প্রথম দিনের পরিচয়টিকে মাখামাখিতে পরিণত করিতে চাহে না। কিন্তু কিছু একটা বলিবার পূর্ব্বেই মেজ-বৌ উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল, এখন তা'হলে উঠি, দিদি, কা'ল আবার—

লক্ষ্মী বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, এখনই যাবে কি রকম, আর একটু বোসো।

মেজ-বৌ কহিল, আপনি হুকুম করলে ত বস্‌তেই হ'বে, কিন্তু আজ যাই, দিদি, ওঁর আস্‌বার সময় হ'ল। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ছেলের হাত ধরিয়া যাইবার পূর্ব্বে সহাস্যমুখে কহিল, আসি, দিদি। কা'ল একটু সকাল সকাল আস্‌বো, কেমন? এই বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বিপিনের স্ত্রী চলিয়া গেলে হরিলক্ষ্মী সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। এখন জ্বর ছিল না, কিন্তু গ্লানি ছিল। তথাপি কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত সে ভুলিয়া গেল। এত দিন গ্রাম ঝেঁটাইয়া কত বৌ-ঝি যে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু পাশের বাড়ীর দরিদ্র ঘরের এই বধূটির সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না। তাহারা যাচিয়া আসিয়াছে, উঠিতে চাহে না, আর বসিতে বলিলে ত কথাই নাই। সে কত প্রগল্‌ভতা, কত বাচালতা, মনোরঞ্জন করিবার কত কি লজ্জাকর প্রয়াস! ভারাক্রান্ত মন তাহার মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহাদেরই মধ্য হইতে অকস্মাৎ কে আসিয়া তাহার রোগশয্যায় মুহূর্ত্ত কয়েকের তরে নিজের পরিচয় দিয়া গেল! তাহার বাপের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় হয় নাই, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়াও লক্ষ্মী কি জানি কেমন করিয়া অনুভব করিল—তাহার মত সে কিছুতেই কলিকাতার মেয়ে নয়। পল্লী অঞ্চলে

লেখাপড়া জানে বলিয়া বিপিনের স্ত্রীর একটা খ্যাতি আছে। লক্ষ্মী ভাবিল খুব সম্ভব বৌটি সুর করিয়া রামায়ণ-মহাভারত পড়িতে পারে, কিন্তু তাহার বেশী নহে। যে পিতা বিপিনের মত দীন- দুঃখীর হাতে মেয়ে দিয়াছে, সে কিছু আর মাষ্টার রাখিয়া স্কুলে পড়াইয়া পাশ করাইয়া কন্যা সম্প্রদান করে নাই। রঙ উজ্জ্বল শ্যাম—ফর্সা বলা চলে না। কিন্তু রূপের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, শিক্ষা, সংসর্গ, অবস্থা, কিছুতেই ত বিপিনের স্ত্রী তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে লক্ষ্মীর নিজেকে যেন ছোট মনে হইল। তাহার কণ্ঠস্বর। সে যেন গানের মত, আর বলিবার ধরণটি একেবারে মধু দিয়া ভরা। এতটুকু জড়িমা নাই, কথাগুলি যেন সে বাড়ী হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিল, এমনই সহজ। কিন্তু সব চেয়ে যে বস্তু তাহাকে বেশী বিদ্ধ করিল, সে ওই মেয়েটির দূরত্ব। সে যে দরিদ্র ঘরের বধূ, তাহা মুখে না বলিয়াও এমন করিয়াই প্রকাশ করিল. যেন ইহাই তাহার স্বাভাবিক, যেন এ ছাড়া আর কিছু তাহাকে কোনমতেই মানাইত না। দরিদ্র, কিন্তু কাঙাল নয়। এক পরিবারের বধূ এক জনের পীড়ায় আর এক জন তাহার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে,—ইহার অতিরিক্ত লেশমাত্রও অন্য উদ্দেশ্য নাই। সন্ধ্যার পরে স্বামী দেখিতে আসিলে হরিলক্ষ্মী নানা কথার পরে কহিল, আজ ও-বাড়ীর মেজ-বৌ ঠাকরুণকে দেখ্‌লাম।

শিবচরণ কহিল, কাকে? বিপিনের বৌকে?

লক্ষ্মী কহিল, হাঁ। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, এত কাল পরে আমাকে নিজেই দেখ্‌তে এসেছিলেন। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের বেশী বসতে পারলেন না, কায আছে ব'লে উঠে গেলেন।

শিবচরণ কহিল, কায? আরে, ওদের দাসী আছে না চাকর আছে? বাসনমাজা থেকে হাঁড়ি ঠেলা পর্য্যন্ত, —কই, তোমার মত শুয়ে ব'সে গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটাক্ ত দেখি? এক ঘটি জল পর্য্যন্ত আর তোমাকে গড়িয়ে খেতে হয় না।

নিজের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য হরিলক্ষ্মীর অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু কথাগুলা নাকি তাহাকে বাড়াইবার জন্যই, লাঞ্ছনার জন্য নহে, এই মনে করিয়া সে রাগ করিল না, বলিল, শুনেছি নাকি মেজ-বৌর বড় গুমোর, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যায় না?

শিবচরণ কহিল, যাবে কোত্থেকে? হাতে ক'গাছি চুড়ি ছাড়া আর ছাইও নেই,—লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না।

হরিলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া বলিল, লজ্জা কিসের? দেশের লোক কি ওঁর গায়ে জড়োয়া গহনা দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, না দেখতে না পেলে ছি ছি করে?

শিবচরণ কহিল, জড়োয়া গয়না! আমি যা তোমাকে দিয়েছি, কোন্ শালার বেটা তা' চোখে দেখেছে? পরিবারকে ত আজ পর্য্যন্ত দুগাছা চুড়ি ছাড়া আর গড়িয়ে দিতে পার্‌লিনে! বাবা! টাকার জোর বড় জোর! জুতো মারবো আর—

হরিলক্ষ্মী ক্ষুণ্ণ ও অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিল, ছি ছি, ও সব তুমি কি বোল্‌ছ?

শিবচরণ কহিল, না না, আমার কাছে লুকোছাপা নেই—যা বোল্‌ব, তা' স্পষ্টাস্পষ্টি কথা।

হরিলক্ষ্মী নিরুত্তরে চোখ বুজিয়া শুইল। বলিবারই বা আছে কি? ইহারা দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রূঢ় কথা কঠোর ও কর্কশ করিয়া উচ্চারণ করাকেই একমাত্র স্পষ্টবাদিতা বলিয়া জানে। শিবচরণ শান্ত হইল না, বলিতে লাগিল, বিয়েতে যে পাঁচশ টাকা ধার নিয়ে গেলি, সুদে আসলে সাত আটশ হয়েছে, তা খেয়াল আছে? গরীব একধারে প'ড়ে আছিস্ থাক, ইচ্ছে কর্‌লে যে কান ম'লে দূর ক'রে দিতে পারি। দাসীর যোগ্য নয়,—আমার পরিবারের কাছে গুমোর।

হরিলক্ষ্মী পাশ ফিরিয়া শুইল। অসুখের উপরে বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার সর্ব্বশরীর যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল।

পরদিন দুপুরবেলায় ঘরের মধ্যে মৃদু শব্দে হরিলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া দেখিল, বিপিনের স্ত্রী বাহির হইয়া যাইতেছে। ডাকিয়া কহিল, মেজ-বৌ, চ'লে যাচ্ছো যে?

মেজ-বৌ সলজ্জে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি ভেবেছিলাম, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ কেমন আছেন, দিদি?

হরিলক্ষ্মী কহিল, আজ ঢের ভাল আছি। কই, তোমার ছেলেকে আনোনি?

মেজ-বৌ বলিল, আজ সে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়্‌লো, দিদি।

হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়্‌লো মানে কি?

অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে ব'লে আমি দিনের বেলায় বড় তাকে ঘুমোতে দিইনে, দিদি।

হরিলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, রোদে রোদে দুরন্তপনা ক'রে বেড়ায় না?

মেজ-বৌ কহিল, করে বই কি। কিন্তু ঘুমোনোর চেয়ে সে বরঞ্চ ভাল।

তুমি নিজে বুঝি কখনো ঘুমোও না?

মেজ-বৌ হাসিমুখে শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিলক্ষ্মী ভাবিয়াছিল, মেয়েদের স্বভাবের মত এবার হয় ত সে তাহার অনবকাশের দীর্ঘ তালিকা দিতে বসিবে, কিন্তু সে সেরূপ কিছুই করিল না। ইহার পরে অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় হরিলক্ষ্মী তাহার বাপের বাড়ীর কথা, ভাই-বোনের কথা, মাষ্টারমশায়ের কথা, স্কুলের কথা, এমন কি, তাহার ম্যাট্রিক পাশ করার কথাও গল্প করিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে যখন হুঁস হইল, তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, শ্রোতা হিসাবে মেজ-বৌ যত ভালই হোক, বক্তা হিসাবে একবারে অকিঞ্চিৎকর। নিজের কথা সে প্রায় কিছুই বলে নাই। প্রথমটা লক্ষ্মী লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু তখনই মনে করিল, আমার কাছে গল্প করিবার মত তাহার আছেই বা কি! কিন্তু কা'ল যেমন এই বধূটির বিরুদ্ধে মন তাহার অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তেমনই ভারি একটা তৃপ্তি বোধ করিল।

দেয়ালের মূল্যবান্ ঘড়িতে নানাবিধ বাজনা-বাদ্য করিয়া তিনটা বাজিল। মেজ-বৌ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে কহিল, দিদি, আজ তা হ'লে আসি?

লক্ষ্মী সকৌতুকে বলিল, তোমার বুঝি ভাই তিনটে পর্য্যন্তই ছুটী? ঠাকুরপো না কি কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়ে বাড়ী ঢোকেন?

মেজ-বৌ কহিল, আজ তিনি বাড়ীতে আছেন।

আজ কেন তবে আর একটু বোসো না?

মেজ-বৌ বসিল না, কিন্তু যাবার জন্যও পা বাড়াইল না। আস্তে আস্তে বলিল, দিদি, আপনার কত শিক্ষা-দীক্ষা, কত লেখাপড়া, আমি পাড়াগাঁয়ের—

তোমার বাপের বাড়ী বুঝি পাড়াগাঁয়ে?

হাঁ দিদি, সে একেবারে অজ পল্লীগ্রামে। না বুঝে কা'ল হয় ত কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি, কিন্তু অসম্মান করার জন্যে;—আমাকে আপনি যে দিব্বি কর্‌তে বল্‌বেন, দিদি—

হরিলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সে কি মেজ-বৌ, তুমি ত আমাকে এমন কোন কথাই বলনি।

মেজ-বৌ এ কথার প্রত্যুত্তরে আর একটা কথাও কহিল না। কিন্তু 'আসি' বলিয়া পুনশ্চ বিদায় লইয়া যখন সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, তখন কণ্ঠস্বর যেন তাহার অকস্মাৎ আর একরকম শুনাইল।

রাত্রিতে শিবচরণ যখন কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন হরিলক্ষ্মী চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মেজ-বৌয়ের শেষের কথাগুলা আর তাহার স্মরণ ছিল না। দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মনও শান্ত, প্রসন্ন ছিল।

শিবচরণ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ, বড়-বৌ?

লক্ষ্মী উঠিয়া বসিয়া কহিল, ভাল আছি।

শিবচরণ কহিল, সকালের ব্যাপার জান ত? বাছাধনকে ডাকিয়ে এনে সকলের সাম্‌নে এম্‌নি কড়কে দিয়েছি যে, জন্মে ভুল্‌বে না। আমি বেলপুরের শিবচরণ! হাঁ!

হরিলক্ষ্মী ভীত হইয়া কহিল, কাকে গো?

শিবচরণ বলিল, বিপ্‌নেকে। ডেকে ব'লে দিলাম, তোমার পরিবার আমার পরিবারের কাছে জাঁক ক'রে তাকে অপমান ক'রে যায়, এত বড় আস্পর্দ্ধা! পাজি, নচ্ছার, ছোট লোকের মেয়ে! তা'র ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে গাঁয়ের বা'র ক'রে দিতে পারি, জানিস।

হরিলক্ষ্মীর রোগক্লিষ্ট মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল,—বল কি গো?

শিবচরণ নিজের বুকে তাল ঠুকিয়া সদর্পে বলিতে লাগিল, এ গাঁয়ে জজ বল, ম্যাজিষ্ট্রেট বল, আর দারোগা পুলিস বল, সব এই শর্ম্মা! এই শর্ম্মা! মরণ-কাঠি,

জীয়ন-কাঠি এই হাতে। তুমি বল, কা'ল যদি না বিপনের বৌ এসে তোমার পা টেপে ত আমি লাটু চৌধুরীর ছেলেই নই! আমি—

বিপিনের বধূকে সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার বিবরণ ও ব্যাখ্যায় লাটু চৌধুরীর ছেলে অ-কথা কু-কথার আর শেষ রাখিল না। আর তাহারই সম্মুখে স্তব্ধ নির্নিমেষ চক্ষুতে চাহিয়া হরিলক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, ধরিত্রী, দ্বিধা হও!

২

দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যার দেহরক্ষার জন্য শিবচরণ কেবলমাত্র নিজের দেহ ভিন্ন আর সমস্তই দিতে পারিত। হরিলক্ষ্মীর সেই দেহ বেলপুরে সারিতে চাহিল না। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন হাওয়া বদ্‌লাইবার। শিবচরণ সাড়ে পোনর আনার মর্য্যাদা-মত ঘটা করিয়া হাওয়া বদলানোর আয়োজন করিল। যাত্রার শুভ দিনে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, আসিল না কেবল বিপিন ও তাহার স্ত্রী। বাহিরে শিবচরণ যাহা না বলিবার, তাহা বলিতে লাগিল, এবং ভিতরে বড় পিসী উদ্দাম হইয়া উঠিলেন। বাহিরেও ধুয়া ধরিবার লোকাভাব ঘটিল না, অন্তঃপুরেও তেমনই পিসীমা'র চীৎকারের আয়তন বাড়াইতে যথেষ্ট স্ত্রীলোক জুটিল। কিছুই বলিল না শুধু হরিলক্ষ্মী। মেজ-বৌয়ের প্রতি তাহার ক্ষোভ ও অভিমানের মাত্রা কাহারও অপেক্ষাই কম ছিল না, সে মনে মনে বলিতে লাগিল, তাহার বর্ব্বর স্বামী যত অন্যায়ই করিয়া থাক, সে নিজে ত কিছু করে নাই, কিন্তু ঘরের ও বাহিরের যে সব মেয়েরা আজ চেঁচাইতেছিল, তাহাদের সহিত কোন সূত্রেই কণ্ঠ মিলাইতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল। যাইবার পথে পাল্কীর দরজা ফাঁক করিয়া লক্ষ্মী উৎসুক চক্ষুতে বিপিনের জীর্ণ গৃহের জানালার প্রতি চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাহারও ছায়াটুকুও তাহার চোখে পড়িল না।

কাশীতে বাড়ী ঠিক করা হইয়াছিল, তথাকার জলবাতাসের গুণে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে লক্ষ্মীর বিলম্ব হইল না, মাস চারেক পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তাহার দেহের কান্তি দেখিয়া মেয়েদের গোপন ঈর্ষ্যার আর অবধি রহিল না।

হিম-ঋতু আগতপ্রায়, দুপুরবেলায় মেজ-বৌ চিররুগ্ন স্বামীর জন্য একটা পশমের গলাবন্ধ বুনিতেছিল, অনতিদূরে বসিয়া ছেলে খেলা করিতেছিল, সে-ই দেখিতে পাইয়া কলরব করিয়া উঠিল, মা, জ্যাঠাইমা।

মা হাতের কাষ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করিয়া লইয়া আসন পাতিয়া দিল, স্মিতমুখে প্রশ্ন করিল, শরীর নিরাময় হয়েছে, দিদি?

লক্ষ্মী কহিল, হাঁ, হয়েছে। কিন্তু না হতেও পারতো, না ফিরতেও পারতাম, অথচ যাবার সময়ে একটিবার খোঁজও নিলে না। সমস্ত পথটা তোমার জানলার পানে চেয়ে চেয়ে গেলাম, একবার ছায়াটুকুও চোখে পড়ল না। রোগা বোন চ'লে যাচ্ছে, একটুখানি মায়াও কি হ'ল না, মেজ বৌ? এম্‌নি পাষাণ তুমি?

মেজ-বৌয়ের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু সে কোন উত্তরই দিল না।

লক্ষ্মী বলিল, আমার আর যা দোষই থাক, মেজ-বৌ, তোমার মত কঠিন প্রাণ আমার নয়। ভগবান্ না করুন, কিন্তু অমন সময়ে আমি তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারতাম না।

মেজ-বৌ এ অভিযোগেরও কোন জবাব দিল না, নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী আর কখনও আসে নাই, আজ এই প্রথম এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘরগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। শতবর্ষের জরাজীর্ণ গৃহ, মাত্র তিনখানি কক্ষ কোনমতে বাসোপযোগী রহিয়াছে। দরিদ্রের আবাস, আসবাবপত্র নাই বলিলেই চলে, ঘরের চূণ-বালি খসিয়াছে, সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি অনাবশ্যক অপরিচ্ছন্নতা এতটুকু কোথাও নাই। স্বল্প বিছানা ঝর্ ঝর্ করিতেছে, দুই চারিখানি দেবদেবীর ছবি টাঙানো আছে, আর আছে মেজ-বৌয়ের হাতের নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম। অধিকাংশই পশম ও সূতার কাষ, কিন্তু একটু দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায়, তাহা শিক্ষানবীশের হাতের লাল ঠোঁটওয়ালা সবুজ রঙের টিয়াপাখী অথবা পাচরঙা বেরালের মূর্ত্তি নয়। মূল্যবান্ ফ্রেমে আটা লাল-নীল-বেগুনি-ধূসর-পাশুটে নানা বিচিত্র রঙের সমাবেশে পশমে বোনা 'ওয়েল কম্' 'আসুন বসুন' অথবা

বানান-ভুল গীতার শ্লোকার্দ্ধও নয়। লক্ষ্মী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, ওটি কার ছবি, মেজ-বৌ, যেন চেনা-চেনা ঠেক্‌চে?

মেজ-বৌ সলজ্জে হাসিয়া কহিল, ওটি তিলক মহারাজের ছবি দেখে বোন্‌বার চেষ্টা করেছিলাম, দিদি, কিন্তু কিছুই হয় নি। এই কথা বলিয়া সে সম্মুখের দেয়ালে টাঙানো ভারতের কৌস্তুভ, মহাবীর তিলকের ছবি আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

লক্ষ্মী বহুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চিনতে পারিনি, সে আমারই দোষ, মেজ-বৌ, তোমার নয়। আমাকে শেখাবে, ভাই? এ বিদ্যে শিখতে যদি পারি ত তোমাকে গুরু ব'লে মান্‌তে আমার আপত্তি নেই।

মেজ-বৌ হসিতে লাগিল। সে দিন ঘণ্টা তিন চার পরে বিকালে যখন লক্ষ্মী বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন এই কথাই স্থির করিয়া গেল যে, কলা-শিল্প শিখিতে কা'ল হইতে সে প্রত্যহ আসিবে।

আসিতেও লাগিল, কিন্তু দশ পনেরো দিনেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এ বিদ্যা শুধু কঠিন নয়, অর্জ্জন করিতেও সুদীর্ঘ সময় লাগিবে। এক দিন লক্ষ্মী কহিল, কই, মেজ-বৌ, তুমি আমাকে যত্ন ক'রে শেখাও না।

মেজ-বৌ বলিল, ঢের সময় লাগবে, দিদি, তা'র চেয়ে বরঞ্চ আপনি অন্য সব বোনা শিখুন।

লক্ষ্মী মনে মনে রাগ করিল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিখতে কত দিন লেগেছিল, মেজ-বৌ?

মেজ-বৌ জবাব দিল, আমাকে কেউ ত শেখায়নি, দিদি, নিজের চেষ্টাতেই একটু একটু ক'রে—

লক্ষ্মী বলিল, তাইতেই। নইলে পরের কাছে শিখতে গেলে তোমারও সময়ের হিসাব থাক্‌তো।

মুখে সে যাহাই বলুক, মনে মনে নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিল, মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে এই মেজ-বৌয়ের কাছে সে দাঁড়াইতেই পারে না। আজ তাহার শিক্ষার কায অগ্রসর হইল না, এবং যথাসময়ের অনেক পূর্ব্বেই সূচ-সূতা-প্যাটার্ণ গুটাইয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। পরদিন আসিল না, এবং এই প্রথম প্রত্যহ আসায় তাহার ব্যাঘাত হইল।

দিন চারেক পরে আবার এক দিন হরিলক্ষ্মী তাহার সূচ-সূতার বাক্স হাতে করিয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেজ-বৌ তাহার ছেলেকে রামায়ণ হইতে ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া গল্প বলিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, দু'তিন দিন আসেন নি, আপনার শরীর ভাল ছিল না বুঝি?

লক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া কহিল, না, এম্‌নি পাঁচ ছ' দিন আস্‌তে পারি নি।

মেজ-বৌ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, পাঁচ ছ' দিন আসেন নি? তাই হ'বে বোধ হয়। কিন্তু আজ তা' হ'লে দুঘণ্টা বেশী থেকে কামাইটা পুষিয়ে নেওয়া চাই।

লক্ষ্মী বলিল, হুঁ। কিন্তু অসুখই যদি আমার ক'রে থাকতো, মেজ-বৌ, তোমার ত এক বার খোঁজ করা উচিত ছিল।

মেজ বৌ সলজ্জে বলিল, উচিত নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সংসারের অসংখ্য রকমের কায,—একলা মানুষ, কাকেই বা পাঠাই বলুন? কিন্তু অপরাধ হয়েছে, তা স্বীকার করচি দিদি।

লক্ষ্মী মনে মনে খুসী হইল। এ কয়দিন সে অত্যন্ত অভিমানবশেই আসিতে পারে নাই, অথচ, অহর্নিশি যাই-যাই করিয়াই তাহার দিন কাটিয়াছে। এই মেজ-বৌ ছাড়া শুধু গৃহে কেন, সমস্ত গ্রামের মধ্যেও আর কেহ নাই, যাহার সহিত সে মন খুলিয়া মিশিতে পারে। ছেলে নিজের মনে ছবি দেখিতেছিল। হরিলক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া কহিল, নিখিল, কাছে এস ত, বাবা? সে কাছে আসিলে লক্ষ্মী বাক্স খুলিয়া একগাছি সরু সোনার হার তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, যাও, খেলা কর গে।

মায়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ওটা দিলেন না কি?

লক্ষ্মী স্মিত মুখে জবাব দিল, দিলাম বই কি।

মেজ-বৌ কহিল, আপনি দিলেই বা ও নেবে কেন?

লক্ষ্মী অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, জ্যাঠাইমা কি একটা হার দিতে পারে না?

মেজ-বৌ বলিল, তা জানিনে, দিদি, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানি, মা হয়ে আমি নিতে দিতে পারিনে। নিখিল, ওটা খুলে তোমার জ্যাঠাইমাকে দিয়ে দাও। দিদি, আমরা গরিব, কিন্তু ভিখিরি নই। কোন একটা দামী জিনিষ হঠাৎ পাওয়া গেল বলেই দু হাত পেতে নেব,— তা' নিইনে।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজও তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী, দ্বিধা হও!

যাবার সময়ে সে কহিল, কিন্তু এ কথা তোমার ভাশুরের কানে যাবে, মেজ-বৌ।

মেজ-বৌ বলিল, তাঁর অনেক কথা আমার কানে আসে, আমার একটা কথা তাঁর কানে গেলে কান অপবিত্র হবে না।

লক্ষ্মী কহিল, বেশ, পরীক্ষা ক'রে দেখলেই হবে। একটু থামিয়া বলিল, আমাকে খামোকা অপমান করার দরকার ছিল না, মেজ-বৌ। আমিও শাস্তি দিতে জানি।

মেজ-বৌ বলিল, এ আপনার রাগের কথা। নইলে আমি যে আপনাকে অপমান করিনি, শুধু আমার স্বামীকেই খামোকা অপমান করতে আপনাকে দিইনি, —এ বোঝবার শিক্ষা আপনার আছে।

লক্ষ্মী কহিল, তা আছে. নেই শুধু তোমাদের পাড়া-গেঁয়ে মেয়ের সঙ্গে কোঁদল করবার শিক্ষা।

মেজ-বৌ এই কটুক্তির জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

লক্ষ্মী চলিতে উদ্যত হইয়া বলিল, ওই হারটুকুর দাম যাই হোক্, ছেলেটাকে স্নেহবশেই দিয়েছিলাম, তোমার স্বামীর দুঃখ দূর হবে ভেবে দিইনি। মেজ-বৌ বড় লোকমাত্রেই গরীবকে শুধু অপমান ক'রে বেড়ায়, এই-টুকুই কেবল শিখে রেখেচ, ভালবাসতেও যে পারে, এ তুমি শেখোনি। শেখা দরকার! তখন কিন্তু গিয়ে হাতে পায়ে পোড়ো না।

প্রত্যুত্তরে মেজ-বৌ শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, না দিদি, সে ভয় তোমাকে করতে হবে না।

৩

বন্যার চাপে মাটীর বাঁধ যখন ভাঙ্গিতে সুরু করে, তখন তাহার অকিঞ্চিৎকর আরম্ভ দেখিয়া মনে করাও যায় না যে, অবিশ্রান্ত জলপ্রবাহ এত অল্পকালমধ্যেই ভাঙনটাকে এমন ভয়াবহ, এমন সুবিশাল করিয়া তুলিবে। ঠিক এমনই হইল হরিলক্ষ্মীর! স্বামীর কাছে বিপিন ও তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাগুলা যখন তাহার সমাপ্ত হইল, তখন তাহার পরিণাম কল্পনা করিয়া সে নিজেই ভয় পাইল। মিথ্যা বলা তাহার স্বভাবও নহে, বলিতেও তাহার শিক্ষা ও মর্য্যাদায় বাধে, কিন্তু দুর্নিবার জলস্রোতের মত যে সকল বাক্য আপন-ঝোঁকেই তাহার মুখ দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার অনেকগুলিই যে সত্য নহে, তাহা নিজেই সে চিনিতে পারিল। অথচ তাহার গতিরোধ করাও যে তাহার সাধ্যের বাহিরে, ইহাও অনুভব করিতে লক্ষ্মীর বাকি রহিল না। শুধু একটা ব্যাপার সে ঠিক এতখানি জানিত না, সে তাহার স্বামীর স্বভাব। তাহা যেমন নিষ্ঠুর, তেম্‌নই প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং তেমনই বর্ব্বর। পীড়ন করিবার কোথায় যে সীমা, সে যেন তাহা জানেই না। আজ শিবচরণ আস্ফালন করিল না, সমস্তটা শুনিয়া শুধু কহিল, আচ্ছা, মাসছয়েক পরে দেখো। বছর ঘুরবে না, সে ঠিক।

অপমান ও লাঞ্ছনার জ্বালা হরিলক্ষ্মীর অন্তরে জ্বলিতেই ছিল, বিপিনের স্ত্রী ভালরূপ শাস্তি ভোগ করে, তাহা সে যথার্থই চাহিতেছিল, কিন্তু শিবচরণ বাহিরে চলিয়া গেলে তাহার মুখের এই সামান্য কয়েকটা কথা বার বার মনের মধ্যে আবৃত্তি করিয়া লক্ষ্মী মনের মধ্যে আর স্বস্তি পাইল না। কোথায় যেন কি একটা ভারি খারাপ হইল, এমনই তাহার বোধ হইতে লাগিল।

দিন কয়েক পরে কি একটা কথার প্রসঙ্গে হরিলক্ষ্মী হাসিমুখে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওঁদের সম্বন্ধে কিছু কোরছ নাকি?

কা'দের সম্বন্ধে?

বিপিন ঠাকুরপোদের সম্বন্ধে?

শিবচরণ নিস্পৃহভাবে কহিল, কি-ই বা কোরব, আর কি-ই বা করতে পারি? আমি সামান্য ব্যক্তি বৈ ত না!

হরিলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, এ কথার মানে?

শিবচরণ বলিল, মেজ-বৌমা ব'লে থাকেন কি না, রাজত্বটা ত আর বট্‌ঠাকুরের নয়—ইংরাজ গভর্মেণ্টের!

হরিলক্ষ্মী কহিল, বলেছে না কি? কিন্তু, আচ্ছা—

কি আচ্ছা?

স্ত্রী একটুখানি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, কিন্তু মেজবৌ ত ঠিক ও রকম কথা বড় একটা বলে না। ভয়ানক চালাক কি না! অনেকে আবার বাড়িয়েও হয় ত তোমার কাছে ব'লে যায়।

শিবচরণ কহিল, আশ্চর্য্য নয়। তবে কিনা, কথাটা আমি নিজের কানেই শুনেছি।

হরিলক্ষ্মী বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু তখনকার মত স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সহসা কোপ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, বল কি গো, এত বড় অহঙ্কার! আমাকে না হয় যা খুসী বলেছে, কিন্তু ভাশুর ব'লে তোমার ত একটা সম্মান থাকা দরকার!

শিবচরণ বলিল, হিঁদুর ঘরে এই ত পাঁচ জনে মনে করে। লেখাপড়া-জানা বিদ্বান্ মেয়েমানুষ কি না! তবে, আমাকে অপমান ক'রে পার আছে, কিন্তু তোমাকে অপমান ক'রে কারও রক্ষে নেই। সদরে একটু জরুরি কায আছে, আমি চল্‌লাম।—এই বলিয়া শিবচরণ বাহির হইয়া গেল। কথাটা যে রকম করিয়া হরিলক্ষ্মীর পাড়িবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না, বরঞ্চ উল্টা হইয়া গেল। স্বামী চলিয়া গেলে ইহাই তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল।

সদরে গিয়া শিবচরণ বিপিনকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, পাঁচ সাত বছর থেকে তোমাকে ব'লে আসচি, বিপিন, গোয়ালটা তোমার সরাও,—শোবার ঘরে আমি আর টিক্‌তে পারিনে, কথাটায় কি তুমি কান দেবে না ঠিক করেছ?

বিপিন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কৈ, আমি ত একবারও শুনিনি বড়দা'?

শিবচরণ অবলীলাক্রমে কহিল, অন্ততঃ দশবার আমি নিজের মুখেই তোমাকে বলেছি। তোমার স্মরণ না থাক্‌লে ক্ষতি হয় না, কিন্তু এত বড় জমীদারী যাঁ'কে শাসন কর্‌তে হয়, তাঁ'র কথা ভুলে গেলে চলে না। সে যাই হোক, তোমার আপনার ত একটা আক্কেল থাকা উচিত যে, পরের যায়গায় নিজের গোয়ালঘর রাখা কত দিন চলে? কালকেই ওটা সরিয়ে ফেল গে। আমার আর সুবিধে হবে না, তোমাকে শেষবারের মত জানিয়ে দিলাম।

বিপিনের মুখে এমনই কথা বাহির হয় না, অকস্মাৎ এই পরম বিস্ময়কর প্রস্তাবের সম্মুখে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পিতামহের আমল হইতে যে গোয়ালঘরটাকে সে নিজেদের বলিয়া জানে, তাহা অপরের, এত বড় মিথ্যা উক্তির সে একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না, নীরবে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তাহার স্ত্রী সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিল, কিন্তু রাজার আদালত খোলা আছে ত!

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। সে যত ভাল মানুষই হউক্, এ কথা সে জানিত, ইংরাজ রাজার আদালত-গৃহের সুবৃহৎ দ্বার যত উন্মুক্তই থাক্, দরিদ্রের প্রবেশ করিবার পথ এতটুকু খোলা নাই। হইলও তাহাই। পরদিন বড়বাবুর লোক আসিয়া প্রাচীন ও জীর্ণ গো-শালা ভাঙ্গিয়া লম্বা প্রাচীর টানিয়া দিল। বিপিন থানায় গিয়া খবর দিয়া আসিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শিবচরণের পুরাতন ইটের নূতন প্রাচীর যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটা রাঙা পাগড়ীও ইহার নিকটে আসিল না। বিপিনের স্ত্রী হাতের চুড়ি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল, কিন্তু তাহাতে শুধু গহনাটাই গেল, আর কিছু হইল না।

বিপিনের পিসীমা সম্পর্কীয়া এক জন শুভানুধ্যায়িনী এই বিপদে হরিলক্ষ্মীর কাছে গিয়া পড়িতে বিপিনের স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে সে নাকি জবাব দিয়াছিল, বাঘের কাছে হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি, পিসীমা? প্রাণ যা যাবার তা' যাবে, কেবল অপমানটাই উপরি পাওনা হবে।

এই কথা হরিলক্ষ্মীর কানে আসিয়া পৌঁছিলে, সে চুপ করিয়া রহিল, কিছু একটা উত্তর দিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না।

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া অবধি শরীর তাহার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না, এই ঘটনার মাসখানেকের মধ্যে সে আবার জ্বরে পড়িল। কিছুকাল গ্রামেই চিকিৎসা চলিল, কিন্তু ফল যখন হইল না, তখন ডাক্তারের

উপদেশমত পুনরায় তাহাকে বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

নানাবিধ কাষের তাড়ায় এবার শিবচরণ সঙ্গে যাইতে পারিল না, দেশেই রহিল। যাবার সময় সে স্বামীকে একটা কথা বলিবার জন্য মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনমতেই সে এই লোকটির সম্মুখে সে কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ অনুরোধ বৃথা, ইহার অর্থ সে বুঝিবে না।

৪

হরিলক্ষ্মীর রোগগ্রস্ত দেহ সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে এবার কিছু দীর্ঘ সময় লাগিল। প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে সে বেলপুরে ফিরিয়া আসিল। শুধু কেবল জমীদারের আদরের পত্নী বলিয়াই নয়, সে এত বড় সংসারের গৃহিণী। পাড়ার মেয়েরা দল বাঁধিয়া দেখিতে আসিল, যে সম্বন্ধে বড়, সে আশীর্ব্বাদ করিল, যে ছোট, সে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। আসিল না, শুধু বিপিনের স্ত্রী। সে যে আসিবে না হরিলক্ষ্মী তাহা জানিত। এই একটা বছরের মধ্যে তাহারা কেমন আছে, যে-সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা তাহাদের বিরুদ্ধে চলিতেছিল, তাহার ফল কি হইয়াছে, এ সব কোন সংবাদই সে কাহারও কাছে জানিবার চেষ্টা করে নাই। শিবচরণ কখনও বাটীতে, কখনও বা পশ্চিমে স্ত্রীর কাছে গিয়া বাস করিতেছিলেন, যখনই দেখা হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে ইহাদের কথাই তাহার মনে হইয়াছে, অথচ, একটা দিনের জন্য স্বামীকে প্রশ্ন করে নাই। প্রশ্ন করিতে তাহার যেন ভয় করিত। মনে করিত, এত দিনে হয় ত যা হোক একটা বোঝা-পড়া হইয়া গেছে, হয় ত ক্রোধের সে প্রখরতা আর নাই,—জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে আবার সেই পূর্ব্বক্ষত বাড়িয়া উঠে, এই আশঙ্কায় সে এমনই একটা ভাব ধারণ করিয়া থাকিত, যেন সে সকল তুচ্ছ কথা আর তাহার মনেই নাই। ও দিকে শিবচরণও নিজে হইতে কোন দিন বিপিনদের বিষয় আলোচনা করিত না। সে যে স্ত্রীর অপমানের ব্যাপার বিস্মৃত হয় নাই, বরঞ্চ তাহার অবর্ত্তমানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, এই কথাটা সে হরিলক্ষ্মীর কাছে গোপন করিয়াই রাখিত। তাহার সাধ ছিল, লক্ষ্মী গৃহে ফিরিয়া নিজের চোখেই সমস্ত দেখিতে পাইয়া আনন্দিত বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া উঠিবে।

বেলা বাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই পিসীমার পুনঃ পুনঃ সস্নেহ তাড়নায় লক্ষ্মী স্নান করিয়া আসিলে তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমার রোগা শরীর, বউ-মা, নীচে গিয়ে কায নেই, এইখানেই ঠাঁই ক'রে ভাত দিয়ে যাক্।

লক্ষ্মী আপত্তি করিয়া সহাস্যে কহিল, শরীর আগের মতই ভাল হয়ে গেছে, পিসীমা, আমি রান্নাঘরে গিয়েই খেতে পারবো, ওপরে বয়ে আন্‌বার দরকার নেই। চল, নীচেই যাচ্চি।

পিসীমা বাধা দিলেন, শিবুর নিষেধ আছে জানাইলেন এবং তাঁহারই আদেশে ঝি ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণে রাঁধুনী অন্নব্যঞ্জন বহিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। সে চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাঁধুনীটি কে, পিসীমা? আগে ত দেখিনি?

পিসীমা হাস্য করিয়া বলিলেন, চিন্‌তে পার্‌লে না, বৌ-মা, ও যে আমাদের বিপিনের বৌ।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে বুঝিল, তাহাকে চমৎকৃত করিবার জন্যই এতখানি ষড়যন্ত্র এমন করিয়া গোপনে রাখা হইয়াছিল। কিছুক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসু মুখে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পিসীমা বলিলেন, বিপিন মারা গেছে, শুনেছ ত?

লক্ষ্মী শুনে নাই কিছুই, কিন্তু এইমাত্র যে তাহার খাবার দিয়া গেল, সে যে বিধবা, তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

পিসীমা অবশিষ্ট ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিলেন, যা ধুলোগুঁড়ো ছিল, মাম্‌লায় মাম্‌লায় সর্ব্বস্ব খুইয়ে বিপিন মারা গেল। বাকি টাকার দায়ে বাড়ীটাও যেতো, আমরাই পরামর্শ দিলাম, মেজ-বৌ, বছর দু'বছর গতরে খেটে শোধ দে, তোর অপগণ্ড ছেলের মাথা গোঁজবার স্থানটুকু বাঁচুক।

লক্ষ্মী বিবর্ণ মুখে তেমনই পলকহীন চক্ষুতে নিঃশব্দে

চাহিয়া রহিল। পিসীমা সহসা গলা খাটো করিয়া বলিলেন, তবু আমি এক দিন ওকে আড়ালে ডেকে বলে-ছিলাম, মেজ-বৌ, যা হবার তা ত হলো,এখন ধার-ধোর ক'রে যেমন ক'রে হোক, একবার কাশী গিয়ে বৌমার হাতে পায়ে গিয়ে পড়! ছেলেটাকে তার পায়ের ওপরে নিয়ে ফেলে দিয়ে বল্ গে, দিদি, এর ত কোন দোষ নেই, একে বাঁচাও——

কথাগুলি আবৃত্তি করিতেই পিসীমার চোখ জল-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কিন্তু সেই যে মাথা গুঁজে মুখ বুজে ব'সে রইল, হাঁ না একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না।

হরিলক্ষ্মী বুঝিল, ইহার সমস্ত অপরাধের ভারই তাহার মাথায় গিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন তিতো বিষ হইয়া উঠিল এবং একটা গ্রাসও যেন গলা দিয়া গলিতে চাহিল না। পিসীমা কি একটা কাযে ক্ষণকালের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া খাবারের অবস্থা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ডাক দিলেন, বিপিনের বৌ? বিপিনের বৌ?

বিপিনের বৌ দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের করুণা চক্ষুর নিমিষে কোথায় উবিয়া গেল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, এমন তাচ্ছীল্য ক'রে কায করলে ত চল্‌বে না, বিপিনের বৌ? বৌমা একটা দানা মুখে দিতে পার্‌লে না, এমনই রেঁধেছ!

ঘরের বাহিরে হইতে এই তিরস্কারের কোন উত্তর আসিল না, কিন্তু অপরের অপমানের ভারে লজ্জায় ও বেদনায় ঘরের মধ্যে হরিলক্ষ্মীর মাথা হেঁট হইয়া গেল। পিসীমা পুনশ্চ কহিলেন, চাকরী করতে এসে জিনিষপত্র নষ্ট ক'রে ফেল্‌লে চল্‌বে না, বাছা, আরও পাঁচ জনে যেমন ক'রে কায করে, তোমাকেও তেমনই করতে হবে, তা ব'লে দিচ্চি।

বিপিনের স্ত্রী এবার আস্তে আস্তে বলিল, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই ত করি, পিসীমা, আজ হয় ত কি রকম হয়ে গেছে। এই বলিয়া সে নীচে চলিয়া গেলে, লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র পিসীমা হায় হায় করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মী মৃদু কণ্ঠে কহিল, কেন দুঃখ কোরচ, পিসীমা,আমার দেহ ভাল নেই বলেই খেতে পার্‌লাম না,—মেজ-বৌয়ের রান্নার ত্রুটি ছিল না।

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া নিজের নির্জ্জন ঘরের মধ্যে হরিলক্ষ্মীর যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্ব-প্রকার অপমান সহিয়াও বিপিনের স্ত্রীর হয় ত ইহার পরেও এই বাড়ীতেই চাকরী করা চলিতে পারে, কিন্তু আজকের পরে গৃহিণীপনার পণ্ডশ্রম করিয়া তাহার নিজের দিন চলিবে কি করিয়া? মেজ-বৌয়ের একটা সান্ত্বনা তবুও বাকি আছে,—তাহা বিনা দোষে দুঃখ সহার সান্ত্বনা, কিন্তু তাহার নিজের জন্য কোথায় কি অবশিষ্ট রহিল!

রাত্রিতে স্বামীর সহিত কথা কহিবে কি, হরিলক্ষ্মী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও পারিল না। আজ তাহার মুখের একটা কথায় বিপিনের স্ত্রীর সকল দুঃখ দূর হইতে পারিত, কিন্তু নিরুপায় নারীর প্রতি যে মানুষ এত বড় শোধ লইতে পারে, তাহার পৌরুষে বাধে না, তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিবার হীনতা স্বীকার করিতে কোন-মতেই লক্ষ্মীর প্রবৃত্তি হইল না।

শিবচরণ ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, মেজ-বৌমার সঙ্গে হ'ল দেখা? বলি কেমন রাঁধচে?

হরিলক্ষ্মী জবাব দিতে পারিল না, তাহার মনে হইল, এই লোকটিই তাহার স্বামী; এবং সারাজীবন ইহারই ঘর করিতে হইবে, মনে করিয়া তাহার মনে হইল, পৃথিবী, দ্বিধা হও।

পরদিন সকালে উঠিয়াই লক্ষ্মী দাসীকে দিয়া পিসী-মাকে বলিয়া পাঠাইল, তাহার জ্বর হইয়াছে, সে কিছুই খাইবে না। পিসীমা ঘরে আসিয়া জেরা করিয়া লক্ষ্মীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন,—তাহার মুখের ভাবে ও কণ্ঠস্বরে তাঁহার কেমন যেন সন্দেহ হইল, লক্ষ্মী কি একটা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কহিলেন, কিন্তু তোমার ত সত্যিই অসুখ করেনি, বৌ-মা?

লক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া জোর করিয়া বলিল, আমার জ্বর হয়েছে, আমি কিচ্ছু খাবো না।

ডাক্তার আসিলে তাহাকে দ্বারের বাহির হইতেই লক্ষ্মী বিদায় করিয়া দিয়া বলিল, আপনি ত জানেন, আপনার ওষুধে আমার কিছুই হয় না,—আপনি যান।

শিবচরণ আসিয়া অনেক কিছু প্রশ্ন করিল, কিন্তু একটা কথারও উত্তর পাইল না।

আরও দুই তিন দিন যখন এমনই করিয়া কাটিয়া গেল, তখন বাড়ীর সকলেই কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে দিন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর, লক্ষ্মী স্নানের ঘর হইতে নিঃশব্দ মৃদু পদে প্রাঙ্গণের এক ধার দিয়া উপরে যাইতেছিল, পিসীমা রান্নাঘরের বারান্দা হইতে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ বৌমা, বিপিনের বৌয়ের কায ;—অ্যাঁ মেজবৌ, শেষকালে চুরি সুরু করলে?

হরিলক্ষ্মী কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মেজবৌ মেঝের উপর নির্ব্বাক অধোমুখে বসিয়া, একটা পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন গামছা ঢাকা দেওয়া সম্মুখে রাখা, পিসীমা দেখাইয়া বলিলেন, তুমিই বল, বৌমা, এত ভাত-তরকারী একটা মানুষে খেতে পারে? ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছেলের জন্যে ;—অথচ বার বার ক'রে মানা ক'রে দেওয়া হয়েছে। শিবচরণের কানে গেলে আর রক্ষে থাক্‌বে না,—ঘাড় ধ'রে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। বৌমা, তুমি মনিব, তুমিই এর বিচার কর। এই বলিয়া পিসীমা যেন একটা কর্ত্তব্য শেষ করিয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিলেন।

তাঁহার চীৎকার শব্দে বাড়ীর চাকর, দাসী, লোকজন যে যেখানে ছিল, তামাসা দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, আর তাহারই মধ্যে নিঃশব্দে বসিয়া ও-বাড়ীর মেজবৌ ও তাহার কর্ত্রী এ বাড়ীর গৃহিণী।

এত ছোট, এত তুচ্ছ বস্তু লইয়া এত বড় কদর্য্য কাণ্ড বাধিতে পারে, লক্ষ্মীর তাহা স্বপ্নের অগোচর। অভিযোগের জবাব দিবে কি, অপমানে, অভিমানে, লজ্জায় সে মুখ তুলিতেই পারিল না। লজ্জা অপরের জন্য নয়, সে নিজের জন্যই। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে লাগিল, তাহার মনে হইল, এত লোকের সম্মুখে সে-ই যেন ধরা পড়িয়া গেছে এবং বিপিনের স্ত্রী-ই তাহার বিচার করিতে বসিয়াছে।

মিনিট দুই তিন এমনই ভাবে থাকিয়া সহসা প্রবল চেষ্টায় লক্ষ্মী আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, পিসীমা, তোমরা সবাই একবার এ ঘর থেকে যাও।

তাহার ইঙ্গিতে সকলে প্রস্থান করিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে অপরের কাছে গিয়া বসিল; হাত দিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তাহারও দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে। কহিল, মেজবৌ, আমি তোমার দিদি, এই বলিয়া নিজের অঞ্চল দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
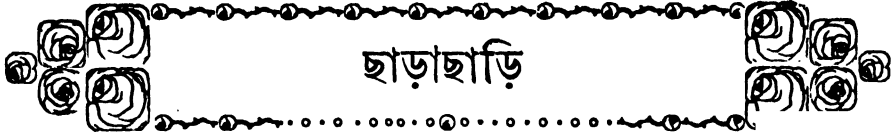
ছাড়াছাড়ি

(ইতালীয় লেখক—Salvatory Farina)

১

ভিয়া বাগুতায় আমার কামরাটা আবশ্যক অপেক্ষা একটু বেশী উচ্চে অবস্থিত ছিল। প্রতিদিনই আমি এই কথা মনে মনে ভাবিতাম; কেন না, ১ শত ১২টা সোপান-শ্রেণী নিম্নজগৎ হইতে আমাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল; আর কতবার আমাকে এই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হইয়াছে! কিন্তু যখনই আমি সিঁড়ির মাথায় পৌছিয়া জানালার ভিতর দিয়া চিত্রপটের ন্যায় ছাদ ও চিমনীর জমকালো দৃশ্য দেখিতাম,—আমার এত ভাল লাগিত যে, আমি সেইখানেই থাকিয়া গেলাম। সমস্ত প্রতিবাসীর সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইল। তবে এক জন অবিবাহিতের প্রতিবাসিবর্গের মধ্যে এমন কেহ না কেহ নিশ্চয়ই থাকিতে পারে, যাহা হইতে তফাৎ থাকাই সার কথা।

এইরূপে এক দম্পতির সহিত আমার পরিচয় হইল। এই দম্পতি যার-পর-নাই বাতিকগ্রস্ত। আমি যদি বলি, শ্রীযুক্ত স্থুলপিচিত্ত ও শ্রীমতী বাঞ্চেত্তা, পরস্পরের তুলনায় প্রত্যেকে ঠিক অর্দ্ধেক, তাহা হইলে আমার এই কথাটা শুধু একটা উপমার হিসাবে ধরা না যাইতেও পারে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে, এক জন সচরাচর মানুষের গায়ে যতটা মাংস ও পেশী থাকে, দু'জনের মিলিয়া ততটা আছে। যদি উহাদের বৎসরগুলা যোগ করা যায়, তাহা হইলে উহার মোট পরিমাণ দেড় শতাব্দী ছাড়িয়া আরও অনেকটা ওঠে। আর যদি কল্পনা করা যায় যে, শ্রীমতী বাঞ্চেত্তা তাহার স্বামীর মাথার উপর দাঁড়াইয়া আছে—তাহা হইলে মনে হইবে,—মহিলার মাথা ঘরের চালে ঠেকিয়াছে কিংবা আর একটু ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। কেন না, আমার কামরাটা ৩৷৷০ গজ উঁচু।

এই গাণিতিক অনুপাত একবার নির্দ্ধারিত হইলে, এই দম্পতির একটা ছবি মনে মনে কল্পনা করা পাঠকের পক্ষে সহজ হইবে, তখন আমার ন্যায় পাঠকের স্মৃতি-পটেও রহিয়া যাইবে—এক যোড়া ডিগ্‌ডিগে শুষ্ক শীর্ণ দেহযষ্টি, বলি-রেখা-কাটা মুখমণ্ডল, কোটরে-বসা দুই জোড়া জলজ্বলে চোখ।

৫০ বৎসর ধরিয়া উহারা শয্যা, খোরাক এবং জীবনের সমস্ত ভাগ্য-বিপর্য্যয় পরস্পরের সহিত ভাগাভাগি করিয়াছে। উহারা পরস্পরের ভিতর দিয়া এমন ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, এমন ভাবে অবস্থিতি করিয়াছে যে, উহাদের মুখ—নাক ছাড়া—এক রকমের হইয়া গিয়াছে—মনে হয় যেন উহারা ভাই-বোন্। কিন্তু ওদের নাক—ওঃ! সে কী নাক! উহাদের নিজ নিজ নাকের গঠনটা উহারা যেন জেদ্ করিয়া বজায় রাখিয়াছে। ঐ রকম দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের নাক, আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই! স্বামীর নাক ছিল বক্রাগ্র শুকচঞ্চু ধরণের—যেন মুখের ভিতর কি ঢুকিতেছে, তাহা নজর রাখিবার জন্য কুতূহলী। পক্ষান্তরে, স্ত্রীর নাকটা ছোট ও পিছনে-হটা,—যেন খাদ্যের একটা বড় গ্রাসকে পথ দিবার জন্য একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই উপমাটা গোড়ায় আমি দিই নাই, উক্ত দম্পতি নিজেরাই দিয়াছিল।

ইহা ঘটিয়াছিল ৪০ বৎসর ১১ মাস পূর্ব্বে এক দিন ভোজনের সময়। কোন এক দুর্ভাগ্য মুহূর্ত্তে একটা সস্‌চাটনীতে ধোঁয়াটে গন্ধ হওয়ায়, উভয়ের মধ্যে রাগারাগি হইল।

উহাদের দাম্পত্য-সুখের নির্ম্মল গগনে এই প্রথম মেঘ দেখা দিল।—অতি বিশ্রী কালো মেঘ—ইহা সস্ হইতে উহাদের নাকে উঠিল, নাক হইতে মাথায়, মাথা হইতে মনের ভিতর প্রবেশ করিল। অবশেষে উহারা আবিষ্কার করিল,—দাম্পত্য-জোয়ালের ভারটা উহারা যেরূপ অনিচ্ছাপূর্ব্বক বহন করিয়া আসিয়াছে, এমন আর কেহ নহে। বাঞ্চেত্তা তাহার আত্মীয়দের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহিল এবং স্থুলপিচিত্ত বলিল—"তথাস্তু, শুভস্য শীঘ্রং।" কিন্তু যেহেতু উহারা বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে এবং যেখানে প্রথম দাম্পত্য-বিবাদ বাধিয়া ওঠে, সেখান হইতে বাঞ্চেত্তার আত্মীয়রা ২ শত মাইল দূরে থাকে—এই কারণে এই মতলবটা কার্য্যে পরিণত করিতে আপাততঃ স্থগিদ করিতে হইল।

কিন্তু "ছাড়াছাড়ি" এই কথাটা উহাদের একটা নিত্য-ব্যবহৃত বুলি হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পরদিন, সুল্‌পিচিত্তর হঠাৎ মাথায় আসিল, তাহার চিরসঙ্গিনীকে কুমারী-রত্ন-স্বরূপ তাহার হাতে সমর্থন করা হইয়াছিল। তাহার শ্বশুরের সহিত তাহার যে মর্ম্মস্পর্শী কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। তাহার পত্নীকে সে সুখী করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহাও তাহার মনে পড়িল। রাশি রাশি সৎচিন্তা ও বিক্ষোচিত সঙ্কল্প তাহার অন্তরাত্মায় আসিয়া উদয় হইল। অবশেষে তাহার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, বাঞ্চেত্তা যাহাতে দাম্পত্য-বন্ধন ছেদন না করে, সেই বিষয়ে বাঞ্চেত্তাকে লওয়াইবার চেষ্টা করা তাহারই কায।

বাঞ্চেত্তাও সব শুদ্ধ ধরিতে গেলে সুবুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক —সে তাহার মাতৃ-প্রদত্ত পরামর্শ স্মরণ করিল। বিবাহ-বেদীর সম্মুখে সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। অবিবাহিত রমণীদের তাহার প্রতি যেরূপ ঈর্ষ্যা হইয়াছিল, তাহার তরুণ সঙ্গিনীরা যে আনন্দের ভাণ করিয়াছিল, সে সমস্ত তাহার মনে পড়িল। তাহার পর সে ভাবিয়া দেখিল, সুল্‌পিচিত্ত আসলে খারাপ লোক নয়, এই ব্যাপারে সমস্ত দোষটা হইতেছে সেই সসের, যাহাতে ধোঁয়ার গন্ধ হইয়াছিল।

যখন সুল্‌পিচিত্ত সুমধুর হাসিমুখে বাঞ্চেত্তার কাছে আসিল, বাঞ্চেত্তাও স্মিতবদনে সুল্‌পিচিত্তর সম্মুখীন হইল। উহারা পরস্পরে হস্তমর্দ্দন করিল, পরস্পরকে আবেগ-ভরে আলিঙ্গন করিল, বিবাদ মিটিয়া গেল—শান্তি স্থাপিত হইল।

কিন্তু উহাদের অন্তরের অন্তস্তলে, এই বোধটা রহিয়া গেল যে, উহাদের মধ্যে একটা বলপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহার পর আরও অনেক বল-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—সে সমস্ত আরও ঝোড়ো রকমের। ভিয়া বাগুতার চৌতলার ভাড়াটিয়ারা এবং কখন কখন সমস্ত প্রতিবাসিবর্গ, এই সব আকস্মিক চীৎকার শুনিয়াছে। লোক বলিত:—"ও হচ্ছে বাঞ্চেত্তা, ও আর কেউ নয়।" বাঞ্চেত্তা সমস্ত ৫৫ বৎসর ধরিয়া, যে সব কড়া-মিঠা বচন জমাইয়া রাখিয়াছিল, সেই সব বচন তাহার অত্যাচারী স্বামীর উপর বর্ষণ করিয়াও যখন কুলাইয়া উঠিতে পারিত না, তখন একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া পরিসমাপ্ত করিত। এইরূপ হাঙ্গামার শেষে বুড়া সুল্‌পিচিত্ত প্রায়ই নীচে পলাইয়া যাইত; তখন বাঞ্চেত্তা সিঁড়ির একটা ধাপ হইতে তাহার প্রতি গালিবর্ষণ করিত।

এই সময় সদাশয় প্রতিবাসিগণ বাঞ্চেত্তাকে সাহায্য করিবার জন্য আসিত। যতক্ষণ না ক্রোধের আবেশটা চলিয়া যায়, ততক্ষণ উহারা উহাকে কথা কহিতে দিত। তাহার পর উহারা উহার রোদন-বিলাপে যোগ দিত, উহার প্রতি মমতা দেখাইত; বলিত যে, তাহার প্রতি উচিত ব্যবহার করা হয় নাই, তাহার স্বামী একটা পশু। হঠাৎ সে শান্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইত; এবং তাহার পর সে খুব আবেগের সহিত সকলের কথার প্রতিবাদ করিত। খুব আবেগের সহিত তাহার সুল্‌পিচিত্তর পক্ষসমর্থন করিত; একমাত্র সে-ই সুল্‌পিচিত্তকে বুঝিতে পারে, তাহার হৃদয়ের কথা একমাত্র সে-ই পাঠ করিতে পারে, এবং সুল্‌পিচিত্তই আর সকলের চেয়ে ভাল।

যখন প্রথম আক্রমণটা শেষ হইল, যায়গাটা খালি হইল, তখন বৃদ্ধা আস্তে আস্তে গোপনে তাহার নিজের কামরায় ঢুকিয়া তাহার কাঁপুনে মাথাটা একটা চওড়া কালো রেশমের বস্ত্রাবরণের ভিতর নিমজ্জিত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া বৃদ্ধা দুই সিঁড়ির ধাপ দিয়া নামিয়া মাদাম নিনার দরজায় আঘাত করিল। মাদাম নিনা ঐখানে তাহার এক দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক খুড়ার সহিত একত্র বাস করিত। এই খুড়া সুল্‌পিচিত্তর এক বন্ধু। বাঞ্চেত্তা জানিত, এই তরুণীর সম্বন্ধে তাহার স্বামীর খুব একটা উচ্চ ধারণা আছে, তথাপি তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা হওয়া দূরে থাক্, তাহাদের বিবাদ মিটাইবার জন্য বৃদ্ধা ঐ তরুণীর সাহায্য প্রার্থনা করিল।

ঠিক সেই সময় স্বামী গোপনে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমার কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। স্বামী জানিত, বাঞ্চেত্তা প্রায় মায়ের মত আমাকে স্নেহ করে; আমার কাছ থেকে একটা কথা এলে অনেকটা কায হইবে। তাই উহাদের গার্হস্থ্য শান্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া আমাকে সম্মানিত করিল।

২

আমার মনে হয়, আমার পক্ষ হইতে কিংবা নিনার পক্ষ হইতে শান্তিস্থাপনের কাযটায় বড় একটা ত্যাগস্বীকারের দরকার ছিল না।

বাঞ্চেত্তা আমাকে দেখিবামাত্র, খুব হৃদ্যতার সহিত আমায় আদর অভ্যর্থনা করিল, তাহার দু'হাত দিয়া আমার হাত ধরিল, এবং নীরবে মাথা নোয়াইয়া এবং আমার দিকে চাহিয়া, তাহার সমস্ত অতীত দুঃখের কথা আমাকে জানাইল। আরও জানাইল, সে দাম্পত্য ধর্ম্মে আবার ফিরিয়া আসিবে, এবং আমার সকল চেষ্টা-যত্নের জন্য আমার প্রতি সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। স্পষ্টই দেখা গেল, বাঞ্চেত্তা তা'র সুল্‌পিচিত্তকে ছাড়িয়া কখন থাকিতে পরিবে না, সুল্‌পিচিত্তও বাঞ্চেত্তাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। তাহারা পরস্পরকে পূর্ব্বে যেরূপ ভাল-বাসিত, এখনও সেইরূপ ভালবাসে। ঝগড়া করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে ভালবাসার কিছু কমতি ছিল না।

যা ভেবেছিলাম, তাই। মত-পরিবর্ত্তনের পর সুল্‌পি-চিত্ত বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবামাত্রই বাঞ্চেত্তা সাধ্যমত একটা কিছু প্রায়শ্চিত্ত করিবে মনে করিতেছিল। কিন্তু আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া নিজের পকেট হাতড়াইতে লাগিল, এবং শেষে পকেট হইতে তাহার অঙ্গুলী-ত্রাণ ও সূচিকর্ম্মের বাক্স বাহির করিল।

ইত্যবসরে আমি দরজার তালাটা ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলাম, কিংবা জানালার ভিতর দিয়া বহির্দ্দেশ অবলোকন করিতেছিলাম, কিংবা কোন বই কিংবা ছবি দেখিতেছিলাম। তখন ঐ দুইটি প্রাণী পরস্পরে আরও কাছে আসিল, আমি আড়চোখে দেখিলাম, দুটি কম্পমান হস্ত পরস্পরকে চাপিয়া ধরিয়াছে, দুইটি মুখমণ্ডলে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, গালের বলি-রেখা বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে উহারা পরস্পরের বাহুপাশে আবদ্ধ হইল। আমি তখন অন্য দিকে চোখ ফিরাইলাম, কিংবা হঠাৎ ফিরিয়া বলিয়া উঠিলাম—"আজ কেমন পরিষ্কার দিন!" যাই হোক্, আমি মনে মনে ভাবিলাম, ঐ অশ্রুতে যৌবন আমার ফিরিয়া আসিয়াছে এবং ঐ স্মিতহাস্য প্রেমোৎফুল্ল বসন্তকালেরই যোগ্য।

কিন্তু এক দিন এমন একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠিল যে, দৌত্যকার্য্যে আমার অনেক ঘণ্টা কাটিয়া গেল এবং খুব নিপুণতার সহিত এই কায করিতে না পারিলে ঐ দুই জাহাজকে শান্ত দাম্পত্যবন্দরে আনিতে পারা যাইবে না। দুই পক্ষই স্থিরসঙ্কল্প হইয়া "ছাড়াছাড়ি"র কথা বলিতে লাগিল—কেহই আপনার গোঁ ছাড়িবে না।

দৌত্যকার্য্যের হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য উভয় পক্ষই বাড়ী ছাড়িয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। উহাদের বোকাটে চাকরটা এইমাত্র জানে যে, কর্ত্তা-গিন্নী পর-পর দু'জনেই বাড়ীর বাহিরে গিয়াছে। এ ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। আমি চুল্লীর ধারে বসিয়া আগুন উস্‌কাইতেছিলাম। সুন্দর শীতের দিন, চুল্লীতে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।

আমারও মন প্রফুল্ল ছিল। আমি আন্দাজ করিতে চেষ্টা করিলাম, উহাদের মধ্যে কে আগে গৃহে ফিরিয়া আসিবে। কে?— নিশ্চয়ই বাঞ্চেত্তা। হঠাৎ গাউনের খস্‌খস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি উঠিয়া, ফিরিয়া দেখিলাম—আমার সম্মুখে শ্রীমতী নিনা—তিন-তলার সেই তরুণী বিধবা।

মনে হইল, তরুণী আমাকে এখানে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। সহজ ঘনিষ্ঠতার ভাবে প্রবেশ করিয়া, সে আরও যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। একটা অবিবেচনার কায করিয়া ফেলিয়াছে, এই কথাটা আমার কাছে লুকাই-বার জন্য সে এইরূপ ভাণ করিল, যেন সে আমাকে দেখিতেই পায় নাই। তাই আমার এই ধারণা জন্মা-ইয়াছিল যে, সে যে এখানে আসিয়াছে, সে শুধু পুরা-তন বন্ধুত্বের বিশেষ অধিকারমুগ্ধ ব'লে। তরুণী জিজ্ঞাসা করিল—"শ্রীমতী বাঞ্চেত্তা কি বাড়ীতে নাই?"

"তিনিও নাই—শ্রীযুত সুল্‌পিচিত্ত-ও নাই। আমি দুজনের জন্যই অপেক্ষা করছি।"

"এক জনের সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল—আচ্ছা, আমি আবার এক সময় আস্‌ব।"

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই গৃহের বাহির হইয়া গিয়াছে, এই কথা শুনিয়া মনে হইল, তরুণী যেন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি সে ঐখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"আমি মনে করেছিলুম, এখানে অপেক্ষা করব—কিন্তু না, আর এক সময় আবার আস্‌ব।"

"ধন্যবাদ। বোধ হয়, আপনার এখানে আস্‌বার কারণ———"

"ঐ একই কারণে।"

এই কথা বলিয়া আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম—আমার মনের ভাবটা, তরুণী যেন এইখানেই থাকিয়া যান। এক মিনিট পরেই তিনি আমার যায়গায় বসিয়া পড়িলেন—সেই চুল্লীর ধারে; আর আমি? আমিও থাকিয়া গেলাম।

নিনা আমাকে জানিত না, কিন্তু নিনাকে আমি খুবই জানিতাম। তা'র জানালার উপরে আমার জানালা ছিল,—সেই জানালা থেকে আমি তার চুলের রং দেখিতে পাইতাম! আশা ছিল, কখন-না-কখন তা'র চোখের রং দেখতে পাব। কিন্তু সে বৃথা আশা। এক বার আমি আসিয়া তা'কে দূরে সরাইয়া দিয়াছিলাম। সেই অবধি জানালায় দাঁড়াইয়া আমি আর কখনও থাকি নাই। যে হাত দিয়া একবার পিয়ানোয় সা-রে-গা-মা সাধিতে দেখিয়াছিলাম, আজ দেখিলাম, সেই সাদা ছোট হাত দু'খানি চিম্‌নী-কার্ণিসের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। যে মুখখানি এত দিন আমার কাছে অবগুণ্ঠিত ছবির মত ছিল, সেই মুখখানি এখন আমি প্রকাশ্যভাবে দেখিতে পাইব।

হাঁ. নিনা সুন্দরী রূপসী; অন্ততঃ আমার নিকট তাহাই মনে হইত। আমি তখনও তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সে ভদ্রভাবে হস্ত-ইঙ্গিতে আমাকে বসিতে আহ্বান করিল। আমি বসিলাম। এক মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ হইয়া অন্য কোন ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কেহই আসিল না।

এই নিস্তব্ধতা একটু অস্বস্তিজনক হইতে আরম্ভ করিল। তরুণী সুল্‌পিচিত্তর কথা পাড়িয়া এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। আমি বাঞ্চেত্তার কথা পাড়িলাম।

যে দিন অবধি আমি এই দম্পতির প্রতিবাসী হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমি যে কাযে ব্রতী হইয়াছি ...ার কর্ত্তব্য যেরূপ বিশ্বস্তভাবে পালন করিয়াছি, ...ন আমি নিনাকে বলিলাম, তখন নিনা একটু ... কি সুন্দর হাসিটি! কি সুন্দর দন্তপংক্তি!

একটু থামিয়া সে বলিল,—"পরস্পরকে না বুঝে, ৫৫ বৎসর একসঙ্গে বাস করা—সে কি দুর্ভাগ্য!"

"অনন্তকাল সংগ্রাম ও ঝগড়া-ঝাটি! আমি এর সাক্ষী। কিন্তু আসলে ওরা পরস্পরকে ভালবাসে।"

বিধবার মুখে কি-এক-রকমের হাসির রেখা দেখা দিল—কিন্তু সে কোন উত্তর করিল না।

আমি বলিলাম,—"এই পরস্পর-বিরুদ্ধ অসঙ্গতিগুলা বিপরীত দিকের বাতাসের মত; এই বাতাস, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠাইয়া তরঙ্গগুলাকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে; তার পর যখন ঝড় থামিয়া যায়, তখন সমুদ্র আবার শান্ত হয়, আবার জলরাশি স্থিরভাব ধারণ করে। দুই জন লোক না ঝগড়া ক'রে কিছুকাল একত্র বাস করতে পারে, এ কথা.আমি মনে ধারণা করতেই পারি নে।"

এ কথাতেও বিধবা কোন উত্তর করিল না। সে মাথা নাড়িল, এবং অধৈর্য্যের সহিত চুল্লীর ছাইগুলা নাড়িতে লাগিল।

আমি চুপ করিয়া ছিলাম। আমি তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া যেন বিরক্ত হইয়াছি, এই মনে করিয়া বিধবা জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন কটা বেজেছে?"

"চারটে।"

"দেরী হয়ে গেছে। আমি এখন যাই, আবার আস্‌ব।"

"ঠিক সময় ধরতে গেলে, এখনও ৪টে বাজতে ১০ মিনিট বাকি।"

নিনা একটু হাসিল; তা'র পর আর চলিয়া গেল না। কেন? আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না—কিন্তু আমার হৃদয়মন্দিরে আনন্দের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

হঠাৎ আমরা দেখিলাম, সুল্‌পিচিত্ত ও বাঞ্চেত্তা হাত ধরাধরি করিয়া এই দিকে আসিতেছে। নিনা ও আমি আমরা উভয়েই চোখের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "সব মিটমাট হয়ে গেছে ত?"

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই ঐ একই ভাষায় উত্তর করিল—"হাঁ, হয়েছে।"

বিধবা বলিল,"আমি এই জন্য অভিনন্দন করতে এসেছিলুম। এখন দেরী হয়ে গেছে, আমার যেতে হ'বে।"

বাক্‌স্তো বেশ ভাল মেজাজে ছিল। তা'র বলি-রেখা হইতে বেশ একটু সদয় স্মিতহাস্য প্রকাশ পাইল। সে তরুণী বিধবাকে বলিল, "শ্রীযুত কার্লো তোমার সঙ্গে ছিল, সে ভালই হয়েছিল।"

লজ্জায় নিনার মুখ একটু লাল হইল। আমারও বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।

নিনা চলিয়া গেল, এবং একটু পরে আমিও বিদায় লইলাম।

সমস্ত দিন আমি নিনার কথাই ভাবিয়াছি, সমস্ত রাত্রি কেবল তাহাকেই স্বপ্নে দেখিয়াছি। তা'র পর-দিনও সমস্ত সকালটা তাকে দেখব ব'লে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে সে আমাকে দেখতে পেয়েছিল, আমার নমস্কারও গ্রহণ করেছিল। সমস্ত মাস ধরিয়া আমি নিয়মিতরূপে ঐ একই সময়ে জান্‌লায় দাঁড়াইয়াছি এবং সমানভাবে সৌভাগ্যবান্ হইয়াছি। কখনও আমি তাহার দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়াছি, কখনও সে আমার দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়াছে। তার পর, ৭ মাস ৮ দিন পরে নিনাকে আমি বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে পারিলাম। এখন সে আর বিধবা নহে।

৩

আমরা সুখী হইয়াছিলাম। সহরের হট্টগোল হইতে বহু দূরে একটি ছোট বাড়ীতে আমরা বাস করিতাম। বিরক্তিজনক কোন প্রতিবাসীর গৃহের দিকে আমাদের জানালা উদ্‌ঘাটিত হইত না। প্রতিদিন প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মি থাকিত এবং আমাদের আস্‌বাব-পত্র উৎসবের আলোকে ঝিক্‌মিক্ করিত।

নিনা বলিল, তাহার বৃদ্ধ বাবা, তাঁহার বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা লইয়া কোনক্রমেই একাকী থাকিতে পারিবেন না, তাই তিনি সহরে, তাঁহার ভগিনীর বাড়ীতে গিয়াছেন।

আমাদের স্বপ্ন-কল্পনা, আমাদের নানা প্রকার মৎলব, আমাদের চিন্তা লইয়া আমরা এখন একলা। ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। অন্য কাহারও সংসর্গ আমাদের কেবল ক্লান্তিজনকই হইত।

আমরা যেমন আনন্দে ডগমগ, আমাদের কামরাটিও সেইরূপ গোলাপী রঙে রঞ্জিত। ভবিষ্যৎটা আমাদের নিকট একটা সুন্দর সুখস্বপ্ন বলিয়া মনে হইত। নিনা এক দিকে যেরূপ সুন্দর, তেমনই তাহার একটা গাম্ভীর্য্যও ছিল। আর, তাহার কি সুমধুর হাসিটি। তাহার নেত্রের দৃষ্টি যেমন উজ্জ্বল, তেমনই চন্দ্র-রশ্মির ন্যায় নির্ম্মল। তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু ও সুমধুর। তা ছাড়া, এমন একটা চিত্তবিমোহন ভঙ্গীসহকারে আমার দিকে সে অগ্রসর হইত এবং আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বিনা বাক্যে আমাকে সে যেন বলিত—"আমি তোমায় কত ভালবাসি"—তখন আমার মনে হইত, আমি যেন অষ্ট প্রহর তাহার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে পারি, আমার চোখ দিয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিতে পারি।

তাহার কেবল একটি দোষ ছিল। একটা ঘর হইতে আর একটা ঘরে যাইবার সময় দড়াম্ করিয়া সজোরে দরজা বন্ধ করিত—তাহা না করিয়া থাকিতে পারিত না। এইরূপ দরজা বন্ধ কর্‌বার শব্দে, আমার স্বপ্নকল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইত এবং এই অপ্রীতিকর অনুভূতি বাক্যে প্রকাশ করিতে আমি অনেক সময় উদ্যত হইতাম। কিন্তু যখনই আমি তা'র টুক্‌টুকে মুখখানি দেখিতাম—অমনই চুপ হইয়া যাইতাম। ইহা সত্ত্বেও এই বিষম শব্দ আমার মনকে ক্রমাগত উত্তেজিত ও ব্যথিত করিত; একটু শান্তভাবে সহ্য করিয়া থাকিব মনে করিতাম, কিন্তু পারিতাম না।

এ কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি ছিলাম নিনার আদর্শ-স্বামী। যতটা সম্ভব আমি তাহাকে একাকী রাখিয়া কোথাও যাইতাম না—যদি বা যাইতাম, সে খুব অল্প সময়ের জন্য। আমি কখনই তাহার কথার প্রতিবাদ করিতাম না; তাহার সমস্ত সাধ-বাসনা আমি আগু থাক্‌তেই কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতাম। আমি সব সময়েই তাহার সহিত মিষ্টভাবে কথা কহিতাম এবং তাহাকে খোস্ মেজাজে রাখিবার জন্য আমি নানা-প্রকার "বাঁদ্‌রামি" করিতেও ক্ষান্ত হইতাম না। কিন্তু আমারও একটি ছোটখাটো দোষ ছিল। আমি ভয়ানক অন্যমনস্ক ছিলাম। কখন কখন,—যখন কোন একটা নিরর্থক চিন্তায় মগ্ন থাকিতাম, তখন আমি লক্ষ্য করিতাম না যে, নিনা একটু হাসিয়া, তাহার প্রত্যুত্তরে

আমার নিকট হইতেও একটু হাসি চাহিতেছে। তা'র পর হয় ত আমি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া একটা ঠাট্টা-মস্কারার কথা বলিতাম। বিধাতা এই দুইটা বিষম দোষ একত্র যুড়িয়া দিয়া, দাম্পত্য-শান্তি স্থাপন করিবার কোন মৎলব গোড়ায় করেন নাই বেশ মনে হয়।

এক দিন আমি আর একটু বেশী অন্যমনস্ক হইলাম এবং নিনাও আরও বেশী দড়াম্ শব্দ করিয়া দরজা বন্ধ করিল। "ওঃ!"—এই উচ্ছ্বাসোক্তি হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নিনা তাহা শুনিতে পাইয়াছিল, আমিও তজ্জন্য অনুতাপ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবই বৃথা। তা'র পর হইতে নিনা আর আমার চিন্তার ব্যাঘাত করিত না। সে পা টিপিয়া টিপিয়া আস্তে আস্তে হাঁটিত, আর সে খুব সাবধানে দরজা বন্ধ করিত—একটুও শব্দ হইতে দিত না।

আমি তাহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া, আমার চেয়ার হইতে এক লাফে উঠিয়া পড়িলাম। তাহার দিকে ছুটিয়া গিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম, চুম্বন করিলাম এবং আমরা দু'জনেই আনন্দে আটখানা হইয়া একত্র হাসিতে লাগিলাম।

কিন্তু নিনার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও নিনা নিজের দোষ শোধরাইতে পারিল না। যখনই এই দোষটা করিত, তখনই তা'র মুখে একটু দুঃখের ভাব আসিত—অথবা একটা রঙ্গ করিবার ভাণ করিত। তাহাতে তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইত।

আর আমি—আমি যখন চিন্তা-কল্পনায় মনোরথে চড়িয়া উধাও হইয়া যাইতাম, তখন কেবল মাথা নাড়িতাম এবং নেত্র বিস্ফারিত করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিতাম। অতএব পূর্ব্বের মতই সমস্ত রহিয়া গেল।

আমাদের "মধু-চন্দ্রমা" অনেক মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে প্রণয়িযুগলের ললাটে একটুও মেঘের রেখা দেখা দেয় নাই।

এক দিন—জুলাই মাসের সূর্য্য যে দিন প্রখর রশ্মি বর্ষণ করিয়া আমাদের মস্তিষ্ককেও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল—সেই দিন নিনা আমাকে বলিল, "আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, তোমাকে আমি এক দিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'তুমি কিসের চিন্তায় এতটা মগ্ন হয়ে থাক, আমার জান্‌তে ইচ্ছে করে'। সম্ভ্রান্ত পাঠক, তুমি কি বিশ্বাস কর্‌বে, নিনা বলে, সেই সময় নাকি একটা কটু কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। উত্তরে আমি আবার একটা কড়া কথা বল্লুম। অশ্রুতে নিনার চোখ ভোরে এল। আমারও গর্ব্বে আঘাত লেগেছিল। আর এক সময় ঐ একই রকম আরম্ভ, একই রকম শেষ; এই ব্যাপার পুনঃপুনঃ চলিতে লাগিল। নিনা বলিল,—"এই রকম জীবন আমার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে।"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমারও তাই মনে হয়।"

"বটে! তুমিও তাই মনে কর? আর আমার কথা যদি বল, আমি ত একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর আমরা প্রায় এক বৎসরকাল এই শৃঙ্খল বহন করছি!"

আমি উত্তর করিলাম,—"দশ মাস।"

"তোমার কাছে ১০ বৎসর মনে হ'তে পারে, আমার কাছে এখনও অতটা মনে হয় না। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, আমাদের সুখ খুবই বেশী দিন টিকে আছে! হায়, আমি কি অসুখী! এখনই আমি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আর কিছু দিন পরে তুমি আমাকে ঘৃণা কর্‌বে—এখনই কর্‌ছ কি না, তাই বা কে জানে। আমিও হয় ত এক সময় তোমাকে দু'চোখে দেখ্‌তে পার্‌ব না!"

আমার ইচ্ছা হইল, রুষ্টা নিনাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সমস্ত ঘরময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াই—যতক্ষণ না সে বলে, "হয়েছে, হয়েছে।" আরও আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, আমি তা'র সম্মুখে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি কিংবা তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন ক'রে তা'র মনোভাব বদ্‌লে দিই। এক কথায়, কোন ভাল স্বামীর মনে যত রকম ভাল চিন্তা আস্‌তে পারে, সমস্তই আমার মনে আসিয়া উদয় হইল। আমি এক বার আড় চোখে তাহার পানে তাকাইলাম। সে ইহা লক্ষ্য করিয়া একটা কাঁধ-ঝাঁকানি দিল। আমি এক পা তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম, সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। আর আমি—আমিও তাই করিলাম। সিঁড়ি দিয়া তর্‌তর্ করিয়া নামিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। শোধ তুলিবার নানাপ্রকার মতলব আঁটিতে লাগিলাম।

কিন্তু তথাপি 'বাড়ীর সম্মুখেই আমি ঘুরঘুর করিতে লাগিলাম; যায়গাটা ছাড়িতে পারিলাম না। যে বাড়ীতে

আমার সুখের বাসা ছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই বাড়ীর উপরেই ক্রমাগত চোখ পড়িতে লাগিল।

তাহার পর হঠাৎ আমাদের পূর্ব্ব-বন্ধু বাঞ্চেত্তা ও স্থুলপিচিত্তকে আমার মনে পড়িল। আমার মনে হইল, আমার এমন কেহ নাই যে, নিনার সহিত বিবাদে আমার হইয়া শান্তিস্থাপনের কায করে। তা' ছাড়া এরূপ কাযের ভার আমি কাহারও হাতে দিতে চাহি না।

আমি মনে মনে ভাবিলাম—"এটা এই প্রথম বার কিন্তু শেষ বার কি না, কে জানে। তা'র কাছে ফিরে যেতে হ'বে, যতটা সম্ভব তা'র শাস্তির সময়টা একটু কমিয়ে দিতে হ'বে। তা'র সঙ্গে সদয়ভাবে কথা কইতে হবে,বল্‌তে হবে যে, আর আমরা ঝগড়া করব না। কিন্তু যদি আমার কথাটা ভালভাবে না নিয়ে, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে?—কি বাজে কথা। মিষ্টিভাবে একটা কথা বল্লে সে প্রাণ ভ'রে আমাকে চুম্বন কর্‌বে, তখন আর আমরা বচসা করব না, দু'জনে মিলে কেবলই হাসব।"

দুই তিন বার এই রকম চিন্তার পর, কে যেন আমাকে টেনে আমার বাড়ীর চৌকাঠের কাছে এনে ফেল্লে—কিন্তু আবার কতবার গৃহ হইতে দূরে চ'লে গেলাম। অবশেষে এক দিন কপাল ঠুকে ছুটে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লাম, এক একবারে দুই তিন ধাপ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেম, তা'র পরেই সেই নিনার সম্মুখে গিয়ে হাজির। নিনা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আগু থাকতেই আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিল। তাহার হাত দিয়া সে মুখ ঢাকিল, একটি কথাও বলিল না। আমি তাহাকে বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া, ঘরের ভিতর লইয়া গেলাম। তা'র পর আমার কোলে উঠাইয়া, আস্তে আস্তে তা'র হাত দুটি তা'র মুখ হইতে সরাইয়া দিলাম, তার মুখের উপর মুখ রাখিয়া, তাহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম। আমার হৃৎপিণ্ডটা সবেগে স্পন্দিত হইতেছিল। নিনার রকম-সকম দেখিয়া মনে হইল, যেন কি একটা দুর্ঘটনা হইয়াছে। আমার অনুপস্থিতি-কালের মধ্যে না জানি কি ঘটিয়াছে—আবার মিষ্টি কথা বলিয়া চুম্বন করিয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন সাহস করিয়া স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হইয়াছে—তখন সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল।

"সে মারা গেছে!"

"কে?"

"বাঞ্চেত্তা, বেচারি বাঞ্চেত্তা!"

"আমি নিস্তব্ধ। সত্য বলিতে কি, এ সংবাদে আমি তেমন মর্ম্মাহত হই নাই। বৃদ্ধার বয়স ৭০ বৎসর পার হইয়াছিল; বহু পূর্ব্বেই তাহার স্থান স্বর্গে সংরক্ষিত হইয়াছিল। তথাপি নিনার এই অকপট দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলাম। যখন তাহার কান্না থামিল, তখন সে গভীর আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এখন তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে!"

"এ খবর তোমার কাছে কে নিয়ে এল?"

"আমার এক জন বন্ধু, যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পরশু দিন সে হঠাৎ মারা যায়।"

"আর স্থুলপিচিত্ত?"

"স্থুলপিচিত্ত হতাশ হয়ে পড়েছে। সে এখন একটি কথাও বলে না, মনে হয় যেন বজ্রাহত হয়েছে।"

"তা' হ'লে তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে হ'বে।"

"হাঁ যাও, এখনই যাও।"

আমি গেলাম। আমি যখন সেখানে পৌঁছিলাম—আহা! বেচারা এই বিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য কর্‌তে পারে নি! সেই রাত্তিরে, তার জীবনসঙ্গিনীকে শ্মশানে নিয়ে যাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই সে তাহার শয্যায় শুইয়া পড়ে—তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, পরদিনের প্রাতঃকাল তা'র আর দেখিতে হইবে না।

মৃত মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল—যেন বলিতেছে;—"মৃত্যুও আমাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে নাই।"

বিষণ্ণ হৃদয়ে আমি বাড়ী ফিরিলাম। আমরা একাকী। নিনাকে আমি একটি কথাও বলিলাম না। সে বিষণ্ণভাবে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার বক্ষের উপর আমাকে চাপিয়া ধরিল।

"কার্লো!"

"নিনা!"

আমার দিকে তাকাইয়া নিনা যেন আমার চোখের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। তা'র পর মৃদুস্বরে বলিল, "আমরাও! এ কথা সত্য নয় কি?"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শক্তি-পূজা

শেষ হ'ল বরষার রাতি, শরতের প্রথম উন্মেষ,
নবোদিত অরুণ পরশ আকুল করিল দিক দেশ।
এক হস্তে কমণ্ডলু, অন্য হস্তে ফুল,
নয়নে ব্যথার দৃষ্টি বিলোল আকুল,
পৃষ্ঠে মুক্ত কেশের সম্ভার চঞ্চল চরণ পানে চায়,
অরুণিম বস্ত্রে লুকাইয়া ওগো মুগ্ধে, চলেছ কোথায় ?
চলেছ কোথায় ওগো তুমি, করিতেছ কাহার সন্ধান ?
ওই অর্ঘ্য-পত্র পুষ্পমালা কাহারে করিবে তুমি দান ?
কে বাসে, কি বাসে, কোথা, কাছে কিংবা দূরে,
আছে কি লুকায়ে কোন অজ্ঞাত মন্দিরে ?
আকুল সকল কুঞ্জ মুগ্ধনেত্রে দেখিছে তোমায়,
হাতে লয়ে পত্র-পুষ্পমালা বল, শুভে, চলেছ কোথায় ?
বল, শুভে, ক্ষণেক দাঁড়াও, ফিরাও ফিরাও দু'টি আঁখি,
কথা যদি কহিতে না চাও ক্ষতি নাই, একবার দেখি।
সম্মুখে তোমার বন, পথ নহে সম,
দু'ধারে কণ্টকলতা—সকলে নির্মম।
অঙ্গের বসন ওই তব, আরো ঘন নব রক্তরাগে
এখনি ভরিয়া যাবে, ওগো, তা'দের বিষম অনুরাগে !
হাঁ শুভে, দাঁড়াও ওই মত, ক্ষতি কি শ্রীমুখ ফিরাইতে ?
তুমিও ত পাগলের মত চলিয়াছ কাহারে দেখিতে ?
জান কি কে গো সে, কে সে কোথা বাস করে—
পাষাণে কি এইমত সচল মন্দিরে ?
হাসির কি কথা মুগ্ধে ? বোসো, যাচে এই ক্ষুধিত পাষাণ,
তোমার পরশ-রস পানে আসুক ফিরিয়া তাহে প্রাণ।
ওদিকে চেয়োনা তুমি আর, বোসো বোসো, শ্রান্তি কর দূর।
অলীক ব্যথায় ছুটে ছুটে করো না এ রূপখানি চুর।
পুষ্পপাত্র কমণ্ডলু দাও মোর করে।
ভয় নাই, লইয়া যাব না আমি ঘরে।
কেবল লইয়া যাব থাক্, আগে দেখি কি আছে তোমার।
এ কি গো, এটা যে রক্তজবা, এ যে রক্তকবরীর হার !
এই রক্তচন্দন-চর্চ্চিত এই সব রক্তপুষ্পমালা,
ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল, কাহার অর্চ্চনালোভে বালা ?
লজ্জা কেন, তোলো মুখ, দেখ গো চাহিয়া,
কোথায় দেবতা আমি দিব দেখাইয়া।

হে হরি, পূজিতে চাও কা'রে ? পাও নাই পরিচয় তা'র ?
ভেবেছ কি ঘনারণ্য পারে করিছে সে প্রতীক্ষা তোমার ?
আমার এ নয়ন-দর্পণে একবার দেখ মুখখানি।
সে দেবতা অন্য কোথা নাই, সে দেবতা এইখানে রাণী !
অপাঙ্গে হাসির ডোরে বাঁধ মুক্তাধারা,
ওগো মুগ্ধে, এখনো এমন আত্মহারা !
শুনিছ না, নীলকান্তি হ'তে ঝরিতেছে কার নামগান ?
দেখিতে কি পাওনি, পাষাণী, শিহরণে জাগিছে পাষাণ ?
একবার নেত্র নিমীলনে চেয়ে দেখ, যুগের সীমায়,
দৈত্যভয়ে কত যে দেবতা আশ্রয় লয়েছে তব পায় !
সমবেত কণ্ঠে তা রা নিত্য করে স্তুতি,
কত রূপে, কত নামে, তোমারে পার্ব্বতী।
সন্তানের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সেই তুমি নিজে দৈত্যভয়ে
স্বরূপ ভুলিয়া, শক্তিময়ী, চলিয়াছ অপর-আশ্রয়ে !
কস্তূরীমৃগের মত আজি—নাভি-পদ্মে গন্ধের ভাণ্ডার—
অলীক সৌরভ আকর্ষণে ছুটেছ ব্যাকুলা চারিধার।
বোসো শ্রান্তে, আর যেতে দিব না তোমারে
গন্ধলোভে মৃন্ময়ীর অন্ধ-কারাগারে।
কি দেখিছ, বিমুগ্ধ চিন্ময়ী ? একবার নত কর আঁখি।
মুগ্ধনেত্রে বহে অশ্রুধার, ক্ষণেক তোমারে আমি দেখি।
হিমালয়পাদমূলে বসি, এক দিন দেবতা যেমন
দেখেছিল অঙ্গে ষোড়শীর স্বরূপের পূর্ণ আবরণ,
সেইরূপে, ওগো বন্ধ-গৃহ-শোভাকরী,
দাঁড়াও ক্ষণেক, আমি পূজা তব করি।
গঙ্গাজলে গঙ্গার তর্পণ—তোমারি রচিত উপায়ন
তোমারি শ্রীচরণকমলে ওগো দুর্গে, করিব অর্পণ।
ওগো উমে, শৈলেশনন্দিনি ! মেনকার অঞ্চলের ধন !
ওগো কান্তি, ভ্রান্তি দিয়ে দূরে নিজ গৃহে কর আগমন।
অম্ভৃণ ঋষির ঘরে বাকরূপ ধ'রে,
যে কথা শুনায়েছিলে কাঁপায়ে অম্বরে—
অদৃষ্টের মুখপানে চেয়ে আজো ব'সে তোমার সন্তান—
শুনাও তা'দের, শক্তিময়ী, তোমার সে স্বরূপের গান।
যাক ঋতু মধুতে ভরিয়া, মধুতে ভরিয়া যাক দেশ
হোক্, দেবী, জাতিরূপে তব জীবনের নবীন উন্মেষ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গল্প লেখা

—গালে হাত দিয়ে ব'সে কি ভাবছ ?

—একটা গল্প লিখতে হবে, কিন্তু মাথায় কোনও গল্প আস্‌ছে না, তাই ব'সে ব'সে ভাবছি।

—এর জন্য আর এত ভাবনা কি? গল্প মনে না আসে, লিখো না।

—গল্প লেখার অধিকার আমার কাছে কি না, জানিনে, কিন্তু না লেখবার অধিকার আমার নেই!

—কথাটা ঠিক বুঝলুম না।

—আমি লিখে যাই তাই, inspirationএর জন্য অপেক্ষা আমি কর্‌তে পারিনে। ক্ষিতি জিনিষটে নিত্য, আর inspiration অনিত্য।

—লিখে যে কত যাও, তা আমি জানি, তা হ'লে একটা পড়া-গল্প লিখে দেও না।

—লোকে যে সে চুরি ধর্‌তে পার্‌বে।

—ইংরেজী থেকে চুরি-করা গল্প বেমালুম চালান যায়।

—যেমন ইংরেজকে ধুতি-চাদর পরালে তা'কে বাঙ্গালী ব'লে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া যায়।

—দেখ—এ উপমা খাটে না। ইংরেজ ও বাঙ্গালীর বাইরের চেহারায় যেমন স্পষ্টই প্রভেদ আছে, মনের চেহারায় তেমন স্পষ্ট প্রভেদ নেই।

—অর্থাৎ ইংরেজও বাঙ্গালীর মত আগে জন্মায়, পরে মরে—আর জন্ম-মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টা ছট্‌ফট্‌ করে।

—আর এই ছট্‌ফটানিকেই ত আমরা জীবন বলি।

—তা ঠিক, কিন্তু এই জীবন জিনিষটিকে গল্পে পোরা যায় না—অন্ততঃ ছোট গল্পে ত নয়ই। জীবনের ছোট-বড় ঘটনা নিয়েই গল্প হয়। আর সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যা নিত্য ঘটে, এ দেশে তা নিত্য ঘটে না।

—এইখানেই তোমার ভুল। যা নিত্য ঘটে, তা'র কথা কেউ শুনতে চায় না। যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান। ঘরে যা নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে আর কে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে যায়?

—এই তোমার বিশ্বাস?

—এ বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাত দুপুরে একটা পড়ো-মন্দিরে আশ্রয় নিলুম—আর অমনি হাতে পেলুম একটি রমণী, আর সে যে সে রমণী নয়! একেবারে তিলোত্তমা! এ রকম ঘটনা বাঙ্গালীর জীবনে নিত্য ঘটে না, তাই আমরা এ গল্প একবার পড়ি, দু'বার পড়ি, তিনবার পড়ি। আর পড়েই যা'ব যত দিন না কেউ এর চাইতেও বেশী অসম্ভব আর একটা গল্প লিখবে।

—তা হ'লে তোমার মতে গল্পমাত্রেই রূপকথা।

—অবশ্য।

—ও দু'য়ের ভিতর কোনও প্রভেদ নেই।

—একটা মস্ত প্রভেদ আছে। রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোল আনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব ব'লে মানি।

—তা হ'লে বলি। ইংরেজী গল্পের বাঙ্গালা কর্‌লে তা হ'বে রূপকথা।

—অর্থাৎ বিলেতের লোক যা' লেখে, তাই অলৌকিক।

—অসম্ভব ও অলৌকিক এক কথা নয়। যা' হ'তে পারে না, কিন্তু হয়, তাই হচ্ছে অলৌকিক। আর যা' হ'তে পারে না ব'লে হয় না, তাই হচ্ছে অসম্ভব।

—আমি ত বাঙ্গালা গল্পের একটা উদাহরণ দিয়েছি। তুমি এখন ইংরেজী গল্পের একটা উদাহরণ দেও।

—আচ্ছা দিচ্ছি। তুমি দিয়েছ একটি বড় লেখকের বড় গল্পের উদাহরণ, আমি দিচ্ছি—একটি ছোট লেখকের ছোট গল্পের উদাহরণ।

—অর্থাৎ যা'কে কেউ লেখক ব'লে স্বীকার করে না, তা'র লেখার নমুনা দেবে? একেই বলে প্রত্যুদাহরণ।

—ভালমন্দের প্রমাণ, জিনিষের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। লোকে বলে, মাণিকের খানিকও ভাল।

—এই বিলেতী অজ্ঞাতকুলশীল লেখকের হাত থেকে মাণিক বেরুয়?

—মাছের পেট থেকেও যে হীরের আংটী বেরয়, এ কথা কালিদাস জান্‌তেন।

—এর উপর অবশ্য কথা নেই। এখন তোমার রত্ন বার করো।

—লণ্ডনে একটি যুবক ছিল, সে নেহাৎ গরীব। কোথাও চাকরী না পেয়ে সে গল্প লিখতে ব'সে গেল। তা'র inspiration এল হৃদয় থেকে নয়—পেট থেকে। যখন তা'র প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হ'ল, তখন সমস্ত সমালোচকরা বল্‌লে যে, এই নতুন লেখক আর কিছু না জানুক, স্ত্রী-চরিত্র জানে। সমালোচকদের মতে ভদ্র-মহিলাদের সম্বন্ধে তা'র যে অন্তর্দৃষ্টি আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের বইয়ের সমালোচনার পর সমালোচনা প'ড়ে লেখকটিরও মনে এই ধারণা ব'সে গেল যে, তাঁ'র চোখে এমন ভগবদ্দত্ত X rays আছে, যা'র আলো স্ত্রীজাতির অন্তরের অন্তরে পর্য্যন্ত সোজা পৌঁছয়। তা'র পর তিনি নভেলের পর নভেলে স্ত্রী-হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত কর্‌তে লাগলেন। ক্রমে তাঁ'র নাম হয়ে গেল যে, তিনি স্ত্রী-হৃদয়ের এক জন অদ্বিতীয় expert। আর ঐ ধরণের সমালোচনা পড়তে পড়তে পাঠিকাদেরও বিশ্বাস জন্মে গেল যে, লেখক তাঁ'দের হৃদয়ের কথা সবই জানেন। তাঁ'র দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গীর মধ্যেও তিনি রমণীর প্রচ্ছন্ন হৃদয় দেখতে পেতেন! মেয়েরা যদি শোনে যে, কেউ হাত দেখতে জানে, তা'কে যেমন তা'রা হাত দেখাবার লোভ সংবরণ কর্‌তে পারে না, তেমনই বিলেতের সব বড় ঘরের মেয়েরা ঐ ভদ্রলোককে নিজেদের কেশের বেশের বিচিত্র রেখা সব দেখাবার লোভ সংবরণ কর্‌তে পার্‌লে না। ফলে তিনি নিত্য ডিনারের নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। কোনও সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁ'র কস্মিনকালেও কোনও কারবার ছিল না, হৃদয়ের দেনা-পাওনার হিসেব তাঁ'র মনের খাতায় এক দিনও অঙ্কপাত করেনি। তাই ভদ্রসমাজে তিনি মেয়েদের সঙ্গে দু'টি কথাও কইতে পারতেন না, ভয়ে ও সঙ্কোচে তা'দের কাছ থেকে দূরে স'রে থাক্‌তেন। ইংরেজ ভদ্রলোকরা ডিনারে ব'সে যত না খায়—তা'র চাইতে ঢের বেশী কথা কয়। কিন্তু আমাদের নভেলিষ্টটি কথা কইতেন না—শুধু নীরবে খেয়ে যেতেন। এর কারণ, তিনি ও রকম চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় জীবনে কখনও চোখেও দেখেননি। এর জন্য তাঁ'র স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার খ্যাতি পাঠিকাদের কাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ল না। তা'রা ধ'রে নিলে যে, তাঁ'র অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আছে বলেই বাহ্যজ্ঞান মোটেই নেই। আর তাঁ'র নীরবতার কারণ তাঁ'র দৃষ্টির একাগ্রতা। ক্রমে সমগ্র ইংরেজ-সমাজে তিনি এক জন বড় লেখক ব'লে গণ্য হলেন, কিন্তু তা'তে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি হ'তে চাইলেন এ যুগের সব চাইতে বড় লেখক। তাই তিনি এমন কয়েকখানি নভেল লেখবার সঙ্কল্প কর্‌লেন, যা' সেক্সপিয়ারের নাটকের পাশে স্থান পাবে।

এ যুগে এমন বই লণ্ডনে ব'সে লেখা যায় না; কেন না, লণ্ডনের আকাশ-বাতাস কলের ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। তাই তিনি পাত্তাড়ি গুটিয়ে প্যারিসে গেলেন; কেন না, প্যারিসের আকাশ-বাতাস মনোজগতের ইলেক্‌ট্রিসিটিতে ভরপুর। এ যুগের য়ুরোপের সব দেশের সব বড় লেখক প্যারিসে বাস করে, আর তা'রা সকলেই স্বীকার করে যে, তা'দের যে সব বই Nobel prize পেয়েছে, সে সব প্যারিসে লেখা। প্যারিসে কলম ধর্‌লে ইংরেজের হাত থেকে চমৎকার ইংরেজী বেরয়—জার্ম্মাণের হাত থেকে সুবোধ জার্ম্মাণ, রাসিয়ানের হাত থেকে খাঁটি রাসিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্যারিসের সমগ্র আকাশ অবশ্য এই মানসিক ইলেক্‌ট্রিসিটিতে পরিপূর্ণ নয়। মেঘ যেমন এখানে ওখানে থাকে, আর তা'র মাঝে মাঝে থাকে ফাঁক, প্যারিসেও তেমনই মনের আড্ডা—এখানে ওখানে ছড়ান আছে। কিন্তু প্যারিসের হোটেলে গিয়ে বাস করার অর্থ মনোজগতের বাইরে থাকা।

তাই লেখকটি তাঁ'র master piece লেখবার জন্য প্যারিসের একটি আর্টিষ্টের আড্ডায় গিয়ে বাসা বাঁধলেন। সেখানে যত স্ত্রী-পুরুষ ছিল, সবই আর্টিষ্ট, অর্থাৎ সবারই ঝোঁক ছিল আর্টিষ্ট হ'বার দিকে।

এই হবু আর্টিষ্টদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল স্ত্রীলোক। এরা জাতে ইংরেজ হলেও মনে হয়ে উঠেছিল ফরাসী।

এদের মধ্যে একটি তরুণীর প্রতি নভেলিষ্টের চোখ
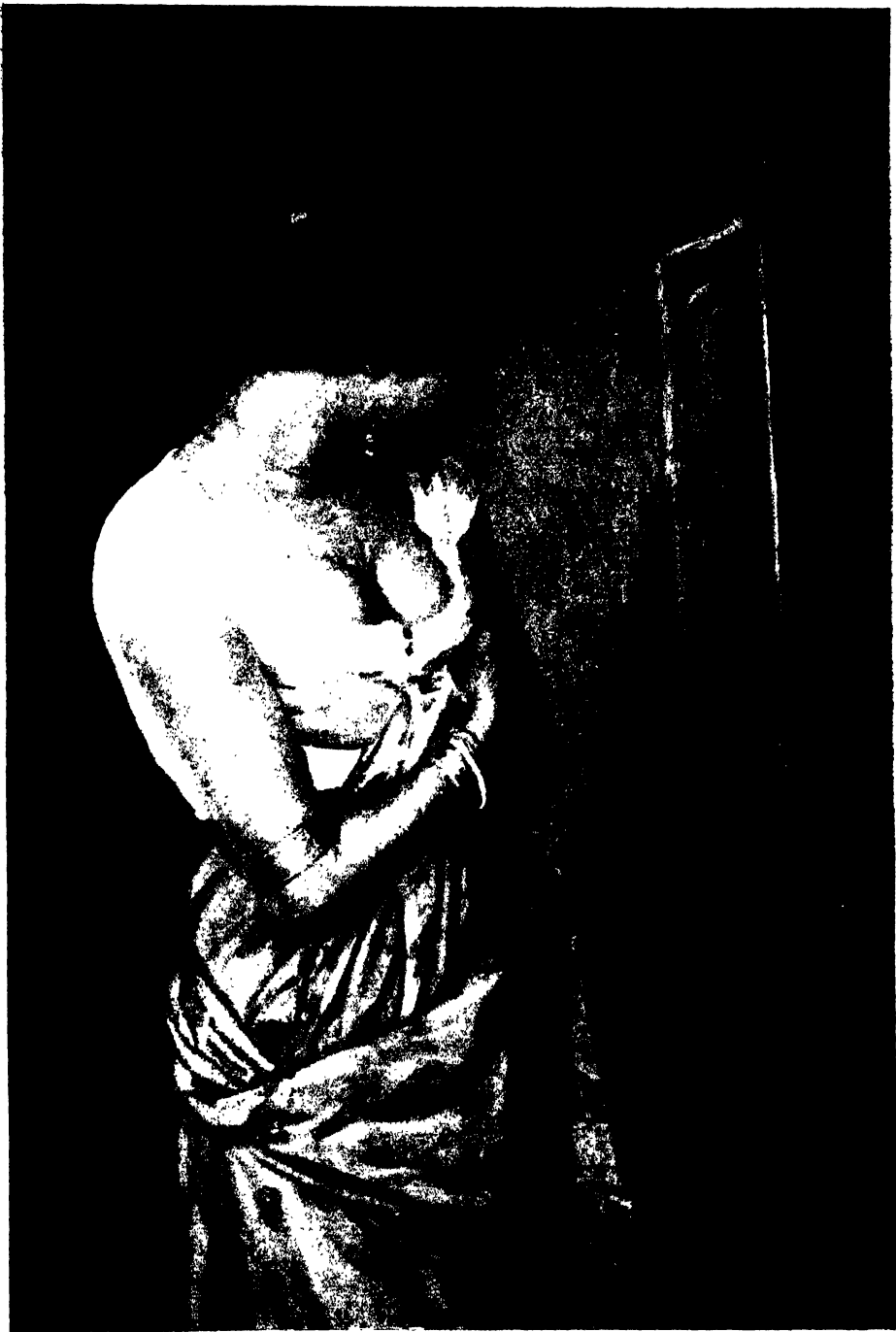
বয়ঃসন্ধি

শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশের সৌজন্যে] শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ।

পড়ল। তিনি আর পাঁচ জনের চাইতে বেশী সুন্দর ছিলেন না, কিন্তু তা'দের তুলনায় ছিলেন ঢের জীবন্ত। তিনি সবার চাইতে বকতেন বেশী, চল্‌তেন বেশী, হাসতেন বেশী। তা'র উপর তিনি স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিচারে সকলের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা কর্‌তেন, কোনরূপ রমণীসুলভ ন্যাকামি তাঁ'র স্বচ্ছন্দ ব্যবহারকে আড়ষ্ট করত না। পুরুষ জাতির নয়ন-মন আকৃষ্ট করবার তাঁ'র কোনরূপ চেষ্টাও ছিল না, ফলে তাদের নয়ন-মন তাঁ'র প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'ত।

দু'চার দিনের মধ্যেই এই নবাগত লেখকটির তিনি যুগপৎ বন্ধু ও মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ালেন। লেখকটি যে ঘাগ্‌রা দেখলেই ভয়ে, সঙ্কোচে ও সম্ভ্রমে জড়সড় হয়ে পড়তেন, যে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং এঁদের ভিতর যে বন্ধুত্ব হ'ল, সে শুধু মেয়েটির গুণে।

নভেলিষ্টের মনে এই বন্ধুত্ব বিনাবাক্যে ভালবাসায় পরিণত হ'ল। নভেলিষ্টের বুক এত দিন খালি ছিল, তাই প্রথম যে রমণীর সঙ্গে তাঁ'র পরিচয় হ'ল, তিনি তা অবলীলাক্রমে অধিকার ক'রে নিলেন। এ সত্য অবশ্য লেখকের কাছে অবিদিত থাক্‌ল না, মেয়েটির কাছেও নয়। লেখকটি মেয়েটিকে বিবাহ কর্‌বার জন্য মনে মনে আকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভরসা ক'রে সে কথা মুখে প্রকাশ কর্‌তে পারলেন না। এই স্ত্রীহৃদয়ের বিশেষজ্ঞ —এই স্ত্রীলোকটির হৃদয়ের কথা—কিছুমাত্রও অনুমান কর্‌তে পারলেন না। শেষটা বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবার কাল ঘনিয়ে এল। মেয়েটি এক দিন বিষণ্নভাবে নভেলিষ্টকে বল্‌লে যে, সে দেশে ফিরে যাবে—টাকার অভাবে। আর ইংলণ্ডের এক মরা পাড়াগাঁয় তা'কে গিয়ে school mistress হ'তে হবে—পেটের দায়ে। তা'র সকল উচ্চ আশার সমাধি হ'বে ঐ সৃষ্টিছাড়া স্কুল-ঘরে আর সকল আর্টিষ্টিক শক্তি সার্থক হ'বে—মুদি চাকরাণীর মেয়েদের grammar শেখানতে। এ কথার অর্থ অবশ্য নভেলিষ্টের হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। দু'দিন পরেই মেয়েটি প্যারিসের ধুলো পা থেকে ঝেড়ে হাসিমুখে ইংলণ্ডে চ'লে গেল। কিছুদিন পরে সে ভদ্রলোক মেয়েটির কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন। তা'তে সে তা'র স্কুলের কারাকাহিনীর বর্ণনা এমন স্ফূর্ত্তি ক'রে লিখেছিল যে, সে চিঠি প'ড়ে নভেলিষ্ট মনে মনে স্বীকার কর্‌লেন যে, মেয়েটি ইচ্ছে কর্‌লে খুব ভাল লেখক হ'তে পারে। নভেলিষ্ট সে পত্রের উত্তর খুব নভেলি ছাঁদে লিখলেন। কিন্তু যে কথা শোনবার প্রতীক্ষায় মেয়েটি ব'সে ছিল, সে কথা আর লিখলেন না। এ উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর এল না। এ দিকে প্রত্যুত্তরের আশায় বৃথা অপেক্ষা ক'রে ক'রে ভদ্রলোক প্রায় পাগল হয়ে উঠল। শেষটা এক দিন সে মন স্থির কর্‌লে যে, যা থাকে কুল-কপালে, দেশে ফিরেই ঐ মেয়েটিকে বিয়ে কর্‌বে। সেই দিনই সে প্যারিস ছেড়ে ইংলণ্ডে চ'লে গেল। তা'র পরদিন সে মেয়েটি যেখানে থাকে, সেই গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গাড়ী থেকে নেমেই দেখলে যে, মেয়েটি পোষ্ট-আফিসের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি বল্‌লে, "তুমি এখানে ?"

"তোমাকে একটি কথা বল্‌তে এসেছি।"

"কি কথা ?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"সে ত অনেক দিন থেকেই জানি। আর কোনও কথা আছে ?"

"আমি তোমাকে বিয়ে কর্‌তে চাই।"

"এ কথা আগে বল্‌লে না কেন ?"

"এ প্রশ্ন কর্‌ছ কেন ?"

"আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

"কা'র সঙ্গে ?"

"এখানকার একটি উকীলের সঙ্গে।"

এ কথা শুনে নভেলিষ্ট হতভম্ব হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, মেয়েটি পিঠ ফিরিয়ে চ'লে গেল।

"বস্, গল্প ঐখানেই শেষ হ'ল।"

—অবশ্য! এর পরও গল্প আর কি ক'রে টেনে বাড়ানো যেত ?

—অতি সহজে। লেখক ইচ্ছে কর্‌লেই বল্‌তে পার্‌তেন যে, ভদ্রলোক প্রথমতঃ থতমত খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে ছিলেন, পরে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে 'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং' ব'লে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে মেয়েটির পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন, আর সেও খিল খিল ক'রে হাসতে হাসতে ছুটে পালাতে

লাগল। রাস্তায় ভিড় জ'মে গেল। তা'র পর এসে জুটল সেই solicitor স্বামী, আর সঙ্গে এল পুলিস। তার পর যবনিকাপতন।

—তা হ'লে ও ট্রাজেডি ত কমেডি হ'য়ে উঠত।

তা'তে ক্ষতি কি, জীবনের যত ট্রাজেডি, তোমাদের গল্প-লেখকদের হাতে সবই ত comic হ'য়ে উঠে। যে তা বোঝে না, সে-ই তা প'ড়ে কাঁদে, আর যে বোঝে, তা'র কান্না পায়।

—রসিকতা রাখো। এ ইংরেজী গল্প কি বাঙ্গালায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায়?

—এ রকম ঘটনা বাঙ্গালী-জীবনে অবশ্য ঘটে না।

—বিলেতী জীবনেই যে নিত্য ঘটে, তা নয়, তবে ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের জীবনে?

—এ গল্পের আসল ঘটনা যা, তা—সব জাতের মধ্যেই ঘটতে পারে।

—আসল ঘটনাটি কি?

—"ভালবাসব, কিন্তু বিয়ে করব না, সাহসের অভাবে।" এই হচ্ছে এ গল্পের মূল ট্রাজেডি।

—বিয়ে ও ভালবাসার এই ছাড়াছাড়ি এ দেশে কখনও দেখেছ? না শুনেছ?

—শোনবার কোনও প্রয়োজন নেই, দেদার দেখেছি।

—আমি কখনও দেখিনি, তাই, তোমার মুখে শুনতে চাই।

—তুমি গল্প-লেখক হয়ে এ সত্য কখনও দেখনি, কল্পনার চোখেও নয়?

—না।

—তোমার দিব্য দৃষ্টি আছে।

—খুব সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু তোমার খোলা চোখে?

—এমন পুরুষ ঢের দেখেছি, যা'রা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু ভালবাসতে পারে না।

—আমি ভেবেছিলুম তুমি বল্‌তে চাচ্ছ যে—

—তুমি কি ভেবেছিলে জানি। কিন্তু বিয়ে ও ভালবাসার অমিল এ দেশেও যে হয়, সে কথা ত এখন স্বীকার করছ।

—যাক্ ও সব কথা। ও গল্প যে বাঙ্গালায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায় না, এ কথা ত মানো।

—মোটেই না। টাকা-পয়সা ভাঙ্গালে রূপো পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তামা। অর্থাৎ জিনিষ একই থাকে, শুধু তা'র ধাতু বদলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তা'র রঙ। যে ধাতু আর রঙ বদলে নিতে জানে, তা'র হাতে ইংরেজী গল্প ঠিক বাঙ্গালা হ'বে। ভাল কথা, তোমার ঐ ইংরেজী গল্পটার নাম কি?

—The man who understood woman.

—এ গল্পের নায়ক প্রতি বাঙ্গালী হ'তে পারবে। কারণ, তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছ the man who understood woman.

—এই ঘণ্টাখানেক ধ'রে বকর বকর ক'রে আমাকে একটা গল্প লিখতে দিলে না।

—আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেব, সেইটেই হবে—

—গল্প না প্রবন্ধ?

—একাধারে ও দুই-ই।

—আর তা পড়বে কে, পড়েই বা খুসী হবে কে?

—তা'রা, যা'রা জীবনের মর্ম্ম বই প'ড়ে শেখে না, ঠেকে শেখে—অর্থাৎ মেয়েরা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।
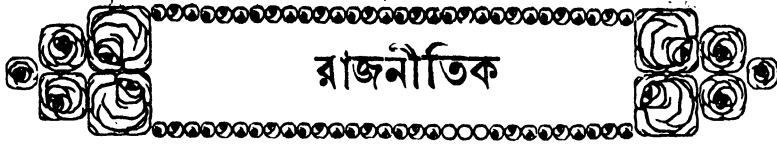
রাজনৈতিক

এই যে রাজনৈতিক নামে একটা অজাযুদ্ধ ঋষিশ্রাদ্ধ দম্পতিকলহ চলেছে, এ ব্যাপারটায় কারও প্রাণেই একটা চোট লাগে না, বরং সকলেই আরও বাহবা দেয়। দেখে শুনে মনে হয়, এত দিন যা' কিছু করা গেল, সবই কি ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা! কত রকমের পায়তাড়া ক'সে শেষে কি না ঠিক হ'ল যে, কেবল ভোটের জোরেই দেশ উদ্ধার করতে হ'বে! মানুষ যা-ই কেন ভাবুক, যা-ই কেন করুক, সে যদি বিদ্যাসাগরের পুত্তলিকার মত স্থানবিশেষে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে হাত তুলতে পারে, তা' হ'লে আর দেশের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু হাসিল করতে বাকি থাকে না। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি, গান শুনবে অক্রূর-সংবাদ আর পয়সা দেবে একটি, এও কি কখন হয়? কিন্তু এ যুগে তা' বলবার জো নেই, সব শিয়ালেরই এক রা হয়—হয়—হয়। এই হাত তোলাতেই নাকি দেশে একটা লড়িয়ে ভাব জাগে, আর এর সঙ্গে সঙ্গে যদি একটু ক'রে পল্লীসংস্কারের সুর ভাঁজা যায়, তা' হ'লে পলিটিক্সের সোনায় সোহাগা! এইত হ'ল হালফিলের রাজনীতি, এর বলবই বা কি, বোঝাবই বা কি? যদি বল, ও রাস্তা রাস্তাই নয়, ওতে যেটুকু স্বদেশী ভাব গজিয়েছিল, তার পিণ্ডী চটকান হচ্ছে, ঘর ছেড়ে পরের আঙ্গিনায় যাওয়ার আস্কারা দেওয়া হচ্ছে, নেড়াকে বেলতলায় নিয়ে গিয়ে তা'র মাথা ফাটানর সুবিধা ক'রে দেওয়া হচ্ছে, তখনই কলেজী বুদ্ধিমান্‌রা একবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠে এই বেল্লিকপণার শিক্ষা দিতে কোমর বাঁধেন। আমি ত ভাই, এই বেল্লিক রাজনীতি ছাড়া আর কিছু জানিনি। আবার বঙ্কিমের কুক্কুর পলিটিক্সটা দেশে নতুন চেহারায় দেখা দিলে! সকলেই বলে, এটা "সিংহীর মামা ভোম্বল দাস, বাঘ মারছে গণ্ডা দশ", কি বাঘ মারছে—কটা বাঘ মারছে, এ কথা মহাত্মার কাছে দশবার জিজ্ঞাসা করেও জবাব পাইনি। তিনিও বলেন, এ পলিটিক্সে খুব একটা ইম্‌প্রেশান করেছে, এখন সে ইম্‌প্রেশানটা কি ধরপাকড়ের মধ্য দিয়ে ফুটল; না, বার্কেনহেডী উক্তির ভিতর দিয়ে লোকের চোখ ঝলসে দিলে; না লী কমিশনের এক ক্রোর টাকার খরচ-খাতে জাহির হয়ে পড়ল; না, কলওয়ালাদের আর মিলওয়ালা-দের সর্ব্বনাশের স্বরূপ প্রকাশ করলে? সে কথার কিনারা করতে কেউ রাজীই নয়। তা'রা কেবলই বলে, ও সব ছোট খাট জমাখরচে কায কি, মোটের উপর কেল্লা ফতে হয়ে গেছে। এই ইংরাজ সরকার ভোটে হেরে নাস্তানাবুদ হচ্ছে, যে চোখখেগো এ না দেখবে, তা'কে উত্তম মধ্যম দেওয়া ছাড়া উপায় কি? এরি মধ্যে যাঁদের একটু ঝাঁজ কম, তাঁ'রা বড় জোর গ্রাটিশ এ্যাডভাইস দেন, তোমার দরকার থাকে, তুমি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে জঙ্গল সাফ করলেই পার, তোমার ত আর কেউ হাত বেঁধে রাখেনি! হাত বেঁধে রাখেনি ত কি করেছে? মানুষের মন নিয়ে কথা। সেই মনই দিয়েছ ভেঙ্গে; গেঁয়ো মানু-ষকে শেখালে তোমার আর কত শত কিছুই ক'রে কায নেই, তোমার মামলা-মোকর্দ্দমা ছাড়তে হবে না; তোমার ছেলেপিলেকে আর পরের ছাঁচতলা মাড়াতে বারণ করতে হ'বে না; তোমার মান-ইজ্জতের ভাবনা মোটেই ভাববার দরকার নেই। তোমার দেশের তাঁতি কর্ম্মকারের ভাবনা ভাববার দরকার নেই, তুমি অমুক সর্দ্দারকে ভোট দাও, তোমার সশরীরে স্বর্গলাভ হ'বে; আর আমাকে বল কেঁচে গণ্ডুষ করতে, আর পাড়াগাঁ দুরস্ত করতে। এই আঁশ-চুবড়ীর গন্ধে দেশটাকে মজিয়ে তার পর বল, তুমি তোমার বেলফুলটা তা'র নাকের কাছে নিয়ে যাও না কেন? এতে যে কি ফল হয়, তা গল্পেই লেখা আছে। এই নৌকা নঙ্গর ক'রে তা'তে দাঁড়টানার পলিটিক্সটা দেশময় চলছে, এ নেশা না কাটলে কাযে হাত দেয় কার বাবার সাধ্যি! রাজনীতি করবার আগে ঠিক হোক, আমরা দেশকে মানি কি না; যদি দেশ মানি, তবে পরের দোরে মাথা খোঁড়বার এই দুরন্ত অভ্যাসটা এমন হাড়ে হাড়ে বসেছে কেন? রাজনীতি ত একটা নীতি, সেখানে কি কোন নিয়ম খাটবে না? ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সকলেরই এক সুর—রাজনীতিতে ধর্ম্ম নেই; কিন্তু বক্তারা মঞ্চে উঠলেই বলেন, ত্যাগ কর, তপস্যা

কর, ছ্যান কর, ত্যান কর ; বলি ওগুলি কি অধর্ম্ম ? যা হোক বাবা, তোমাদের রাজনীতির বালাই নিয়ে মরি। এখন ছেড়ে দাও, কেঁদে বাঁচি !

আর যদি রাজনীতির আশ এখনও না মিটে থাকে, তবে সেই গাঁধির ন মণ তেল না হ'লে রাধা নাচবে না, নাচবে না। প্রথমেই ঘরের দিকে মন ফেরাতে হ'বে। যদি মনের কথা শুনে আঁতকে উঠ, মন ফেরানটাকে পাগলামী ব'লে মনে কর, তবে পরাধীন দেশের পলিটিক্স তোমার কায নয়! রামও বলবে, কাপড়ও তুলবে, এ হ'বে না। এই যে বিলাতী বিদেশী নেশা, এ না ছুটলে ভাবের ঘরে চুরি না ঘুচলে যত বড় রাজনীতিজ্ঞই হ'ন না কেন, তিনি উপরে কিছুই গড়তে পারবেন না। এই যে একটা একটা আন্দোলনের জোয়ার দেশের উপর ভেসে যাচ্ছে, আর আমরা কিছু দিন বাদেই ভাঁটার কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছি, এতে কি আমাদের কারও মোটেই চৈতন্ত হয় না ? আমি যতদূর ভেবে চিন্তে দেখেছি, রাজনীতির পাকা গাঁথনি গাঁথতে হ'লে প্রথম মনের চিকিৎসা চাই। এই পরমুখ মন নিয়ে দেশকে বাঁচানও যাবে না, বড় করাও যাবে না। যে হাওয়া চলছে, বাঁচতে হ'লে একে ঘোরাতে হবেই হবে।

পূজা, পাঠ, কথকতা, জাতীয় শিক্ষা, দিবারাত্রি জাতীয় ভাবের চর্চ্চা, সেই উদ্দেশ্যে সভাসমিতি—এগুলি একটু ফলাও রকম ক'রে না করতে পারলে মানুষের মনই ভিজাতে পারা যাবে না। দেশে প্রচারকার্য্যটা তেমন ক'রে হয়ই নি, এইটা হচ্ছে গোড়ায় গলদ। আমরা বড় বড় কর্ম্মীকেও জিজ্ঞাসা ক'রে এ উত্তরই পেয়েছি। মানুষকে শিখালেই শিখে, কিন্তু এ চেষ্টাই তেমন ক'রে হয় নি। মহাত্মার সঙ্গে গিয়ে দেখেছি, কাতারে কাতারে লোক আসে, কোথাও কোথাও মেলা লেগে যায়, কিন্তু দর্শন করে, আর চ'লে যায়। কিছু শুনতেও চায় না—বুঝতেও চায় না। নবাবগঞ্জ, মালিকন্দা, আরামবাগ, অভয় আশ্রম, খালিসপুর এই রকম হাজার হাজার আড্ডা জমিয়ে যদি পল্লীসেবায় প্রাণ ঢেলে দেওয়া যায়, তবে দেশে সাড়া আসবেই আসবে। পল্লী নিয়েই সহর ; পল্লীর লোক ধরা-ছোঁয়া না দিলে সহরের তাসের ঘর আপনা থেকে ধূলায় মিশাবে। এখন দিন কয়েক কেবল শেখাতে হবে—

হরি বোল হরি, চল যাই বাড়ী,
বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল।
বিদেশপ্রবাসে পরপাদবাসে
কত আর গোঁয়াবে বল।
বাড়ী পানে মন ছুটেছে,
এখন, মা মা ব'লে ঘরে চল।

শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।
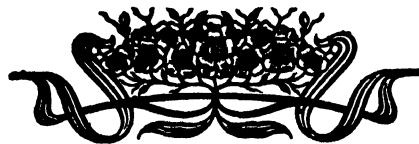
বৈরাজ্যনগরে দুই-দিন

সূচনা

পূজার ছুটীতে কোথাও যাওয়া হইল না। বাড়ীর সকলেই মুখ ভারী করিয়া আছে। দোষ আমার। বৈদ্যনাথে বাড়ী পাওয়া গিয়াছিল। বাড়ীওয়ালা কোট করিয়া বসিল, ১ শত ৫০ টাকা না হইলে এক মাসের জন্য কিছুতেই ভাড়া দিবে না। এ বাড়ীর কোনও দিন এত ভাড়া হয় নাই। পূর্ব্ব-বৎসর আমার বন্ধু এক জন ১ শত টাকায় ছিলেন। আমি ১ শত হইতে ক্রমে ১ শত ২৫ পর্য্যন্ত উঠিলাম। তাহার পর আরও ১০ টাকা বাড়াইলাম। বাড়ীওয়ালা রুখিয়া বলিল, দেড়শত টাকার কাণা কড়া কম হইবে না। আমিও রুখিয়া বলিলাম, ১ শত ৩৫ টাকার কাণা কড়া বেশী দিব না। ১ শত টাকার যায়গায় ১ শত ৩৫ পর্য্যন্ত উঠিয়াছি দেখিয়া সে পাইয়া বসিয়াছে, এই বলিয়া চলিয়া আসিলাম। "যা' হোক গে, পোনের টাকার জন্য বাড়ীটা ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই"—গিন্নী বলিলেন, "গরজ আমার, তা'র ত নয়।" আমি চটিয়া বলিলাম, "আমারও অত গরজ নাই। বছর বছরই যে পূজার সময় বাইরে গিয়ে এত টাকার শ্রাদ্ধ কর্‌তে হ'বে, এমন কথা নাই।" গিন্নী বলিলেন, "তবুও যদি নিজের রোজগার হ'ত?" এর ফলে এবারে বাহিরে যাওয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। শ্বশুরের বিষয় ভোগ করা যে কি, ইহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া মনে মনে সংকল্প করিলাম, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, তা-ও ভাল, তবু এ বিষয় আর ছুঁইব না। গৃহিণীকে বলিলাম, "আচ্ছা, তাই হোক। যা'দের বিষয়, তা'রা দেখুক। আজ হ'তে তোমার বাপের টাকা আমার গোমাংস।" গৃহিণী বলিলেন, "কোথাকার, পেলিটির না উইলসেনের বাড়ীর?"

যাহা হোক, শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না। ঝগড়াটা খুবই পাকিয়া উঠিবার উপক্রম হইল, কিন্তু শেষে দাম্পত্য কলহের সনাতন পরিণামে পরিণত হইল। তখন পূজা ফুরাইয়াছে। যাহারা বাহিরে যাইবার, বাহিরে গিয়াছে। যাহারা সহরে থাকিবার, তাহারা সহরেই থাকিয়া গিয়াছে। প্রাণটা কিছু আই-ঢাই করিয়া উঠিল। ছেলেমেয়েরাও কোথাও যাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। শেষটা নৌকা করিয়া সারা দিনের জন্য কোম্পানীর বাগানে যাইয়া চড়ুইভাতি করাই সাব্যস্ত হইল।

বাড়ীমুখো হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। তবুও সকলের সাধ মিটিল না। জ্যোৎস্নায় গঙ্গার দু'ধারে যেন রূপ ঢালিয়া দিয়াছে। গঙ্গাবক্ষ নির্ম্মল জ্যোৎস্নাতে যেন সাঁতার ভুলিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। বায়ু নিস্তব্ধ; যেন এই রূপের ধ্যানে সমাধিস্থ। নৌকায় উঠিবামাত্র ছেলে-মেয়েরা বলিল, "এখনই ফিরিব না। চল, একটু ভাঁটার মুখে নামিয়া যাই। জোয়ার আসিলে তা'র মুখে বাড়ী ফিরিব।" তাহাই ঠিক হইল। বজরাখানি দক্ষিণমুখো হইয়া কোম্পানীর বাগান হইতে দ্রুত গতিতে স্রোতো-বেগে রাজগঞ্জের দিকে চলিল।

হঠাৎ মোড় ফিরিতেই একটা প্রকাণ্ড আলোকের সাম্‌নে পড়িয়া গেলাম। যে আলোতে মানুষ পথ দেখে, এ সে আলো নয়। এই আলো শতসূর্য্যের মত; চক্ষু ঝলসিয়া গেল। মাঝি অন্ধ হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে "বান্ধ, বান্ধ," বলিতে বলিতে একটা রাক্ষস যেন ঐ আলো লইয়া আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। তা'র পর সব নিবিয়া গেল!

একটা বিরাট, নিরেট অন্ধকারের মাঝখানে যাইয়া পড়িলাম। সেই অন্ধকারের ভিতরে একটা প্রবল অন্ধকারের স্রোতে, বর্ষাকালের পার্ব্বত্য নির্ঝরের মত, খরবেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিলাম। অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই, কেবলই টানিয়া লইয়া গেল। এমন আঁধার কখনও দেখি নাই। এমন আঁধার কখনও কল্পনা করিতেও পারি নাই। এমন প্রবল স্রোতও দেখি নাই; কেহ কখনও কল্পনাও করে নাই। ইহাকে অন্ধকার বলিতেছি, ইহাও কল্পনা। কারণ, এ অন্ধকার চোখে দেখা যায়—প্রচণ্ড দিবালোকের মতই দেখা যায়। তবে দিবালোক দেখি—এই পরিদৃশ্যমান জগতের মাঝখানে। এ সকল খণ্ড খণ্ড বস্তু না থাকিলে, এ আলোও দেখিতে

পাইতাম কি? এই অন্ধকারে কোনও বস্তু নাই, আঁধারেই আঁধার ডুবিয়া আছে। আর স্রোতের গতিও বুঝি যা' তীরে দাঁড়াইয়া আছে, তা'র সঙ্গে মিলাইয়া, কিংবা যা' ভাসিয়া চলিয়াছে, তা'র প্রতি লক্ষ্য করিয়া। এ স্রোতের তীর নাই, তা'তে কিছু ভাসিয়া যায় না। স্রোতই স্রোতকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রথমে ভয় হইল। ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া আশ্বস্ত হইলাম। তা'র পর ধীরে ধীরে, অতি ধীরে—অতি ধীরে, যেন আমি, এই আঁধার,এই স্রোত, সকলই এক মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। সে শূন্য সকল ভয় নষ্ট করিল। চিরশান্তিতে বিরাম পাইলাম। এ কি সত্য, না স্বপ্ন, কিছুই বুঝিলাম না।

প্রথম দিন

এ ঘুম যখন ভাঙ্গিল, তখন দেখি, এক অপূর্ব্ব নদীকূলে তৃণশয্যায় শুইয়া আছি। চোখ ফিরাইয়া দেখিলাম, এক সরল, সুন্দর, যুবা পুরুষ আমার মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছে। আমার সঙ্গে চোখো-চোখি হইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে হে বাপু?"

আমি। তুমি কে?

সে। আমি যে-ই হইনে কেন, তুমি কে?

আমি। আমি, আমি কে? দেখছ না, আমি মানুষ?

সে। মানুষ ত দেখ্‌ছি। কোন্ দেশের মানুষ?

আমি। কেন? দেখে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি বাঙ্গালী।

সে আমার কথায় হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। "বাঙ্গালীর এই চেহারা? বাঙ্গালীর এই পোষাক?"

আমি। কেন? চিরদিনই ত বাঙ্গালীর এই চেহারা। আর চিরদিনই ত বাঙ্গালীর এই পোষাক।

সে। বাঙ্গালী ত লাঙ্গা মাথায় বেড়ায় না। তোমার টুপী কৈ? আর বাঙ্গালী ত এমন ফিন্‌ফিনে ধুতিও পরে না। এ পোষাক তুমি পেলে কোথায়? আমিও ত বাঙ্গালী।

আমি তখন তাহার কাপড়-চোপড় লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম। সত্যই ত সে যদি বাঙ্গালী হয়, আমি তবে বাঙ্গালী নই। তা'র পরিধানে ধুতি আছে বটে, কিন্তু কোঁচা নাই, কাছা নাই। মাথায় টুপী, টেরিকাটা ।ই। শরীর একটা মেরজাই দিয়া ঢাকা। আমি বলিলাম—"তুমি বাঙ্গালী? তুমি ত খোট্টা।"

সে বলিল,—"অবশ্য আমি যা-ই হই না কেন, তুমি বাঙ্গালী হ'লে, আমি বাঙ্গালী নই, এ কথাটা মানি। তবে বুড়োদের মুখে শুনেছি, এক দিন নাকি বাঙ্গালীর ঐ চেহারা ও ঐ পোষাকই ছিল। আমাদের যাদুঘরে তা'র ছবি আছে।"

আমি চটিয়া উঠিলাম; "তুমি ত বেহদ্দ বেয়াদব দেখছি! আমাকে তুমি কি ভূত না পাগল ঠাওরিয়েছ? যাদুঘর কি আমার জানা নাই? আমিও ত আমার খোঁড়া পুরাণো মূর্ত্তি সকল যাদুঘরে রাখিয়াছি। আমি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির এক জন আদি সভ্য।"

সে তখন আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল,—"মাফ করুন, ও কথা আমি ভাবতেই পারি নাই। ও যুগের মানুষ এ-যুগে বাঁচিয়া আছে, এ যে কল্পনাও করা যায় না।"

আমি। ও-যুগ! এ-যুগ! আমি কোন্ যুগের, আর তুমিই বা কোন্ যুগের? চেহারা দেখে ত তোমাকে আমাদের যুগেরই মনে হয়। তবে কথাবার্ত্তায় বোধ হয়, তুমি ত্রেতাযুগেরই বা হ'বে।

সে। সে ত মহা ভাগ্যের কথা হ'ত। যে যুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্র আর ভক্ত মহাবীর, সে যুগত প্রণম্য। আমরা রামচন্দ্রেরই উপাসক। ভক্তাবতার মহাবীরই আমাদের আদিগুরু।

আমি। তা' বুঝেছি। তোমার মত সব বাঙ্গালীই কি মহাবীরের শিষ্য?

সে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল,—"অমন ভাগ্য হ'ল কৈ?"

আমি। বাঙ্গালী তবে আর কালী-দুর্গার উপাসনা করে না?

সে কাণে আঙ্গুল দিয়া কহিল,—"রাম! রাম! সে যে পৈশাচী ব্যাপার ছিল, শাস্ত্রে পড়িয়াছি। হাজার হাজার ছাগশিশু হত্যা না করলে না কি তা'দের পূজা হ'তো না।"

আমি। তবে তোমরা বলি-টলি উঠিয়ে দিয়েছ?

সে। আমরা অহিংসাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

আমি। সে ত ভালই। কিন্তু ঠাকুর-দেবতার পূজাও কি তুলিয়া দিয়াছ?

সে। ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। আমরা রামচন্দ্র ও মহাবীরেরই পূজা করি। আর কোনও দেবতার পূজা করি না। কালী, দুর্গা প্রভৃতি সকল দেবতাও ত দিন-রাত শ্রীরাম ও শ্রীমহাবীরের ভজনা করেন। ঐ আরতির বাজনা বাজিয়াছে —চলুন আমাদের মন্দিরে দেখবেন, কত ভক্ত-সমাগম।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি তাহার সঙ্গে চলিলাম।

নদীর দিকে চাহিয়া দেখি—কাতারে কাতারে হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার মণের নৌকা সকল নঙ্গর করিয়া আছে। এক-খানাও জাহাজ না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"এত নৌকার বহর, এ নদীতে কি জাহাজ ঢুকে না?"

সে। জাহাজ চালান এ দেশে বন্ধ হইয়াছে।

আমি। তবে বিদেশী মাল আসে কিসে?

সে। আমরা বিদেশী জিনিষ আমদানী করি না। আমাদের দেশে কিসের অভাব? আমাদের যা' কিছু প্রয়োজন, নিজেরাই তৈয়ার করিয়া লই।

আমি। কল-কব্জা ত চাই। এগুলি ত বিদেশ হতেই আসে।

সে। কলকব্জা—সয়তানের ফাঁদ। আমরা কল-কব্জা তৈয়ারও করি না, ব্যবহারও করি না।

আমি। কোনও কলই ব্যবহার কর না? এ কাপড় বুনলে কিসে? তাঁতে ত? সেও ত কল!

সে। না—আমাদের তাঁতটাত নাই। হাতই ভগবান্ দিয়েছেন, হাতেই আমরা সূতা কাটি—

আমি। তোমাদের চরকাও নাই?

সে। শুনেছি, প্রথমে নাকি ছিল। তা'র পর তা-ও উঠে যায়। এই দেখ, আমি হাতে কত সরু সূতা কাটতে পারি।

এই বলিয়া একটা ছোট্ট লাটাই এক টেঁক হইতে বাহির করিয়া ও আর এক টেঁক হইতে একটু তুলা লইয়া, সে আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে দিব্য সূতা কাটিতে লাগিল। আমি তা'র এই অপূর্ব্ব কুশলতা দেখিয়া খানিকটা অবাক্ হইয়া রহিলাম; তা'র পর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সূতা কাটা যেন হাতেই হ'ল। কাপড় বুনাও কি হাতেই হয়?"

সে। হাঁ। হাতেই আমরা কাপড় বুনি।

আমি। দশ বারো হাত লম্বা কাপড় হাতে বুন,—এও কি সম্ভব?"

এবার সে বিস্মিত হইল। "দশ বারো হাত লম্বা কাপড়! অত লম্বা কাপড় আমাদের দেশে নাই। অত লম্বা কাপড় দিয়া কি হবে?"

আমি। কেন? এগার বারো হাত কাপড় নইলে ত স্ত্রীলোকের লজ্জানিবারণ হয় না।

সে। লজ্জানিবারণ? লজ্জা কিসের?

আমি। কেন? নগ্নতার লজ্জা।

সে। নগ্নতা ত বিধাতারই নিয়ম। মানুষ ত নগ্ন হইয়াই জন্মায়। বিধাতা ত তাহাকে পোষাক পরাইয়া সংসারে পাঠান না? কাপড় দিয়া শরীর ঢাকিয়া লজ্জা নিবারণ কর্ত্তে হ'বে তবে কেন?

আমি। তবে তোমরা কি কাপড় পর না?

সে। পরি। শীত নিবারণের জন্য। স্বাস্থ্যের খাতিরে।

আমি। গরমের দিনে তবে তোমরা কাপড় পর না?

সে। পরি। গরম হাওয়া গায়ে লাগিলে স্বাস্থ্য-হানি হয়, এই জন্য।

আমি। তোমার মাথার টুপীটা তবে পরেছ কেন?

সে। ওটা আমাদের জাতীয়তার নিদর্শন। ঐ টুপীতেই আমরা কোন্ দেশের, কোন্ জাতির, ইহা জানা যায়।

আমি। আর ঐ কটিবস্ত্র?

সে। ঐটেই আমাদের প্রাচীন সংস্কারের শেষ চিহ্ন এখনও আছে।

আমি। ঐটুকুও বুঝি ক্রমে খ'সে পড়বে?

সে। তা ত বটেই। তখনই আমরা সিদ্ধি লাভ করব। বিধাতা যেমন সৃষ্টি করেছেন, সেই ভাবেই বেড়ে উঠব ও সংসার করব।

আমি। স্ত্রীলোকেরাও কি কাপড়-চোপড় পরেন না?

সে। অনাবশ্যক কাপড়-চোপড় পরেন না।

আমি। তাঁ'রাও কি কৌপীন এঁটে থাকেন?

সে। কটিবস্ত্র ছাড়া তাঁ'রাও আর কাপড় পরেন না। তবে শীতাতপ নিবারণের জন্য সময় সময় গায়ের কাপড় দরকার হয় বটে, চার পাঁচ হাত কাপড়েই সব চলে। আর আমরা হাতেই এ কাপড় বুনতে পারি। ঐ দেখুন, এক জন কাপড় বুনতে বুনতে এ দিকে আসছে।

চাহিয়া দেখলাম, আমাদের গ্রাম্য জেলেরা যেমন করিয়া হাতে জাল বুনে, ঠিক তেমনই এ ব্যক্তি হাতে কাপড় বুনিতেছে; বলিলাম, "তোমরা তবে চরকাও তুলিয়া দিয়াছ, তাঁতও তুলিয়া দিয়াছ।"

সে। বিধাতা মানুষকে যে সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়াছেন, তা'র বেশী কোনও কলকৌশলের তা'র প্রয়োজন নাই,—হতেই পারে না। সে বিধাতার প্রতিকূলতা করিয়াই যত কলকব্জার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা সংসার হ'তে এ সকল সয়তানের ফন্দি তুলিয়া দিয়াছি।

আমি। তোমরা দেশদেশান্তরে যাতায়াত কর কিসে? জাহাজ ত তুলিয়া দিয়াছ দেখছি। রেলও কি ভাঙ্গিয়া দিয়াছ?

সে। রেলগাড়ী নাকি এক দিন এ দেশে ছিল। এখন তা'র চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

আমি। তোমরা দেশবিদেশে যাতায়াত কর তবে কিসে?

সে। কেন? পায়ে হেঁটে।

আমি। পায়ে ত আর তাড়াতাড়ি যাতায়াত চলে না!

সে। তাড়াতাড়ির প্রয়োজন কি? যত দিনরাত্রি কেবলই দৌড়াদৌড়ি করবে, তত আয়ুক্ষয় হ'বে। কলকব্জা যখন ছিল, তখন তা'রাও ত বলত যে, যে কল যত চলে, তা' তত শীগগির নষ্ট হয়ে যায়।

আমি। ব্যবসাবাণিজ্য চলে কিসে?

সে। বাণিজ্যেরই বা প্রয়োজন কি? যা'র যা প্রয়োজন, সে যদি নিজেই তাহা উৎপন্ন বা তৈয়ার করে, তবে তা'র ত আর বিদেশ হ'তে কোনও জিনিষ আমদানী করতে হয় না।

আমি। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এ প্রাচীন কথাটাও কি মিথ্যা?

সে। বাণিজ্যে লোককে নিঃস্ব করে, তাও ত শুনেছি। এককালে আমাদের কত বাণিজ্য ছিল, বিদেশ হ'তে কত কোটি কোটি টাকার জিনিষ আসত, এ দেশ হ'তে কত কোটি কোটি টাকার জিনিষ বিদেশে যেত, কিন্তু দেশের লোক লাখে লাখে না খেয়ে তবুও মর্‌তো। তা'রই জন্য ত আমরা এ সকল আমদানী রপ্তানী বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

আমি। কেবল বেসাতি নয়, বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে এক দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাস্ত্র-সাহিত্য, শিল্প ও ললিতকলাও অন্য দেশের লোক পায়। বাণিজ্য-স্রোত বন্ধ হ'লে সভ্যতার বিকাশও যে বন্ধ হয়ে যায়।

সে। শুনেছি, সভ্যতা ব'লে একটা ভূত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পেয়ে বসেছিল। আমরা সে ভূতের উপদ্রব হ'তে রক্ষা পেয়েছি। চল, একবার আমাদের দেশটা কেমন হয়েছে, আমরা কিরূপে চলি-ফিরি, খাই-দাই, দেখ। তা'র পর বলিও, আমরা সেকালের লোকের চাইতে বেশী সুখী কি না।

প্রথমেই লক্ষ্য করিলাম যে, এই ব্যক্তির পায়ের পেশী অতিশয় পুষ্ট, তা'র গতি দ্রুত, অথচ তা'তে তা'র কোনই ক্লান্তি জন্মাচ্ছে না। আমি ত দু' চার পা যাইয়াই হাঁপাইয়া পড়িলাম। একটু যেতে না যেতে কাতর হইয়া বলিলাম, "তোমার সঙ্গে আমার চলা সম্ভব নয়। তোমাদের কি কোনও গাড়ী-টাড়ী নাই?"

সে বলিল,—"আছে। সে কেবল রোগী, আতুর ও খঞ্জের জন্য। কিন্তু আমাদের বড় রোগ-বালাই নাই। আর আতুর বা খঞ্জও কচিৎ দেখা যায়।"

আমি। তোমরা এমন নীরোগ হ'লে কিসে?

সে। আমরা স্বভাবের নিয়ম পালন ক'রে এত নীরোগ হয়েছি।

আমি। আর অন্ধ, খঞ্জ, আতুর এ সকলও অত কমাইলে কিরূপে ?

সে। ঐ পথে চলিয়াই।

আমি। তোমরা স্বভাবটা কাকে বল, বুঝতে পাচ্ছি না।

সে। অতি সোজা কথা। বিধাতা মানুষকে যে ভাবে সৃষ্টি করেছেন, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে রেখে-ছেন, ঠিক সেই ভাবে, সেই অবস্থার সঙ্গে সমন্বয় ক'রে সে সকল নৈসর্গিক নিয়মের বশ্যতা স্বীকার ও তাহার ইঙ্গিত নিয়ে চলিতে পারিলেই স্বভাবের নিয়ম রক্ষা করা হয়।

আমি। বন্য পশুরাও ত ঐ ভাবেই চলে। মানুষ তবে শ্রেষ্ঠ হ'ল কিসে ?

সে। শ্রেষ্ঠ কে বল্লে ? তোমাদের আগেকার সভ্য মানুষের চাইতে বনের পশুই শ্রেষ্ঠ ছিল। তা'রা নিজেদের প্রকৃতিকে মানিয়া চলে। সভ্য মানুষ এই প্রকৃতির বিপর্য্যয় করিয়া পশু হইতে নিজেকে বড় করিতে চাহিয়াছিল। পারিয়াছিল কি ?

আমি। অবশ্য। সভ্য মানুষ প্রকৃতির দাস নহে। প্রকৃতির শক্তিকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাই ত সভ্যতার প্রমাণ।

সে। আর স্বল্পায়ু তাহার ফল। নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি এই সভ্যতার মারাত্মক ফশল। এ কথাও ত পুরাণ-কাহিনীতে পড়িয়াছিল।"

আমি। তা বটে। কিন্তু আবার ঐ সভ্য মানুষই এ সকল রোগের ঔষধও আবিষ্কার করিয়াছে।"

সে। আমরা স্বভাবের অনুবর্ত্তী হয়ে রোগের বীজই নষ্ট করিয়াছি। কোন্‌টা ভাল ? তোমাদের সভ্যতার অন্যান্য বস্তু ও বিষয়-ব্যবস্থার মত, ভিষক্‌বিদ্যা ও ভৈষজ্য-ব্যবসায়ও সয়তানের ফাঁদ ছিল। তোমাদের হাঁসপাতালগুলি পাপের প্রতিষ্ঠান ছিল না কি ? এই সকলে বিধাতার নিয়মের প্রতিকূলতা করিয়া, পবিত্র সংসারকে পাপের ক্রীড়াস্থল করিয়া তুলিয়াছিল।

আমি রোগের প্রতীকার করা কি ঈশ্বরের সেবা নয় ?

সে। ঈশ্বরের বিদ্রোহী হইয়া ঈশ্বরের সেবা— অদ্ভুত ভক্তি বটে !

আমি। তোমার কথার অর্থ বুঝিলাম না।

সে। অতি সোজা। রোগ হয় স্বভাবের নিয়ম ভাঙ্গিলে ; রাজার আইন ভাঙ্গিলে যেমন রাজদণ্ড ভোগ করতে হয়। রোগ পাপের শাস্তি। রাজার আইন ভাঙ্গিবার জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অপরাধীর উপর যে দণ্ড বিহিত হয়, সে দণ্ড হইতে তাহাকে জোর করিয়া রক্ষা করা কি রাজদ্রোহিতা নহে ? তবে ঈশ্বরের দণ্ড হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে যাওয়াই বা ঈশ্বরদ্রোহিতা হইবে না কেন ?

আমি। রোগ হইলে তোমরা তবে কোনও চিকিৎসা করাও না ?

সে। না। কেবল যাহাতে রোগী আর ভবিষ্যতে স্বভাবের নিয়ম না ভাঙ্গে, তাহাকে সেইরূপ উপদেশই দেওয়া হয়, এবং সেইরূপ শাসনে ও সাধনে তাহাকে চালান হয়।

আমি। তাতেই কি সকল রোগী আরোগ্য হয় ?

সে। কেউ হয়, কেউ হয় না।

আমি। কেউ ত মরেও। তা'রও কোন ত প্রতী-কার তোমরা কর না।

সে। 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।' মানুষ ত অমর নয়, এক দিন ত সে মরিবেই। স্বভাবের নিয়মে সে জন্মায়, স্বভাবের নিয়মে সে বাঁচিয়া থাকে। স্বভাবের বশেই কাল পূর্ণ হইলে সে মরে। সে জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে কি ?

আমি। অকালমৃত্যু ত আছে ?

সে। যতটা পারা যায়, আমরা অকালমৃত্যু বন্ধ করিয়াছি।

আমি। কিরূপে করেছ ?

সে। স্বভাবের বশবর্ত্তী হয়ে।

আমি। স্বভাবের কি কি নিয়ম তোমরা প্রবর্ত্তিত করেছ ?

সে। সব নিয়ম। প্রথম খাদ্যাখাদ্যবিষয়ে।

আমি। তবে তোমরা খাদ্যাখাদ্যের বিচার কর ?

সে। করি না? তবে স্বাস্থ্য, শক্তি, সৌন্দর্য্য, আয়ু লাভ করি কিসে?

আমি। খাদ্যাখাদ্যের নিয়ম কি?

সে। আমরা শাক্-সব্জী, ফলমূলাদি ব্যতীত আর কিছু খাই না।

আমি। ঘি-দুধও নয়?

সে। প্রায় নয় বলিলেই চলে। শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান করে। আর কোথাও কোথাও আমাদের ভক্ত সাধকরা বৎসতরীর পরিপূর্ণ উদরপূর্ত্তির পরে যদি গাভীর বাঁটে কিছু দুধ পাওয়া যায়, তাহা পান করিয়া থাকেন। নতুবা আমরা ঘি-দুধ ব্যবহার করি না। কেহ কেহ বা বাছুরের মুখ হইতে যে ফেন পড়ে, তাহাও সংগ্রহ করিয়া পান করেন।

আমি। খাদ্যাখাদ্যের আর কি নিয়ম আছে?

সে। আমরা যতটা পারি, শাক্‌সব্জী প্রভৃতিও কাঁচাই খাইয়া থাকি। শুনিয়াছি, প্রাচীনকালে রন্ধন বলিয়া একটা কলা-বিদ্যা ছিল। রাজাদের পাকশালে সুপকাররা দিনরাত নানা প্রকারের সুখাদ্য রন্ধন করিয়া নিজেদের প্রভুদের সেবা করিতেন। আমাদের মধ্যে সেরূপ হয় না।

আমি। মিষ্টান্ন?

সে। অন্ন জানি। মিষ্টান্ন আবার কি?

আমি। যেমন সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়া, পান্তুয়া, ক্ষীরমোহন প্রভৃতি।

সে। এ সকলের খোঁজ আমরা জানি না। ইক্ষু-দণ্ড ছাড়া আর কোনও মিষ্টরসের স্বাদ আমরা জানি না। আর কোনও কোনও সুমিষ্ট ফল আছে, তাহাও আমরা আদর করিয়া থাকি।

আমি। মধু?

সে। মধুমক্ষিকারাই ত মধু সংগ্রহ করে। তাহাদের খাদ্য আমরা হরণ করি না।

আমি। লুচি, নিম্‌কি, এও কি নিষিদ্ধ?

সে। এগুলি কি?

আমি। আটা ঘিয়ে ভাজিয়া লুচি, নিম্‌কি তৈয়ার হয়।

সে। আমরা কোনও খাদ্যই ভাজিয়া খাই না। আইনে নিষিদ্ধ।

আমি। গম-যবাদি খাও না?

সে। খাই বৈ কি। গমের ও যবের ছাতু আমাদের অতি প্রিয় খাদ্য।

একটা পুরান ছেলেবেলাকার গান মনে পড়িল। আমি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলাম:—

ওহে লুচিনাথ! কেমন কঠিন তুমি কচুরী!
ওহে ছানা, পূরাও বাসনা,
চিনিতে মাখিয়ে তোমায় বদনে ভরি!
পানিতাওয়ার শিরে দিয়ে হাত,
কি বোল্ বলিয়ে গেলে ওহে গজা-নাথ!
তোমারি লাগিয়ে, পাতেতে পড়িয়ে,
কাঁদিতেছে কাঁচাগোল্লা সুন্দরী॥
ওহে লুচিনাথ! কেমন কঠিন তুমি কচুরী!

সে। ও কি কর? এখনই তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।

আমি। অপরাধ?

সে। ভজন ছাড়া, এ রাত্রিতে আর কোনও গান গাওয়া নিষেধ।

আমি। তা' বেশ, একটা ভজনই গাই তবে—

সদা কালী, কালী, কালী ব'লে ডাক রে রসনা।
বেদাগমে শিব-উক্তি, ডাক রে মন মহামুক্তি,
নিতান্ত জেনেছি রে মন, শমনভয় আর রবে না।"

সে। কি কর? কি কর? আমাকেও দেখ্‌ছি বিপদে ফেল্‌বে।

আমি। কেন? এ ত ভজন বটে।

সে। যে সকল দেবতার পূজায় প্রাণিহিংসা হতো, তা'দের ভজন নিষিদ্ধ।

আমি। বলিই যেন বন্ধ হয়েছে। নাম নিলে ক্ষতি কি?

সে। আমাদের ভয়, কি জানি লোক যদি ঐ নাম শুনে ক্ষেপে উঠে ও আবার তাদের পূজা সুরু করে।

আমি। তবে তোমরা কা'র পূজা কর?

সে। আমরা বৈষ্ণব, কৃষ্ণোপাসক।

আমি। তোমাদের মধ্যে কি কৃষ্ণোপাসক ছাড়া আর কোনও সম্প্রদায় নাই?

সে। আছে। শাক্তও আছেন। তাঁ'রা গণেশ-জননীর পূজা করেন।

আমি। শ্রীকৃষ্ণ ত বিষ্ণু, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী।

সে। ও শ্রীকৃষ্ণকে আমরা চিনি না। তাঁ'র ভজনা আমরা করি না। আমরা গোপবেশ বেণুকর শ্রীকৃষ্ণেরই ভজনা করি। চল না, আরতির সময় এল ব'লে। মন্দিরে চল, দেখবে আমাদের পূজা-পদ্ধতি সকলই।

নদীতীর ধরিয়া তার সঙ্গে চলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ নদীর নাম কি?"

সে। গঙ্গা।

আমি। গঙ্গা? এ কোন্ গঙ্গা?

সে। কেন? গঙ্গা কি আবার দুই আছে না কি?

আমি। একই গঙ্গা নানা নামে নানা দেশ দিয়া প্রবাহিত। তোমাদের এ গ্রামের নাম কি?

সে। বৈরাজ নগর।

আমি। নগরের ত কোন লক্ষণই দেখ্‌ছি না। কেবলই ত মাঠ, ধানক্ষেত ও বাগান। তোমাদের নগরটা কত দূরে? এ উপকণ্ঠ হবে?

সে। আমরা একেই নগর বলি। এ নগর নয় কেন?

আমি। নগরে প্রাসাদ থাকে, পাকা ইমারত থাকে, বাজার-বন্দর থাকে; কত লোকসমাগম হয়, পথে মানুষের ভীড় ঠেলিয়া চলিতে হয়; কত গাড়ী-ঘোড়া চলে; কত পুলিস পাহারা। এ সকলের ত কিছুই দেখ্‌ছি না।

সে হাসিয়া কহিল,—"আমি ভুলে যাচ্ছিলাম, আপনি এ যুগের মানুষ নন। আপনার যুগে তাই ছিল বটে। কিন্তু আমরা ওসব ওলট-পালট করিয়া দিয়াছি। এখানেও বুড়োদের মুখে শুনেছি, আপনাদের যুগে একটা বড় নগরই ছিল। তখন গঙ্গার দুধারে সারি সারি জাহাজ ভাসত। দু'তীরে আকাশভেদী গুদাম সকল ছিল। তাহাতে দেশবিদেশের পণ্যজাত এসে জমা হ'ত। পাকা প্রশস্ত রাস্তা ছিল। গাড়ী-ঘোড়া ত চল্‌তই, তা' ছাড়া হাজার হাজার কলের গাড়ী ছুটাছুটি করত, আর কত লোক তা'র চাকার নীচে পড়িয়া মরিত।"

আমি। বটে! সে নগরীর নাম কি ছিল, জান?

সে। শুনেছি—সেকালের লোক একে কলিকাতা কহিত।

আমি। কলিকাতা? এই সেই কলিকাতা? আমার সাধের কলিকাতা? মিথ্যা কথা।

সে। মিথ্যা বল্‌ব কেন? ফায়দা কি? মিথ্যা কাকে বলে, আমরা জানি না। লোকে মিছা কথা কয় শুনেছি, হয় লোভে না হয় ভয়ে। আমাদের লোভ নাই। কারণ, অভাব অতি অল্প। ভয় নাই; কারণ, আমরা এ সংসারে কাউকে হিংসা করি না বলিয়া—আমাদের কোনও শত্রু নাই। এই সেই পুরান যুগের কলিকাতা। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, চলুন, আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ প্রপিতামহের নিকটে লইয়া যাই, তিনি পুরাণেতিহাস সব জানেন। তাঁ'র মুখে সব শুন্‌বেন।

আমি। কলিকাতা? তবে গঙ্গার উপরে পোল কৈ?

সে। শুনিয়াছি বটে, একটা অদ্ভুত পোল ছিল। সেটা ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিদেশের সঙ্গে সব ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হ'লে, আর সে পোল মেরামত হ'তে পারে নি। তা'র সাজসরঞ্জাম আমাদের দেশে তৈয়ার হয় না। সে পোলের একটা স্মৃতিচিহ্ন এখনও আছে। ঐ যে একটা উঁচু যায়গা দেখ্‌ছেন, ওটাই সে পোলের আরম্ভ ছিল। লোকে ইহাকে এখন সয়তানের ঢিপি বলে।

আমি। এই একটা পাকা পড়ো বাড়ী দেখ্‌ছি। এটা যে তোমরা রেখেছ। এটা ত আমাদের বড় ব্যাঙ্ক ছিল মনে হয়।

সে। এটা আমাদের পাগলা-গারদ। বেশী লোক ইহাতে নাই। দু'পাঁচ জন উন্মাদ এখনও আমাদের মধ্যে যা'রা আছে, তা'দের আমরা ঐখানেই রাখি। বস্তুতঃ এর নাম নাকি আগেই পাগলা-গারদ হয়েছিল। তখন যা'রা টাকা টাকা করিয়া উন্মাদ হইয়া বেড়াইত, ঐটা তাহাদের আড্ডা ছিল।

আমি। এখন তোমাদের ব্যাঙ্ক নাই?

সে। ব্যাঙ্ক কাকে বলে?

আমি। জান না? যেখানে রাজসরকারের ও দেশের ধনীদের টাকা মজুত থাকে, তাকেই ত ব্যাঙ্ক বলে।

সে। আমরা টাকা মজুত করি না। টাকার চলনই এ দেশে নাই।

আমি। রাজার ত টাকা আছে।

সে। আমাদের কোনও রাজা নাই।

আমি। রাজ্য শাসন করে তবে কে?

সে। শাসন কাকে বলে, আমরা জানি না।

আমি। দুষ্টের দমন করে কে? শিষ্টের পালনই বা করে কে? সমাজ-ধর্ম্ম ও সমাজ-স্থিতি রক্ষা হয় কিসে?

সে। ধর্ম্ম স্বয়ং ধর্ম্মকে রাখেন। আর স্বভাবের নিয়মে সকলেই শাসিত বলিয়া রাজশাসনের কোনও প্রয়োজন আমাদের নাই। স্বভাবের নিয়ম ভাঙ্গিলে স্বভাবই শাস্তি দেন। স্বভাবের নিয়ম প্রতিপালন করিলে, স্বভাবই তাহাকে রক্ষা করেন ও পালন করেন।

আমি। তাই ত, এতক্ষণ চল্‌ছি, এক জনও ত পুলিস পাহারা বা সিপাই-সান্ত্রী দেখ্‌লাম না।

সে। আমরা পুলিস পাহারা কাদের বলে, জানি না। সিপাই-সান্ত্রীও কোনও দিন দেখি নাই।

আমি। চোর-ডাকাতের উপদ্রব হ'তে তোমাদের রক্ষা করে কে?

সে। চোর-ডাকাত? আমাদের দেশে চোর-ডাকাত নাই।

আমি। বল কি? অমন অদ্ভুত কথা ত শুনি নাই। সত্যযুগে নাকি এরূপ ছিল, —পুরাণে বলে।

সে। লোক চুরি করে লোভে। লোভ হয় অভাবে। আমাদের ত অভাব অনটন নাই, কাযেই লোভ নাই। চুরি করারও প্রয়োজন হয় না।

আমি। তোমরা সবাই কি যা' চাও, তা' পাও?

সে। এ'কে যা' পায়, অপরেও তাহা' পায়। সবাই খেতে পায়।

আমি। খাদ্য ত কিন্‌তে হয়!

সে। কেনা-বেচা এখানে নাই। যা'র যখন যা' প্রয়োজন, সে তাহা অমনি পায়।

আমি। কেউ ত তাহা উৎপাদন বা আহরণ করে। যে যাহা উৎপাদন করে, তাহা' ত তা'রই সম্পত্তি হয়। সে বিনামূল্যে অপরকে তা দিবে কেন?

সে। দেয় কি না দেয়, চলুন, এখনই দেখ্‌বেন। বেলাও ত হয়েছে। আপনার অবশ্যই ক্ষুধাও পেয়েছে।

আমি। তা' পেয়েছে বটে। কিন্তু পেটের ক্ষুধার চাইতে আমার মনের ক্ষুধাটা বেশি হয়েছে। আমি তোমাদের কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আচ্ছা—তোমাদের কোনও ট্যাকস বা খাজানা-টাজানা দিতে হয় না?

সে। না।

আমি। তবে রাজ্য চলে কিসে? শাসনের ত একটা খরচ আছে।

সে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের কোনও শাসনই নাই। তা'র আবার খরচ কি তবে? কিতাবে পড়েছি, আগে লোকে ট্যাক্‌স দিত। রাজা বা রাজ-পুরুষরা সেই ট্যাক্‌স আদায় করিতেন। আর সেই ট্যাক্‌সের বেশি ভাগই পুলিস পাহারার ও সিপাই-সান্ত্রীর জন্য খরচ হইত। আমাদের যখন পুলিস পাহারা নাই, সিপাই-শান্ত্রী নাই, অস্ত্র-শস্ত্র নাই, তখন রাজ্যের খুব বড় যে খরচটা, তাহাই কমিয়া গিয়াছে। তা'র পর এই রাজস্ব আদায় করতেই কত না খরচ হ'ত! বিচারকদের মাহিয়ানা ও তা'দের দপ্তরের জন্য কত খরচ হ'ত! এ সকল কিছুই আমাদের নাই। রাজ্যের তবে আর খরচ কি? খরচ যখন নাই, রাজস্বেরই বা প্রয়োজন কি? ট্যাক্‌সই বা তুলিব কেন? আগেকার সব সংস্কার নষ্ট না হ'লে আমাদের এ বৈরাজনগরীর কোনও কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।

একটু এগিয়েই একটা বাগান দেখিলাম। চারিদিকে নানা ফলের গাছ। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি। আম-জামের সময় নয়। কলা কাঁদি কাঁদি গাছে ঝুলিতেছে। শশা মাচায় ঢুলিতেছে। ক্ষেতে মুলাশাক সবে মাথা তুলিতেছে। কচি বেগুণ ধরিয়াছে। মাঝখানে বিস্তৃত পুকুর; পরিষ্কার জল, নীচের মাটী পর্য্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু পাড় এত উঁচু যে, ঐ জলে নামিবার উপায় নাই। মাঝখান পর্য্যন্ত একটা লম্বা কাঠ সাঁকোর মত হইয়া গিয়াছে। ঐ সাঁকোর উপর দিয়া মালী যাইয়া জল তুলিয়া আনিতেছে ও পিপাসিত যা'রা, তা'দের ঢালিয়া দিতেছে।

ইহারই একটু দূরে আর একটা জলাশয়; সে জলেও কেউ নামে না। তীর হইতে দড়ি দিয়া জল তুলিয়া হাত-মুখ ধুইয়া লইতেছে। মাঝে মাঝে বিশাল বটগাছ সকল। ঐ বটচ্ছায়ায় বসিয়া লোকরা যথেচ্ছ মুলা, বেগুণ ও কাঁচা-পাকা কলা খাইতেছে। যা'র যাহা প্রয়োজন, মালী আনিয়া দিতেছে। কেহ বা নিজেরাই পাড়িয়া বা উপড়াইয়া যাহাতে রুচি, তাহা খাইতেছে।

এখানে একটা স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, মসৃণ মর্ম্মর-রচিত মঞ্চে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলাম। তা'র পর দু'চারিটি সুপক্ক কদলী ভক্ষণ করিয়া, কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে, আবার এই অপূর্ব্ব "নগরী" দেখিতে বাহির হইলাম।

এতক্ষণ ধরিয়া পথে বা এই বিশ্রামোপবনে একটিও স্ত্রীলোক দেখিতে পাই নাই। তাই পথে বাহির হইয়াই আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তোমাদের এই নগরে একটিও স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম না। ইহার কারণ কি? তোমাদের স্ত্রীলোকেরা কি অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে? আর সে অন্তঃপুরই বা কই?"

সে কহিল,—"অবরুদ্ধ থাকিবে কেন? আমাদেরই মত তা'রাও স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে তা'দের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়।"

আমি। তা'দের রাজ্য? সে আবার কি? স্ত্রীলোকদের কি আর একটা রাজ্য আছে? এটা কি পুরুষের রাজ্য?

সে। ঠিক তা' নয়। তবে আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষরা সর্ব্বদা একত্র বাস করে না। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়।

আমি। ব্রহ্মচর্য্য? সংসারাশ্রমে আবার ব্রহ্মচর্য্য কি?

সে। জাতির শক্তি, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইলে সকল আশ্রমেই ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন হয়।

আমি। সংযমের প্রয়োজন বুঝি; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য আর সংযম ত এক বস্তু নয়।

সে। ব্রহ্মচর্য্যেই প্রকৃত সংযমের প্রতিষ্ঠা।

আমি। তোমাদের সমাজে কি পরিবার বলিয়া কোনও কিছু নাই? পিতামাতা পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া একত্র বাস করেন, পতি-পত্নী মিলিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন ও তাহাদের শিক্ষাদির ব্যবস্থা করেন, এ সকল পদ্ধতি কি উঠিয়া গিয়াছে?

সে। এ ত অনাচার ও স্বেচ্ছাচার। একে আবার পদ্ধতি বলিব কিসে?

আমি। তোমাদের পদ্ধতিটা কি?

সে। শুনিয়াছি, এককালে ঐরূপ ব্যবস্থাই ছিল। ইহার ফলে সমাজে জনসংখ্যা অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে। কোথাও কোথাও এ সকল জনগণের বাসস্থানের ও খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ফলে মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া সমাজের লোকক্ষয় করিয়া, সমাজকে বাঁচাইয়া রাখে। আবার কোথাও বা এই লোকসংখ্যার বাস ও খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য অন্য দেশ আক্রমণ ও দখল করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এইরূপে সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্ব্বদাই লাগিয়া ছিল। এই জন-বৃদ্ধির সমস্যা অতিশয় বিষম ও ভয়ানক হইয়া উঠে। চারিদিকে বংশবৃদ্ধির হার হ্রাস করিবার নানা চেষ্টা হয়। পশ্চিমদেশে নাকি ম্যাল্‌থাস্ নামে এক পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথমে এই সমস্যার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা প্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরাও এই পথ ধরিয়াই এই বিষম সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম ব্যতীত আর কোনও পথে ইহার সমাধান অসম্ভব ও অসাধ্য দেখিয়া, আমাদের এক তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ এই বিধান প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি দেখিলেন, প্রাচীন বিবাহ-প্রথা যত দিন রহিবে, তত দিন—

আমি। তোমাদের মধ্যে কি তবে বিবাহপ্রথা নাই?

সে। প্রাচীনরা যেরূপ বিবাহ করিতেন, সেরূপ বিবাহ আমাদের নাই। ও পথে আদর্শ নাগরিকের উদ্ভব অসম্ভব।

আমি। তবে তোমাদের বিবাহের রীতিটা কিরূপ?

সে। শুনিয়াছি, পুরাকালে একটি পুরুষ এক বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া আমরণ একত্র বসবাস করিত। এই ভাবেই প্রজোৎপত্তি ও সমাজস্থিতি রক্ষা পাইত।

কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্যলীলার ফলে বংশবৃদ্ধির বেগ অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে। ইহাতে এক দিকে যেমন বংশবৃদ্ধি অতিমাত্রায় চলিতে লাগিল, অন দিকে শিশু-মৃত্যুও বাড়িয়া উঠিল। ফলে জনসংখ্যা স্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়া ত দূরের কথা, ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া মনুষ্যসমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এক তত্ত্বদর্শী ঋষি এই আসন্ন বিনাশ হইতে জনসমাজকে বাঁচাইবার জন্য এই নূতন ব্যবস্থা করিয়া যান। আমরা তাঁহারই নির্দ্ধারণ অনুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।

আমি। তিনি কি ব্যবস্থা করিলেন?

সে। তিনি দেখিলেন, পুরাতন পরিবার-প্রথা নষ্ট না হইলে, মানুষের বৃত্তি কদাপি সংযত হইবে না। সুতরাং যাহাতে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর হইতে সচরাচর পৃথক হইয়া রহে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জন্মিবা-মাত্রই আমাদের সমাজে বালক-বালিকাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা হয়।

আমি। কি ভয়ানক কথা?

সে। ভয়ানক কি?

আমি। পিতামাতার বাৎসল্য, ভাই-ভগিনীদের সখ্য, পরিবার-পরিজনের সেবা ও সাহচর্য্য—এগুলির দ্বারাই ত মানুষ—মানুষ কেন, দেবতা হইয়া উঠে! এগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া মনুষ্যত্ব থাকে কৈ?

সে। এ সকলই শারীর সম্বন্ধ। আত্মার রাজ্যে এ সকল মনুষ্যত্ববিকাশের সহায় নয়, অন্তরায়ই হইয়া থাকে।

আমি। যাক্। তোমাদের এ গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব বুঝি না। কিন্তু তোমরা সংসারস্থিতি রক্ষা কর কিরূপে, তাই জান্‌বার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি।

সে। আচ্ছা, এই বিশাল জীবরাজ্য রক্ষা পায় কিসে? উদ্ভিজ্জগতে বা অপর প্রাণিসমাজে ত এরূপ পরিবারের ব্যবস্থা নাই। তা'দের মধ্যে জীবস্থিতি রক্ষা পায় কিরূপে?

আমি। মানুষ কি তা'দেরই মত?

সে। মানুষ নিজেকে যদি নিজে নষ্ট না করিত, তবে অন্য প্রাণিসমাজে যে বিধান, মনুষ্যসমাজেও সেই বিধানই থাকিত। আচ্ছা, ভাবিয়া বলুন ত, পরিবারের উৎপত্তি হইল কিসে? অসহায় শিশুজীবন রক্ষা করি-বার জন্য নয় কি? আর এই প্রয়োজন হইল, অপরের আততায়িতার জন্য নয় কি? কেউ যদি কাউকে হিংসা না করে, বিশ্বময় যদি বিশ্বজনীন মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে একের অন্যের উপরে ত এই আততায়িতা থাকিবে না। তখন যত কেন অসহায় হউক না, কেউ ত তাহাকে হিংসা করিবে না। আর সে অবস্থায়, শিশু-জীবন রক্ষা করিবার জন্য পরিবার বান্ধিয়া স্ত্রীপুরুষের সহজ স্বাধীনতা নষ্ট করারও ত কোনই প্রয়োজন থাকিবে না। আমরা এই সার্ব্বজনীন অহিংসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি বলিয়া আমাদের সমাজে পুরাতন পরিবারবন্ধন রক্ষা করা অনাবশ্যক হইয়াছে। প্রাচীন বিবাহপ্রথাও উঠিয়া গিয়াছে।

আমি। বিবাহ নাই, স্ত্রীপুরুষেরা আজন্ম পরস্পর হইতে পৃথক রহে, তবে তোমাদের সমাজধারা রক্ষা হয় কিসে?

সে। আচ্ছা, এই যে আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে এই শরৎসমাগমে বালিহাঁস উড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে কি বিবাহ-প্রথা বা পরিবারবন্ধন আছে?

আমি। নাই।

সে। তবে তা'দের মধ্যেও বংশধারা রক্ষা হয় কিসে? আবার ঐ দিকে দেখুন—ঐ যে কুক্কুর-কুক্কুরীরা কেমন আনন্দে এই শরৎসমাগমে পরস্পরের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতেছে. এ ও'র সঙ্গে ক্রীড়া করি-তেছে, একে অন্যের অঙ্গে বেদনাহীন দন্তাঘাত করিতেছে, তা'দেরও মধ্যে ত পরিবারবন্ধন বা বিবাহপ্রথা নাই, অথচ তা'দের বংশধারা রক্ষা হয় কিসে? আবার দেখুন —ঐ পক্ষিমণ্ডলে বা এই সারমেয়সমাজে মানুষের মত প্রজাবৃদ্ধির বিষম সমস্যাও বোধ হয় কখনও ওঠে নাই। অথচ তা'রা ত নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের বংশবৃদ্ধির মাত্রা কমাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে নাই। প্রকৃতি-মাতা অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁহার এই সুন্দর সৃষ্টিকে আপনি রক্ষা করিতেছেন। আমরাও এই স্বভাবের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই, মানুষগড়া পরিবার বা বিবাহ-প্রথা ব্যতীতও আমাদের সমাজস্থিতি রক্ষা করিতেছি।

আমি। নিম্ন শ্রেণীর জীবজগতে প্রজননের এক একটা বিশিষ্ট কাল আছে। মনুষ্যসমাজে ত সেরূপ কিছুই নাই।

সে। আমরা তাহাই প্রবর্ত্তিত করিয়াছি।

আমি। এ আবার কি?

সে। চলুন, ক্রমে সবই স্বয়ং দেখিয়া সকল সমস্যার মীমাংসা ও সকল সন্দেহের নিরসন করিতে পারিবেন।

কিয়ৎকাল উভয়ে ইহার পর নীরব হইয়া রহিলাম। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমরা birth control করিবার কত চেষ্টা করিতেছি, এই বিষম সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কত না মাথা ঘামাইতেছি, কিন্তু ইহারা এত সহজে ইহার অমন মীমাংসা করিল কিরূপে? এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় সে আবার কহিতে লাগিল,—"দেখুন, প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের এই নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ এই শরীরটাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল। আত্মার জ্ঞান তা'র জন্মে নাই, বা কোনও দিন জন্মিয়া থাকিলে, একেবারে নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আর এই যে শরীরের প্রতি মমতা, ইহারই জন্য প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ঐরূপ হইয়াছিল। বিবাহের মুখ্য প্রয়োজন প্রজনন। প্রাচীনদের বিবাহপদ্ধতিতে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইত কি? আর কেবল প্রজোৎপত্তি নয়, সুস্থ, সবল, সুন্দর, দীর্ঘায়ুঃ নাগরিকোৎপত্তি হইত কি? মশকের মত মানুষ-শিশু পালে পালে জন্মাইত, আর মশকের মত মরিয়া যাইত। আমরা সে সকল বন্ধ করিয়াছি। কৃত্রিম উপায়ে নয়, স্বভাবের নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া।

আমি। তোমাদের নিয়মটা কি?

সে। প্রথমতঃ দেখুন, বৎসরের দুই ঋতুতে জীবকুল প্রজননের প্রেরণা অনুভব করে,—শরতে আর বসন্তে। সুতরাং বৎসরে দুইবার আমাদের দুইটা প্রজননোৎসব হয়; এক শারদীয় শুক্লপক্ষে, আর এক বাসন্তী শুক্লপক্ষে। এখন শারদীয় উৎসবের সময়, এখন এই উৎসব চলিতেছে, চলুন দেখিবেন।

আমি। কদিন এ উৎসব থাকে?

সে। এক পক্ষকাল।

এ অদ্ভুত প্রাণোৎপত্তির ব্যবস্থা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। ইতর প্রাণীদের, বিশেষতঃ পাখীদিগের মধ্যে এ যৌন-লীলার কথা পুস্তকে পড়িয়াছি। পশুদের মধ্যেও কোথাও এ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্য মানুষের মধ্যে এরূপ প্রথা কল্পনা করিতে পারি নাই। আমার কথার উত্তরে আমার সঙ্গী কহিলেন, "প্রাচীনকালে মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলিত, তখন মনুষ্য-সমাজেও এ ব্যবস্থা ছিল। তাহার পর মানুষ স্বভাব-চ্যুত হইয়া একটা কৃত্রিম সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। সেই হইতেই পুরাতন বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, প্রাচীনদিগের মুখে ইহা শুনিয়াছি। সে কালে মনুষ্য-সমাজে বাহুবল বা পশুশক্তিই প্রবল ছিল। আর এই পশুশক্তির উপরে সমাজ গড়িয়াছিল বলিয়া ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। স্ত্রীলোকরাও তখন একটা সম্পত্তিবিশেষ বলিয়াই পরিগণিত হইত। এইরূপেই ক্রমে পুরাতন বিবাহ-প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

আমি। তোমাদের মধ্যে কি তবে বিবাহ-বন্ধন নাই?

সে। পূর্ব্বকার সকল বাঁধনই আমরা কাটিয়া, মানুষকে তাহার স্বভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সত্য-ভাবে স্বাধীন করিয়াছি।

আমি। তবে তোমাদের মধ্যে পরিবারবন্ধনও নাই?

সে। পরিবার নামে শুনিয়াছি, এক দিন একটা সংকীর্ণ স্বার্থের বন্ধন ছিল। আমরা তাহার কথা ইতিহাসেই কেবল পড়িয়াছি।

আমি। তবে পিতামাতা, ভাই-ভগিনী প্রভৃতি সম্বন্ধও তোমাদের মধ্যে নাই?

সে। আমাদের সমাজই পিতা, সমাজই মাতা, সমাজই পালন করেন, সমাজই যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা মাপিয়া দেন। অন্য পিতামাতা আমরা মানি না। পিতামাতা আমরা জানি না।

আমি। সমাজ ত কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষের সমষ্টি-মাত্র। এই সমষ্টিগত সমাজের ত প্রজননশক্তি নাই। প্রজনন ত উচ্চতর জীবজগতে পিতামাতা ভিন্ন সম্ভব হয় না।

সে। ওঃ, সে অর্থে অবশ্য আমাদেরও পিতামাতা আছেন বৈ কি?

আমি। পিতামাতা থাকিলেই পরিবারও ত থাকিবে?

সে। কেন?

আমি। প্রথম স্ত্রী-পুরুষের মিলন ব্যতীত প্রজোৎপত্তি ত হয় না। আর স্ত্রী-পুরুষের মিলনের উপরেই ত পরিবারের প্রতিষ্ঠা।

সে। পাখীদের কি পরিবার আছে? না, ঐ যে কুক্কুর-কুক্কুরী দেখিলেন, তাহারাই একটা কৃত্রিম পরিবার বাঁধিয়া থাকে?

আমি। পাখীদের মধ্যে ত পরিবারের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষিমাতা কখন ডিমে তা দেয়, নরপাখী তখন চারিদিক হইতে তাহার খাদ্য আনিয়া দেয়। আর কুক্কুরী যখন সন্তান প্রসব করে, তখন কুক্কুর ত সেই অন্ধ ছানাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া বেড়ায়। মানুষও এই কারণেই বোধ হয় আদিতে পরিবার বাঁধিয়াছিল।

সে। এখন তাহার প্রয়োজন হয় না। সমাজে চিরশান্তি স্থাপিত হইয়াছে। কেউ কাউকে হিংসা করে না। বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সকলেই সকলকে রক্ষা করে ও জীবনের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই, সুতরাং খাদ্যাদির জন্য লড়াই বা রেষারেষি নাই। এই জন্য পরিবার নামে এক একটা পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আমাদের শিশু-জীবন রক্ষা করিতে হয় না।

আমি। তোমরা বিবাহ-প্রথা তবে উঠাইয়া দিয়াছ?

সে। বিবাহ-বন্ধন কাটিয়া দিয়াছি। প্রজোৎপাদনের ও সমাজস্থিতিভঙ্গ নিবারণের জন্য স্ত্রী-পুরুষের সহজ ও স্বভাবানুবর্ত্তী মিলনকে যদি বিবাহ বলেন, তাহা অবশ্য প্রাচীনদের মধ্যে যেমন ছিল, আমাদের মধ্যেও তেমনই আছে।

আমি। কিন্তু সাময়িক মিলন শেষ হ'লে কি অনুরাগ ও সেবাধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়?

সে। অনুরাগ? অনুরাগ ত উদার বিশ্বব্যাপী। পাত্রবিশেষে আবদ্ধ থাকিলে তাহা ত রক্ত-মাংসের একটা ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়! এই অনুরাগ সর্ব্বভূতে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িবে। পরিবারবন্ধন এই সাধনের অন্তরায়।

আমি। তোমাদের সমাজস্থিতিরক্ষার ব্যবস্থা কি?

সে। আপনাকে ত এইমাত্র কহিয়াছি, আমাদের মধ্যে শরতে ও বসন্তে বৎসরে দুই বার এক একটা মিলনোৎসব হয়। শরতে আশ্বিনের শুক্লাপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এক মহোৎসব হয়। আবার চৈত্রের শুক্লপক্ষে এইরূপ আর একটা উৎসব হয়। এখন আমাদের শারদীয় উৎসব চলিতেছে। চলুন, স্বয়ং দেখিবেন।

খানিক যাইতে যাইতে দূরে সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বান, নির্ম্মল আকাশে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলিয়া কানে আসিয়া পৌঁছিল। ক্রমে নূপুরের ধ্বনি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, এক বিস্তীর্ণ উপবন। সে উপবনের উপর দিয়া মৃদু মৃদু বায়ু বহিয়া চারিদিক্ অপূর্ব্ব, সুমিষ্ট সৌরভে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছে। ক্রমে মৃদুল বংশীধ্বনি কানে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহার পর আরও কাছে যাইলে, এই বাঁশীর তানের মধ্যে যেন শত শত কোকিল পাপিয়া গান গাহিতেছে, এমনই বোধ হইতে লাগিল। মানুষে-পাখীতে কি এমন সঙ্গীত সম্ভব? বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যি কি পাখীরা পর্য্যন্ত বাঁশীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গান করিতেছে?"

সে। ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি?

আমি। মানুষের ভয়ে ত পাখীরা দূরে চলিয়া যায়।

সে। যে যুগে মানুষ অপর জীবকে হিংসা করিত, তখন তাহাই ছিল বটে, কিন্তু আমরা যে কাউকে হিংসা করি না, কাযেও নয়, মনেও নয়। তাই আমাদের কেউ ভয় করে না। চলুন, দেখবেন, আমাদের বাঁশীর স্বরে যে কেবল পাখীকুল আনন্দে গাহিয়া উঠে, তাহা নয়, সাপে পর্য্যন্ত নেচে উঠে। কেবল প্রাণিজগৎ নয়, গাছে ফুল ফোটে, জলে তরঙ্গ উঠে, বায়ু-সাগর মৃদু মন্দ আলোড়িত হয়ে হেলিয়া দুলিয়া নাচতে থাকে।

আমি। পুরাণে শুনেছি, শ্রীবৃন্দাবনে নাকি এরূপ হ'ত।

সে। আমরা নব-বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।

খানিকটা গিয়া সেই সঙ্গীত-নৃত্য নূপুর-সিঞ্জন-মুখরিত উপবনে প্রবেশ করিলাম। শত শত নিভৃত নিকুঞ্জে এই বিস্তৃত উপবন রচিত। আর এ সকল কুঞ্জে কুঞ্জে

গন্ধপত্র

বসুমতী প্রেস]　　　　[শিল্পী শ্রীচঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লবভূষিত শত শত যুবক-যুবতী যুগ্মে যুগ্মে বিহার করিতেছে। উপবনের মাঝখানে বিস্তীর্ণ নব-দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে সঙ্গীত-কলা-বিশারদরা গান-বাজনা করিতেছেন। আর তাঁহাদের সঙ্গীতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে যৌন-দম্পতি এখানে আসিয়া নৃত্য-গীতে শরীর-মন ঢালিয়া দিতেছে। আবার নাচিতে নাচিতে ক্লান্ত হইয়া কেহ বা ঐ শষ্প-শয্যায় শুইয়া পড়িতেছে, কেহ বা অন্তরালে নিজ নিজ কুঞ্জে যাইয়া রাত্রির মত বিরাম লাভ করিতেছে। এ অদ্ভুত খেলা জীবনে কখনও দেখি নাই। এই স্বপ্নাতীত উপবনে প্রবেশ করিয়া বৃন্দাবনের ছবি প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সত্যই এখানকার ভূমি "চিন্তামণি-মণ্ডিত"—স্বপ্নখচিত। এখানকার স্রোতস্বিনী ঘুরিয়া-ফিরিয়া, সঙ্গীতের সঙ্গে লয় দিয়া মৃদুল বায়ু-বিচালিত হইয়া, তরঙ্গগুলি তুলিয়া, স্বর্গের মন্দাকিনীর প্রতিরূপ জাগাইতেছে। এই উপবনের যুবক-যুবতীদের চলন, নৃত্য, কথা, গগন, দৃষ্টি-স্বপ্ন, অঙ্গরাগ পারিজাত-জাত। সঙ্গী যাহা বলিয়াছিল, সত্য তাহা দেখিলাম, সাপ পর্য্যন্ত ভয় ও হিংসা ভুলিয়া, মাঝে মাঝে নিবিড় বনে হারান নায়কের সন্ধানে অভিসারিকা নায়িকার পায়ে, কোমলস্নিগ্ধ স্পর্শলাভের লোভে যেন জড়াইতেছে। আবার এই ভুজঙ্গমস্পর্শে শিহরিত অঙ্গের স্পন্দনে কি জানি তাহার ক্লেশ হয়, এই ভয়ে না ছাড়িয়া দ্রুত-বেগে আপনার বিবরে যাইয়া প্রবেশ করিতেছে। মৃগ-মৃগীরা দলে দলে এই সকল নায়ক-নায়িকার মনোভাব বুঝিয়া যেন প্রীতিবিহ্বল নেত্রে একে অন্যকে নিরীক্ষণ ও একে অন্যের গাত্র লেহন করিতেছে। এখানে সকলেই যুগল। গাছে পাখীরা যুগল যুগল হইয়া বসিয়া আছে, আবার যুগল হইয়াই আকাশে উড়িয়া বৃক্ষান্তর বা শাখান্তর আশ্রয় করিতেছে। পৃথিবীতে চতুষ্পদরা যুগল যুগল হইয়া খেলা করিতেছে। আর তারই মাঝে যুবক-যুবতীরা যুগল হইয়া গাইতেছে, নাচিতেছে, পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া চলিতেছে। দেখিয়া বিস্ময়ে, আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম।

ক্রমে পূর্ণিমার চাঁদ যখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতে লাগিল, তা'র সঙ্গে সঙ্গে এই নৃত্যগীত কোলাহল থামিয়া যাইতে লাগিল। আমার সঙ্গী বলিল, "চলুন, এবার একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যাউক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যাব কোথায়? এ পর্য্যন্ত ত কোনও লোকালয় দেখিলাম না। কেবলই ত মাঠ, ময়দান, আর উপবন।"

সে। এই উপবন ও মাঠ ময়দানেই আমরা অধিকাংশ রাত কাটাই।

আমি। তোমাদের ঘর-বাড়ী নাই?

সে। ঘর-বাড়ীর প্রয়োজন কি?

আমি। কেন, শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য।

সে। মুক্ত আকাশতলে, মুক্ত বায়ুতে কি ঘুমাইতে পারা যায় না?

আমি। যায় বটে। কিন্তু মাঘমাসের শীতে বা শ্রাবণের বারিধারায় পারা যায় কি?

সে। শীতে পারা যায় বটে। আর বর্ষায়, ঐ যে নদীতে শত শত বড় নৌকা দেখেছেন, আমরা উহাতেই আশ্রয় লই। যা'ক্, এখন ত মাঘের শীতও নয়, শ্রাবণের বর্ষাও নয়। এখন চলুন, একটা গাছতলায়ই যাইয়া নিদ্রার আশ্রয় লই।

নিকটেই একটা আমবাগান দেখিতে পাইলাম। তা'র নীচে অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, যেন প্রতিদিন লেপিয়া মুছিয়া দেয়। এই আমবনে নিবিড় শাখাতলে, মাঝে মাঝে এক একটা উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতি মঞ্চের উপরে একটা করিয়া সদ্যধৌত ওয়াড়ে ঢাকা বালিস, একখানি পাতিবার কম্বল একখানি, চাদর একখানি ও মোটা খদ্দরের অঙ্গবস্ত্র রহিয়াছে। কোথাও কোথাও বা কেহ শুইয়া আছে। কোথাও বা যা'রা শুইতে আসিবে বা আসিতে পারে, তাদের জন্য শয্যা প্রস্তুত হইয়া আছে। আর প্রত্যেক শয্যাপার্শ্বেই একটি করিয়া পানীয় জলের কলসী, একটি মাটীর গ্লাস, ও একটা মাটীর ঘটী আছে। একটু দূরেই হাত-মুখ ধুইবার জন্য একটা ক্ষুদ্র জলাশয় রহিয়াছে।

আমার সঙ্গী একটি শয্যা অধিকার করিয়া, তাহার পার্শ্বেই আমাকে আর একটি শয্যা গ্রহণ করিতে কহিলেন। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কাযেই বালিসে মাথা রাখিতে না রাখিতে প্রগাঢ় সুষুপ্তির ক্রোড়ে যাইয়া অচেতন হইয়া পড়িলাম।

দ্বিতীয়-দিন

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া, আমার সঙ্গী প্রথমেই আমাকে প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ করিলেন। দু'জনে এবারে নদীতীরে যাইয়া একটা বিস্তীর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। এখানে সর্ব্বপ্রথমে কতকগুলি পাকা বাড়ী দেখিতে পাইলাম। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি? তোমাদের রাজ্যে আবার এ সকল পুরান ঘর-বাড়ী? তোমরা ত এ রকম অস্বাভাবিক ধরণে বসবাস কর না?"

সে কহিল, "একেবারে প্রাচীন অভ্যাস নষ্ট হয় নাই।"

আমি। এখানে কা'রা থাকে?

সে। বিদেশী ব্যাপারীরা।

আমি। তোমাদের ত বিদেশের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে। আবার বিদেশী কেন?

সে। একেবারে ঘুচে নাই। আমরা বিদেশে যাই না। কিন্তু বিদেশীরা যদি আমাদের রাজ্যে আসে, তাহাদের ত তখন নিবারণ করিতে পারি না।

আমি। কেন?

সে। সনাতন ধর্ম্মে কহে, অতিথি দেবোভব।

আমি। এটা কি তবে তোমাদের অতিথিশালা?

সে। ঠিক তা, নয়। এরা বিদেশী বেপারী।

আমি। তোমরা ত বিদেশের কোনও কিছু ব্যবহার কর না।

সে। একেবারেই যে করি না, তা' নয়। আমাদের দেশের সাধু-সজ্জনরা, ধর্ম্মপ্রয়োজনে কিছু কিছু বিদেশী বস্তু ব্যবহার করেন বটে।

আমি। সে সকল কি?

সে। কাবুলি মেওয়াই প্রধান। এগুলির আহারে মানুষের ভিতরকার সাত্ত্বিক-শক্তি বৃদ্ধি পায়।

আমি। কিন্তু তোমাদের রাজ্যে ত বেচা-কেনা নাই। এদের জিনিষ তবে কিনে কে?

সে। তোমরা যে ভাবে, শুনেছি, কেনা-বেচা করিতে, সে ভাবে নাই। কিন্তু পণ্যবিনিময় আছে বৈ কি? কাবুলিরা বাদাম, পেস্তা, আখরুট, বেদানা, আপেল প্রভৃতি আমাদের দেশে লইয়া আসে। যে যা' চায়, তা'কে দেয়। আর দেশে ফিরিবার সময় তা'দের ইচ্ছামত, যে যত ধান, গম, কাপাস, সুতা, লুঙ্গি বহিয়া নিতে পারে, তাহা লইয়া যায়। দামদস্তুর নাই। এত মেওয়া দিয়া তবে এতটা ধান, চাল বা গম পাইবে, এরূপ ব্যবস্থা নাই। যে যত ইচ্ছা নিজেদের দেশ হইতে আমাদের রাজ্যে লইয়া আইসে। যে যাহা পারে, তাহা আমাদের দেশ হইতে লইয়া যায়। বিনিময়ের পরিমাণ বস্তুর পরিমাণ দিয়া ঠিক হয় না, বেপারীদের বোঝা বহিবার শক্তি দিয়াই ঠিক হয়। তা'রা নিজেরা যা বহিয়া আনে, এই জন্য প্রায় সেই পরিমাণ বস্তুই তা'দের প্রয়োজন মাফিক্ আমাদের এখান হইতে লইয়া যায়। চলুন, একটা যায়গায় যাইয়া এ সকল মেওয়া দিয়াই প্রাতরাশ করা যাউক। প্রাতঃকালে টাটকা দ্রাক্ষারস, আখরুট-বাদাম-পেস্তা দিয়া পথ্য করিলে, আয়ুঃ-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য বর্দ্ধিত হয়, প্রাচীনরা কহিয়া গিয়াছেন।

একটা দোকানে যাইয়া প্রবেশ করিলাম। এক জন শালপ্রাংশু মহাভুজ, দীর্ঘ-বংশদণ্ডধারী কাবুলী সসম্ভ্রমে একখানা ভুটিয়া কম্বল পাতিয়া আমাদের সংবর্দ্ধনা করিল। তা'র পর দুইটি পেয়ালা ভরিয়া টাটকা দ্রাক্ষারস আনিয়া দিল। এই রস নিঃশেষে পান করা হইলে, দুটা মাটীর থালায় কতকগুলি বাদাম, পেস্তা, আখরুট, কিসমিস্, মনাক্কা পরিবেশন করিল। সর্ব্বশেষে এক এক পেয়ালা সফেন দুধ আনিয়া দিল। আমি বিস্মিত হইয়া আমার সঙ্গীকে কহিলাম—"তোমরা ত দুধ খাও না—"

সে। খাই না—পান করি। আপনারা কি দুধ খান?

আমি। বাঙ্গালা ভাষায় দুধ খাওয়া শিষ্ট ব্যবহার।

সে। সে সকল পদ্ধতি বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

আমি। কিরূপ?

সে। আমাদের রাজ্যে সব এক ভাষা।

আমি। সে ভাষাটা কি?

সে। হিন্দি-বাঙ্গালাও বলিতে পারেন, বাঙ্গালা-হিন্দিও কহিতে পারেন। আমরা হিন্দি রীতি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রহণ করিয়াছি। স্ত্রী যাইতেছে, আমাদের ভাষায়

ইহা অশুদ্ধ। আমরা বলি, স্ত্রী যাতী বা যাইতাছি। আর কলা খাই বলি, দুধও সেইরূপ পী করি, খাই না।

আমি। তোমাদের এ নূতন বাঙ্গালা শিখতে আমার বাকী জীবনে আর কুলাইবে না।

সে হাসিয়া কহিল, "আপনি আপনার অভ্যাসমতই বলুন। আমরা ঠারে ঠোরে বুঝিয়া লইব।"

আমি। তোমরা ত বাছুরের প্রতি—

সে। কেবল বাছুরের প্রতি মমতা প্রযুক্ত নয়, গো-মাতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার খাতিরেও।

আমি। দুধ পী কর না, বলিয়াছিলে। তবে এখানে এর বিপরীত দেখছি কেন?

সে। এ গরুর দুধ নয়। ছাগলের বা ভেড়ার।

আমি। তবে ছাগলের বা ভেড়ার বা গাধার—

সে। না, গাধা গো-পর্য্যায়ভুক্ত।

আমি। আচ্ছা, ছাগল বা ভেড়ার দুধ পান কর, গরুর দুধে আপত্তি কি?

সে। আপত্তি এই যে, প্রথম শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

আমি। তোমরা শাস্ত্র-টাস্ত্র তবে ম'ন?

সে। শাস্ত্র মানব না? শাস্ত্রেই ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

আমি। কোন্ শাস্ত্র মান? বেদ, না বাইবেল, না কোরাণ?

সে। সত্যই আমাদের শাস্ত্র। এই জন্য আমরা বেদ, বাইবেল, কোরাণ সকল শাস্ত্রই মানি।

আমি। বেদে যজ্ঞ ও পশুবলি বিহিত, কোরাণে কোর্ব্বানি—

সে। ঐটুকু মানি না। বিশ্বমৈত্রী ও অহিংসার সঙ্গে যে শাস্ত্রের যেখানে বিরোধ, সেটা ঈশ্বরাদিষ্ট নয়, তাহা শয়তানের সৃষ্টি।

আমি। কিন্তু ঐ কথাটা বুঝলাম না—গরুর দুধে আপত্তি, ছাগলের বা ভেড়ার দুধে নয়।

সে। কথাটা ত খুবই সোজা। প্রথম গরু আমাদের মাতৃস্বরূপ। শাস্ত্রে গাভীকে গো-মাতা কহে। ছাগলকে ত ছাগল-মাতা কহে নাই। তার পর, ছাগলের দুধ এত পুষ্টিকর যে, ছাগ-বৎস যদি সবটা পী করে, তাহা হইলে সে পেট ফাটিয়া মরিয়া যাইবে। এই জন্য ছাগবৎসের প্রতি মমতাবশতঃ ছাগ-মাতার দুধ টানিয়া ফেলা প্রয়োজন। ইহা না ফেলিয়া যদি মানুষের ব্যবহারে আসে, তবে স্বভাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। আমাদের সাধুরা এই জন্য গো-দুগ্ধপান নিষেধ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে, ছাগশিশুকে বঞ্চিত না করিয়া যতটুকু মিলে, ততটুকু ছাগলের দুধ পান করা যায়, এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। এবার চলুন, আমাদের প্রাচীনদের কাছে আপনাকে লইয়া যাই, তাঁ'দের মুখে কত জ্ঞানের কথা শুনিবেন।

আমি। সে কত দূর?

সে। নিতান্ত কাছে নয়। যতটা পথ হাঁটিলে আবার ক্ষুধাবোধ হইবে, ততটা।

আমি। তোমাদের কি সময় ঠিক কর্‌বার কোনও পন্থা নাই?

সে। আছে বৈ কি? ঐ সূর্য্যের গতি।

আমি। সূর্য্য যখন মেঘে ঢাকা থাকে, আর রাত্রিকালে?

সে। তখনও আলোর তারতম্য থাকে ত? আর রাত্রিতে আকাশের নক্ষত্র দিয়া কালনির্ণয় করি। তার পর আমাদের শরীর-যন্ত্র দিয়াও কাল নির্ণয় হয়।

আমি। সে যাহা হউক, তোমাদের পা ছাড়া কি চলাফেরার আর কোনও ব্যবস্থা নাই?

সে। না। সুস্থরা নিজের পায়ে চলে, যা'রা অচল, তা'দের জন্য অন্য ব্যবস্থা।

আমি গঙ্গার দিকে তাকাইয়া কহিলাম, "ওটা কি তোমাদের পথ নয়?"

সে। ও পথেও আমরা চলি বটে, ঐ দেখছেন না, কত নৌকা রহিয়াছে?

আমি। ঐ হাজারমণি নৌকা চালাইতে বহু লোকের প্রয়োজন।

সে। ঐ সকল নৌকার পেছুনে ছোট্ট ছোট্ট ডিঙ্গী ভাস্‌ছে দেখছেন না? এগুলি ত সকলেই চালাইয়া নিতে পারে।

আমি। ঐ পথে কি তোমাদের শ্রেষ্ঠীপল্লীতে যাওয়া যায় না?

সে। যায় বৈ কি? চলুন, একটা ডিঙ্গী লইয়াই যাই।

এক জন লোককে ইঙ্গিত করিবামাত্র সে একটা ডিঙ্গী ভাসাইয়া আমাদের নিকটে আসিল। আমার সঙ্গী কহিলেন, তিনিই এই নৌকা চালাইয়া যাইবেন, অন্য মাঝির প্রয়োজন নাই। আমরা দু'জনে তখন এই ডিঙ্গীর আশ্রয় করিয়া গঙ্গার বক্ষে ভাসিয়া পড়িলাম। তখন ভোর জোয়ার আসিয়াছে, জোয়ারের মুখে দ্রুত-বেগে ডিঙ্গীখানি উত্তরদিকে ছুটিতে লাগিল। খানিক পরে, কতকগুলি মন্দিরের চূড়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কি ? চেনা চেনা ঠেক্‌ছে যে ?"

সে। প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি, ইহার পূর্ব্ব-নাম ছিল দক্ষিণেশ্বর। আমরা ইহাকে সত্যপুরী বলিয়া জানি।

আমি। এ মন্দিরগুলি যে তোমরা বড় রাখিয়াছ ?

সে। কেন ? রাখব না কেন ?

আমি। ওগুলি যে কালীর মন্দির ছিল। ওখানে দেবীর সমক্ষে শত শত ছাগশিশু বলি হইত। বিশেষ এই দেবীপক্ষে।

সে। ও'সব এখন নাই। তার চিহ্নও নাই। আছে কেবল ঐ ঘরগুলি। চলুন, ওখানেই আমরা যাচ্ছি।

আমি। দক্ষিণেশ্বরের এ পাশে অনেকগুলি কল-কারখানা ছিল, তার কোনও চিহ্ন ত দেখছি না !

সে। সে সব ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছি। সয়তানের রাজ্যের কোনও ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত আমরা রাখি নাই।

আমি। তোমরা ত গাছতলায় বাস কর ! দেবতার মন্দিরে ত পূজা কর না—এই সুবিশাল বিশ্বই তোমাদের দেবমন্দির, তবে এগুলিকে অমন যত্ন করিয়া রাখিয়াছ যে ?

সে। এখানে এক জন মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করে-ছিলেন, তাঁর স্মৃতি নষ্ট করা অসঙ্গত বলিয়া এগুলি রাখা হইয়াছে। আমাদের নবজাতির আদি পিতা ইঁহাকে নিরতিশয় ভক্তি করিতেন। এখানে তিনিও তাঁর শেষ-জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁর প্রধান শিষ্যরা এইখানেই বাস করেন। পুরুষপরম্পরায় এইরূপে এই স্থানটি আমাদের পীঠস্থান হইয়া রহিয়াছে। কেবল এইখানেই পাকাবাড়ী দেখিতে পাইবেন। আর বিদেশী বেপারীদের জন্যও ঐ কয়টা পাকা কুটীর দেখিলেন, তাই আছে। এ ছাড়া আমাদের কোথাও পাকা বা কাঁচা ঘর-বাড়ী দেখিবেন না।

আমি। এই মন্দির-বাড়ীতে কারা থাকেন ?

সে। আমরা ইঁহাদিগকে স্থবির বা থেরা বলি।

আমি। এ ত পুরাতন বৌদ্ধ নাম দেখছি।

সে। গীতা পড়েছেন ত ?

আমি। এককালে দেখেছিলাম বটে।

সে। দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ভক্তের লক্ষণ আছে—যারা সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ—যারা অনেকটা স্থিরমতি—তাদেরেই আমরা স্থবির কহি। ঐ সকল শ্রেষ্ঠ সাধকই এখানে থাকেন। ইঁহারাই আমাদের রাজ্যের নিয়ামক।

নৌকা হইতে নামিয়া এক সভামণ্ডপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে এক অপূর্ব্ব সভা বসিয়াছে। গুণিয়া দেখিলাম—অষ্টোত্তরশত, শ্বেতশ্মশ্রু, পক্বকেশ, তেজোময় পুরুষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া আছেন। ইঁহাদের বামে, একটা ঈষদুন্নত মঞ্চে প্রায় অর্দ্ধশত পক্বকেশা ব্রহ্ম-চারিণী ঐরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কি সভা ?"

আমার সঙ্গী কহিলেন—"ইহাই আমাদের রাষ্ট্র-সভা। ইঁহারাই আমাদের রাজ্যের বিধিব্যবস্থা ঠিক করিয়া দেন। ইঁহারাই কখনও আমাদের মধ্যে কোনও বিরোধ বাধিলে, তাহা মিটাইয়া দেন।

আমি। ইঁহাদের অধীনে কি তবে সিপাহী-সান্ত্রী আছে না কি ? নইলে কেউ যদি এঁদের কথা অমান্য করে, তাহার প্রতিবিধান হয় কিসে ?

সে। ইঁহাদের আত্মার শক্তি এমন অপ্রতিহত যে, যাদের সম্বন্ধে ইঁহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তার পক্ষে তাহার প্রতিরোধ করা কখনই সম্ভব হয় না। আজ দেখছি ইঁহাদের সমক্ষে কোনও বিশেষ বিবেচ্য বিষয় নাই। চলুন এইখানেই আমাদের প্রাচীনতম স্থবির মহাশয় আছেন। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠেন না। তাঁর কাছে যাই। তিনি পুরাণ কথা আপনাকে বলিতে পারিবেন।

গঙ্গাতীরে, পরমহংস মহাশয়ের সাধন-পীঠের পার্শ্বে একটা পর্ণকুটীর বাঁধিয়া দেখিলাম, এই মহাস্থবির মহাশয়

আছেন। আমরা যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার চরণতলে মাটীতে বসিলাম। মহাস্থবির মহাশয় আমাকে দেখিয়া একটু যেন বিস্মিত হইয়া, হঠাৎ আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আমাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। কহিলেন, "নমস্কার করি। এ মানুষ আবার দেখিব, কল্পনা করি নাই। কত, কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, এ চিরপরিচিত মূর্ত্তি আমি দেখি নাই।"

আমি। মহাপুরুষের পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি। আমিই বা কিরূপ আপনার পূর্ব্বপরিচিত, ইহাও জানিতে অতিশয় কৌতুহলী হইয়াছি।

তিনি। ঠিক আপনাকেই চিনিতাম, তাহা বলিতে পারি না। তবে এক দিন বাঙ্গালা দেশে আপনার মতনই মানুষ ছিল। তা'দের আপনারই মতন চেহারা, আপনারই মতন পোষাক-পরিচ্ছদ, আপনারই মত চালচলন ছিল। তা'রা আপনারই মতন কথাবার্ত্তা কহিত। আপনি যে কুলে জন্মিয়াছেন, আমিও সেই কুলেই জন্মিয়াছিলাম। আমার পিতা পিতামহের ঐ রূপই চেহারা ও কাপড়-চোপড় ছিল। তাঁ'দের স্মরণ করিয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

এই বলিয়া মহাস্থবির মহাশয় পুনরায় অবনত মস্তকে আমাকে অভিবাদন করিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তবে সেই প্রাচীন যুগেরই লোক। সে যুগান্তর কি করিয়া হইল, আপনার মুখে শুনিবার জন্যই আকুল হইয়া এখানে আসিয়াছি।"

তিনি কহিতে লাগিলেন, "আমার যখন জন্ম হয়, ইংরাজ তখন এ দেশের রাজা ছিল। তা'রা নিজেদের ইচ্ছামত আমাদের শাসন-সংরক্ষণ করিত। তা'রা দেশের লোককে ইংরাজী শিখাইয়া তা'দেরই মত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল। বাঙ্গালী তা'দের মতই হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তা'দের শাসন সহ্য করিতে পারিল না। প্রথমে তা'রা সভা করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া ইংরাজ-শাসনের দোষ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল, আর এ সকল দোষ শুধরাইবার জন্য ইংরাজ রাজার নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে লাগিল। ইংরাজ প্রথমে ইহাতে একটু ভয় পাইয়াছিল। তাই তা'রা যা' চাচ্ছিল, একটু একটু তাহা দিতে আরম্ভ করিল। তান্ত্রিক সাধকরা যেমন শবসাধন করেন, ইংরাজ সেইরূপ ভারতবর্ষের এই বিরাট মৃতদেহের বুকে বসিয়া এই অদ্ভুত শবসাধন আরম্ভ করিল। শব যখন মুখ বিকৃত করিয়া চীৎকার আরম্ভ করে, সাধক তখন একমুঠা ছোলাভাজা বা কড়াই ভাজা ও এক গণ্ডূষ কারণ তাহার মুখে দেন। সে যতক্ষণ এই ছোলা-কড়াই খাইতে থাকে ও এই কারণ পান করিয়া শান্ত হয়, ততক্ষণ সাধক আপনার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লন। ইংরাজ এইভাবেই ভারতের বুকে বসিয়া রাষ্ট্রসাধন করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল গেল। তার পর আবেদন নিবেদনে কুলাইল না দেখিয়া, এক দল লোক এই ভিক্ষানীতি বর্জ্জন করিয়া, স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁ'রা ইংরাজের সঙ্গে যথাসম্ভব ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ করিবার আয়োজন করিলেন। বিলাতী বস্তু "বাইকট"—কথাটা আপনার পরিচিত নিশ্চয়ই—করিতে লাগিলেন। ইংরাজ ভয় পাইয়া, এ সকল দ্রোহীকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিল। ইহারা তখন গুপ্তহত্যার দ্বারা ইংরাজ রাজত্ব নষ্ট করিতে সংকল্প করিয়া, ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। তার পর ইংরাজ এদের আরও খানিকটা অধিকার দিল। কিন্তু মূল কলকাঠিটি নিজের মুঠোর ভিতর রাখিল। তার পর ইংরাজে জর্ম্মাণে একটা প্রলয়ান্ত লড়াই বাধিল। ইংরাজ তখন সকল যায় দেখিয়া, ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষা ও ভারতের প্রজাদের সন্তোষবিধান করিবার জন্য, একেবারে আকাশের চাঁদ তাদের হাতে তুলিয়া দিবে, এমনি সব কথা কহিতে লাগিল। ক্রমে যুদ্ধ শেষ হইলে একটু আধটু নিজেদের শাসনকে শিথিল করিল। এ দিকে লোক অস্থির হইয়া উঠিল। তা'রা এবারে একেবারে ইংরাজের সঙ্গে সকল সম্পর্ক রহিত করিয়া দিল। ইংরাজের বেসাতি কিনা বন্ধ করিল, ইংরাজের স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করিল, ইংরাজের আইন-আদালতে যাওয়া বন্ধ করিল, ইংরাজের রেল-জাহাজে চড়া বন্ধ করিল। শেষে ইংরাজের অধীনে সকল চাকুরী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিল। এইরূপে ইংরাজ রাজা রহিল বটে, কিন্তু তার পুলিস পাহারা রহিল না, সৈন্যসামন্ত রহিল না, দেশের লোকের কোনও সাহায্য পাইল না। তখন অসহায় হইয়া, ইংরাজ দেশ

ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা নিরুপদ্রব অসহযোগ অস্ত্রে, বিনা অস্ত্রাঘাতে, বিনা রক্তপাতে স্বদেশের উদ্ধার-সাধন করিলাম। তার পর ক্রমে দেখিলাম, স্বাধীন থাকিতে হইলে, কেবল ইংরাজের সঙ্গে নয়, সকল বিদেশীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ কাটিতে হইবে। তাদের আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা সব বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা বুঝিয়া আমরা প্রথমেই বস্ত্র ত্যাগ করিলাম, কেবল বহু-জন্মার্জ্জিত সংস্কারের বশে, একেবারে উলঙ্গ হইতে পারিলাম না, কৌপীন ধারণ করিলাম। রেল, জাহাজ সব উঠাইয়া দিলাম। পুরাতন এমারত ভাঙ্গিয়া সাগরে ডুবাইয়া দিলাম। তরুতল আশ্রয় করিলাম। এইরূপে এখন আপনি যে সমাজব্যবস্থা দেখিতেছেন, ক্রমে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বেশ সুখে, শান্তিতে আছি। তবে, জানেন কি, আমার মত অতিবৃদ্ধ যারা, তাদের প্রাণটা মাঝে মাঝে আইঢাই করিয়া উঠে এবং মুসা-পরিচালিত ইহুদীদের মত, আমাদের চিত্ত লোভচালিত হইয়া, পুরাতন ও পরিত্যক্ত সভ্যতা ও সাধনার দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে। এই দুর্ব্বলতাই আমাকে আপনাকে দেখিয়া আজ অভিভূত করিয়াছে। বুড়া হইয়াছি বটে, কিন্তু কেবল কাঁচা কলা ও শাকসব্জী খাইয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। আর এই বার্দ্ধক্যে মানুষের মন পুত্রপৌত্রাদির সেবা ও সঙ্গের জন্য লালায়িত হয়। কিন্তু আমাদের সে সাধ মিটিবার নয়।

মহাস্থবিরের এই চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া আমার সঙ্গী একটু বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা ভাল নয় ভাবিয়া, আমাকে আবার ঐ স্থবিরদের সভায় লইয়া আসিলেন।

এবারে দেখিলাম, কি যেন একটা ঘটিয়াছে। আগেকার সে স্থৈর্য্য, সে প্রশান্তভাব, সে অভয় প্রতিষ্ঠা যেন একটু বিচলিত হইয়াছে। কুতূহলপরবশ হইয়া সভাপার্শ্বে যাইয়া ব্যাপারখানা কি বুঝিতে চেষ্টা করিলাম।

এক জন স্থবির কহিলেন:—"আপনারা এইমাত্র শুনিলেন যে, আফগানরা পঞ্চনদ আক্রমণ করিয়া সেখানকার স্থবিরসভাকে বন্দী করিয়াছে। তার পর আফগান সেনা লোকক্ষয় করিতে করিতে প্রয়াগ দখল করিয়াছে। সেখান হইতে রাজগৃহ দখল করিয়া, বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। এখন উপায় ?"

অপর এক সভ্য কহিলেন,—"কি আশ্চর্য্য, এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে,আর আমরা তার কোনই খবর পাই নাই।"

এক জন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক স্থবির কহিলেন,—"পাইবেন কি করিয়া ? পায়ে হাঁটিয়া ত দু'দশ দিনে বা দু'এক সপ্তাহে কি মাসে এই বর্ষার সময় পঞ্জাব হইতে বাঙ্গালার লোক আসিতে পারে না।"

একাধিক স্থবির তখন একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিলেন—"এখন উপায় ?"

তখন স্থবিরশ্রেষ্ঠ দাঁড়াইয়া—হাত তুলিয়া কহিলেন, —"শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।"

এক দল চেঁচাইয়া উঠিলেন,—শান্তি ? এই ম্লেচ্ছ অভিযানের মুখে শান্তি ?"

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। শান্তিই একমাত্র লক্ষ্য। শান্তিই উপায়, শান্তিই উদ্দেশ্য।

এক জন বলিলেন,—"কিন্তু আফগান যখন দেশ লুঠপাট করিবে, তখন শান্তি কোথায় থাকিবে ?"

স্থবিরশ্রেষ্ঠ কহিলেন,—"আমরা যদি অহিংসাসাধন করিয়া থাকি, তারা আমাদের হিংসা করিতে পারিবে না। ভুলিয়া গিয়াছেন শাস্ত্রবাক্য—অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ ?"

আর এক জন। ও ত শাস্ত্রে আছে। কাযে দেখি কৈ ?

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। এটাই জগতে আমাদিগকে কাযে দেখাইতে হইবে।

এক জন। আপনার প্রস্তাব কি ?

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। আমার প্রস্তাব, আমরা সকলে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া আফগানদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া আসি।

আর এক জন। তার পর ? তারা কি আমাদের বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলিবে ?

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। আমাদের আত্মার শক্তি থাকিলে, তাহাদের পশুপ্রবৃত্তিকে নিশ্চয়ই জয় করিবে ?

আর এক জন। আমরা তাদের কোথায় রাখিব ? আমাদের ত ঘর-বাড়ী নাই।

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। অতিথির অভ্যর্থনার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশে যেখানে যে পাকা ঘর আছে—

আর এক জন। সে ত কেবল দেব-মন্দির—অন্য ঘর-বাড়ী ত নাই।

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। ঐ দেব-মন্দিরেই এই অতিথিদের বাসের ও অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সনাতন ধর্ম্ম বলেন—অতিথি দেবো ভব। এরা আমাদের যখন অতিথি, তখন দেবমন্দিরেই ত এদের রাখা কর্ত্তব্য।

আর এক জন। এরা ত আমাদের ধর্ম্ম মানে না। এঁরা যে গো-খাদক। এদের দ্বারা আমাদের মন্দির অশুদ্ধ হ'বে না?

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। যে দেবতার যাহা প্রিয়, তাঁহাকে তাই নিবেদন করিতে হয়—এষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

আর এক জন। তবে আমাদিগকে গরু-মুর্গী জবাই করিয়া অতিথিসৎকার করিতে হইবে?

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। যে দেশে দাতা কর্ণের কথা ঘরে ঘরে প্রচারিত, সে দেশে এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

এমন সময় হৈ হৈ শব্দে বৈরাজ্য নগরে যে সকল আফগান বেপারী মেওয়া দিয়া লোকের সেবা করিতেছিল, তাহারা উদ্যতদণ্ড হইয়া সভাস্থলে আসিয়া পড়িল। মহাস্থবির মহাশয় অমনই অগ্রসর হইয়া, তাহাদের চরণে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন। ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর সকল স্থবির "চরণ দেহি"—"স্বাগতং"—"ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি" এ সকল পুরাতন মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে আফগান-অভিযানের এই সকল অগ্রদূতের অভ্যর্থনা করিলেন। ইহারা প্রথমে ইঁহাদের মুণ্ডপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদিগকে এরূপভাবে আত্মসমর্পণ করিতে দেখিয়া, ইহারা উদ্যত যষ্টি নামাইয়া হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। এক জন অগ্রসর হইয়া কহিল, "তোমাদের ধন-দৌলৎ কোথায় আছে, বাহির কর। আমাদের শাহান্‌-শাহার হুজুরে তাহা পাঠাইতে হইবে।"

স্থবিরশ্রেষ্ঠ কহিলেন, "আমরা ত দুনিয়ার ধন-দৌলৎ কিছুই রাখি নাই। আমাদের যা ধন এই দেশ-মাতৃকা—আমাদের যা দৌলৎ এই বসুন্ধরার প্রসাদ, ফলশস্যাদি।"

আফগান। আমরা তাহাই চাই।

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। এখনও ত এ বৎসরের শস্য কাটা হয় নাই।

আফগান। কাটিয়া আনিতে হইবে। সব আমরা লইয়া যাইব।

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। তথাস্তু।

আফগান। তোমাদের স্ত্রীলোকরা?

স্থবিরমণ্ডলে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। এ ওর মুখ চাহিতে লাগিল।

স্থবিরশ্রেষ্ঠ কহিলেন, "অতিথির সকলই প্রাপ্য। তবে পরদারামর্ষণ মহাপাপ।"

আফগান। আমরা তার ব্যবস্থা করিব—মোল্লা ডাকিয়া সকলকে নিকা করিয়া লইব।

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহা ত স্ত্রীলোকদিগেরই ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিবে।

আফগান। আমরা তাদের সমজাইয়া লইব। আমাদের বহুত সোনারূপা আছে, রেশমী-পশমী কাপড় আছে, বিলাতী কত সুগন্ধ আছে। এ সকল দিয়া এদের সাজাইয়া আমাদের বিবি করিব। ভয় কি?

স্থবিরশ্রেষ্ঠ। কিন্তু—

আফগান। চল ভাই, এদের সঙ্গে কথা কাটা-কাটি করিয়া ফল কি? এদের মেয়েরাজ্যে চল।

কিন্তু দেশের স্থবিরেরা যখন এ সকল কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন, তখন এই দুঃসংবাদ স্ত্রীরাজ্যেও পৌছিয়াছে। যুবক-যুবতীরা পূর্ব্বরাত্রিতে মিলনোৎসবে মাতিয়াছিল, তারা এ সংবাদ পাইয়া, যে যাহা হাতের নিকট পাইয়াছে, তাই লইয়া আফগানদের বিরুদ্ধে ছুটিয়াছে। কারও হাতে লাঙ্গলের ফাল, কারও হাতে বা গাছের ডাল, রমণীরা কেহ বা বটী, কেহ বা খন্তা লইয়া, দেশরক্ষা, আত্মরক্ষা, জাতিরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য ছুটিয়াছে। ইহারা চক্ষুর নিমেষে এই স্থবির-সভায় উপস্থিত হইল। মহাস্থবির মহাশয় এই রণসজ্জা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এই কি আমাদের অহিংসাধর্ম্ম।"

এক তেজস্বিনী যুবতী বঁটী উঁচাইয়া কহিলেন, "আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার চাইতে আর ধর্ম্ম কি আছে? প্রকৃতির প্রতিশোধের সময় উপস্থিত। এস— আততায়ী বিনাশ করিয়া এই মহাযজ্ঞের উদ্বোধন করি।

অমনি সেই যুযুৎসু যুবকযুবতীর দল আফগানদের উপরে লাফাইয়া পড়িল।

দূরে গান উঠিল :—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"—

* * * *

শেষ

"বাবা, বাবা, আজ না আমাদের বোটানিকেল গার্ডনে চড়ুইভাতি করিবার কথা? বেলা হয়ে গেল যে!"

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

১৯৭৫

অনেক দিন পরে এ বছর "চালের" বাজার খুব নেমে গেছে। "চাল" সস্তা হ'লে প্রায় অন্যান্য জিনিষও অনেকটা সস্তা হয়ে পড়ে। ভাল পুরান বালাম ৩০।৩২ টাকা মণের ভিতর এখন অনায়াসে পাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ একেবারে চালের দাম ৮।১০ টাকা নেমে যাওয়ায় ডাক্তারদের মধ্যে একটা সন্দেহ হ'ল যে, এত সস্তার চাল নগরবাসীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর হওয়া খুব সম্ভব; তখন নগর-নক্ষত্র ডাক্তার অঙ্গনারঞ্জন আঁকুশী এম, ডি, মহাশয় মিউনিসিপ্যালিটীর এক মিটিংএ প্রস্তাব করলেন, "বর্ত্তমানে বাজারে যে চাউল বিক্রয় হইতেছে, তাহার মূল্যের হ্রাসতা দর্শন করিয়া এই হাউস বিশ্বাস করতে চালিত হয়েছেন যে, ঐ তৃণবীজের তন্মতে মনুষবংশ ধ্বংসকারী কোনরূপ রোগাণু অবশ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছে; সুতরাং অদ্যকার এই মিটিংএ চাউলের নমুনা বিশ্লেষণীত ও ব্যবচ্ছেদিত ক'রে অথবা আণুবীক্ষণিক কি দূরবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা উহার পোষ্টাই শক্তির টেষ্ট করা হ'ক।"

অন্যমনস্ক পাঠকপটলকে স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে যে, ঘটনাটি বর্ত্তমান সময়ের অর্থাৎ ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ ও ঘটনাস্থল কলিকাতা নগরী। রায় সাহেব, রায় বাহাদুর প্রভৃতি টাইটেল এখন আর বড় বাজারে চলন নেই; গভর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষা না ক'রে জনতন্ত্রের নেতৃগণ আপনারাই টাইটেল সৃষ্টি ক'রে আপনা আপনির মধ্যে বিতরণ করছেন। গ্রাম-গ্রহ, নগর-নক্ষত্র, বঙ্গ-বদন, কারাভূষণ, হাজজীবন, মিল-মর্দ্দন, গোয়ালাগণ্য, মুটীয়ামান্য প্রভৃতি টাইটেলের জ্যোতি রায় সাহেব রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর প্রভৃতির রশ্মিকে ম্লান ক'রে দিয়েছে। সেই জন্যই আমরা ডাক্তার অঙ্গনারঞ্জনের নগর-নক্ষত্র উপাধিটি এখানে প্রকাশ ক'রে দিলাম, তাঁহার এম্, ডিটিও এখন আর Doctor of Medicineএর সাঙ্কেতিক চিহ্ন নয়; এম, ডি, অর্থে যে Messenger of Death এটি Calender ভুক্ত ক'রে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

ডাক্তার আঁকুশীর প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হয়ে চাউল বিশ্লেষণের জন্য একটি কমিটী গঠিত হ'ল; মেম্বর হলেন ডাঃ এন, এ, সন্ন্যাসী, ডাঃ কাদের গোলাম, ডাঃ অন্তিমবিধান, ডাঃ অপ্সরামোহন, ডাঃ জারজজীবন, ডাঃ পিচকারীবল্লভ। আমহরণ ও বিজোড় বাবু উকীলদ্বয়ও মেম্বরভুক্ত হলেন। এতদ্ভিন্ন চার জন বি, কম, পাশ করা যুবাকেও কমিটীতে নেওয়া হ'ল। তবে এঁদের হলপ করতে হয়েছিল যে, এঁরা বা এঁদের অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ ধানের ক্ষেত, ধানের গোলা (বোধ হয় বা ভাতের হাঁড়ী) চোখে দেখেননি।

অনেক গবেষণার পর স্থির হ'ল যে, চালের ভেতর এক রকম সেমিকোলন ব্যাসিলি জন্মেছে, আর সেই জন্যে চাল হঠাৎ চল্লিশ টাকা থেকে ত্রিশ টাকা মণে নেমে পড়েছে; হাঁড়ীতে যদি প্রতি এক আউন্স জলে এক ড্রাম পারম্যাগেনট অব পটাশ মিশিয়ে ভাত রাঁধা যায়, তা হ'লে দোষ নষ্ট হওয়া সম্ভব, নচেৎ আবিসিনিয়ায় যে গ্রীন্ ফিভার চলছে, তা এখানেও দেখা দিবে।

কয়লার মহাজন, পাটের বেলার, মিউনিসিপ্যাল কনট্রাক্টর, অবসরপ্রাপ্ত সন্দেশওয়ালা, জুতোওয়ালা, প্রভৃতি নতুন বড় মানুষরা তাঁদের ধনবান্ জীবনের ভয়ে দিশী চাল খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলেন; ব্রেজিল থেকে টিনের কৌটোয় করা চাল আমদানী হচ্ছে, তাই এক ডলার হিসাবে এক এক পাউণ্ড কিনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা উচিত যে, আমেরিকা ইদানীং ভারতবর্ষের—বিশেষ বঙ্গদেশের জন্য অনেক হিতকর কার্য্য করছেন—টিনে মোড়া গরম মুড়ি এখন বড় লোকরা প্রায়ই চায়ের সঙ্গে ব্যবহার করেন, আর ক্যানাডা থেকে আমদানী Devil's Delight ব'লে একটা প্রীতিকর খাদ্য ক্যালকাটা, ড্যাকা, চিটাগং অঞ্চলে খুব ফেসানেবল্ হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেটা চাল আর কেনারী সীডে মিশিয়ে খিচুড়ির মত এক রকম পদার্থ। তবে আমাদের দেশী সাধারণ খিচুড়ি তার কাছে দাঁড়াতেই পারে না। সে Sweet oilএ পাক করা আর তাতে ভিনিগর ও চীজ মিশান আছে। কালিফর্ণিয়ার আম, ফ্রিস্কোর জামরুল, মেক্সিকোর সাত হাত পটল আর উনিশ সেরা বেগুন এত আমদানী হচ্ছে যে, এ দেশে

বামুন-কায়েতের ছেলেরা শীগ্‌গিরই ধানকাটা, গরু চরান, ঘরামিগিরি কাষ ছেড়ে দিয়ে মিউনিসিপ্যাল ও অন্যান্য স্কুলে ভর্ত্তি হ'তে পারবে ও তাদের বসবার বেঞ্চি করবার জন্য দেশের সমস্ত আম-কাঁঠালের গাছ নিজ নিজ কলেবর দান করবার সুযোগ পাবে।

বলা গেছে, চালের সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যথা—ডাল, কলাই ইত্যাদি অনেক সস্তা হয়েছে, খাবার জিনিষে আর ভেজাল মিশোবার জো নেই, আইন এমনি কড়া। চর্ব্বিতে যদি একটুও ঘিএর গন্ধ পাওয়া যায়, তখনি মেয়াদ। ল্যাকটোরাম ব'লে জার্ম্মাণী থেকে একরকম জিনিষ এসেছে, যার এক গ্রেণ একটি ট্যাবলেট এক সের জলে ফেললে ঐ জল তখনই এক সের খাঁটী দুধে পরিণত হয়। বড় বড় বিলাতী রোলার মিলওয়ালা মাত্র এক হন্দর সাদা পাথরের. সঙ্গে এক সের গম মিশোবার অনুমতি পেয়েছেন। ময়রারা এখন সকলেই জমীদার, সন্দেশের কারবার হোমিওপাথিক ডাক্তারখানার সঙ্গে amalgamate হয়ে গেছে; বোরিক কোম্পানীর এক ড্রাম গ্লবিউলের সঙ্গে তিন ফোঁটা ছানার জল মিশোলে ফার্ষ্টক্লাস সন্দেশ তৈয়ারী হয়ে যায়। এখনকার বিবাহাদি ভোজে ঐ গ্লবিউল পরিবেশন দর্শন একটা সুখভোগ্য ব্যাপার। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলকাতা বল্‌লে যে অল্প স্থানটিকে বোঝাত, এখন আর তা নেই; এক দিকে নৈহাটী, অপর দিকে ডায়মণ্ডহারবার, আর এক দিকে তারকেশ্বর ও অন্য এক দিকে টাকী—সবই কলকাতা। সে কালের সেই চাঁদনীর চক, ধর্ম্ম-তলার রাস্তা, দু'ধারের দোকান, হাটসাহেবের আড়গড়া এখন আর কিছুই নেই, সমস্ত ভেঙ্গে চুরে এক বিরাট মিউনিসিপ্যাল আফিসে পরিণত হয়েছে। এই মিউনি-সিপ্যাল আফিসের জানালা দরজা কিছুই.নেই—থাকবার আবশ্যকও নেই; ছাতেই এরোপ্ল্যান ষ্টেশন, সুতরাং ছাতেই বাড়ীতে ঢোকবার সদর দরজা। শুধু মিউনিসিপ্যাল আফিস নয়, কলকাতার প্রায় সব বাড়ীই নতুন আদর্শে গঠিত। রাস্তায় গো-যান অশ্বযান একেবারেই নেই, তবে মোটর এখনও বিশ পঞ্চাশখানা দেখা যায়, সামান্য লোকে চড়ে বা কাণা-খোঁড়ারা চ'ড়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়, মোটর লরীর সংখ্যা বরং একটু বেড়েছে; কারণ, পাটই জন্মাচ্ছে বেশী।

এরোপ্লেনে আকাশ একেবারে ছেয়ে ফেলেছে; এরোপ্লেনের জাহাজ, লঞ্চ, বজরা, বোট, ডিঙ্গী। একলা একলা ওড়বার বা মোটর সাইকেলের মত যুগলে ওড়বার ডানাকলও তৈরী হয়েছে, তবে তা যে সে ব্যবহার করতে পারে না, এখনও অনেক ব্যয়সাধ্য। বৈকালে যখন সাদা সাদা মেমরা সাদা পোষাক প'রে, সাদা প্যারা-সোল মাথায় দিয়ে শ্বেতপক্ষ বিস্তার ক'রে ঝাঁকে ঝাঁকে গড়ের মাঠের উপর আকাশে উড়তে থাকেন, তখন সে দৃশ্য দেখলে কলিকাতায় বাস ক'রে ৫৯½ পারসেণ্ট টেক্স দেওয়াটা সম্পূর্ণ সার্থক মনে হয়।

ছাতে কাহারও উঠবার জো নেই, এরোপ্লেন থেকে কখন্ কি মাথায় পড়ে, কতবার কে নেয়ে মরে বাপ্! তবে সবার ঘরেই ইলেকট্রিক ফ্যান ও ল্যাম্প আছে, সুতরাং ব্যবহার্য্য আলো ও আহার্য্য বাতাসের অভাব নেই; ব্যোম-স্ক্যাভেঞ্জার প্রতি সপ্তাহে এক দিন এসে ছাত ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যায়।

মিউনিসিপ্যাল অফিসের বাড়ীর আয়তন সহস্র-গুণের ওপর বৃদ্ধি হয়েছে, বলা গেছে; কিন্তু অফিসে কাষ করবার লোকের খুবই কম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক জন হিন্দু একজিকিউসনার ও দুই জন মুসলমান একজিকিউসনার, দু'জাতীয় তিন জন সেক্রেটারী, ডিটো ডিটো ইঞ্জিনিয়ার, দফে ঐ ঐ হেলথ অফিসার। এই রকম দুই ভায়ের মধ্যে হিন্দুর অনুপাতে মুসলমানদের দ্বিগুণ নিয়োগ ধ'রে বড় বড় গুটিকতক চাকরী জীবিত মনুষ্য দ্বারা সম্পাদিত হয়, আর সব কাষই কলে চলে। প্রতি ঘরেই ছোট বড় নানান রকম কল চলছে। কোন কল থেকে চিঠি বেরুচ্ছে, কোন কল থেকে ঠিকানা লেখা এনভেলাপ, কোন কল ঠিক দিচ্ছে, কোন কল মল্‌টিপ্লিকেশন কষছে। কলে প্ল্যান তৈরী; কলে শমন বেরুচ্ছে. নোটীশ বেরুচ্ছে; কলের চাপরাশী শমন নিয়ে উড়ছে। কেবল আই, এ, বি, এ, ফেল কেরাণী ২২টি নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সব ঘর ঘুরে ঘুরে আধ আধ ঘণ্টা এক একখানা কেদারায় ব'সে আসেন, এই তাঁদের কাষ। এক জন ধর্ম্মপ্রাণ মাড়োয়ারী কাউন্সিলারের প্রস্তাবে

ছারপোকা জাতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই ক'টি চাকরীর সৃষ্টি। এখনকার মিউনিসিপ্যালিটী কারুর প্রাণে ব্যথা দেন না। যে কাউন্সিলার যে আবদার ধরেন, তাই পাশ হয়ে যায়। মিউনিসিপ্যাল বাটীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। এটি কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান নাগর মহামান্য পরম বিজ্ঞ শব্দকল্পদ্রুম মেয়র মহাশয়ের অফিস। এ ঘরটির দেয়ালে ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বেরাল প্রভৃতির রঙ্গিন ছবি টাঙ্গান; বড় বড় অক্ষরে ছাপা চার্ট সব খাটান; তার কোনখানিতে অ আ, কোনখানিতে ক খ গ ঘ, কোনখানিতে A B C D। ঘরের এক ধারে একখানি ছোট খাট, মাঝখানে একখানি দোলনা, এক পাশে একটি সাইড টেবলের উপর দুধের বাটি, ঝিনুক, মাইপোষ বা ফিডিং বটল্, চুষি, ঝুমঝুমি, হরলিকস্, মেলিন্স ফুড, কাজললতা প্রভৃতি মেয়র-জীবন-সুখকর পদার্থ সকল বিদ্যমান। এক জন বিলিতী নার্শ, তিন জন দেশী ধাত্রী, দু'জন আয়া মেয়র বাবাজীর সেবায় সতত নিযুক্ত। আর একটি বাঙ্গালী বুড়ো ঝি এক কোণে ব'সে সমস্ত অফিস টাইমটি গুন্ গুন্ স্বরে গান করে:—

ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী ঘুমের বাড়ী যায়।
যত ছেলের ঘুম এনে আমার মেয়রের চোখে দেয়॥

এই মেয়রনির্ব্বাচন একটি বিচিত্র ব্যাপার। আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক ও আধিব্যাধিবৈদিক এই ত্রিবিধ উপায়াবলম্বনে বহু বৎসরের গবেষণার পর মিউনিসিপ্যালিটী তিব্বতের দালাই লামার পরামর্শে এই মেয়র-নির্ব্বাচন-প্রণালী নগরে প্রবর্ত্তন করেছেন। এক লামাই বার বার জন্ম নিয়ে যেমন তিব্বতের প্রধান লামা হন, তেমনই কলিকাতার মেয়রও সেই এক আত্মাই দেহের বাসা বদলে বদলে বার বার অবতার হন, এই হচ্ছে মূল সিদ্ধান্ত। যদি ঘুংড়ি, হাম, ইনফেনটাইল লিবার প্রভৃতি কোনরূপ দৌরাত্ম্যে বর্ত্তমান মেয়র দেহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তবে এঁরই চুষি, ঝুমঝুমি,খেলানা প্রভৃতি নিয়ে তিন জন কাউন্সিলার নবজাত মেয়র অন্বেষণে পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা কি লুসাই প্রদেশে বা ঐরূপ অপর কোন অবতার-সুলভ বন্য তীর্থে যাত্রা করবেন।

সিভিলিজেশান অর্থবোধক সভ্যতা বছর পঞ্চাশের মধ্যে এত দূর অগ্রসর হয়েছে যে, শাপগ্রস্ত মানবের আর কপালের ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করতে হয় না। কলকাতার রাস্তা ইঞ্জিনিয়ারিং-নৈপুণ্যে এক অপূর্ব্ব প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি হাতীবাগানের মোড় থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যাবে, কেবল দরজা থেকে বেরিয়ে ফুট পথে দাঁড়াও আর তোমার এক পা'ও চলতে হবে না; তুমি থাকবে দাঁড়িয়ে, চল্‌বে কেবল ফুটপাত। এ ব্যবস্থাটি কিন্তু কেবল পুরাতন কলিকাতার জন্য। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা থেকে কালীঘাট পর্য্যন্ত ফুটপাথই চলছে, কেবল দয়া ক'রে দাঁড়াবে, এইটুকু অপেক্ষা। রাস্তায় জলের কলের পাশাপাশি আর একটি ক'রে হাইড্রাণ্ট্ বসেছে। এখন সকলকেই চায়ের ট্যাক্স দিতে হয়, সুতরাং সকালে ৭টা থেকে ৮টা, আর বৈকালে ৬টা থেকে ৭টা ঐ হাইড্রাণ্ট খুললেই এক এক পেয়ালা গরম চা অনায়াসেই পাওয়া যায়। প্রাতঃস্নানরতা ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবী, বড় গিন্নী, মেজ গিন্নী, সেজ বৌ, ছোট বৌ, পাচিকা, যাচিকা, সবাই গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরবার পথে রাস্তাতেই চা খেয়ে বাড়ী যেতে পারেন।

কর্‌পোরেশনে এখন অনেকগুলি শাশুড়ী কাউন্সিলার আছেন। বধূদিগের শাসনে এঁরা রেজলিউসনের পর রেজলিউসন মুভ্ ক'রে পাস্ করিয়ে নিয়েছেন যে,এক তলায় জলের বিশেষ প্রয়োজন নাই, দোতলায় ও তেতলায় বধূমাতাদের শয্যাত্যাগের অর্থাৎ বেলা সাড়ে ৮টার সময় থেকে সাড়ে ১০টা পর্য্যন্ত আর অপরাহ্ণে তাঁদের তাস খেলে উঠবার পর অর্থাৎ ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত গা-টা ধোবার জল যেন ৩৩ ফুট প্রেসারে জল দেওয়া হয়। পুরুষদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক বাড়ীতেই এক একটি ক'রে টিউব অয়েল রাখবার আইন হওয়ায় ঐ খরচার জন্য অনেকের ভদ্রাসন বাঁধা প'ড়েছে বটে,কিন্তু বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। পাটের ব্যবসার এত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে যে, সমস্ত সহরটা অর্থাৎ নৈহাটী থেকে ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত আর টাকী থেকে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত থানায় থানায় মোটর দমকলের আড্ডা বসেছে। এই অনবরত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আশ্রিত প্রতিপালনের কতদূর যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, তার মর্ম্ম Economicsএ Honours যাঁরা পাশ করেছেন, তাঁহারাই বুঝতে পার্‌বেন।

কেরাণী-জীবন একটা বিষাদপূর্ণ, বৈচিত্র্যশূন্য, অসাড়, একঘেয়ে অস্তিত্বমাত্র ব'লে এক সময় আখ্যাত হ'ত, এখন আর তা নাই। পূর্ব্ববর্ণিত বিস্তারপ্রাপ্ত মিউনিসিপ্যাল কলকাতার মধ্যে ১৭শত ৭২টি রেস কোর্শ স্থাপিত হওয়ায় ঘোড়দৌড়ের খেলা রম্-রম্ চলছে। গাড়ীটানারূপ জান্তব জীবনের কেরাণীগিরি ছেড়ে ঘোড়ারা মনের সাধে দৌড়ুচ্ছে, আর মানবজাতিদের ভাগ্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্ত্তিত ক'রে দিচ্ছে। প্রতি রেস-কোর্সে'র পাশে "মঘাভূষণ" "অশ্লেষালঙ্কার" 'রাহুশাস্ত্রী" 'কেতুবাগীশ" প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্‌গণ আপনার আপনার অফিস খুলে বসেছেন, মঙ্গল বৃহস্পতি শনি শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণ পেন্‌সন পেয়েছেন; লোকের রাশিচক্রে ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসেছেন উইন, প্লেস, আউটসাইডার, ফেবারিট প্রভৃতি অশ্বগণ, আর নবগ্রহকবচের স্থলে লোক দক্ষিণা দিয়ে কিনছে "টিপ।" বড় বাবুর কৃপায় ভাগ্যপরিবর্ত্তনের আর কোন উপায় না দেখে কেরাণীরা ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে ৪ টাকাকে ১৪ শত টাকায় মন্টিপ্লাই করবার নেশায় উন্মত্ত হয়ে আপনাদের অসাড় জীবন সজীব ক'রে তোলেন। এ বিষয়ে অফিসের "সাহেবরা"ও সময় সময় প্রিয় সেবকবিশেষকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করেন। অর্থের অভাবে যদি কোন কেরাণী প্রথম খেলা আরম্ভ করতে না পারে, তা হ'লে জন জেফ্রিস জনাথান মহাশয়গণ তাঁকে ৪।৫ টাকা নিজ পকেট থেকে দান করেন। এ ঘোড়দৌড় যে কেবলমাত্র কেরাণী-জীবনে উত্তেজনা ও বৈচিত্র্য দান ক'রে ক্ষান্ত হয়েছে, তা নয়, পতির ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সাহায্যে আত্মনিয়োগ করবার সঙ্কল্পে অনেক ধনীর মাথার মণিও বালাকে ব্রেশলেটে পরিবর্ত্তিত করবার মানসে রেশের নেশায় হাত শুধু করেন।

৬০ বৎসরের উপর সমাজ-সংস্কারকরা প্রবন্ধ লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, সভাসমিতি ক'রে এ দেশ হ'তে কুসংস্কার আজও দূর করতে সমর্থ হন নি। এখনও সেই জাত্যভিমান, এখনও অস্পৃশ্য ব'লে ইতর জাতিকে ঘৃণা। সে দিন আমরা স্বচক্ষুতে দেখলাম, একটা বুড়ো গোছের বামুন কি একটা হিজিবিজি লেখা রাঙ্গা চাদর গায় দিয়ে বিড় বিড় বকতে বকতে অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে, এমন সময় একখান এরোপ্লান থেকে একটা খালি বোতল তা'র মাথার কাছে পড়ল, সে যেমন ভয়ে দৌড়ে স'রে যাবে, অমনই এক জন জুতাশেলাই মশাইয়ের গায়ের উপর গিয়ে পড়ল; জুতাশেলাই মশাই তাঁর চামারোচিত ক্ষমাগুণ ভুলে তৎক্ষণাৎ বামুনটার মস্তকস্থিত লাঙ্গুলবৎ একটা পদার্থ ধ'রে "পাজী বামুন, আমায় ছুঁয়ে ফেললি! এই এত বেলায় আবার আমায় গঙ্গাস্নান করতে হবে" ব'লে সেই হতভাগা ভটচায্যিটাকে মারতে সুরু ক'রে দিলে। আজকাল একতার দিন, ভ্রাতৃভাবে সকল জাতিরই হৃদয় পরিপূর্ণ, সুতরাং মুচি মশাইকে রণে অগ্রসর হ'তে দেখে সেই স্থানে সমবেত ব্যগ্রক্ষত্রিয়, পদ্মরাজ, কেওরাবর্ম্মা, প্রণম্য শূদ্র, বেদে ও বেদিনী প্রভৃতি উচ্চজাতীয় নরনারীগণ ঐ অস্পৃশ্য বামুনটাকে যথেষ্ট প্রহার করলে। হায়! এই কুসংস্কার কবে দূর হবে! বামুন, কায়েত, বদ্যি সবই ত সেই একই মানবজাতিভুক্ত; তবে কেন, কি অভিমানে, কি জাতিগত গর্ব্বে চামার, ধাঙ্গড়, মেথর প্রভৃতির বংশধরগণ উহাদের ঘরে কন্যাদান করিতে বা উহাদের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন! কাপড় কাচিয়া উদর পূরণ করে বলিয়া কায়স্থরা কি এতই ঘৃণ্য? সত্য বটে, কেওরা মহাশয়, তুমি না মন্ত্র পাঠ করলে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ঠাকুরপূজা কিছুই হয় না, কিন্তু যদি বৈদ্যরা ক্ষৌরকার্য্য করতে বিরত হয়, তবে তোমার মুখাকৃতিতে পৌরোহিত্যের মসৃণ লালিত্য কোথায় থাকবে? আর বামুন—হে নমস্ত—প্রণম্য —অভিবাদ্য—পাদপদ্মধারী শূদ্রগণ, আজও যে এই সহরে কখনা পাল্কী দেখা যায়, যা চ'ড়ে তোমাদের অন্তঃপুরিকারা গঙ্গাস্নানে যান, যদি এই বামুনরা বেঁচে না থাকে, তবে সে পাল্কী কে কাঁধে করবে?

সে কালে যখন এ দেশের গৌরব-রবি ভারতাকাশের ব্রহ্মতালু হইতে অনপিধানপতত্তপনাতপং, তখন গ্রামে গ্রামে এক এক জন প্রবলপরাক্রান্ত সসাগরা নরপতি রাজত্ব করতেন; সেই গৌরবের সৎ-দৃষ্টান্ত স্মরণ কোরে ও প্রজার মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য সদাশয় গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। কলিকাতায় এখন একটি হিন্দু, একটি মুসলমান ও একটি মাড়োয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা, ময়মনসিং,

নোয়াখালি, কুমিল্লা, ফরিদপুর, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানে দুইটি করিয়া মুসলমান ও একটি করিয়া হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়। কয়েক বৎসর হ'ল দার্জ্জিলিং বর্ম্মা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও আসাম সিংহল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন হয়েছে। আসাম ও দার্জ্জিলিংএর ছাত্রদের সিংহল ও বর্ম্মা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যা' রাহাখরচ হবে, তার ভার সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় নিয়েছেন। অর্দ্ধ-শতাব্দীর উপর তিন বৎসরের শিশুদের "কদাচ মিথ্যাকথা বলিও না" "কদাচ চুরি করিও না," "তামাকু সেবন করিও না" "মদ্যপান সতত পরিহার্য্য" "বনিতারা মায়াবিনী" ইত্যাদি নীতিবাক্য সতত শিক্ষা দেওয়ার ফলে বঙ্গের বাল-জীবন দৃঢ় চরিত্রবান্ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়েছে, কাযেই এখন ছেলেরা ৮ বছরে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ১৪ বছরেই এম, এ, ডিগ্রি পাচ্ছে, তার পরেই পোষ্ট গ্রাজুয়েট। প্রতি পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে ৫টি ক'রে ছাত্র, ১৮টি ক'রে অধ্যাপক।

সেকালে ৭৪৷৷০ এর দাগটা অভিশপ্ত ছিল, ইদানীং ৬৪ হাজারের অঙ্কটা মন্ত্রীদের বেতনের পরিমাণ ধার্য্য হওয়ায় অভিশপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই পোষ্ট গ্রাজু-য়েটের অধ্যাপকরা আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বৎসরে মাত্র ৬৩ হাজার টাকা ক'রে বেতন নিতে সম্মত হয়েছেন। তবে আত্মত্যাগের এই দৃষ্টান্ত মাত্র যে সব অধ্যাপক কোয়েটা, কাবুল, পেশোয়ার, মালাবার, সেরিঙ্গাপটাং, সিঙ্গাপুর, যাভা প্রভৃতি দেশ হ'তে এসেছেন, তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; ক্যামস্কাট্‌কা, নিউজিলণ্ড, বর্ণিও প্রভৃতি দেশ হ'তে আগত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, প্রেততাত্ত্বিক অধ্যাপকগণ পুরাপুরি ৬৪ হাজার টাকাই ড্র করেন। সম্প্রতি চীন হইতে যে বেদান্তদর্শনের প্রফেসার এসেছেন, তাঁর বেতন নিয়ে সেনেটে একটা বিষম গণ্ডগোল চলছে।

বাণিজ্যশিক্ষার জন্য বি, কম্ ডিগ্রি ত ছিল-ই, তার ওপর ছুতরগিরী শিখবার জন্য বি,কার্প, ঝুড়ি বোনার জন্যে বি, বাস্ক, হাঁড়ি তৈরীর জন্যে বি, পট, জুতা তৈরীর জন্যে বি, ট্যান্ প্রভৃতি অনেকগুলি ডিগ্রির সৃষ্টি হয়েছে।

যখন বি, কম ডিগ্রি প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন-ই স্থির হয়েছিল, যে কোন এম, এ চেক্ ভাঙাবার জন্যে কখনও কোন ব্যাঙ্কে প্রবেশ করেছেন অথবা কেরাণীগিরীর দরখাস্ত হাতে কখন-ও কোন সদাগর আফিসে ঢুকেছেন, তাঁহারা বাণিজ্য শেখাবার জন্যে অধ্যাপকতা পাবেন না। সেই নজীরানুসারে সেন্‌জিভিয়ার কলেজ থেকে কেম্‌ব্রিজ সিনিয়র পাশ ক'রে যাঁরা ল্যাটিনে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন, তাঁরা-ই কার্পেনটারীর লেকচার দেবেন। ভাটপাড়ার উপাধি-পরীক্ষায় যাঁরা কাব্যতীর্থ হয়েছেন, তাঁরাই ঝুড়ি বোনার লেকচার দেবেন; কুমোরের চাক এক সেকেণ্ডে ক'পাক ঘোরে, তার ম্যাথামেটীক্যাল ডিমনষ্ট্রেসান দেখিয়ে দেবার জন্যে কাশী থেকে এক জন দণ্ডীকে আনান হয়েছে।

সরকারের তহবিলে টাকার খাঁকতি, অথচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়ে পড়েছে, তাই শ্রীযুত আবদুল গফুর সামাধ্যায়ীর প্রস্তাবে ও ডাক্তার ডি, এস, কানকাটাজির অনুমোদনে পাঠ্য পুস্তক ছাপিয়ে বিক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-জীবনের উপকারের আর-ও অনেক ব্যবসা খুলে দিয়েছেন। ইউনিভার্সিটী টেলার সপ; সেখানে বিশ্ব-চাপকান, বিশ্ব-নেকটাই, বিশ্ব-পাঞ্জাবী, বিশ্ব-খদ্দর প্রভৃতি বিক্রয় হয়। ইউনিভার্সিটী সু-ডিপো; এখানে বিশ্ব-চটী, বিশ্ব-বুট, বিশ্ব-এলাহাইজান, বিশ্ব-খুরম জুতা বিক্রয় হয়। ইউনিভার্সিটী রেস্তরা; সেখানে বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ব-কপে বিশ্ব-চা পান করেন; বিশ্ব-ক্যাটলেট্ বিশ্ব-চপ্ বিশ্ব-স্যাণ্ডউইচ-ও পাওয়া যায়। সব চেয়ে জোরে চলে ইউনিভার্সিটী হেয়ার কাটীং স্যালুনটি—এইখানে বিশ্ব-ছাত্ররা বিশ্ব-মোহন বিশ্ব-বিমোহন ঘাড় ছেঁটে কনভোকেসনের দিন স্বয়ম্বর সভায় গমন করেন।

বোলপুরে বিশ্ব-ভারতী স্থাপন করায় তখনকার অনেক লোক কবিকুলীন রবীন্দ্রনাথকে পাগল বলত; কিন্তু তাঁর যে কতটা দূরদৃষ্টি ছিল, এখন তা সপ্রমাণ হয়েছে। আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিবার জন্য রবিবাবু বড় বড় কোট-প্যান্টুলেন পরা পিতার পুত্রদিগের দ্বারা-ও বিছানা করিয়ে, বাসন মাজিয়ে, ঘর ঝাঁট দিয়ে নিতেন; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেই বিদ্যা প্রসারিত হওয়ায় এখন অনেক কৃতবিদ্য ইডেন হোষ্টেলে, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে এবং অন্যান্য কলেজের মেসে পরিচারকের কায ক'রে শ্রমের

মর্য্যাদা রক্ষা করছে, কেবল শ্রমের মর্য্যাদারক্ষা নয়, এরা না থাকলে এই হোষ্টেল মেশ-টেশগুলি চলাই মুস্কিল হ'ত; কেন না, ও সব স্থানের জন্ম এখন আর ঝি বেশী পাওয়া যায় না; পেলে-ও তার ভাগ্যে বেশী দিন ঝি-গিরি করা চলে না। ঔপন্যাসিক লজিক যুবাজীবনকে এতটা মার্জ্জিত ক'রে তুলেছে যে,জন্মভূমির কলঙ্কমোচনের উদ্দেশ্যে তাঁরা ঝি-জাতিকে সতীত্ব-মুকুটে মণ্ডিত করবার জন্ম উন্মাদ-প্রায় হয়ে উঠেছেন।

গ্রাজুয়েটেরা পতিত জাতিকে উন্নত ক'রে দিয়ে নিজেরা শ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করছেন বটে, কিন্তু যথার্থ দেশের মঙ্গলে রত আছেন পোষ্ট গ্রাজুয়েট পাশকরা স্কলাররা। এই বঙ্গদেশে য়ুরোপীয় ত আছেন-ই, তা ছাড়া সমস্ত বাণিজ্য ব্যবসায় দোকানদারী ফিরিওয়ালাগিরির অমার্জ্জিত অশিক্ষিত ভার হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, ভাটিয়া প্রভৃতি A, B, C, বোধবিহীন মূর্খদের হাতে দিয়ে আর দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, বন্যা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির জন্ম গবর্ণমেণ্টকে কমিশন বসাতে ব'লে পোষ্ট-গ্রাজুয়েটরা অনেকগুলি গুরু সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলেছেন। এক জন এমন একটি বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড আবিষ্কার করেছেন যে, যার দ্বারা ভূমণ্ডল হ'তে মঙ্গল-মণ্ডল ওজনে ক' কোটি টন থেকে ক' গ্র্যাম পর্য্যন্ত কম, তা স্থির করা যায়। স্বর্গগত জগদীশচন্দ্র বসু তরুলতাদির চৈতন্য ও অনুভবশক্তি আছে, এইমাত্র আবিষ্কার ক'রে গেছেন, কিন্তু মর্ত্ত্যে স্থিত বিধুবদন ঢাকী Ph, D. এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যা কানে লাগালে নটেগাছের সঙ্গে চালতাগাছের যে বোটানিক্যাল আলাপ হয়, তা স্পষ্ট শোনা যায়। আচার্য্য তরুবালা চ্যাটার্জ্জী পি আর এস প্রমাণ করেছেন যে, মিশরের বায়ুস্তরে যে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন আছে, তারবিহীন তড়িৎশক্তিতে তা আকর্ষণ ক'রে বরিশালের ধান্যক্ষেত্রে পরিচালিত করতে পারলে মর্ত্তমান কলার মত এক একটা ধান তথায় ফলতে পারে। এই রকম আরও কতরূপ আবিষ্কার দেখে পাশ্চাত্য জগৎ একেবারে চমৎকৃত হয়েছে, সুতরাং আমাদের এই সাধের বঙ্গদেশ যে সকল দেশের সেরা, স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা আর গাড়ল দিয়ে গড়া, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি হয়েছে বাঙ্গালা সাহিত্যের। পূর্ব্বগামী পুরুষদের অজ্ঞ প্রতিপন্ন করার অপেক্ষা আত্মোন্নতি প্রমাণের প্রকৃষ্ট উপায় সভ্য জগতে আর নাই। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ঘুটেপাড়া গ্রামের মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র কবিবর শ্রীকুড়ানচন্দ্র সাঁই বর্ত্তমান কালে বালখিল্য কবিগণের রচনা হ'তে পদাবলীর পর পদাবলী উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়ে দেছেন যে, সে কালের কবি রবীন্দ্রনাথের কলাজ্ঞান মোটেই ছিল না; তিনি ছন্দ, যতি, বিরাম প্রভৃতি নিগড়ে কাব্য মাতাকে শৃঙ্খলিত ক'রে গেছেন। আর তাঁর কবিতা লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র; কেন না, ভাষাজ্ঞান তাঁর মোটেই ছিল না, তিনি চাহিদা কথা মোটে জানতেন না, তাই খদ্দের লিখতেন; একখানা জামা না লিখে জামাটা লিখে গেছেন; "স'ড়ে পরা" না লিখে 'স'রে পড়া" প্রভৃতি কত ভুল লিখেছেন, তা গণনা করা যায় না।

সংস্কৃতের ইতর সংসর্গে বাঙ্গালা ভাষা জাতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ব'লে সংস্কৃতজ শব্দ একেবারে অভিধান হ'তে বহিষ্কৃত হয়েছে। সীতার বনবাসের নূতন সংস্করণে "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষ প্রজাপালন করিতেছেন" এর পরিবর্ত্তে লিখিত হয়েছে—"রাম রাজ-গদিতে বইস্যা নিজির কোকনের পারা রায়ত জনারে পালচেন, ইসে—" ইত্যাদি। 'পাখী সব করে রব"এর বদলে দাঁড়িয়েছে, যথাঃ—"চিড়িয়ারা রা কাড়ে রে, বিয়ান অইল। বাগিচার বিচে ফুলেড় কুরি কতই ফুটল।" মেঘনাদবধ-চলেছে :—"রেতের খোয়াব পারা তোর থপর রে নফর—না-মরা-গুলা কাপে যার হেতের হিম্মতডরে,সে তীরন্দাজে রঘুয়ার বেটা পাড়ে কি নড়ুয়ে।"

চুম্বনের বদলে এখনকার কবিরা বোচা শব্দের মাধুর্য্যে তাঁদের কোকশাস্ত্রসম্মত কাব্যগ্রন্থ রোশনাইত করছেন। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এত হয়েছে যে, ছেলে-মেয়েরা খেলনার বদলে চকচকে বাঁধান উপন্যাস আর ছবিওয়ালা সংবাদপত্র খরিদ করছে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি কল্পনারচিত সতীর গল্পে লোকের এখন আর রুচি নাই। সেই জন্ম কতকগুলি নবীন উপন্যাস-লেখক ছাড়া-কাপড় আড়ং ধোপ দিয়ে এমন সুন্দর সুন্দর আর্টিষ্টিক সতীচিত্র তাঁদের গ্রন্থপত্রে প্রতিফলিত করেছেন

যে, তার ভিতর সাইকলজির সহিত আর্টের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখে লোক অবাক্ হয়ে গেছে।

সাহিত্যে যেমন দেশের লোকের সৌন্দর্য্যশক্তি অনুভবের পরিমাণ বোঝা যায়, সংবাদপত্রে তেমনই দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ৫ বৎসরের মধ্যে সংবাদপত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ সময় কি একটা হাঙ্গামায় কতকগুলি বিদেশী স্কুলের ছাত্র পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত হবার ইচ্ছা করেন এবং এই দায়িত্বপূর্ণ কাযে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভের ইচ্ছায় তাঁরা প্রথমে মোড়ে মোড়ে পয়সায় ২ খানা ৪ খানা হিসাবে কাগজ বিক্রী ক'রে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করেন। আজ সেই সম্পাদক-বীজগুলি শাখাপত্র-কণ্টকাদিশোভিত গুল্মরাজিতে পরিণত। এর মধ্যেই এঁরা সতেজে লেখনীচালনা করছেন, তাতে যখন এঁদের গোঁপ ঝেড়ে উঠবে, তখন অনায়াসে যে ক্ষুদ্র লেখনী ফেলে দিয়ে বড় বড় গাঁতি-কোদালাদি সজোরে চালনা করতে পারবেন, বিশ্বস্ত প্রাণে তার প্রত্যাশা করা যায়। দু'একখানি কাগজ থেকে উদ্ধৃত ক'রে তার নমুনা দেখাচ্ছি:—"বিফল হইয়াছিল যে চরকাপ্রচারপ্রয়াস মহাত্মা গন্ধীর, প্রধান কারণ তাহার সেই ক্ষুদ্র গুজরাটী প্রাণের মধ্যে হয়নি মাত্র আর্টের ছায়াপাত, যদি তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন একখানা মিউজিক্যাল চরকা, যা ঘোরালে সুতাও কাটত আর অর্গিনের মত বাজনাও বাজত, তা হ'লে ঢাকাই খদ্দরপরিহিতা সমগ্র বঙ্গদুহিতা ঘরে ঘরে সুতা কাটিত রায়চন্দ্র প্রফুল্ল আচার্য্যের উপদেশে।" "হা ভীরু চিত্তরঞ্জন! কি কুক্ষণে তুমি সার্থক করিতে দাশ নাম জন্মেছিলে এই বঙ্গভূমে। না করিয়া কিছুমাত্র লজ্জাবোধ মন্ত্রিত্বে তাঁদের জন্মগত অধিকার, সেই নারীজাতিকে মিনিষ্টার করিবার প্রস্তাব না করিয়া মাত্র পুরুষ মন্ত্রীদের বেতন না-মঞ্জুর করিয়াই আপনাকে দিয়াছিলেন পরিচয় দেশবন্ধু বলিয়া।"

এইরূপ বিজ্ঞাপনস্তম্ভেও দেশভক্তির উচ্ছ্বাস!—"নুর উল্লার বিঁড়ি ব্যবহার করিলে প্রাতঃকালে উঠিয়াই স্বরাজের সহিত সেক হাণ্ড করিতে পারিবেন," "বিদ্যারত্নের চা পান না করিলে ভারতের স্বাধীনতার অন্য পন্থা নাই।" "যদি ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইতে চান, তবে মদনমথনচূর্ণ ব্যবহার করুন। ৩৫৭ বৎসর বয়স্ক এক জন মহাপুরুষ ৭৫ বৎসর ধ্যানে মগ্ন হইয়া এই মহৌষধি লাভ করেন ও তাঁহার পিস্তুত ভাই আমার ভগ্নীপতিকে দান করেন।" "নুরজাহান জুতা ব্যবহার না করিলে হিন্দু-মুসলমানে একতা স্থাপন হইবে না।"

যখন সকলেই আপনারা প্রত্যহ সংবাদপত্র পাঠ করেন,তখন অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। রাজসাহীতে এক যায়গায় পুষ্করিণী খনন করতে করতে কতকগুলি প্রাচীন কালের গৃহব্যবহার্য্য সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে এবং সম্প্রতি তাহা কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে; যথাঃ—শীল,নোড়া, জাঁতা, কুলো, ঢেঁকী, পিতলের ঘড়া, গাড়ু, ঘটী, বাটি, আরও কত কি। আশ্চর্য্য, ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও লোক এনামেল বাসনের উপকারিতা বুঝতে পারে নি, এ সব পিতল-কাঁসার জিনিষ তৈরী ক'রে পয়সা নষ্ট করত, অথচ শোনা গেছে, তখনও কোন কোন কলেজে ইকনমিক্‌স পড়ান হ'ত।

মিউনিসিপ্যালিটীর চেষ্টায় বছর ২০ পূর্ব্বে সহর থেকে মদের দোকান একেবারে উঠে গিয়েছিল; কিন্তু তাতে টেম্পারেন্স সোসাইটী অর্থাৎ মাদকনিবারণী সভার কায একেবারে রহিত হয়ে যাচ্ছিল, তাই ঐ সভার উদ্যোগে, আন্দোলনে ও আবেদনে এখন আবার মোড়ে মোড়ে মদের দোকান খোলা হয়েছে, আর সভার নেতারা পাঠশালার শিশুদের মাতাল-নন্দন-নন্দিনী সাজিয়ে সেই সব দোকানের সামনে গান গাইয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তারা গায়ঃ—

বাড়ী এস বাবা, ভাত রয়েছে বাড়া।
মদ খেয়ে খেয়ে কেন হচ্ছ লক্ষ্মীছাড়া॥
দেখ বয়েস সাত আট বছর পরিমাণ,
তবু ত আমরা কভু করি না মদ্যপান,
সত্যি বটে তুমি বাবা দোকানেতে নাই,
কিন্তু বিলেতে নাকি ডাকে এমন, শিখিয়েছে সবাই;
"সাহেবের" কাছে ছোট হব বড় অপবাদ
গান গেয়ে তাই ভাই-বোনেতে মিটিয়ে নিচ্ছি সাধ।
এমনি ক'রে বেড়াই যদি পাড়া পাড়া পাড়া;—
বুকে মোদের দুলবে মেডেল খাড়া খাড়া খাড়া॥

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য
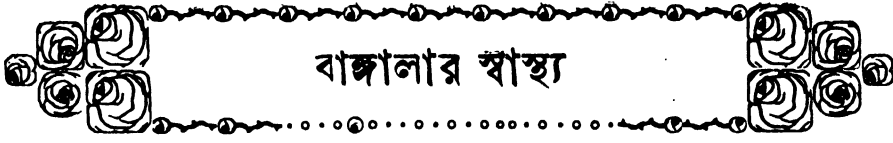
বাঙ্গালা দেশ কোন কালেই জলবায়ু সম্বন্ধে আদর্শ স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান ছিল না। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় এত নদী-বহুল জলাকীর্ণ নিম্নভূমির জলবায়ু স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালায় বিদ্রোহ দমনের জন্য দিল্লী হইতে মোগল অভিযান হইত, তখনও ঋতুবিশেষে বাঙ্গালাদেশ অতিশয় অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিজেতাদিগের নথিতে বর্ণিত হইয়াছে। ১ শত ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যখন ইংরাজাধিকার প্রথম স্থাপিত হয়, তখনও বাঙ্গালার স্থানবিশেষ বিষম জ্বর দ্বারা প্রপীড়িত ও বাসের অযোগ্য বলিয়া ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে।

অবশ্য পূর্ব্ব-বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল ছিল এবং এখনও পশ্চিম-বাঙ্গালার তুলনায় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম-বাঙ্গালার অনেক স্থান স্বাস্থ্যকর ও শ্রীসম্পন্ন ছিল। বিগত শতাব্দীর ৬০ সালের পর হইতেই ভীষণ ম্যালেরিয়ার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার এই অকথনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। এখন পশ্চিম-বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানই বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের নিষ্ঠুর অত্যাচারে অনেকানেক সহর ও পল্লী মনুষ্যাবাস-শূন্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে (হিন্দু) বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ কখনই ছিল না। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-শ্রীসম্পন্ন বাঙ্গালীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এখন কোন বয়সেই বাঙ্গালীকে নিখুঁত স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতে দেখা যায় না।

শিশু-জীবনে মৃত্যুসংখ্যা এ দেশে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক। ইংলণ্ডে যে বয়সে প্রতি ১ সহস্র শিশুর মধ্যে ৭০ হইতে ৮০ জন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বাঙ্গালাদেশে সেই বয়সে হাজারকরা ৩ শত হইতে ৪ শত শিশু কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।

সকল দেশেই যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাস্থ্যের প্রভাব পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং শারীরিক ক্ষিপ্রতা ও মানসিক স্ফূর্ত্তি এই বয়সেই প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশমান হইতে দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্গালার এমনই দুর্ভাগ্য যে, দেশের আশা-ভরসার স্থল ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে শতকরা ৬৬ জন কোন না কোনরূপ শারীরিক ব্যাধি বা দৌর্ব্বল্য দ্বারা প্রপীড়িত।

মানসিক স্ফূর্ত্তির ত কথাই নাই, এরূপ অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও মানসিক অবসাদ বাঙ্গালী ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে লক্ষিত হয় কি না সন্দেহ। বাঙ্গালীকে এখন প্রাণ খুলিয়া হাসিতে বা আমোদ করিতে ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিক স্ফূর্ত্তি স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ লক্ষণ; যে জাতি স্বাস্থ্যসম্পদে আজীবন বঞ্চিত, তাহাদের ভাগ্যে এই সুখভোগের আশা দুরাশামাত্র।

ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালী দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিয়া অধিক দিন সুস্থ শরীরে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। অজীর্ণ, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ রোগের আক্রমণে শিক্ষিত বাঙ্গালীর শরীর কয়েক বৎসরের মধ্যেই অপটু হইয়া পড়ে এবং তাহার উদ্যম, অধ্যবসায় ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়। কোনমতে কয়েক বৎসর কায চালাইয়া কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিতেই অনেকে অকালে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চিরদিনের মত অবসর গ্রহণ করে; অবশিষ্ট লোকের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় শরীর ও মন এরূপ ভাঙ্গিয়া পড়ে যে, কোনরূপ দেশহিতকর কার্য্যের ভার বহন করিবার শক্তি আর কিছুমাত্র থাকে না, অকর্ম্মণ্য দেহভার কোনমতে কিছু দিন বহন করিয়া তাহারা চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকে। যে প্রৌঢ়বয়সে এক জন ইংরাজ নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশের ও দশের কাযে নিজের শারীরিক ও মানসিক শক্তি একান্তভাবে নিয়োগ করিতে সমর্থ হয়, বাঙ্গালী সেই বয়সে অকালবার্দ্ধক্য ও জরাপ্রপীড়িত হইয়া ইহকালের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতির জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে থাকে। সাধারণতঃ ৫০।৫৫ বৎসরের পর উচ্চধীসম্পন্ন বাঙ্গালীর মানসিক পরিশ্রমসাপেক্ষ দায়িত্ব-পূর্ণ কর্ম্ম করিবার সমর্থ্য থাকিতে কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়!

মানসিক পরিশ্রমকুশল কর্ম্মঠ বাঙ্গালীর মধ্যে অধিক-সংখ্যক বৃদ্ধ লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহারা দেশের বড় লোক, সমাজের বিভিন্ন কর্ম্মবিভাগে নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত, কার্য্যক্ষেত্রে যাঁহারা নানা বিষয়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, সেবার জন্য দেশ যাঁহাদের মুখ চাহিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ৫০ বা ৬০ বৎসরের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভারের পেষণে আত্মীয়স্বজনবন্ধুবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রাখিয়া, ইহকাল হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে কতিপয় মনস্বী কর্ম্মবীর বাঙ্গালী কত বয়সে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা উপলব্ধ হইবে :—

সংখ্যা	নাম	মৃত্যুকালের বয়স
১।	কেশবচন্দ্র সেন	৪৫
২।	কৃষ্ণদাস পাল	৪৬
৩।	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৮
৪।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৪৯
৫।	পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব	৫১
৬।	রাজা রামমোহন রায়	৬১
৭।	প্যারীচরণ সরকার	৫২
৮।	স্বামী বিবেকানন্দ	৪০
৯।	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	৫৫
১০।	আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ...	৫৯
১১।	আনন্দমোহন বসু	৫৯
১২।	রমেশচন্দ্র দত্ত	৬১
১৩।	ভূপেন্দ্রনাথ বসু	৬৬
১৪।	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৭১
১৫।	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১
১৬।	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৭৮
১৭।	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৭

ইঁহাদের মধ্যে ৫ জন ৫০এর মধ্যে এবং ১০ জন ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ৩ জন ৬০, ৩ জন ৭০ এবং কেবল ১ জন ৮০ বৎসর অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইঁহারা কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তালিকার শেষোক্ত ৪ জনকে বাদ দিয়া সেই সকল ক্ষেত্রের ইংরাজ কর্ম্মীদিগের সহিত তুলনা করিলে ইংরাজ কর্ম্মিগণকে সচরাচর ১৫ হইতে ২০ বৎসর যথোচিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত কর্ম্ম করিতে দেখা যায়। ইংলণ্ডে লোক গড়ে ৫০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে; বাঙ্গালীর পরমায়ু গড়ে ২৩ বৎসর মাত্র।

এক জন অভিজ্ঞ বহুদর্শী বাঙ্গালী চিকিৎসক বাঙ্গালী জাতিকে মরণ-পথের যাত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি নিতান্ত ভিত্তিশূন্য বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানের মৃত্যুর হার জন্মের হারের অপেক্ষা অধিক হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশের মৃত্যুর হার হাজারকরা ৩০ হইতে ৩২, জন্মের হার ২৮ হইতে ৩০। ইংলণ্ডে বৎসরে প্রতি সহস্র লোকের মধ্যে ৮ হইতে ১০ জন লোকমাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাঙ্গালা দেশের মৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষা হাজারকরা ৩ গুণ অধিক।

বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া যাহারা কোনমতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের আক্রমণে জীর্ণ, শীর্ণ ও বিপন্ন। তাহারা কর্ম্মে অপটু ও উপার্জ্জনে অক্ষম, সুতরাং তাহাদের পরিজনবর্গ দারিদ্র্য-নিপীড়িত এবং অভাবের তাড়নায় শারীরিক ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত। যথোচিত পুষ্টিকর আহারের অভাবে তাহাদের জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের রোগ-প্রতিষেধ করিবার শক্তি (Resisting power) বিশেষ-ভাবে কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং যে কোন রোগের প্রাদুর্ভাবে তাহারাই অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়। এইরূপে জীবনীশক্তি ক্ষয় হইবার জন্য তাহাদিগের বংশে যে সকল পুত্র-কন্যা জন্মিতেছে, তাহারা যে রুগ্ন, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় অবিলম্বে নির্দ্ধারিত না হইলে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব যে কালে লোপ পাইবার সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

শারীরিক পটুতা ও মানসিক শক্তির অভাবে সাধারণ বাঙ্গালী কর্ম্মক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে। যে কার্য্যে শারীরিক

বল, সাহস ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, বাঙ্গালী একে একে সেই সকল কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছে। বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত কলের মজুরদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজমিস্ত্রী, ছুতার-মিস্ত্রী, কামার, গাড়োয়ান, কোচমান্, সহিস, মোটর-চালক, ট্রামওয়ে ড্রাইভার্, রেলওয়ে ড্রাইভার্, গার্ড, ইলেক্‌ট্রিক্ ফিটার, গ্যাস্ জল ও ড্রেণের মিস্ত্রী, এই সকলের কাযই বাঙ্গালার বাহিরের লোক নিজস্ব করিয়া লইয়া বাঙ্গালীকে তাহার জন্মভূমিতে অন্নসংস্থান হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর শক্তি ও সাহস এতই কমিয়া গিয়াছে যে, অন্তঃপুরের সম্ভ্রম এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাহাকে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমদেশবাসী দ্বারবান্ নিযুক্ত করিয়া ইজ্জৎ বাঁচাইতে হয়। পল্লী-গ্রামে দুষ্ট দুর্বৃত্ত লোকের আক্রমণ হইতে তাহার পরিবারস্থ মহিলাগণকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাহার নাই; নিতান্ত লজ্জার বিষয় এই যে, ইহার জন্য সভা-সমিতি করিয়া তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়।

কল-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরাজ ও মাড়োয়ারীদিগের একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আগে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক উর্ব্বর বলিয়া সওদাগরি আপিসে মুৎসুদ্দিগিরি তাহাদিগের একচেটিয়া ছিল। এখন মুৎ-সুদ্দিমাত্রেই মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী মুৎসুদ্দির নাম কচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। সরকারী বিচার বিভাগ, ওকালতী ও ডাক্তারী ভিন্ন এখন বাঙ্গালীকে শিক্ষক, কেরাণী, কন্‌ট্রাক্টর, উমেদার বা বেকারের আকারেই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে, কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে, ব্যবসাক্ষেত্র ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী, শুদ্ধ বাঙ্গালা দেশ নহে, বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যদেশ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য স্থানে নেতৃপদ অধিকার করিয়া শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া-ছিল। ঐ সকল প্রদেশবাসিগণ বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা এবং সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনে যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালীর প্রভাব তাহার মূলে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্গালা তাহার পূর্ব্ব-গৌরব হারাইতে বসিয়াছে। যে সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষায় বাঙ্গালী চিরদিন উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে অধুনা সেই বাঙ্গালীর নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! এখন বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে আচার্য্য জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র, কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, কলা-বিভাগে অবনীন্দ্রনাথ, প্রত্নতত্ত্ববিভাগে রাখালচন্দ্র, পূর্ত্ত ও ব্যবহারিক শিল্প-বিভাগে রাজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েক জন বাঙ্গালীর নাম বাদ দিলে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব-গৌরব নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয় এবং কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা মনে করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্বাস্থ্যহীনতাই কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অকৃতকার্য্যতার যে একটি কারণ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পিতামাতা সুস্থ ও সবল না হইলে বাঙ্গালীর সন্তান-সন্ততি পুনরায় সুস্থ সবল হইয়া জন্মিবে না এবং জীবনসংগ্রামে জয় লাভ করিয়া আপনাদিগের ন্যায্য দাবী-দাওয়া ও অধিকার বুঝিয়া লইতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর বাঙ্গালীর ভীষণ শত্রু। ইহাদিগের কবলে পড়িয়াই বাঙ্গালীজাতির স্বাস্থ্যের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইহাদিগের অত্যা-চারে অনেকানেক সমৃদ্ধিশালী সহর ও গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। তদুপরি কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রকোপে জনসংখ্যা দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। সুবিধার বিষয় এই যে, এই সকল রোগই সংক্রামক, সুতরাং প্রতিষেধ্য। উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অন্যান্য সভ্যদেশ হইতে এই সকল ভীষণ ব্যাধি বিতাড়িত হইয়াছে। যাহা অন্য দেশে সম্ভব হইয়াছে, আমাদের দেশে তাহা সম্ভব হইবে না কেন? তবে এ পর্য্যন্ত যে ইহা সম্ভব হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, সংক্রামক রোগের উৎপত্তির কারণ এবং উহার নিবারণের

উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী পালন সম্বন্ধে ঔদাস্য।

যে যে কারণে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে উহাদিগের বিস্তৃতি নিবারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এক সময়ে আমাদের ধারণা ছিল যে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এই সকল রোগের প্রতীকারের অন্য কোন উপায় নাই। সুখের বিষয় এই যে, এখন লোক বুঝিতে পারিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাইলেও দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় আমরা এই বিপদের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে পারি। এ বিষয়ে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সম্যক আকৃষ্ট হইয়াছে এবং দেশের মধ্যে একটা সমবেত চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। দেশের নানা স্থানে হিতসাধন-মণ্ডলী ও স্বাস্থ্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই সকল সমিতি আলোক চিত্র-সমন্বিত বক্তৃতা (Lantern Lectures) এবং প্রদর্শনীর (Exhibition) সাহায্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সরকারী শিক্ষাবিভাগ বাঙ্গালা দেশের বিদ্যালয়সমূহে এইরূপ শিক্ষাদানের যথারীতি ব্যবস্থা করিয়াছে এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী সহরের মধ্যে পল্লীতে পল্লীতে প্রসূতি-চর্চা, শিশুপালন এবং সংক্রামক রোগের প্রতিষেধ সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করাইয়া করদাতৃগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছে। দেশবাসীর সংখ্যা ও অজ্ঞানতার তুলনায় এই চেষ্টা অকিঞ্চিৎকর হইলেও ইহা সুফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ে জনসাধারণ নিতান্ত উদাসীন ও অবিশ্বাসী ছিল, এখন অনেক স্থলে শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই কার্য্যে গ্রামের সাধারণ লোকের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এক্ষণে লোক বুঝিয়াছে যে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য অধিক কষ্টসাধ্য বা ব্যয়সাধ্য উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। গ্রামের লোকের সমবেত চেষ্টায় এবং সামান্য খরচেই গ্রামকে এই রোগের আক্রমণ হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা করিতে পারা যায়। কলিকাতায় কয়েক বৎসর হইল, রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টা, উদ্যোগ ও পরিশ্রমে সেন্ট্রাল এণ্টিম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটী নামক ম্যালেরিয়া-নিবারণের জন্য যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলেই উপরে উক্ত উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। এই সমিতি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহার কার্য্যক্ষেত্র দুই তিনখানি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সকল গ্রামের লোক মাসে মাসে সামান্য অর্থব্যয় করিয়া এবং কায়িক পরিশ্রম ও সমবেত চেষ্টা দ্বারা সমিতি-নির্দ্দিষ্ট সহযোগ প্রথায় ম্যালেরিয়া-রোগ-প্রতিষেধক সহজ উপায়সমূহ অবলম্বন পূর্ব্বক দুই এক বৎসরের মধ্যে গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এত সহজ উপায়ে যে এরূপ গুরু জীবন-মরণের সমস্যার পূরণ হইতে পারে, তাহা এই সমিতির কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না। যাহা অসম্ভব বলিয়া লোক মনে করিত, তাহা সম্ভব হওয়াতে এই সমিতির কার্য্যের উপর জনসাধারণের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইল এবং এণ্টিম্যালেরিয়া সোসাইটীর কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে লাগিল। এখন এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ৬ শত হইতে ৭ শত কো-অপারেটিভ গ্রাম্য সমিতি বাঙ্গালার বিভিন্ন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণের জন্য দেশের নানা স্থানে একটা মহতী চেষ্টা চলিতেছে। সমিতির এই সমবেত চেষ্টা এতই সুফল লাভ করিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগ ইহার সাফল্য স্বীকার করিয়াছে এবং এই কার্য্যের প্রসারণের জন্য গভর্ণমেণ্ট সমিতিকে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য প্রদান করিতেছেন। কালাজ্বরচিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া কতকগুলি গ্রাম এই ভীষণ রোগের (যাহা এক সময়ে দুরারোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত) প্রকোপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে এবং অনেক গ্রামে ম্যালেরিয়ার অত্যাচার বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে। সমবেত চেষ্টা ও স্বল্প ব্যয়ে রোগপ্রতীকার সম্বন্ধে কিরূপ সুফল লাভ করা যায়, এণ্টিম্যালেরিয়া সোসাইটীর গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালার প্রতি পল্লী যদি কায়মনোবাক্যে এই

সমিতির কার্য্যের সহিত যোগদান করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ করে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, এই দেশ এক দিন ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জনবল ও ধনবলে পুনরায় পূর্ব্বশ্রী লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

খাদ্যের মধ্যে যথোচিত পরিমাণ পুষ্টিকর পদার্থের অভাব বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার আর একটি কারণ—

শরীর পোষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে জল ব্যতীত ৫ প্রকার পুষ্টিকর পদার্থের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক, যথা—(১) আমিষ বা ছানা জাতীয় (Proteins); (২) মাখন বা তৈল জাতীয় (Fat); (৩) শর্করা বা শালিজাতীয় (Carbohydrates); (৪) লবণজাতীয় (Salts); এবং (৫) ভাইটামিন্ (Vitamines)। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত 'খাদ্য' নামক পুস্তকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদার্থের অভাবে বা উহার পরিমাণ কম হইলে শরীর নষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। আমিষ বা ছানাজাতীয় পদার্থ মাংসপেশী ও অন্যান্য যন্ত্রাদির গঠন ও পুষ্টিসাধন এবং পরিশ্রমজনিত ক্ষয় নিবারণ করে। মাখন এবং শর্করাজাতীয় খাদ্য শারীরিক তাপ অপনোদন করে এবং ঐ তাপের কিয়দংশ কার্য্যকরী শক্তিতে পরিণত হইয়া সকল প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য করিবার জন্য বল প্রদান করে। মাংসপেশীর গঠন বা পুষ্টি-সাধন করিবার ক্ষমতা ছানাজাতীয় খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন জাতীয় খাদ্যের নাই। এই তত্ত্বটুকু আমাদিগকে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বাঙ্গালীর খাদ্যের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে ছানাজাতীয় (Protein) খাদ্যের পরিমাণ কম থাকে এবং শর্করা বা শালিজাতীয় (Carbohydrates) খাদ্যের পরিমাণ অযথা অধিক পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য অন্ন। প্রস্তুত অন্নের মধ্যে মোটামুটি শতকরা ৫ ভাগ মাত্র ছানাজাতীয় পদার্থ থাকে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও ডালের মধ্যে ছানাজাতীয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকে। রুটীর মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ দ্বিগুণ পরিমাণে থাকে। কিন্তু বাঙ্গালী অন্নগতপ্রাণ, দুই বেলা ভাত খাইতে পাইলেই সে সন্তুষ্ট, সে রুটীর ভক্ত নহে। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ যেরূপ মহার্ঘ্য হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এই সকল পুষ্টিকর খাদ্য যথোচিত পরিমাণে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যথাপরিমাণ ডাল খাইলে মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতির অভাব পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু ডাল দুষ্পাচ্য বলিয়া জনসাধারণের মনে যে ভ্রান্ত সংস্কার আছে, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী যথোচিত পরিমাণ ডাল ব্যবহার করিতে সাহসী হয় না। এ স্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, ডাল সম্পূর্ণ গলিয়া গেলে এবং ঘন করিয়া রন্ধন করা হইলে উহা পরিপাক করিতে আয়াস পাইতে হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রোটীনের অভাব বশতঃ তাহার মাংসপেশী পূর্ণভাবে গঠিত ও সবল হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী যুবক ছাত্রদিগের খাদ্যে যে পরিমাণ প্রোটীন থাকা উচিত, সচরাচর তাহার ⅔ ভাগেরও কম থাকে। একজন বাঙ্গালী যুবকের খাদ্যে দেড় ছটাক (৩ আউন্স) পরিমাণ প্রোটীন্ থাকা উচিত, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ছাত্রদিগের খাদ্যে এক ছটাকের (২ আউন্স) অধিক থাকে না। সাধারণ গৃহস্থ বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রোটীনের ভাগ ইহা অপেক্ষাও অনেক কম থাকে। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর খাদ্যের এরূপ দুরবস্থা ছিল না; তখন বাঙ্গালীর খাদ্য বেশ পুষ্টিকর ছিল এবং বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। দেশে তখন দুধ ও মাছ যথেষ্ট পরিমাণে সুলভমূল্যে পাওয়া যাইত, সুতরাং সামান্য অবস্থার বাঙ্গালীও অন্নের সহিত দুধ ও মাছ ভক্ষণ করিয়া শরীরপোষণোপযোগী যথোচিত পরিমাণ প্রোটীন প্রাপ্ত হইত। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মাছ সস্তা বলিয়া সেখানকার লোক ভাতের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ মাছ খাইতে পায়, সুতরাং তাহাদের দৈনিক খাদ্যে প্রোটীনের অভাব হয় না। এই জন্য তাহাদের স্বাস্থ্য এবং দেহের পরিসর, গঠন ও শক্তি পশ্চিম-বাঙ্গালার লোকের অপেক্ষা অনেক উন্নত। তাহারা বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও তেজীয়ান্ এবং রোগপ্রতিরোধ করিবার শক্তি আমাদের অপেক্ষা তাহাদের অনেক অধিক। খাদ্যে প্রোটীনের

পরিমাণ কম হইলে দেহ সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না; শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, কার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি থাকে না, মাংসপেশীর দৃঢ়তার অভাবে অধিক পরিশ্রমজনক কার্য্য করিবার সামর্থ্যের অভাব হয় এবং সংক্রামক রোগ প্রতিষেধ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাঁহারা অধিক পরিমাণ মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন, সহজ-পরিপাচ্য প্রোটীন পদার্থ তাঁহাদের খাদ্যে যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহার অভাবে তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ, শরীর দুর্ব্বল ও মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী যুবকদিগের খাদ্যে প্রোটীন বা ছানা-জাতীয় উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার অভাবে তাহাদিগের শরীর যথোচিত বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না এবং তাহারা দুর্ব্বল, নিরুৎসাহী, নিস্তেজ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রোটীনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ ভাতের অংশ কমাইয়া উহার পরিবর্ত্তে রুটীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। রুটীতে ভাত অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক প্রোটীন থাকে, সুতরাং এক বেলা ভাত এবং এক বেলা রুটী খাওয়ার ব্যবস্থা হইলে এই বিষয়ে অনেক সুবিধা হইবে। ভারতবর্ষে যাহারা রুটী ও ডাল খায়, তাহাদের দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য "ভেতো" বাঙ্গালী অপেক্ষা যে অনেকাংশে উন্নত, এ কথা, বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রোটীন খাদ্য এত বহুমূল্য যে, তাহা সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অধিকন্তু অনেক বাঙ্গালী (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ) মাংস বা ডিম স্পর্শ করেন না। এরূপ স্থলে যদি তাঁহারা ডাল কিছু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে অতি অল্প খরচেই, তাঁহাদের খাদ্যে যে প্রোটীনের অভাব আছে, তাহা সহজেই পূরণ করিয়া লইতে পারেন। মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ অপেক্ষা ডালে অধিক পরিমাণে প্রোটীন্ থাকে এবং ডাল যদি সুসিদ্ধ হয় ও ঘন করিয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে ডাল পরিপাক হইতে অধিক বিলম্ব হয় না বা অধিক আয়াস পাইতে হয় না। বিশেষতঃ, ডাল মিষ্টান্ন, বড়া, বড়ী, ধোঁকা, সিদ্ধ প্রভৃতি নানা আকারে গ্রহণ করিলে উহার পরিমাণও বাড়িয়া যায় অথচ আহারও তৃপ্তিকর হইয়া থাকে। যাঁহারা খরচ করিতে সমর্থ অথচ মাংস, ডিম প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে যাঁহাদের কোন আপত্তি নাই, ভাতের পরিমাণ কমাইয়া এই সকল খাদ্য যথোচিত পরিমাণে ভক্ষণ করিলে শীঘ্রই তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষিত হইবে। বৈকালিক জলখাবারের জন্য অনেকেই দূষিত ভেজাল-ঘৃত-পক্ক বাজারের মিঠাই ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহাতে অনেক স্থলে জীবনব্যাপী অজীর্ণ রোগের সূত্রপাত হয়। বাজারের মিঠাইয়ের পরিবর্ত্তে ছানা ও চিনি অথবা মুড়ি, ছোলা বা মটর ভাজা এবং নারিকেলের শাঁস ও কলার ব্যবস্থা হইলে ভেজাল জিনিষ খাইতে হয় না অথচ এরূপ খাদ্য হইতে অধিক পরিমাণ প্রোটীন্ ও অন্যান্য সার পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। যাঁহারা আমিষ পদার্থ ভোজন করেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে কিয়ৎপরিমাণ দুধ গ্রহণ করিতে পারিলে ভাল হয়। দুধ বাঙ্গালীর এতই প্রিয়-খাদ্য যে, দিনে একটু দুধ না খাইলে আহার সম্পূর্ণ হইল বলিয়া তাহার মনে হয় না। নিম্নে সাধারণ বাঙ্গালীর জন্য একটি দৈনিক খাদ্যের তালিকা প্রদত্ত হইল। এই পরিমাণ খাদ্য সমস্ত দিনে ৩ বারে ভাল করিয়া খাইলে তাহার দেহের সম্যক্ পুষ্টি-সাধন ও বলবিধান সম্পন্ন হইবে। অন্যান্য কাযে খরচ বাঁচাইয়া পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য কিছু বেশী ব্যয় করিলে জাতির স্বাস্থ্য শীঘ্র উন্নতি লাভ করিবে।

তালিকা

খাদ্য	পরিমাণ
চাউল	৩ ছটাক
আটা	৫ "
ডাল	১½ "
মাছ বা মাংস	২½ "
আলু	২ "
অন্য তরকারি	২ "
ঘৃত বা তৈল	½ "
দুগ্ধ	৮ "
লবণ	½ "
মসলা ইত্যাদি	যথা পরিমাণ

যাঁহারা মাছ বা মাংস না খাইবেন, তাঁহারা ডালের পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিলেই তাঁহাদের খাদ্যে যথোচিত পরিমাণ প্রোটীনের অভাব পূর্ণ হইবে। যাঁহারা মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিবেন, তাঁহাদের তালিকা-নির্দ্দিষ্ট চাউল বা আটার পরিমাণ কিছু কমাইয়া দিতে হইবে। যথোচিত পরিমাণ ভাইটামিন্ সংগ্রহ করিবার জন্য জলে ভিজান অঙ্কুরযুক্ত ছোলা, মটর অথবা মুগ এবং সময়োপযোগী কাঁচা ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিলে খাদ্যে এই দ্রব্যের অভাব হইবে না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রাতে ভিজা ছোলা ও গুড় খাইবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা অতি সুসঙ্গত; ইহা দ্বারা আমাদের প্রোটীন্ ও ভাইটামিন্, এ দুই পদার্থই সংগ্রহ করিবার সুবিধা হইত।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার আর একটি কারণ এই যে, বাঙ্গালী ব্যায়াম করিতে একান্ত বিমুখ। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন মাত্র কোনরূপ খেলা-ধূলা বা ব্যায়ামচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকে, বাকি ৬২ জন ছাত্র মোটেই কোনরূপ শরীর-চালনা করে না। ছাত্র-জীবন অতিক্রম করিয়া যখন আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হই, তখন ব্যায়ামচর্চ্চা আমরা একেবারেই পরিত্যাগ করি এবং শারীরিক পরিশ্রমঘটিত কোন কার্য্য করিতে আমাদের নিতান্ত বিরক্তি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে ব্যায়াম বা পরিশ্রমঘটিত কার্য্যে এরূপ অস্বাভাবিক বিরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজ এবং ভারত-বর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসিগণ আজীবন ব্যায়ামের চর্চ্চা করিয়া থাকে; তাহার ফলে তাহাদের বৃদ্ধবয়সেও শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ এবং মন প্রফুল্ল, সতেজ ও উদ্যমশীল থাকে এবং তাহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে। মস্তিষ্ক-চালনার প্রভাবে এবং শরীর-চালনার অভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালী যৌবনেই অজীর্ণ, বহুমূত্র, বাত (gout) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালবার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয় এবং প্রৌঢ়াবস্থা অতীত হইবার পূর্ব্বেই অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি তদধীন প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে বাধ্যতামূলক ব্যায়ামচর্চ্চার (Compulsory physical training) প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগের খাদ্য সম্বন্ধে যাহাতে উন্নতি-লাভ হয়, তাহার জন্যও যত্নবান্ হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এই মহতী চেষ্টা পূর্ণ সাফল্যলাভ করুক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কোন না কোনরূপ ব্যায়ামচর্চ্চা করিলে জাতির স্বাস্থ্য যে শীঘ্রই উন্নত হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর কোন কার্য্যই শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, সকল কার্য্যেই নিয়মের (method) অভাব লক্ষিত হয়। **ইহাও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার আর একটি কারণ।** বাঙ্গালী সব দিন এক সময়ে স্নান বা আহার করে না, তাহার নিদ্রা ও বিশ্রামের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, তাহার পাঠ বা কাযেরও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। সে সুবিধামত যে দিন যখন ইচ্ছা, স্নান ও আহার করে এবং সুবিধামত বিশ্রামভোগ করে এবং নিদ্রার অধীন হয়। ইংরাজদিগের ভিতর এরূপ অনিয়ম প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের দুই বেলা ভোজন, কর্ম্ম, ব্যায়াম ও ক্রীড়া-কৌতুকের সময় ঘড়ী ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে, অত্যন্ত গুরু কারণ উপস্থিত না হইলে তাহারা ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে না। এই সকল বিষয়ে নিয়মের অধীনে না থাকিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও শরীর শীঘ্রই অপটু হইয়া পড়ে। আমাদের সকলের এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার অপর একটি কারণ সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কারণটি গুরুতর, ইহার দ্বারা জাতির স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। **ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব এবং বিবাহিত-জীবনে সংযমের অভাবে আমাদের জাতির জীবনীশক্তি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হই-তেছে এবং আমরা দিন দিন দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছি।** সামান্য অবস্থার গৃহস্থদিগের সংযমের অভাবে দেশে দীন-দুঃখী, ভিক্ষুক ও বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই-তেছে এবং অন্নসমস্যা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠি-তেছে। এখন পুত্র-কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু অসংযমের প্রভাবহেতু সমাজ তাহার সুফল

লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। পূর্ব্বে সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও আচার ও নিয়মের এরূপ বাঁধাবাঁধি ছিল যে, বাল্যবিবাহের কুফল সমাজকে বিশেষ-ভাবে পীড়িত করিতে পারিত না। সাধারণতঃ দুর্ব্বল জাতির মধ্যে ইন্দ্রিয়চর্চ্চা প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। ছাত্রজীবনে কোনরূপ ইন্দ্রিয়ঘটিত অসংযম ঘটিলে সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হয় এবং জীবন অনেক সময়ে দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। বিবাহিত জীবন কেবল ইন্দ্রিয়সেবার জন্য নহে, এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জীবনের সকল অবস্থাতেই সংযমের অধীন হইয়া চলিলেই আমরা পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিয়া মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীচুণিলাল বসু।

দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি !

যুক্তির সাহায্যে ছিল শুদ্ধির ব্যবস্থা। চটীজুতো গড়ে মোর ফিরেছে অবস্থা॥

হরিণের আত্মোৎসর্গ

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদিগের মহাসভার যে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার পর অনেক কাল গত হইয়াছে। সেই প্রথম মহাসভার সভাপতি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ অমিতোদর এবং ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহোদয়দ্বয়ের প্রাণপাত চেষ্টায় ব্যাঘ্ররাজ্যে অতি আশ্চর্য্য শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"কুৎসাকারী খলস্বভাব অন্যান্য পশুবর্গ" সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলীর বশ্যতাস্বীকার করিয়া পরম সুখে বাস করিতেছে। এমন কি, কেহ কেহ ব্যাঘ্রদের মত সভ্য ও পণ্ডিতও হইয়াছে। ব্যাঘ্রগণ সকল কার্য্যে "জাতি-হিতৈষিতা" প্রকাশ পূর্ব্বক নানাবিধ পশু হনন করিয়া-ইদানীং পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। কেবল মৃগজাতীয় যুবকগণ মাঝে মাঝে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া থাকে; সে জন্য তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কড়া-শাসনে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উহাদের কোন প্রকার বেয়াদপি মাপ করা হয় না। কোন ব্যাঘ্র যদি দয়া করিয়া কোন মৃগ-যুবকের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তাহা হইলে দৌড়াইয়া পলায়ন করা আইনমতে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং ধরা পড়িলে প্রাণদণ্ড হয়। সভ্যতা-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রগণ মৃগীদিগকে হত্যা করেন না। তাঁহাদের অর্থ-সচিব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, মৃগী-ভোজনের ব্যবস্থা করিলে, মৃগবংশ লোপ হেতু সুন্দরবন-রাজ্যে খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে।

পরম দয়াল ব্যাঘ্রজাতির দ্বারা সুশাসিত ও সুরক্ষিত হইয়াও একদা এক শিক্ষিত মৃগ-যুবক, তাহাদের এলাকার শাসনকর্ত্তা ব্যাঘ্র-মহাশয়ের বিষ-নয়নে পতিত হইল। তাঁহার মনে হইল, মৃগ-যুবকটির চালচলন সন্দেহ-জনক। গোপনে অনুসন্ধান করিয়া ব্যাঘ্র-প্রবরের সন্দেহ বাড়িয়া গেল। এক দিন তাহাকে অদূরে বিচরণ করিতে দেখিয়া ব্যাঘ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, তোমার সহিত কথা আছে।"

প্রভুর বিকশিত দশনরাজির শোভা মৃগযুবকের মোটেই রুচিকর মনে হইল না, সে আদেশ অমান্য করিয়া দৌড় দিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা—তিন লম্ফে ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার সুকোমল গ্রীবা ধারণ করিলেন এবং ব্যাঘ্র-ভাষায় কহিলেন, "যেহেতু তুমি আমার প্রথম ডাক শুনিয়া আইস নাই এবং আমাকে দৌড়াইবার ক্লেশ স্বীকার করাইয়াছ, সেই জন্য তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। কিন্তু আজ আমার আহার হইয়াছে, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীও ভূরিভোজনে তৃপ্তা। তাহার উপর গৃহে কিছু খাদ্য মজুত আছে। অতএব তোমাকে ঐ গর্ত্তে বন্দী থাকিতে হইবে রক্ষীরা তোমাকে চোখে চোখে রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঘাস-জল খাইতে দিবে। তাহার পর সম্ভবতঃ—হাঃ হাঃ—আমি তোমাকে ক্ষমা করিব।"

অসহায় মৃগ অগত্যা গর্ত্তে গিয়া বসিল।—অনিশ্চিত কালের এই কারাদণ্ড! কত দিন, কত মাস পরে তাহাকে মরিতে হইবে, কে জানে? কারাগারের দ্বারে চাহিয়া দেখিল, ব্যাঘ্র প্রহরীর চক্ষু দুইটি আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিতেছে! দিবারাত্রি তেমন তীব্র চাহনি—অসহ্য! মাঝে মাঝে আবার কর্ত্তা বাঘ বাঘিনীকে লইয়া পরিদর্শনে আইসেন—চারি চক্ষুর সেই ক্ষুধিত দৃষ্টি,—কি মর্ম্মান্তিক! বাঘ ও বাঘিনী, ব্যাঘ্র-ভাষায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলাবলি করে, তাহার পর দুই জনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিয়া উভয়ে উভয়ের গায়ে গড়াইয়া পড়ে! বাঘের বাচ্ছাগুলি একেবারে তাহার গায়ে আসিয়া পড়ে; সাদা সাদা তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য ওৎ পাতে—মৃগ-যুবকের ক্ষুদ্র প্রাণটি বাহির হইবার অপেক্ষায় বুকের কাছে ধুক ধুক করিতে থাকে।

জীবনের প্রতি এত মমতা সে কখনও অনুভব করে নাই। বাঁচিয়া থাকিবার সাধ যেন তাহার সারা অঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠে। সম্ভ্রান্ত মৃগবংশে তাহার জন্ম, নব-বিবাহিতা মৃগবধূকে সে নদীতীরে লতাকুঞ্জে ফেলিয়া আসিয়াছে। সেই বিরহাতুরা ভীতা চকিতা মৃগবধূর সজল-আয়ত চক্ষু দুইটি ভাবিতে ভাবিতে সে গৃহে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে এই দুর্দ্দৈব!

মৃগবধূ কি করিবে? সে ত এ দুঃসংবাদ পায় নাই।

হয় ত অভিমানিনী বালিকা মনে করিবে, আমি তাহাকে ছলনা করিয়া অন্য কোথাও গিয়াছি! না, সে অপলকে আমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে, শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরে চকিতে চমকিয়া চারিদিকে চাহিবে—তাহার পর অন্য কোন ভাগ্যবান্ মৃগ আসিয়া তাহার ব্যথিত দেহ লেহন করিবে, যে আবেশ-পুলকে চক্ষু মুদিবে অথবা তাহাকেও কোন গুপ্তচর ব্যাঘ্র—ওঃ, আর ভাবিতে পারি না।

হরিণ কান্দিয়া ফেলিল। সংসারে কত সুখের আশা করিয়াছিলাম……মৃত্যুর আর বাকী কি!

. সে দিন সকালবেলায় সে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময় তাহার স্ত্রীর ভ্রাতা ধীর শঙ্কিত পদে কারাগারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কাতর কণ্ঠে বলিল, "তোমার বিধবা বৃদ্ধা মাতা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তোমার অনিশ্চিত কালের জন্য বন্দী হওয়ার সংবাদ শুনিবার পর হইতে আমার ভগিনীও ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। মাতার শ্রাদ্ধ ও পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একবার তোমার যাওয়া প্রয়োজন।"

নিদারুণ দুঃসংবাদে বন্দী মৃগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কি অপরাধে ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাস! সে চিরদিন নিতান্ত নিরীহ "ভালমানুষের" মত জীবন কাটাইয়াছে। কখনও কোন মৃগকে বিদ্রোহের উত্তেজনা দেয় নাই; গোপনে কোনরূপ অস্ত্র লইয়া ভ্রমণ করে নাই; মাতা ও স্ত্রীর সহিত বনপ্রান্তে চরিয়া বেড়াইয়াছে; নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে! এই অপরাধে তাহার মাতা আজ পরলোকে—তাহাকেও মরিতে হইবে। আর সেই সরলা হরিণী, বুকভরা অতৃপ্ত ভালবাসা লইয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া মরিবে। হায়, যদি এই মুহূর্ত্তেই সে তাহার নিকট ছুটিয়া যাইতে পারিত! সেই তরুতলে অর্দ্ধ-মুদিতনয়ন শিথিল দেহখানি লেহন করিয়া কত সোহাগ করিত! সেই কোমল মসৃণ গ্রীবার স্নিগ্ধ সরল—

নবাগত মৃগ নিম্ন স্বরে কহিল, "চল, আমরা পলাইয়া যাই।"

বন্দী মৃগ চমকিয়া উঠিল। ভীত নেত্রে চারিদিকে চাহিল; এক বার মনে হইল, প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াইলে কেহ কি ধরিতে পারিবে? এমন সময় অদূরে দণ্ডায়মান বাঘ ও বাঘিনীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। উত্তেজিত মৃগের হৃদয় মুহূর্ত্তে অবসন্ন হইল। বেদনাক্লিষ্ট স্বরে সে কহিল, "আমি কেমন করিয়া যাইব, বন্ধু? ব্যাঘ্র মহাশয়ের অনুমতি ত এখনও পাই নাই।"

দুইটি অসহায় প্রাণী যখন কথা বলিতেছিল, তখন ব্যাঘ্র মহাশয় সস্ত্রীক অদূরে দাঁড়াইয়া উভয়ের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন, আর ব্যাঘ্র-ভাষায় পত্নীকে কি যেন বলিতেছিলেন; বোধ হয়, তাঁহার আদেশের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া বন্দী মৃগ-যুবকের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছিলেন!

বন্ধু মৃগ নিম্ন স্বরে কহিল,"পলাইয়া চল! এখন ত আর তোমাকে কারাগারে রাখে না, তবে আর পলাইতে বাধা কি?"

বন্দী মৃগ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,"এই আটক অবস্থার চেয়ে কারাগার ঢের ভাল! ঐ যে সীমাবদ্ধ জঙ্গলে চরি, কত রকমের বাঘ-বাঘিনী ক্ষুধিত হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। এই শত চক্ষু এড়াইয়া পলাইতে গেলেই প্রাণে মরিব। সুন্দরবনরাজ্যে বাস করিয়া লুকাইয়া থাকিব কোথায়?"

ব্যাঘ্র মহাশয় লম্ফ দিয়া নিকটস্থ হইলেন, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ফিস ফিস্ করিয়া কি ষড়যন্ত্র করিতেছ?"

অসহায় মৃগদ্বয়ের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। বন্দীকে পলায়নের উত্তেজনা প্রদান—ভীষণ অপরাধ। হায়, মৃগ-বধূ একসঙ্গে বুঝি স্বামী ও ভ্রাতা হারাইল! বাঘ ও বাঘিনী যত নিকটে আসিয়াছে, তাহারা ত খাইয়া ফেলিতেও বিচিত্র নাই।

বন্দী হরিণ বাঘের দন্তঘর্ষণের শব্দে চৈতন্য পাইয়া জড়িত স্বরে কহিল, "হুজুর, এ কিছু নয়—এ বলিতেছিল, আমার বিধবা মাতা পুত্রশোকে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।"

ভয়ে অর্দ্ধমৃত হরিণকে ধমক দিয়া ব্যাঘ্র কহিলেন,—"তোমার মা মরিয়াছে, তাহার আবার শ্রাদ্ধ কি?"

"হুজুর, ওটা আমাদের ধর্ম্মকার্য্য—না করিলে জাতি যাইবে। আপনাদের আইনে ত ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয় না। অতএব আমাকে মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য

কয়েক দিনের ছুটী দিন! আমি আবার ফিরিয়া আসিব।"

"একটা অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধা মরিয়াছে, সে জন্য আনন্দিত হও! তোমাদের কুসংস্কারের প্রশ্রয় আমরা দিব না।"

নবাগত হরিণ অতি চতুর, সে সজল নয়নে বাঘিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কেবল মা-ই মরে নাই। আমার ভগিনী, উঁহার পত্নীও মৃত্যুশয্যায়। মরিবার পূর্ব্বে এক বার দেখা করিতে চায়। আপনারা এক হতভাগিনী মৃগ-নারীর প্রতি কি ব্যাঘ্রোচিত উদারতা প্রকাশ করিবেন না?"

বাঘিনী মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"হাঁ, এ ক্ষেত্রে দয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে! কোন তরুণী মৃগী মরুক, ইহা আমরা বাঞ্ছা করি না। উহাতে রাজ্যের বিষম ক্ষতি। আমাদের ব্যাঘ্রবংশের দিন দিন যে প্রকার বৃদ্ধি, তাহাতে প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন। মৃগীরা প্রেমের বিকারে মরিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের সংখ্যা-হ্রাস হইবে। অতএব হে প্রিয়তম স্বামী, এই মৃগকে কয়েক দিনের ছুটী দিন!"

"কিন্তু আমার আদরিণী, আর পাঁচ দিন পরে যে উহাকে আমরা খাইয়া ফেলিব, নির্দ্ধারিত হইয়াছে।"

বন্দী মৃগ ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বলিল, "হুজুর, ধর্ম্মাবতার, আমি পাঁচ দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব। ঈশ্বরের নামে শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি—আমি আসিবই!"

উৎকণ্ঠিত মৃগ ব্যাঘ্র মহাশয়ের শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অনুমতি করাইবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল; তীরবেগে ছুটিয়া যাইবার জন্য তাহার চরণ চঞ্চল হইয়া লম্ফ প্রদান করিল। সেই লঘুভঙ্গিম-নৃত্য-চঞ্চল মৃগ-চরণ-চতুষ্টয়ের মনে মনে প্রশংসা করিয়া ব্যাঘ্র মহাশয় ভাবিলেন,—আমাদের ব্যাঘ্র-সৈনিকগণ যদি ঐরূপ দ্রুত চলিতে পারিত?

মৃগের পত্নী-প্রীতি দেখিয়া বাঘিনী বাঘের গা ঘেঁসিয়া বিষাদ-খিন্ন-কণ্ঠে কহিল,—"দেখ, অর্দ্ধ-সভ্য মৃগরাও স্ব স্ব পত্নীকে কত ভালবাসে! আমাদের সভ্য বাঘদের মধ্যে দাম্পত্য-বন্ধন কত শিথিল!"

বাঘ সে কথায় কান না দিয়া বলিল,"উত্তম, তোমাকে ৪ দিনের ছুটী দেওয়া গেল। ৫ দিনের দিন ভোর ৮টায় তুমি আমার আফিসে আসিয়া এত্তালা দিবে।"

ব্যাঘ্র মৃগকে ছুটী দিলেন বটে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধী মৃগকে জামিনস্বরূপ রাখিলেন।

"যদি তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিয়া না আইস, তাহা হইলে তোমার বন্ধুকে খাইয়া ফেলিব এবং পরে তোমাকেও খাইয়া ফেলিব। যদিও···সম্ভবতঃ···আমি···তোমাকে ক্ষমাও করিব!"

মুক্তি পাইয়া মৃগ তীরের মত ছুটিয়া চলিল। কত ছোট বড় নদী-নালা লাফাইয়া, কত কাঁটাবন ভেদ করিয়া সে ছুটিয়া চলিল—সেই নদীতীরে ঘন সুন্দরীবনের অন্তরালে শুষ্ক-পত্র-শয্যায় শায়িতা বিরহিণী মৃগীর মুখখানি চিন্তা করিয়া সে যেন বহির্জ্জগৎ বিস্মৃত হইল!

ঐ সেই পরিচিত প্রিয় বাসস্থান! মিলনের সে করুণ-দৃশ্য মুখে বলা যায় না, লেখনীতে লেখা যায় না।

প্রিয়দর্শনমুগ্ধা হরিণী রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া শয্যোপরি উঠিয়া বসিল; পিছনের পা দুইখানিতে ভর দিয়া উঠিতে গিয়া আবার পড়িয়া গেল! ক্রমে প্রতিবেশী হরিণ-হরিণীরা খবর পাইয়া মৃগকে দেখিতে আসিল। দুই এক জন বিজ্ঞ হরিণ ভয়ে কাছে আসিল না—পাছে ব্যাঘ্রের কোপানলে পড়িতে হয়।

দুই দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। তৃতীয় দিন মাতৃ-শ্রাদ্ধের পর, সন্ধ্যাবেলা সে আসিয়া প্রেয়সীর পার্শ্বে বসিল, সাদরে গ্রীবা-লেহন করিতে করিতে বলিল, "কল্য প্রভাতে আমাকে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

"কেন?"

"ব্যাঘ্র মোটে ৪ দিনের ছুটী দিয়াছে। আমাকে ফিরিতেই হইবে।"

পরদিন প্রভাতে হরিণের বন্ধুগণ আসিল। কেহ বলিল,—'যাইও না, আমরা তোমাকে লুকাইয়া রাখিব।"

বন্দী হরিণ সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিল। সত্যরক্ষা মৃগধর্ম্ম—কোন মৃগ সত্য ভঙ্গ করে নাই। তাহার আবেগময় বক্তৃতায় সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"হে বীর-হৃদয় বন্ধু, তুমি সত্যব্রত! আমাদের মৃগজাতি সত্যভঙ্গকারীকে চিরদিন ঘৃণা করে। সকলের ঘৃণিত হইয়া বাঁচিয়াই বা কি ফল?"

মৃগ পত্নীকে আদর করিয়া বলিল,—"প্রিয়তমে!

দুঃখকে বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হও। যদি আমাদের সন্তান হয়, তাহা হইলে তাহাকে সুশিক্ষা দিও। বলিও, তোমার পিতা হরিণ-জাতির কল্যাণে আত্মবলি দিয়াছে। তাহাকেও সেই ভাবে শিক্ষা দিও।" সহসা ব্যাঘ্রের কথা মনে করিয়া সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "আবার এমনও হইতে পারে, ব্যাঘ্র আমাকে হাঃ হা.—ক্ষমাও করিবেন।

বিদায়ের পালা শেষ করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। তথাপি মৃগ হিসাব করিয়া দেখিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে সে উপস্থিত হইতে পারিবে। কিন্তু পথে আসিয়া সে দেখিল, ছোট ছোট খালগুলি জোয়ারের জলে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই তীব্র স্রোতে সাঁতার দিয়া পার হওয়া সহজ নহে। কিন্তু উপায় নাই! কয়েকটি খাল সাঁতরাইয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল। সূচিভেদ্য অন্ধকারে কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, বৃক্ষকাণ্ডে প্রতিহত হইয়া রক্তাক্তকলেবর মৃগ ছুটিয়া চলিল! এখনও বহু দূর—তাহার মনে পড়িল, সেই বাল্যবন্ধুর কথা! সে মুক্তির আশায় করুণ নয়নে তাহারই আসা-পথ চাহিয়া আছে! আমার জীবনে ত কোন আশা নাই—তাহাকে যদি বাঁচাইতে পারি; সে ত ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে!

ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের তীক্ষ্ণ নখদন্তের দয়াহীন আক্রমণ হইতে বন্ধুকে রক্ষা করিবার জন্য সে নিজের দুঃখ ভুলিল। রজনী প্রভাতপ্রায়। পেচক কোটরে গেল, বাদুড় ঘন-পত্রচ্ছায়ায় আত্মগোপন করিল। শীতল সজল বাতাসে মৃগের ক্লান্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। বন্যপশুগণের চীৎকার থামিয়া গেল। সমস্ত অরণ্যানী যেন মৃত্যুর মত স্তব্ধ! কেবল মৃগ ছুটিয়া চলিয়াছে—কেবল এক চিন্তা—বিলম্ব হইলে বন্ধু আমার প্রাণ হারাইবে!

পূর্ব্বাকাশে রঙ্গিন মেঘের গায়ে আগুন যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে; সহসা শিখা জ্বলিয়া উঠিল! সবুজ তৃণের শীর্ষে দোদুল শিশিরবিন্দুগুলি ঝলমল করিতে লাগিল; গাছে গাছে পাখীর কলরব—প্রভাত-সমীরে লতায় পাতায় কি যেন আনন্দ-বার্ত্তার কানাকানি চলিতে লাগিল। মৃগ কিছু দেখিল না, কিছু শুনিল না। সীমাহীন মরণযাত্রার পথে দাঁড়াইয়া তাহার ব্যথিত স্মরণে কেবলই বাজিতে লাগিল, আমি বন্ধুকে হত্যা করিলাম—আমি কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক! ঐ জলাভূমি! তাহার পরেই বনপ্রান্তে ঐ উচ্চভূমি! কিন্তু এখনও এক ঘণ্টার পথ! বিলম্ব—বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে!

সাধ্যাতীত কার্য্যের জন্য সে অমিতবলে অগ্রসর হইল! কর্দ্দমাক্ত জলাভূমিতে পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল! প্রোথিত পদ আর যেন তুলিতে পারে না! শ্রমক্লান্ত দেহ এলাইয়া পড়িতে চাহে! পড়িলে সে কি আর উঠিতে পারিবে?

ব্যাঘ্র-প্রাসাদে প্রাভাতিক ঘণ্টাধ্বনি হইল। ব্যাঘ্র মহাশয় শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। আনন্দে লাঙ্গুল দুলাইয়া তিনি প্রাতরাশের জন্য মৃগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বিনাবাক্যব্যয়ে সম্মুখের পদনখরে মৃগকে বিদ্ধ করিয়া টানিয়া আনিলেন। সন্তানগুলি সহ বাঘিনী আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। মৃগটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার জন্য ব্যাঘ্র আর এক পদে তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন।

"আমি আসিয়াছি—আমি আসিয়াছি"—মৃগের চীৎকারের মধ্য দিয়া যেন সমগ্র অসহায় মৃগ-জাতি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! কাতর কম্পিত দেহে সে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল! ব্যাঘ্র সোল্লাসে তাহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"তাই ত, মৃগদের কথায় বিশ্বাস করা যায় দেখিতেছি! সে যাহা হউক, এখন আমার আদেশ শুন, তোমরা একটু বিশ্রাম কর, এবং যদি কোন কথা বলিবার থাকে, বলিয়া লও, ইতোমধ্যে আমি প্রস্তুত হইতেছি, এবং পরে আমি...হাঃ···হাঃ···তোমাকে ক্ষমা করিব।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

দুনিয়ার চিড়িয়াখানা

কাসেম ফকির চশমা দিলে, চোখে তাই এঁটে।
গামছা কাঁধে ঘুরে এলাম মাইলখানেক হেঁটে ॥

আজব মজার ব'সে গেছে দেখি ভবের বাজার।
চল্‌ছে ফিরছে আস্‌ছে যাচ্ছে মূর্ত্তি হাজার হাজার

দু' পায়েতে দাঁড়ায় তারা মানুষ পরিচয়।
কিন্তু ভিতর থেকে উঁকি মেরে জন্তু কথা কয় ॥

পুরুষসিংহ

বক্ষেতে রুদ্রাক্ষ প্রত্যক্ষ হর্য্যক্ষ জটাজালমণ্ডিত মুণ্ডু।
শীকারের তরে থাবা দু'টি গেড়ে ব'সে আছে শিবু কুণ্ডু ॥

ফড়িং

ফড়িং যেন তিড়িং মারে লম্বা শুক্নো গরাণ ।
উকীল-বাড়ীর বিল-সরকার আমাদের পরাণ

পা-চাটা কুকুর

কুড়োরাম নাম এর বাড়ী ঝামাপুকুর ।
বড়বাবুর পা-চাটা আফিসের কুকুর ॥

সুখের পায়রা

বয়েস উচক্কা কবুতরী লক্কা তোয়াক্কা রাখে না কা'র।
কর্ম্মকালে রোগ নর্ম্ম সুখভোগ ধর্ম্মের ধারে না ধার॥

ধর্ম্মের ষাঁড়
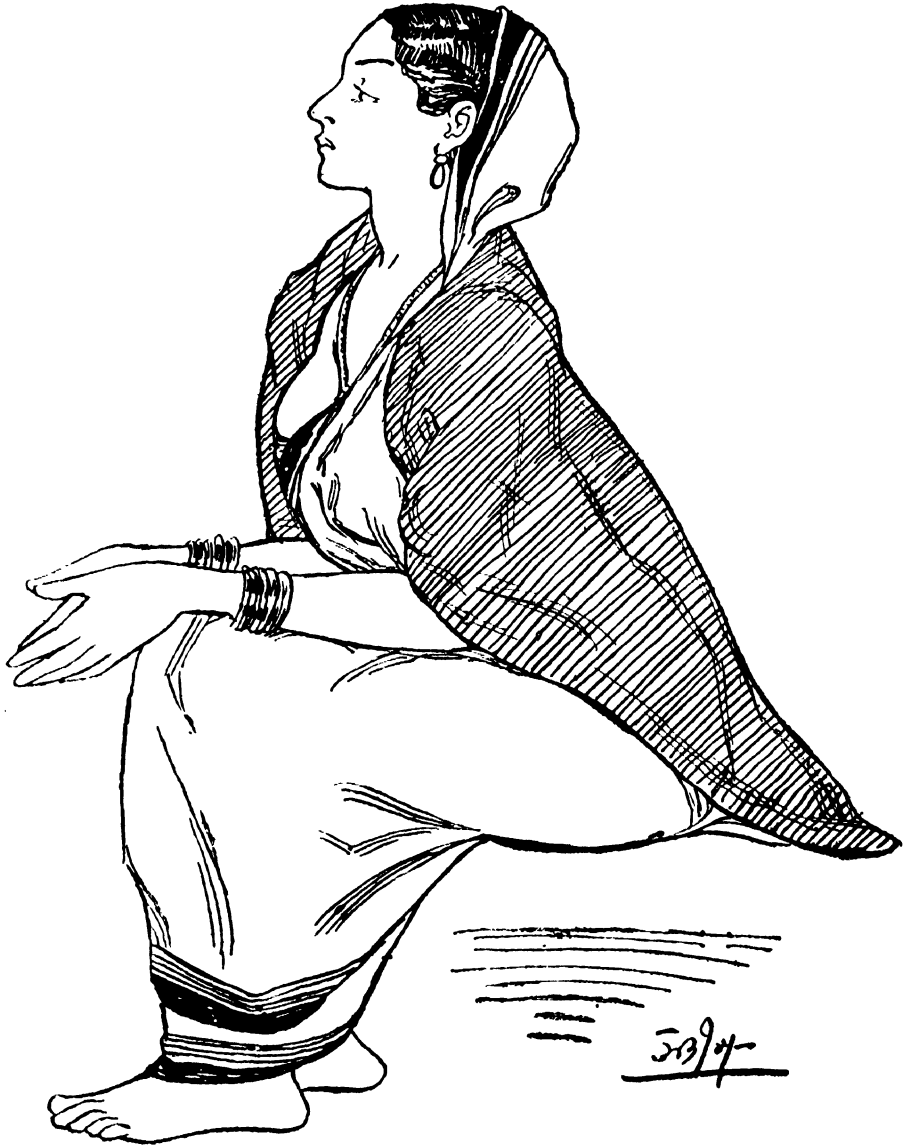
পাকা বীচিভরা খোল ইনি একটি পাড় ।
চর্ম্মে নাইক কর্ম্মের গন্ধ শর্ম্মা ধর্ম্মের ষাঁড় ॥

শকুনি

ভাগাড় টাউন, গায়েতে গাউন কার্য্য শুধু বকুনি ।
লম্বা নাকে টাকা শোঁকে ইটি আসল শকুনি ॥

গভীর জলের মাছ

ডুবে ডুবে কাষ সারি মনে মনে আঁচ।
রবির আড়ালে নড়ে গভীর জলে মাছ॥

গজেন্দ্র গামিনী

মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব হেরিয়া।
ষোল হাত সাড়ী আছে শ্রী-অঙ্গ ঘেরিয়া

টাকার কুমীর

কুমীরের পেটে পোরা কত সোনাদানা।
দেখো ম'লে প'রে, তা'রে জ্যান্তে ছুঁতে মানা॥

পাঁটা

গাধা
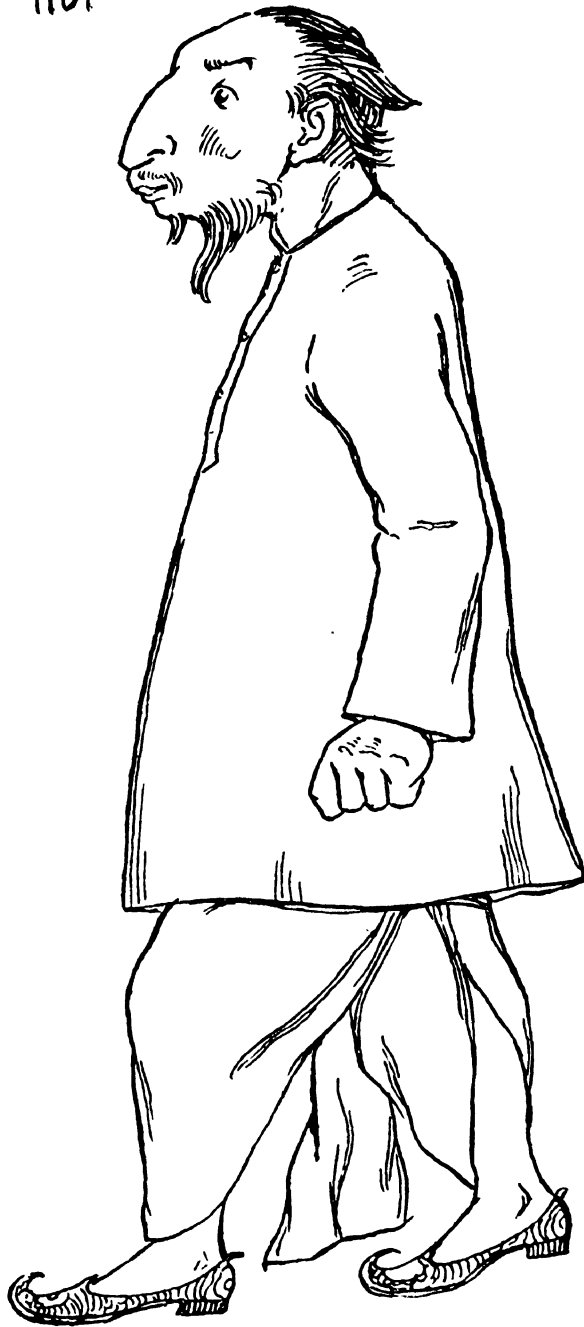
খোলার ঘরের দোরে দোরে খেয়ে বেড়ান ঝাঁটা,
গায়ে ছোটে বোটকা গন্ধ আস্ত একটি পাটা ॥
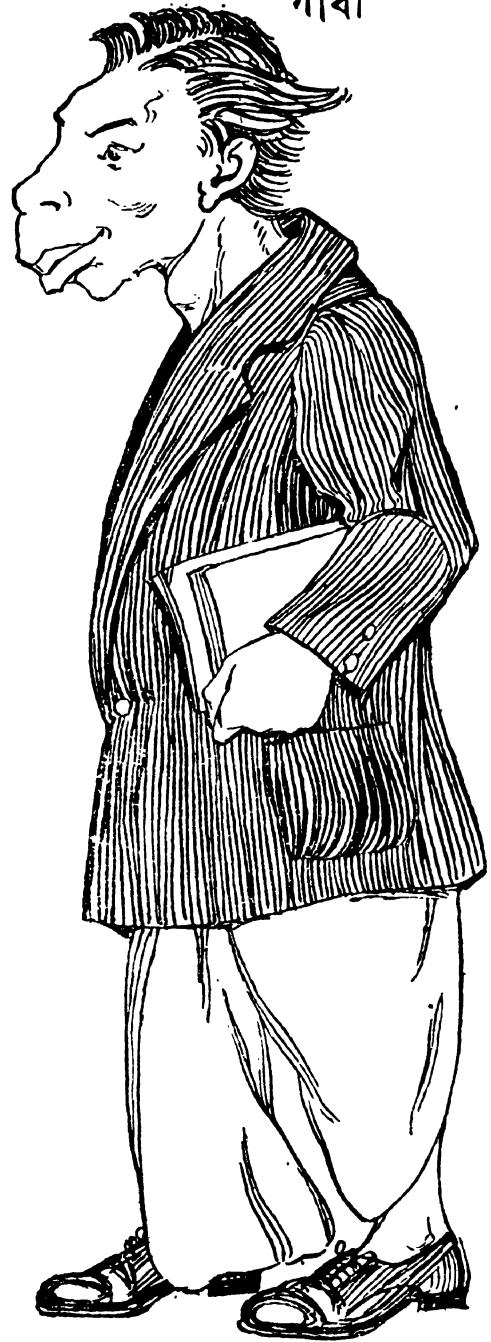
খাতা হাতে ঘোরেন কর্ত্তা সেধে সেধে চাঁদা।
দাদার খাতায় আদায় জমা, ইনি কেবল গাধা ॥

কোলা ব্যাং

গুটাইয়ে ঠ্যাং, যেন কোলা ব্যাং,
মুখ বুজে আছে ব'সে।
মিটি মিটি চায়, পোকা পেলে খায়,
লেজ কেন গেল খ'সে ?

আস্ত বাঁদর

নাহি মান-অপমান, ফুড়ুক ফুড়ুক টান,
পোড়া মুখে গুড়ুকে আদর।
উদরে উদয় স্বাস্থ্য, গলায় তুলসী মস্ত
বাস্তু জুড়ে ব'সে আস্ত এ বাঁদর ॥

মেনী

টুকটুকে মুখখানি জল্ জল্ চোখ।
ননীমাখা মেনীটি গো শুধু দুধে ঝোঁক॥

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ
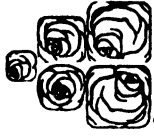
১

পৌষ মাস; পূরা শীতের দিন। বারুণী কিন্তু উত্তরের নির্জ্জন ছোট বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—"এবার কি শীত আসিবে না নাকি?" হিমালয়ের তুষার-শীতল বায়ু তাহার অঙ্গে যেন বসন্ত-হিল্লোল ছড়াইয়া দিতেছিল।

বারুণীর বয়স উনিশ বৎসর। এই বয়সে সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের তরুণীগণ একাধিক সন্তানের মাতা হইয়া পড়েন। বারুণী তাঁহাদের মত সংসারের জ্বালায় এখনও ঝালা-পালা হয় নাই; সে অবিবাহিতা; তাই ষোড়শীর মতই তাহার রূপলাবণ্য। পল্লবিনী লতার মতই তাহার প্রফুল্ল হাবভাব।

অবিবাহিতা হইলেও বারুণী বাগ্‌দত্তা। তাহার ভাবী পতি মিষ্টার দত্ত I. C. S. পাশ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। এখন যুদ্ধের সময় সমুদ্রপথ যৎপরোনাস্তি বিপৎসঙ্কুল। জর্ম্মাণ ডুবো-জাহাজগুলি সমুদ্রগর্ভে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে এবং সুবিধা বুঝিলেই শত্রু-জাহাজের তলা ফুটা করিয়া দিয়া শত্রু-নাশ করিতেছে। কিন্তু বিপদের ভয়ে কর্ম্মপ্রবাহ বন্ধ রাখা আর জীবনপ্রবাহ বন্ধ রাখা ইংরাজের মনে একই কথা। সুতরাং এই ঘোর সঙ্কটময় বাধাবিঘ্নের মধ্যেও যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বনে নিয়মিতভাবেই ইংরাজ সমুদ্রবক্ষে ষ্টীমার চালাইতেছেন। আমাদের নব সিভিলিয়ান দত্ত সাহেব এ সময় প্রেমের টানে প্রাণের মায়া অগ্রাহ্য করিয়া ভারতগামী 'ডুনেরা' জাহাজে চড়িয়া বসিয়াছেন।

জাহাজ মধ্যপথ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চলিয়াছে, কলিকাতার জাহাজ-আফিস হইতে এ খবর পাওয়া গিয়াছে। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ষ্টীমার বোম্বাই জেটিতে আসিয়া পৌছিবে। তাহার পর রেলে কলিকাতার পথ দুই তিন দিন মাত্র। তাই বুঝি আনন্দের আতিশয্যে শীতবাতাসও আজ বসন্তের ন্যায়ই বারুণীর এত উপভোগ্য মনে হইতেছিল। নীলাকাশে শুভ্র মেঘের স্তরে কত রকম বিচিত্র চিত্রাঙ্কন ভাসিয়া চলিয়াছে। বারুণী সেই মেঘচিত্রের দিকে চাহিয়া একখানি জাহাজ-চিত্র কল্পনা করিয়া লইল। ঐ যে তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি! মুখখানি কি হাসি হাসি! হাসিয়া কি যেন তাহাকে বলিতেছেন। কি সে কথা, তাহা কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না; হঠাৎ ছবিখানি মিলাইয়া গেল। কোথা হইতে সহসা রসুনচৌকি বাজিয়া উঠিল। এ যে অসময়ের বাঁশী! পৌষমাসে ত কোন পূজা-পার্ব্বণ বা বিবাহোৎসব নাই। তাঁহারই প্রাণের কথা বাঁশীতে কহিয়া তিনি চলিয়া গেলেন নাকি? রসুনচৌকির ভৈরবীতে বারুণী সাহানা তান শুনিতে পাইল। তাহার মাসতুতো বোন্ সুষমা আসিয়া তাহার এই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া কহিল—"এই যে দিদিমণি এখানে? আমি ভাবলুম, বুঝি বা সশরীরে নক্ষত্রলোকে যাবার পাখা-টাকা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ!"

বারুণী কহিল, "কেন রে? এরই মধ্যে নক্ষত্রলোকে যাওয়াতে চাস আমাকে? আমি ত মোটেই তা'তে রাজি নই?"

"তোমার মনটিকে ত ধরাতে ধরা-ছোঁয়া যায় না; তাই ভাবলুম, বুঝি বা দেহটাকেও উড়োকল বানিয়ে তুল্লে তুমি। বাতাসী বল্লে, সাত রাজ্যি খুঁজেও তোমার দেখা পেলে না।"

"তা খোঁজা খুঁজিরই বা এত দরকার কি ছিল?"

"তাই ত? কটা বেজেছে, সে হুঁসটা পর্য্যন্ত নেই দেখছি।"

"কটা বেজেছে?"

সুষমা হাসিয়া উত্তরে কহিল, "এই সবে ভোর পাঁচটা। প্রভাতী নহবৎ শুনছ না?"

বারুণীও হাসিয়া তাহার খোলা চুলে একটা টান দিয়া বলিল, "আর ঠাট্টা করতে হ'বে না। সত্যি কটা বেজেছে?"

সুষমা "উহু উহু" করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ঘড়ীতেও ১০ টা বাজিয়া উঠিল। সুষমা কহিল, "ঐ শোনো কটা বাজছে, তোমার জন্য কি সূর্য্যদেব আটকা প'ড়ে থাক্‌বেন নাকি?"

"তাই ত! এরই মধ্যে ১০ টা, এখনই বাবা খেতে আসবেন, চল চল—"

"তাঁ'র খাওয়া হয়ে গেছে, তিনি আফিস চ'লে গেছেন।"

বারুণী এতক্ষণে ঠিক বাস্তব রাজ্যে ফিরিয়া আসিল, মনটা খারাপও হইয়া পড়িল। সে রাগ করিয়া কহিল, "বাবা খেতে এলেন, আর তোরা আমাকে একটা খবরও দিলিনি, বেশ ত?"

সুষমা রাগিয়া বলিল, "হাঁ, দোষ আমাদেরই বই কি! বাতাসী ত তোমার হাল ছেড়েই দিয়েছিল; আমি তবু আবার এলুম, তোমার অন্ধি-সন্ধি জানি কি না!"

এই সময় স্বয়ং বাতাসীর আবির্ভাব হইল। হাঁপ ছাড়িয়া, হাঁক-ডাকে বারান্দা সরগরম করিয়া সে কহিল, "বাপ রে বাপ, সারা রাজ্যি খুঁজে খুঁজে জান্‌টা বেরিয়ে গেল, চল গো ঠাক্‌রুণ, মা ঠাক্‌রুণ ডাকতে নেগেছে।"

বারুণী বলিল, "আমি যাচ্ছি, তোরা এগো, স্নানটা ক'রে নিয়ে শীগ্‌গিরই আস্‌ছি।"

সুষমা বলিল, "তোমার ত শীগ্‌গির? নাবার ঘরে গিয়ে যেন আবার ভাবতে বসো না।"

অল্পক্ষণের জন্য নহবৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আবার বাজিয়া উঠিল। বাতাসী বলিল, "ওদের বাড়ী আজ নূতন জামাই আসছে গো।"

বারুণী হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "ও, তাই বুঝি! আমি ভাবছিলুম, অসময়ে কেন আজ বাজনা বাজছে?"

উত্তরে বাতাসী বলিল, "বাজবে গো বাজবে, এখানেও বাজনা বাজবে। এই বর এলো ব'লে।"

বারুণী রাগ প্রকাশ করিয়া ধমক দিয়া কহিল— "চ'লে যা এখান থেকে, তোর আর রসিকতা করতে হ'বে না।"

সুষমা হাসিতে লাগিল। দাসী বলিল, "তা যাচ্ছি গো যাচ্ছি। বর আসুক না আগে, তখন কি আর তোমার কথা মানব। তানার সামনে রস-কথার তুবড়ি ছড়াব, চল্লু আমি। একটুকু শীগ্‌গির আপুনি এস।"

তাহারা চলিয়া গেল। বারুণী রেলিংএ হাতের ভর দিয়া রসুনচৌকীর সুরের দিকে মনোনিবেশ করিল। এবার বাঁশী ললিতে বাজিতেছিল। বারুণী গাহিল—

ললিত রাগে ঐ বাঁশরী বাজে!
থেকো না, বঁধু, হে শুধু আর
আমার গোপন মনের মাঝে।
এস মোর অন্তরতম
দাঁড়াও হে বাহির ভরি,
দেখাও হে সুতৃষিত আঁখিরে মরি,
রূপ তব, চিত্তরঞ্জন হে,
নেত্ররঞ্জন বর-সাজে।
ওহে মানসমোহন
কেবলি হে রাখিও না স্বপনে,
দরশনে পরশনে তব প্রেম সত্য বচনে
ভাঙ্গ হে ভাঙ্গ হে ওগো যতনে
আমার মিথ্যা সরম-লাজে।

গান করিতে করিতে বারুণী স্নান করিতে গেল।

২

স্নান-ধৌত শুভ্রবেশে এলায়িতকুন্তলা বারুণী জলদেবতার প্রতিমূর্ত্তিটির মতই যখন মাতৃসমীপে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মাতার সর্ব্বান্তঃকরণ আনন্দপুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গৃহপ্রান্তে তখন বসিয়া ছিলেন এক জন সন্ন্যাসিনী। বারুণীকে দেখিয়া তাঁহারও কাঠিন্যরেখামণ্ডিত মুখমণ্ডল কোমল স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিল।

ত্রিবঙ্ক লামার ন্যায় আলখাল্লাধারী বলিয়া এই সন্ন্যাসিনীকে বাহিরের লোক বলে ভুটিয়া ভৈরবী, আর দলের লোকের নিকট ইঁহার ডাক-নাম ক্ষেপা ভৈরবী।

বারুণীর মাতা অরুন্ধতী আনন্দকল্যাণবর্ষী মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, "বারু, দেখ দেখি কে এসেছেন?"

বারুণী গৃহপ্রবেশকালে আশেপাশে নজর দেয় নাই, এখন সচকিত দৃষ্টিতে মুখ ফিরাইয়া ভৈরবীকে দেখিয়া কুণ্ঠিত ও অপ্রসন্ন হইয়া পড়িল। ইঁহার সহিত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীধামে অন্নপূর্ণামন্দিরে বারুণীদের দেখা-শুনা। সেই হইতে ইঁহারা যে ভৈরবীর কিরূপ সুনজরে পড়িয়াছেন, কলিকাতায় আসিলেই ইনি একবার ইঁহাদের দেখিতে আসিবেনই আসিবেন। ভৈরবী অর্থ প্রত্যাশী নহেন, অতএব অরুন্ধতী ইহাতে তাঁহার নিঃস্বার্থ দর্শনানুরাগই দেখিতে পায়েন। কিন্তু বারুণী তাঁহার এই

নিঃস্বার্থ স্নেহের মর্ম্মগ্রহণে একেবারেই অক্ষম। কারণ, যেরূপ বাহ্যিক রঙচঙে ভাবে বালহৃদয় সহজে মুগ্ধ হয়, তাহার অভাব ইঁহাতে সম্পূর্ণ। ভৈরবীর চেহারাখানিও প্রিয়দর্শন নহে, আর সাজসজ্জাও বেশ একটু কিম্ভূত-কিমাকার। লামাদের ন্যায় মুণ্ডিত মস্তকে সদ্য-গজান সজারুর কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা চুল আর রেখাবলী-ভরা ছাইপাঁশ-মাখা মুখের মধ্যে গাঁজা-ধূমপানজনিত জ্বলন্ত অঙ্গার সম রক্তবর্ণ দুই চক্ষু দেখিলেই বারুণীর প্রাণের ভিতর কেমন একটা ভয়-শিহরণ উঠিত।

তখন অরুন্ধতী থালা সম্মুখে রাখিয়া একখানি আসনের উপর বসিয়া পান সাজিতেছিলেন। কিছু দূরে ঘরের কোণে আসনের উপর উপবিষ্ট ভৈরবী বাম হস্তে গাঁজা রাখিয়া ডান হস্তের আঙ্গুল দ্বারা তাহা মলিতে মলিতে বারুণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আয় কল্‌কেমুখী বেটী, কাছে এসে ব'স্‌।" কলিকা হইল তাঁহার প্রাণদাতা গঞ্জিকার আধারবস্তু, অতএব অন্য কোন্‌ সম্বোধনে আর তৎপ্রতি তাঁহার প্রাণের অনুরাগ এমন পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন!

কিন্তু ভৈরবীকে দেখিলেও যেমন বারুণী বিরক্ত হয়, তাঁহার কথা শুনিলেও তেমনই তাহার গায়ে জ্বালা ধরে। এমন কি, তাঁহার আদরবাক্যও গালিগালাজের মতই তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতে থাকে। বারুণী বসিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৈরবী তাঁহার হাতের গাঁজা কলিকার মুখে রাখিয়া তাহা নামাইয়া রাখিয়া, বারুণীর জন্য আনীত টিপ-কৌটা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। আল্‌থাল্লার এই থলিটি তাঁহার সম্পত্তি-ভাণ্ডার; যত কিছু প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভরপুর। তিনি চলিবার কালে ইহা জাহাজের পালের মতই ফুলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র দেহটির অগ্রে অগ্রে চলে, আর বসিলে উদরীরোগের আনুমানিক সিদ্ধান্তে ভক্ত হৃদয় মমতা-পূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার আলখাল্লার এই চলন্ত মূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু বাস্‌ রে! হাসিলে কি আর রক্ষা আছে? ক্রুদ্ধ অভিশাপবাক্যে তৎক্ষণাৎ তাহার লয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণ অশ্রাব্য গালিগালাজের বুলি যদিও তিনি ব্যবহার করেন না, কিন্তু তিনি বিড়বিড় করিয়া যাহা বলেন, অভিধান-অলব্ধ সেই দুর্ব্বোধ্য তাষা তাহাকে অধিকতর ভীত করিয়া তোলে। ভৈরবী খুঁজিয়া পাতিয়া বুকের ভিতর হইতে অবশেষে কৌটাটি বাহির করিয়া বলিলেন, "আয় রে তুফান-তুলুনীর বেটী আয়, টিপ পরিয়ে দিই।"

বারুণী নড়িল না। মা বলিলেন, "যা, ভৈরবী মা'কে প্রণাম কর গিয়ে।"

এই সময় বাতাসী জ্বলন্ত টীকা আনিয়া কলিকার উপর রাখিল। যদিও ভৈরবীর আলখাল্লার মধ্যে চক্‌মকি প্রভৃতি আগুন প্রস্তুতের সরঞ্জামাদি থাকিত, কিন্তু গৃহস্থ-বাটীতে আসিলে তিনি নিজে আগুন জ্বালাইতেন না। জ্বলন্ত গাঁজার কলিকাটি বাতাসী তাঁহার হাতে ধরিয়া দিবামাত্র ভৈরবী টিপের কৌটা নীচে রাখিয়া দুই হাতে কলিকাটি ধরিয়া সজোরে একবার টান দিয়া ধোঁয়াটা উড়াইয়া দিলেন।

কি বীভৎস দৃশ্য! বারুণীর অসহ্য হইয়া উঠিল; সে মৃদু স্বরে মা'কে বলিল, "মা, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।"

ভৈরবী তাহা শুনিতে পাইলেন। গাঁজার ধূম তখন তাঁহার মাথায় বেশ চড়িয়া উঠিয়াছে; ক্ষেপা মেজাজে বলিলেন, "চ'লে যাওয়া হচ্ছে! কোথা যাবি রে দেমাকী বেটী! আয় বল্‌ছি, নইলে ভাল হ'বে না।"

অরুন্ধতী ভীত হইয়া পড়িলেন। দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপের মতই কথাটা তাঁহার প্রাণে গিয়া বাজিল। করুণ অনুরোধে তিনি ভৈরবীকে বলিলেন, "ভৈরবী-মা, ছেলেমানুষের উপর রাগ কর্‌বেন না। যা বারু, যা, প্রণাম কর ওঁকে।"

অতঃপর অরুন্ধতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বারুণীর হাত ধরিয়া তাহাকে ভৈরবীর নিকটে টানিয়া আনিয়া আবার বলিলেন, "প্রণাম কর।" বারুণী এ বার বিনাবাক্যে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বসিল। ভৈরবী গাঁজার কলিকাতে জোরে আর একটি টান দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভাল হ'বে, ভাল হ'বে বৈ কি, দাও ত মা, দাও ত মা অরুন্ধতী, ধূমধূমানী বেটীকে একটা টিপ পরিয়ে, আমি এবার আক্‌চায় যাই।" অরুন্ধতী মেঝের উপর হইতে কৌটাটি হাতে লইলেন, তাহার পর ঢাক্‌না খুলিয়া একটি টিপ কন্যাকে পরাইয়া দিলেন। ভৈরবী

আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, ম'রে যাই, ঠিক যেন সাগরজলে তুফানঢুলুনী!" বলিয়া তিনি তাঁহার আলখাল্লায় মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র হুঁকা বাহির করিলেন। এইটি তাঁহার থলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসবাব। দরকারমত ইহার মস্তকে চড়ে তাঁহার গাঁজার কলিকা,—আর বিনা দরকারে ইহার দেহে-চড়ান তারে তাঁহার আঙ্গুলের আঘাত পড়ে। ভৈরবী কলিকার ছাইটা মেঝের উপর ঢালিয়া দাসীর হাতে দিলেন। সে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া জল ঢালিয়া কলিকাটা ঠাণ্ডা করিয়া আনিয়া দিল। তখন তিনি কলিকাটি থলির মধ্যে পূরিয়া হুঁকার বীণাটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর প্রীং প্রীং করিয়া গান ধরিলেন—

"বম্ বম্ ববম্ ববম্ ভৈরবা ভৈবরী!
দুনিয়া ভরা সাগর তুফান
তোরা—কে মর্‌বি আর কে রবি?
খ্রীং খ্রীং খ্রীং প্রীং প্রীং প্রীং,
কি করলি তুই ও ঠাকুর!
পুণ্যি নিয়ে মন্দি দিলি
ভক্তি ভক্ত সব ফতুর।
বম্ বম্ বম্ গাঁজায় দে দম্ ভৈরবা ভৈরবী।
ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি সাধন
ফাঁকিজুঁকী আর সবই?"

গাহিতে গাহিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন বৈকালবেলা খবর আসিল, মিষ্টার দত্ত যে জাহাজে আসিতেছিলেন, সে জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে।

৩

য়ুরোপব্যাপী মহাসমরের আরম্ভকাল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। নিম্নলিখিত কাহিনীটি তাহার বহু বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। অতএব এখন হইতে ধরিলে সে আজ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

তৃতীয় প্রহর রাত্রি, ঊর্দ্ধদেশে চন্দ্রহীন আকাশ—তারকারাজ্যের একখানি বিরাট—বিচিত্র চিত্রপটের ন্যায় প্রতিভাত। অগণ্য নক্ষত্র-ঘন মৃদু-জ্যোতিঃ ছায়া-পথের উভয় পার্শ্বে কোথাও বা বড় বড় দুই চারিটি উজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্র, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকারাজি শ্রেণীতে শ্রেণীতে, গুচ্ছে গুচ্ছে, মাঝে মাঝে বা বিরল সংখ্যায় সঙ্গিহারা বিজনচারী বেশে দ্যুতি বিস্তার করিতেছিল। নিম্নে গঙ্গাসাগর এই আলোকচ্ছটা বক্ষে ধারণ করিয়া তরঙ্গলীলায়িতরূপে অবিরাম গর্জ্জনে মহাসাগরের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইয়াছিল।

এমন সময় দুই জন স্ত্রীপুরুষ তীরদেশে বালুকাপারে কাঁটা-বনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ইহারা স্বামি-স্ত্রী। স্ত্রীর বক্ষে একটি নিদ্রিত শিশু সন্তান। সন্ধ্যাকালে পুরুষটি কলাগাছের একটি ভেলার উপর তালপাতার একটি ডোঙা আঁটিয়া এই ঝোপের নীচে রাখিয়া গিয়াছিল। এখানে আসিয়া কলার ভেলা টানিয়া লইয়া স্ত্রীর সহিত সে উপকূলে পৌঁছিল,—তরঙ্গস্পর্শ হইতে দুই এক হাত তফাতে ভেলাখানি নামাইয়া রাখিয়া স্ত্রীর বক্ষ হইতে শিশু সন্তানটিকে লইয়া ডোঙার মধ্যে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। শিশু জাগিল না, কান্দিল না, সামান্যমাত্রায় অহিফেন-সেবিত হইয়া সে বেশ অঘোরে ঘুমাইতেছিল।

পত্নী মৃতবৎসা, তাহার সন্তান হইয়া রক্ষা পায় না। এই নিমিত্ত সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই সাগরের উদ্দেশে তাহারা শিশুকে মানত রাখিয়াছে। শিশু এখন এক বৎসরের। মাতা আবার অন্তঃসত্ত্বা, এবার মানত রক্ষা না করিলেই নয়। বিলম্ব হইলে দেবতার ক্রোধানলে বর্ত্তমান পুত্র ও ভাবী সন্তান উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এই বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল।

শিশুকে ভেলায় শোয়াইয়া, সমস্ত প্রাণ তাহার উপর ঢালিয়া দিয়া, মর্ম্মভেদী আকুল দৃষ্টিতে পিতা-মাতা উভয়েই মুহূর্ত্তকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নক্ষত্র-দেবতাগণ একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিয়া বালকের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল। মাতা ক্ষিপ্তের ন্যায় কান্দিয়া শিশুকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইতে গেলেন। স্বামী বনমালী সবল হস্তে তাঁহাকে বাধা দিয়া মনের বেদনা ক্রোধের আগুনে জ্বালিয়া কহিলেন, 'সর্ব্বনাশী, ক্ষান্ত দে, চিরকাল সর্ব্বনাশ ক'রে এসে এখনও তোর আশ মিটল না? নতুন ক'রে আবার সর্ব্বনাশ করতে চাস্?"

এ ভর্ৎসনা পত্নী ক্ষেমঙ্করীর মর্ম্মের শিরায় শিরায় বিঁধিল। স্বামী ত ঠিক কথাই বলিতেছেন, অভাগিনীই
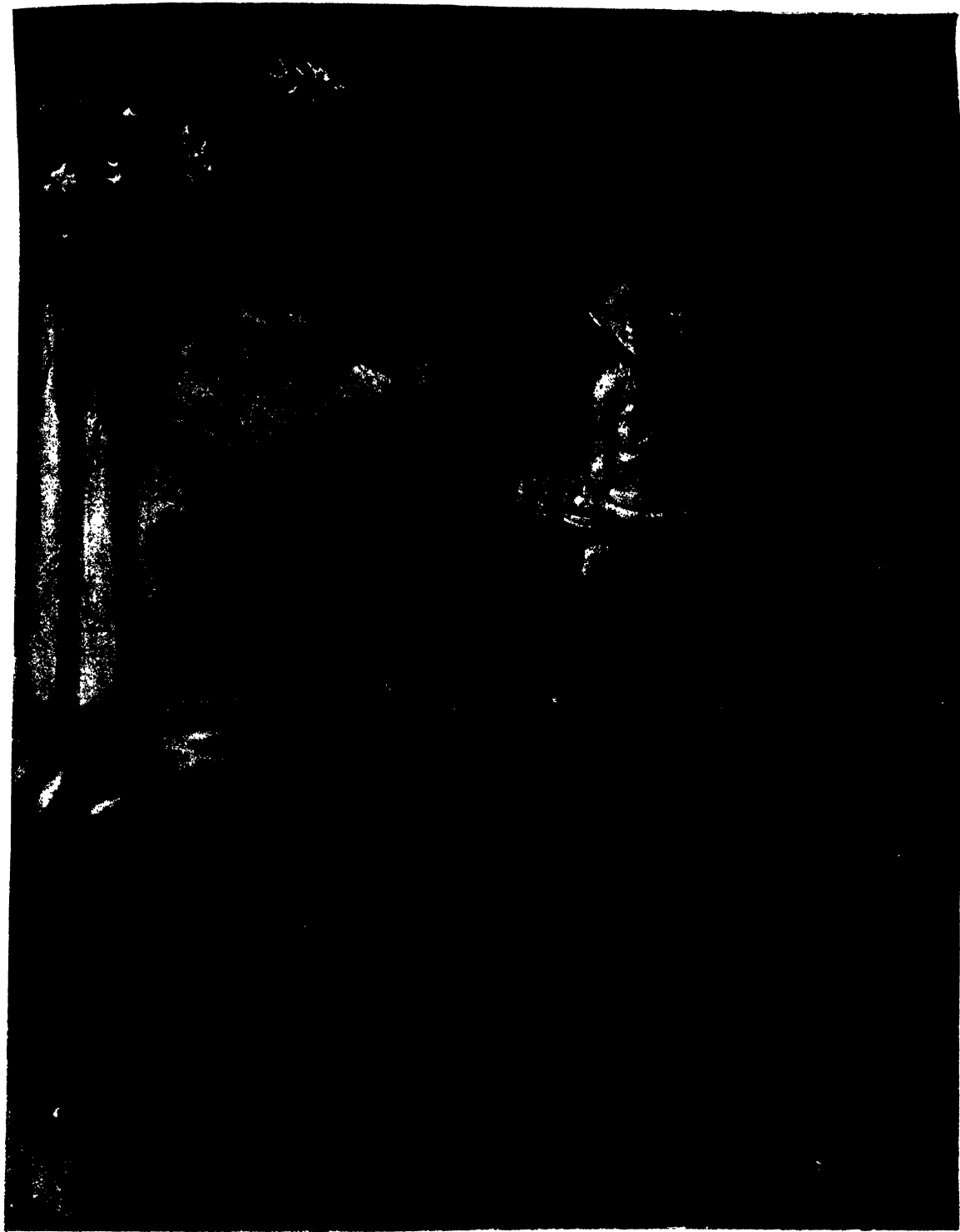
দীপালোকে

বসুমতী প্রেস]　　[শিল্পী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

ত সর্ব্ব অনর্থের মূল। সে মৃতবৎসা না হইলে ত আজ এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় তাহাদিগকে পড়িতে হইত না। স্ত্রী উত্তোলিত হস্ত গুটাইয়া লইয়া চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল। স্বামীর নয়নও অশ্রুজলে অন্ধ হইয়া গেল। দুই হাতে চোখের জল ঝাড়িয়া ফেলিয়া নরম স্বরে কহিলেন, "একে ঘরে নিয়ে গিয়ে কি রক্ষা করতে পারবি গো তুই? এ যে দেবতার মানত, দেবতার নিবেদিত ধন। কত রকম ছদ্মবেশে ঘরে ঢুকে সাগর-দেবতা তাঁর ধন তুলে নিয়ে যাবেন। একেও বাঁচাতে পারবিনে, আর যেটিকে গর্ব্বে ধ'রে আছিস্, সেটিকেও হারাবি। তুই স'রে দাঁড়া।"

স্ত্রী দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামী দুই হাতে ভেলা ধরিয়া জলে ভাসাইল। কিন্তু মনের কঠোর কর্ত্তব্য কার্য্যতঃ সে ঠিক পালন করিতে পারিল না। সমস্ত প্রাণে ভেলা ঠেলিয়া দিতে সে অক্ষম হইল; কম্পিত দুর্ব্বল হস্ত-চালিত ভেলা বেশী দূর গেল না; একটিমাত্র বিপরীতগামী তরঙ্গবলে তাহা পুনরায় পিতার হাতের কাছে আসিয়া পৌছিল। মাতা ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ফিরে এল গো বাছা আমার! সাগর দয়া ক'রে ফিরে দিলেন আমার কোলের ধনকে, তুলে নাও গো, তুলে নাও। আমার বুকে তুলে দাও, বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাক।"

ভক্তিসংস্কারান্ধ বনমালী কহিল, "কি ক'রে জানব যে, তিনি দয়া ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছেন? আমরা যে কাঁদতে কাঁদতে দান করেছি, যদি অশ্রুহীন চোখে কর্ণরাজার মত বিশ্বাসে ছেলে দান করতে পারি, আর সাগরদেব তখনও যদি ফিরিয়ে দেন, তবেই বুঝব তাঁর দয়া।"

হৃদয়ে ভক্তিবল সংগ্রহ করিয়া অশ্রুহীন নেত্রে সবল হস্তে এবার বনবালী ভেলা ঠেলিয়া দিল। ভেলা আর ফিরিল না,—তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া চলিল। একবার যেন শিশুর ক্রন্দনধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল,—একবার যেন দুইটি ছোট হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়া পিতামাতার ক্রোড় প্রার্থনা করিল। তাহার পর আর কিছুই দেখা বা শুনা গেল না। দূর হইতে দূরান্তরে চলিতে চলিতে ভেলাখানি অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

* * * *

পিতা-মাতা মানত রক্ষা করিল বটে, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাস তাহাদের মনঃকষ্ট দূর করিতে পারিল না। পুত্রশোকে ক্ষেমঙ্করী পাগল হইয়া গেল। উন্মত্তাবস্থাতেই তাহার একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ইহার পর হইতে ক্রমশঃ তাহার বাতুলতা যদিও কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি সে পূরাপূরি ফিরিয়া পাইল না। এক দিন যে ইহার অগ্রজকে তাহারা সাগর-জলে বিসর্জ্জন দিয়াছে, এ কথা তাহার মনে নাই। নবজাত শিশুকে সে তাহার পূর্ব্বশিশু বলিয়াই জানে। পাগলিনী ভুলিল না কেবল পূর্ব্ব-মানতের কথা। এক দিন ইহাকে সাগরজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে, এ কথা মনে করিয়া আতঙ্কে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতেই সে কন্যাকে স্তন্য দান করিত।

স্ত্রী পুত্রশোক ভুলিল পাগল হইয়া, স্বামী পুত্রশোক ভুলিতে চেষ্টা করিল গুরু ধরিয়া। গুরুর কৃপায় ধূমপান মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষেপামীতে তিনি স্ত্রীকেও ছাড়াইয়া উঠিলেন।

মেদিনীপুর জিলার রাঘবপুর গ্রামে বনমালীর নিবাস। গ্রামের মধ্যে সে ছিল এক জন সম্পন্ন লোক। জমী-জমা, গরু-বাছুর, ধানের মরাই, কৃষাণ, ভৃত্য এ সবই তাহার ছিল, ইহা ছাড়া সে মহাজনী কারবারও চালা-ইত। ইহার দৌলতে গ্রামভরা চালা ঘরের মধ্যে তাহারই ছিল একখানি কোটাবাড়ী। তাহারা নিঃসন্তান, এই দুঃখ ছাড়া, সাংসারিক কোন রকম দুঃখই তাহাদের ছিল না,কিন্তু রোগমুক্ত হইয়া ক্ষেমঙ্করী এক নূতনতর দুঃখের ভিতর পড়িল। সে দেখিল, স্বামী গাঁজার মোহে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন। দিবারাত্রি প্রায় তাঁহার ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীর সহবাসে কাটে। তিনি এখন চেলা নহেন, স্বয়ং গুরু। বাটীর উঠানে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে তিনি বোম্ ভোলানাথ গুরু সাজিয়া বসেন, আর বামা-চারী, কামাচারী, তান্ত্রিক, শৈব, উদাসপন্থী, নাগা প্রভৃতি সর্ব্বদলভুক্ত চেলাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বীভৎস অনাচারে রত থাকে। ক্ষেমঙ্করী সে দিকে মোটেই ঘেঁসেন না, কখন কখন দূর হইতে উঁকি মারিয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন উঠানের অগ্নিকুণ্ড হইতে ঝলক উঠিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝলসিয়া

দিয়া যায়। তিনি ঘরে ঢুকিয়া কন্যাকে বুকে লইয়া সে জ্বালা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এরূপভাবে বেশী দিন চলিল না। চেলাদের রসদ যোগাইতে ক্রমশঃ বনমালী যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইলেন। জমী-জমা, ধান-চাল, গরু-বাছুর, গহনাপত্র সমস্তই দেনার দায়ে বিকাইল, বাড়ীটিও ক্রমে নীলামে চড়িল। চেলার দল বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। বনমালী স্ত্রী-কন্যা লইয়া নদীতীরের শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রামের লোক চাঁদা করিয়া সেইখানেই একখানি খড়ো-ঘর তাহাদের জন্য বাঁধিয়া দিল। আহার্য্যও তাহারাই যোগান দিতে লাগিল। আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীর অন্নকষ্ট কখনও ঘটে না।

মেয়েটি এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মাতৃস্নেহে দুই বৎসরের হইয়া উঠিল। তখনও যে স্বামী মানতপালন জন্য তাহাকে গঙ্গাসাগর তীর্থে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন না, এই ভাবিয়া ক্ষেমঙ্করী মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য বোধ করিত। তাহার মনে হইত, নেশার ঘোরেই সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে ক্রমশঃ সে বেশ আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। এই দৈন্য-দারিদ্র্যের মধ্যেও কন্যার মুখ দেখিয়া সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্বামী ভুলিলেও নিষ্ঠুর নিয়তি যে সে কথা ভুলে নাই, ক্ষেমঙ্করী এক দিন ভাল করিয়াই তাহা বুঝিল। সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় সে কন্যাকে হারাইল। স্নানান্তে এক দিন নদী হইতে ফিরিয়া সে দেখিল, কন্যা অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে, নেত্রতারকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছে। ক্ষেমঙ্করী কন্যাকে একবার নাড়াচাড়া করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক কান্দিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণবায়ুটুকু বাহির হইয়া গেল।

সর্পাঘাতে কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, এই অনুমানে বনমালী মৃত কন্যাকে বক্ষে লইয়া জলে ভাসাইতে চলিল, আজ আর সঙ্গে আগত ক্ষেমঙ্করীর নয়নে জল নাই—মুখে হাহাকার নাই, মৃত কন্যাকে যে তাহারা জলে ভাসাইতে চলিয়াছে, এ জ্ঞান তাহার নাই। তাহার মনে হইল, তাহারা মানত রক্ষা করিতে চলিয়াছে। স্বামী কন্যাটিকে জলে ফেলিয়া দিবার সময় সে যখন চক্ষু বুজিল, মুহূর্ত্তের জন্য পূর্ব্ব-স্মৃতি তাহার মানসপটে সহসা ভাসিয়া উঠিল; কিন্তু আবার যখন সে চোখ খুলিল, সে স্মৃতি তখন মনের কোণে মিলাইয়া পড়িয়াছে। মানত রক্ষা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সযত্নে পত্নীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া বনমালী তাহার হস্তে গাঁজার কলিকা তুলিয়া দিয়া কহিলেন, "সর্ব্বদুঃখ দূর হোক্ তোর ক্ষেমা, আমাকে গুরু ব'লে মেনে এই ধোঁয়া পান কর ত লক্ষ্মীটি।"

ক্ষেমঙ্করী স্বামীর চরণে নত হইয়া গাঁজার কলিকা লইয়া মুখে ঠেকাইল। অতিরিক্ত গাঁজা খাইয়া ইহার কিছুদিন পরে স্বামীও ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। সংসার-বন্ধনমুক্ত ক্ষেমঙ্করী ভৈরবীর দলে মিশিয়া দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৪

ইহার ১২ বৎসর পরে কাকদ্বীপের জমীদার নিখিলচাঁদের পত্নী করুণাময়ী বৈদ্যনাথ মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অদূরে একটি নির্জ্জন গাছের তলায় এক ভৈরবী বসিয়া আছেন, এবং সম্মুখস্থ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এই ভৈরবীর মাহাত্ম্য তিনি বৈদ্যনাথের অনেকের মুখেই শুনিয়াছেন। করুণাময়ী নিকটে আসিবামাত্র মন্ত্রপাঠ বন্ধ করিয়া ভৈরবী প্রাতঃ-সূর্য্যের দিকে একবার চাহিলেন, তাহার পর মাটী হইতে শূন্য কলিকাটি হাতে লইয়া তন্মধ্যে গাঁজা ঠাসিতে লাগিলেন। করুণাময়ী নীরবে বসিয়া রহিলেন। কার্য্য শেষ হইলে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া করুণাময়ীকে ভৈরবী বলিলেন, "ভাল হোক্ বেটী, তোর ভাল হোক্। কি চাস তুই?" বলিয়া তিনি চিমটার দ্বারা অগ্নিকুণ্ডের আগুন উঠাইয়া গাঁজা ধরাইয়া তাহাতে টান দিলেন।

করুণাময়ী বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদই চাইতে এসেছি, ভৈরবী মা। আমাকে দয়া করুন।"

ভৈরবী তখন মুখ হইতে ধূম ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কেই বা ভাল করে, কেই বা মন্দ করে! কি বা ভাল, কি-ই বা মন্দ রে বেটী?"

করুণাময়ী বলিলেন, "ও কথা শুনবো না আমি,

ভাল করতেই হ'বে আমার, নইলে পায়ে হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাকব।"

ভৈরবী গাহিলেন,—

বম্ বম্ বম্ ববম্ ববম্ ববম্ ভৈরবা ভৈরবী,
ছুনিয়া জোড়া সাগর-তুফান, তোরা কে
মরবি আর কে র'বি।"

তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তুই কি বেটী সন্তানহারা?"

করুণাময়ীর ভক্তি আরও বাড়িয়া উঠিল; অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "তুমি ত বুঝতেই পারছ সব। আমি অধিক কি আর বলব, আমি, মা, বড় দুঃখী, অনেকগুলি সন্তানকে অকালে যমের হাতে তুলে দিয়েছি। সম্প্রতি কোলের ছেলেটিকেও তাঁকে দিয়ে এসেছি। আশীর্ব্বাদ কর, ভৈরবী মা, যে ক'টি এখনও বাকি আছে, তাদের যেন না হারাই। গ্রহশান্তির জন্য যা তুমি চা'বে, তাই দেব আমি।" করুণাময়ী এই কামনায় সাধু-সন্ন্যাসী, দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অনেকেরই উদরপূর্ত্তি করিয়া আসিতেছেন।

ভৈরবী একটু হাসিয়া কলিকাটা মুখ হইতে হাতে লইয়া বলিলেন, "টাকা-কড়ির ভাবনা অনেক কাল এড়িয়েছি, বেটী! শান্তি অশান্তিও আমার হাত-ধরা নয় রে, ভজন-পূজন, সিদ্ধি-সাধন সব মিছে রে বেটী, সব মিছে। তার পিছে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছিস্?"

করুণাময়ী দেখিলেন, টাকার কথা বলিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। মিনতির স্বরে কহিলেন, "ভৈরবী মা, অজ্ঞানের দোষ নিও না। আমার ছেলে-গুলি যেন রক্ষা পায়, এই দয়াটুকু তোমায় করতেই হ'বে।"

ভৈরবী বলিলেন, "তোর এখন ক'টি ছেলে বেটী?"

করুণাময়ী বলিলেন, "সাতটি ছেলের মধ্যে এখন মোটে দাঁড়িয়েছে তিনটি, ভৈরবী মা।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে ১৩ বৎসরের একটি বালক আসিয়া মাতার পিঠের দিকে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। করুণাময়ী ভৈরবীকে বলিলেন, "এইটি আমার বড় ছেলে।"

ভৈরবী প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মাতা পুত্রকে বলিলেন, "যা সাগর, ভৈরবীকে প্রণাম কর।"

বালক প্রণাম করিবার পর ভৈরবী ভূপতিত এক খণ্ড অঙ্গার হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা বালকের কপালে তিলক-রেখা টানিয়া দিয়া কহিলেন, "যা বেটা, তোর আর কোন মার নেই।"

করুণাময়ী আনন্দিত চিত্তে ভৈরবীকে পুনঃ প্রণাম করিয়া পুত্রকে কহিলেন, "যা বাবা, তুই তোর ভাই দুটিকে এখানে নিয়ে আয় দেখি।"

বালক চলিয়া গেল। ভৈরবী বলিলেন, "তোর এমন সব ছেলে রয়েছে বেটী, তুই তবু কাঁদিস?"

করুণাময়ী কহিলেন, "আগে ত বলেছি, মা, সাতটির মধ্যে এখন তিনটিতে ঠেকেছে, তাইতে ভয় পাই।"

ভৈরবী বলিলেন, "তবু ত তিনটিও তোর সঙ্গে আছে, বেটী, আমার যে একটিও নেই।"

এই দুঃখের স্বর করুণাময়ীর মর্ম্ম স্পর্শ করিল। ভৈরবী আবার বলিলেন, "তোর সন্তানগুলি যে যম গ্রহণ করেছে, আর আমি যে আমার নিজের ছেলেকে নিজের হাতে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।"

করুণাময়ী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ১২ বৎসর পূর্ব্বকার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার প্রথম গর্ভের শিশু হারাইয়া তিনি তখন বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামী নিখিলচাঁদ স্ত্রীকে সুস্থ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের ষ্টীমলঞ্চে জলভ্রমণে জমীদারী কাকদ্বীপ পরিদর্শনে আসিলে সেই সময়ে বালকটিকে তিনি এক দিন তীরদেশে লাভ করেন। শিশুহারা করুণাময়ী এই শিশুটিকে পাইয়া দেবাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ইহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি অনেকগুলি সন্তানের মাতা হইয়াও ইহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রতুল্যই স্নেহচক্ষুতে দেখেন। সাগরলব্ধ বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে সাগরদত্ত।

ভৈরবীর কথায় করুণাময়ীর সহসা মনে হইল, তবে কি আমার সাগরদত্ত এই ভৈরবীরই সন্তান না কি! তিনি একটু দম লইয়া থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "যে ছেলেটিকে আপনি দেখলেন, ভৈরবী মা, সেটিকে আমি গর্ভে ধরিনি, সাগরতীরেই আমরা ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।"

ভৈরবী চোখ বুজিলেন, কিছু পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু সেটি যে আমার কন্যাসন্তান।" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

৫

প্রায় দশ মাস কাল 'ডুনেরা' জাহাজ খানি জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে সাগরদত্ত ও বারুণী উভয়েরই পিতামাতার চোখের জল যদিও অনেকটা শুকাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু মনের আগুন এবং প্রাণের আশা এখনও নিঃশেষে নিবিয়া যায় নাই। মৃতের তালিকায় তাহার নাম না মেলায় হতাশ্বাসভরা প্রাণও মাঝে মাঝে আশাদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জীবিতের লিষ্টেও ত তাহার নাম নাই। সে বাঁচিয়া থাকিলে কি কোন না কোন রকমে সে খবরটা মিলিত না, এই ভাবিয়া সেই আশালোকও আবার নিরাশাক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ আশানিরাশার স্বপ্ন-প্ররোচনায় কখনও বিশ্বাসে, কখনও সন্দেহে, কখনও ধীরচিত্তে, কখনও অধীর প্রাণে তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেছেন।

নিখিলচাঁদের কেবলই মনে পড়ে সেই পুরাতন দিনের কথা,—যে দিন তিনি সাগরকে তীর হইতে কুড়াইয়া আনিয়া স্ত্রীর তাপিত বক্ষ জুড়াইয়া দিয়াছিলেন। কি সুন্দর দেখিতে ছিল শিশুটি! তাহার মাথাভরা কালো চুল, জলে ভিজিয়া যত্নকুঞ্চিত অলকদামের ন্যায়ই গুচ্ছে গুচ্ছে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রাতঃসূর্য্য বালকের রূপমুগ্ধ হইয়াই যেন সস্নেহে তাঁহার যত কিছু সোনার রং তাহার অঙ্গে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। শিশু তীরদেশ আলো করিয়া ঘুমাইতেছিল। আহা! কাহার শিশু এ! কেমন করিয়া এখানে আসিয়া পড়িল? বুঝি বা কোন নৌকাডুবি হওয়াতে বালক জলে পড়িয়াছিল; বরুণদেব তাহাকে রক্ষা করিয়া তীরে রাখিয়া গিয়াছেন! শিশুকে কোলে তুলিয়া তাঁহার সে দিন এইরূপ কথাই মনে হইয়াছিল। আজ মনে হইল, সাগরদেব শিশুকালে যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, যৌবনেও কি তাহাকে রক্ষা করিবেন না? তাহা যদি না করেন, তবে যে তাঁহার দয়া অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

সাগরদত্তের কথা মনে করিতে করুণাময়ীর বেশী করিয়া মনে পড়িত ভৈরবীকে। তিনি প্রাণ ভরিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে? বালকের কপালে তিলকরেখা টানিয়া দিয়া তিনি যে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন, দেবীতুল্য ভৈরবীর সেই 'মা ভৈঃ' বাক্য কি নিষ্ফল হইবে? কখনই না—কখনই না। তাহা হইলে সাধন, সিদ্ধি, দৈবশক্তি সবই মিথ্যা।

সাগরকে হারাইয়া বারুণীর মাতারও তার শৈশব কালের কথাই অধিক করিয়া মনে পড়িত। তখনও অরুন্ধতীর কোন সন্তানাদি জন্মে নাই। তিনি এই সুন্দর বালকটিকে দেখিবামাত্র করুণাময়ীর সহিত "বেয়ান" পাতাইয়া লইলেন। বলিলেন, "এই ছেলেকেই জামাই করব আমি।"

করুণাময়ী বলিলেন, "ছেলের যদি তোর মেয়েকে পছন্দ না হয়?"

কথাটা অরুন্ধতীর হাস্যকর লাগিল, বলিলেন, "তা হ'বে না বৈ কি! দেখে নিস্ তখন। তোর ছেলের নাম সাগর, আমার মেয়ের নাম রাখব আমি বারুণী, জানিস্ ভাই।"

"কেন, সাগরিকা নাম ত আরও ভাল।"

অরুন্ধতী বলিলেন, "আরে, তোর ছেলের যেন সাগরে জন্ম হয়েছে, আমার মেয়ে ত আর সাগরে জন্মাবে না। তুই যদি ছেলের নাম বরুণ রাখতিস, তা হ'লে বরঞ্চ আরও ভাল হ'ত, একটু নতুন রকম শোনাত। সাগর নামটা কিন্তু বড় পচা।"

এইরূপ রহস্যালাপের মধ্যে অরুন্ধতীর পরে পরে কন্যাসন্তানের পরিবর্ত্তে দুইটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। করুণাময়ী বলিলেন, "তুই আমাকে দেখছি ফাঁকি দিলি, এখনও ত তোর মেয়ে হ'ল না?"

কিন্তু সাত বৎসর পরে তাঁহাদের আশা ও ইচ্ছা সফল করিয়া বারুণী জন্মগ্রহণ করিল।

তাঁহাদের এত দিনকার আশা অভিলাষ কি সত্য-সত্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে? এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারও মনে পড়িয়া যায় ভৈরবীকে। হায় রে, তাঁহার অভিশাপবাক্য ত ফলিয়াছে, তাঁহার আশীর্ব্বচন কি ফলিবে না?

সর্ব্বাপেক্ষা শান্ত ছিল বারুণী। তাহার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। তাহার বিশ্বস্ত হৃদয় বলিত, ফিরিবেনই তিনি—নিশ্চয় ফিরিবেন। সূর্য্যের আলোকে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, নক্ষত্রের জ্যোতিতে, মেঘের বর্ণে সে তাঁহার প্রফুল্ল স্বাগত মুখই দেখিত। বাতাস কহিত, তিনি আছেন গো, তিনি আসিতেছেন। তরুলতা, ফুল বা মঞ্জরী, সকলেই কহিত, তিনি আছেন, তিনি আসিতেছেন। অটল বিশ্বাসে, দৈববলে বারুণী আশ্বস্ত ছিল।

বারুণীর পিতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের পার্শ্বে গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাটী ছিল, কিছু দিন হইতে বারুণীরা সেইখানে আসিয়া আছে। আজ বিজয়া-দশমী। স্বামী কলিকাতায় গিয়াছেন, অরুন্ধতী বিকালে করুণাময়ী ও নিখিলচাঁদের সহিত গঙ্গার সম্মুখস্থ বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। ইঁহারা তাঁহাকে বিজয়ার প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। ইঁহারা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন সাগরেরই সম্বন্ধে। অরুন্ধতী কহিলেন, "আর কিছু কি খবর এসেছে?"

নিখিলচাঁদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন, "খবর ত আর কিছুই পাচ্ছিনে।"

করুণাময়ী বলিয়া উঠিলেন, "আমার কি মনে হয় জান? তুমি এক দিন যেমন না চাইতে তাকে আমার কোলে এনে তুলে দিয়েছিলে, তেমনই এক দিন সে হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। কে জানে, সর্ব্বদাই আমার এই কথাই মনে হয়।"

পাশের বোটানিক্যাল গার্ডেনের জেটীতে ফেরি ষ্টীমার একখানা লাগিল। দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ কয়েক জন লোক ষ্টীমার হইতে নামিয়া পড়িল, অনেকেই তাহাদের মধ্যে হ্যাটকোটধারী। করুণাময়ী তাড়াতাড়ি রেলিংএর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, ঠিক যেন আমার সাগরের মতই শরীরের গঠন না ঐ ছেলেটির? বিলাত যাবার দিন ঠিক ঐ রকম দেখাচ্ছিল আমার সাগরকে। মুখটা যদি একবার তোলে, তা হ'লে ভাল ক'রে দেখতে পাই।"

এই কথায় সকলেই রেলিংএর নিকটে আসিলেন, কিন্তু ততক্ষণ যাত্রীরা জেটী হইতে বাগানে নামিয়া পড়িয়াছে। নিখিলচাঁদ বলিলেন, "হ্যাটকোট দেখলেই যাকে তাকে তোমার মনে হয়, ঐ বুঝি তোমার সাগর। এ ষ্টীমারে সে আসতে যাবে কেন?"

করুণাময়ীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, সত্যই ত, এ বৃথা আশা। ষ্টীমার যখন রাজগঞ্জ অভিমুখে চলিয়া গেল, তখন আবার তাঁহারা চৌকিতে আসিয়া বসিলেন। করুণাময়ী আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে, ও সাগর।"

অরুন্ধতী কহিলেন, "তা হ'তেও পারে। হয় ত কলকাতায় এসে খবর পেয়েছে যে, আমরা এখানে আছি।"

নিখিলচাঁদ বাস্তব জগতের লোক। তিনি পূরা অবিশ্বাসের স্বরে বলিলেন, "তা হ'তে পারে না। তা যদি হ'ত, এতক্ষণ এখানে এসে পড়ত।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে সত্যই সাগর তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে মুহূর্ত্তকাল বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। করুণাময়ী আনন্দগদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "সত্যই কি তুই বাবা, সাগর? দেবতা দয়া ক'রে তোকে ফিরে পাঠালেন?"

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগরের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক আনন্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কখন্ যে বারুণী আসিয়া বারান্দার ধারে দাঁড়াইয়াছে, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু সাগর তাহা দেখিল এবং উভয়ের মনের তরঙ্গ অন্যের অলক্ষ্যে উভয়ের চোখের মধ্য দিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল।

সহসা আর এক জন নবাগতের আগমনে এ নিস্তব্ধ ভাব সহসা তিরোহিত হইল। এ কি! এ যে ভৈরবী! ভৈরবী আজ সে আলখাল্লা ধারণ করিয়া আইসেন নাই। তিনি এখন গৈরিকধারী, তাঁহার কেশগুলিও ঈষদ্দীর্ঘ হইয়া মুখখানিকে অভিনব শ্রীযুক্ত করিয়াছে। করুণাময়ী পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "প্রণাম কর এঁকে, সাগর, ইনিই তোমার গর্ভধারিণী।" ভৈরবী পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছেন, তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, "তুমি মা গর্ভধারিণী না হইয়াও প্রকৃত মাতা, তুমি ইহার ধাত্রী—পালয়িত্রী। নিজের স্তন্যদানে তুমি ইহাকে জীবন দান দিয়াছ। আমি কুন্তীর মত নিষ্ঠুরা মা, ইহাকে পুত্র বলিয়া ডাকিবার অধিকার আমার নাই।"

করুণাময়ী বলিলেন, "এ শুভদিনে ও কথা মুখে আনবেন না, ভৈরবী মা।"

অরুন্ধতী ইতোমধ্যে বারুণীকে দেখিয়া তাহাকে টানিয়া সাগরের পাশে দাঁড় করাইয়া কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ কর, মা, তোমার পুত্রকন্যাকে।"

ভৈরবী সানন্দ কণ্ঠে কহিলেন, "স্বস্তি—স্বস্তি, কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক তোদের।"

নীচে গঙ্গার তীরে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। তাহার মধ্য হইতে মধুর বাঁশরীতান ধ্বনিত হইয়া উপরের কয়েকটি লোকের প্রাণে বিজয়ার দিনে আগমনীর মিলন-সঙ্গীতধারা ঢালিয়া দিল।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

কেরাণী-কাব্য

মারিতে মারিতে মাছি কলম গুঁজিল কাণে।
প্রেয়সী লিখেছে পত্র দেশে মন টানে॥

The only message I can give to the politically minded is

By all means go to the councils ~~and~~ but achieve boycott of foreign cloth by wearing khaddar and spinning at least 30 minutes daily to help to make this idle nation industrious.

M. K. Gandhi

10/9/25

যাঁহারা রাজনীতি চর্চ্চা করেন, তাঁহাদিগকে আমি এই মাত্র বলিতে চাহি—ব্যবস্থাপক সভায় গমন করুন ক্ষতি নাই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খদ্দর বয়ন করিয়া ও প্রত্যহ অন্ততঃ ৩০ মিনিট সূতা কাটিয়া বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে এই অলস জাতি আবার শ্রমশীল হইতে সাহায্য করা হইবে।

এম, কে, গন্ধী।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫।

উদ্ভিদের জীবন ও প্রাণিজীবন

অজৈবিক বস্তু যে ভাবে সাড়া দেয়, তাহাতে তাহার পর উদ্ভিদের ও জীবের দেহে সাড়ার বিষয়ে অনুসন্ধান করা স্বাভাবিক। কিন্তু উদ্ভিদ প্রায়ই নিষ্ক্রিয় এবং তাহার চাঞ্চল্য ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ বলিয়া, যাহাতে তাহার সাড়া বহু সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশ পায় তাহার জন্য বিশেষ যন্ত্র নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়। তাহাতেই অণুবীক্ষণাতিরিক্ত অতি সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় এবং অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও ধরা পড়ে। এইরূপ যন্ত্র-সাহায্যে উদ্ভিদের স্বহস্তলিপির দ্বারা প্রথমেই তাহার প্রাণ প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বে উদ্ভিদ সকলকে সংজ্ঞাযুক্ত ও সংজ্ঞাহীন বলিয়া ভাগ করা হইত। সে শ্রেণীবিভাগ দূর হইয়া গেল। ফরিদপুরে যে গাছটি প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে মৃত্তিকার উপর পতিত হইত, তাহার দ্বারাই উদ্ভিদের, বিশেষতঃ কঠিন বৃক্ষের সংজ্ঞাহীনতার অপবাদ বিদূরিত হয়। আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, সর্ব্ববিধ উদ্ভিদই পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারে এবং ভাসমান মেঘাহত আলোকের সামান্য বৈচিত্র্যও অনুভব করে। পরীক্ষায় দেখা যায়, জীবদেহে ও উদ্ভিদদেহে জীবনের স্পন্দন একইরূপ এবং উভয়েই নিদ্রায় অভিভূত হয়। জীবদেহে যাহাকে হৃদয়ের স্পন্দন বলে উদ্ভিদেও তাহা বিদ্যমান। উত্তেজক, সংজ্ঞাহারক ও বিষবস্তুর প্রয়োগে উভয়ের দেহেই একরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ের এই দৈহিক সাদৃশ্য যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বিশেষরূপ সাহায্য করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, রোগীর দেহ অপেক্ষা উদ্ভিদের দেহে ঔষধের ফল-পরীক্ষা সরলভাবে নির্ব্বাহিত হইতে পারে এবং জীবদেহে পরীক্ষায় যে নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান অনিবার্য্য, তাহাও বর্জ্জন করা যায়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য ব্যবহারভেদে যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, আমার 'ক্রেস্কোগ্রাফ" যন্ত্রে তাহা ধরা পড়ে। এইরূপ অনুসন্ধান-ফলে কৃষিবিজ্ঞানেরও বিশেষ উন্নতি হইবে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

[বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে বিবৃত]